# ফুলের বাগান

ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত

9744
9744
9744
STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

৭744

# ফুলের বাগান

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal



স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

# ফুলের বাগান

ভিক্ষু বুদ্ধদেব
ও
মলয় দাশগুপ্ত

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা - ৯

প্রকাশক: ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক: দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি আই টি স্কীম ৬ এম
কলিকাতা-৫৪

কপিরাইট: মলয় দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ: বিপুল গুহ

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৭৯

নামপত্রের সামনের ছবি : এ দেশে তৈরী একটি দুরঙা স্মল ডেকরেটিভ ডালিয়া, নাম স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

মূল্য : ২০.০০

Date..........
Acc. No. ~~5969~~ 6069

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়
শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী
মহারাজের করকমলে

STATE INSTITUTE OF EDUCATION * Govt. of West Bengal *

Govt. of West Bengal

## ভূমিকা

একটি কথা আছে 'পশ্য দেবস্য শিল্পম্'। এটি বোধ হয় সব থেকে ভাল খাটে ফুলের সম্পর্কে। তার পাপড়ির বিন্যাস, রঙের বৈচিত্র্য, গন্ধের মাধুর্য মানুষের মনকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে। তা কোনও ব্যবহারিক কাজে লাগে না; তার ব্যবহার আধ্যাত্মিক। তা আনন্দ দেয়, তা যে শক্তি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবিষ্ট করে। তাই আমরা তাকে ব্যবহার করি শ্রদ্ধা নিবেদনের বা প্রীতি নিবেদনের প্রতীক হিসাবে। দেবতাকে ফুল দিয়ে পূজা করি, শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে ফুলের মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, প্রীতি-ভাজন ব্যক্তিকে ফুল উপহার দিই। তা আনন্দ দেয় বলে ফুল দিয়ে ঘর সাজাই, ফুলবাগান করে বাড়ীর পরিবেশ সুন্দর করি।

তাই দেখি ফুলের আবেদন সর্বজনীন। যে সৌন্দর্যের পূজারী, তার কাছে তার আকর্ষণ তীব্র। শুনেছি জাপানীরা এত ফুল ভালবাসে যে ধনী-দরিদ্র সকলেরই প্রতিদিন ঘর সাজাতে ফুল দরকার হয়। গরিব মানুষ ফুল দিয়ে ঘর সাজাতে অনাহারে থাকবে তবু পয়সা দিয়ে ফুল কিনবে। তারা ফুল এত ভালবাসে বলেই বোধ হয় ফুল সাজানো তাদের সমাজে একটি শিল্প হয়ে গড়ে উঠেছে। তার অনুসরণে 'একাবেনা' চর্চা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তিবিদ্যার জয়জয়কার। তার প্রভাবে গ্রামের মানুষ নগরবাসী হচ্ছে। ফলে সে প্রকৃতি হতে দূরে সরে আসছে। অথচ ইট-পাথর-সিমেন্টের শুষ্ক পরিবেশে মন যখন নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন প্রকৃতির স্পর্শের চন্দনপ্রলেপের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আমার মনে হয় একালে পুষ্পচর্চার প্রয়োজন আরও বেশী। বাড়ীর সংলগ্ন এক ফালি জমি জুটল তো ভালই, না জুটলে ছাত, তা না জুটলে বারান্দায় যদি ফুল ফোটাতে পারি, তা হলে অবসর-সময়-বিনোদনের সুযোগ পাই, ফুল ফুটিয়ে আনন্দ পাই, ফুলের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির স্পর্শ লাভ করে মনকে স্নিগ্ধ করতে পারি।

তাই বর্তমান যুগে ব্যাপক হারে পুষ্পচর্চার খুব দরকার আছে। এখানে নিজেই নিজের শিক্ষক হতে হবে। কিন্তু তার জন্য দরকার এমন একটি উপযুক্ত পুস্তকের, যাতে সকল কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে। আমার যতদূর জানা আছে, বাংলায় এ ধরনের পুস্তক ছিল না। আমার ধারণায় আলোচ্য পুস্তকখানি সে অভাব পূরণ করবার ক্ষমতা রাখে। পুস্তকের অন্যতম লেখক ভিক্ষু বুদ্ধদেবের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে। আমি বছরের পর বছর ধরে দেখে এসেছি কতখানি ঐকান্তিকতা নিয়ে তিনি নরেন্দ্রপুরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ফুলচাষ নিয়ে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ফলে তিনি এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কিছু কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি একটি সংকর ডালিয়া উৎপাদন করে এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রদর্শনীতে সকল জাতির ডালিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেটির তিনি নাম দিয়েছেন 'ভিক্ষুজ মাদার'। এইজন্য পুস্তকখানির নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হতে সঞ্চিত বিদ্যাকে অবলম্বন করেই এই পুস্তক রচিত হয়েছে।

বইটি পড়ে তার যেগুলি উল্লেখযোগ্য গুণ বলে আমার ধারণা হয়েছে, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি :

(ক) এর প্রধান গুণ ব্যাপকতা। ফুল চাষের সব বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; কিছু বাদ পড়েছে বলে মনে হয় না। বাগানে ফুলচাষ, ছাতে ফুলচাষ, বৃত্তি হিসাবে ফুলচাষ, অসাধারণ শ্রেণীর ফুলচাষ—যেমন অর্কিড, ক্যাকটাস—কিছুই বাদ পড়েনি। এমন কি

জাপানে যে বড় বনস্পতিকে ছোট করে টবে রাখার পদ্ধতি আছে (যাকে বনসাই বলে) তারও সবিস্তার বিবরণ আছে এবং আমাদের দেশে তার চর্চা কিভাবে সম্ভব সে বিষয়েও উপদেশ দেওয়া আছে।

(খ) প্রত্যেকটি বিষয়কে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ শ্রেণীর ফুলের কি করে চারা উৎপাদন করতে হয়, কি সার দিতে হয়, কেমন ভাবে জল দিতে হয়—সবই উল্লেখিত হয়েছে। ফলে অনভিজ্ঞ মানুষেরও নিজের পছন্দমত নির্বাচিত ফুলের চাষ সহজ হবে।

(গ) প্রতিটি ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে। যেখানে সম্ভব বাংলা নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কিউবা হতে আনা লেমোনিয়া ফুলের নাম যে লাবনি, স্প্যাথোডিয়ার নাম যে রক্তোপল তা এই বই হতে জানতে পারি। প্রয়োজন মত জনপ্রিয় ফুলের সংস্কৃত নামও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এই বই পড়ে শিখলাম রঙ্গনের সংস্কৃত নাম রুক্মিণী। আরও শিখলাম শিউলির সংস্কৃত নাম পারিজাত। তাই কি স্বর্গের পারিজাত? এই ধরনের তথ্য রচনাকে শুধু সরস করে না, পুষ্পচর্চায় আকর্ষণও বাড়ায়।

এক কথায় বলা যায়, সাঁইত্রিশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই নাতিবৃহৎ বইখানি বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ করবে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, সহরবাসীদের মধ্যে ফুলচাষের আকর্ষণ সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছে। এখন দেখি অনেকেরই ছাতে বাগান আছে। বর্তমান যুগের প্রতিকূল পরিবেশে নানা যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনকে স্নিগ্ধ করতে, সুন্দর করতে পুষ্পচর্চার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ধারণা তার জন্য এই গ্রন্থ উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।

১ বালিগঞ্জ টেরাস,
কলিকাতা-১৯

**হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়**

STATE INS
Gov. of We

## প্রস্তাবনা

সমতল বাংলায় সারাবছর ধরেই খুব ভাল ফুলের চাষ করা সম্ভব। এখানে ফুলের বাগানের পরিচর্যা কি হওয়া উচিত এই বইটি সে বিষয়ে লেখা। জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থার উপরে বাগান করার পদ্ধতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। সমতল বাংলায় যে ভাবে চাষ করা হয়, সমতল বিহারে ঠিক একই ভাবে চাষ করা যাবে না, যদিও দুয়ের ভেতরে দূরত্বের পরিমাণ এমন কিছু নয়। কাছাকাছি জায়গার ভেতরে পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না ঘটতে পারে, কিন্তু প্রভেদ থাকবেই। বইটির নাম 'ফুলের বাগান' হলেও এতে ফুল-বাগানের সুপ্রতিষ্ঠিত অধিবাসী বাহারি পাতার গাছ, লন প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে। আসলে ফুলবাগানের বাইরে এদের কিছুতেই রাখা চলে না। ফুলের বাগানের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য পাখির সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

বইটির বিস্তারিত সূচীপত্র ও নির্ঘণ্টের সাহায্যে বিভিন্ন ফুলগাছ ইত্যাদির সম্পর্কে এতে কি আছে তা সহজেই বার করা যাবে। গাছের পরিচয় দেবার কাজে তাদের বেশি প্রচলিত নামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বহুল প্রচলিত বাংলা নাম থাকলে তাদের পরিচয় করানো হয়েছে সেই নামে। বাংলা নাম আছে কিন্তু যথেষ্ট প্রচলিত নয়, এ অবস্থায় গাছের পরিচিতির ক্ষেত্রে এ নামটির উল্লেখ রয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যার নাম সব গাছের প্রধান পরিচয়ের বেলাতে জানানো হয়েছে। নানা কারণে উদ্ভিদবিদ্যার নামেরও পরিবর্তন ঘটে এবং কোন কোন গাছের একাধিক বৈজ্ঞানিক নামও প্রচলিত। এদের বেলায় এ দেশে বেশি প্রচলিত নামটি সাধারণত ব্যবহার করেছি। বইটির মূল অংশে উদ্ভিদবিজ্ঞানের নাম তাদের উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলাতে লেখা হয়েছে। তবে ল্যাটিন নামগুলির উচ্চারণ সঠিক কি হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বোধ হয় সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে এখানে প্রচলিত উচ্চারণের সঙ্গে শুদ্ধ উচ্চারণের প্রভেদ এত বেশি যে শেষের উচ্চারণে সে গাছটিকে এখানে চেনা অতি সুকঠিন কাজ। আবার, একই ল্যাটিন নামের উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং এদের স্ট্যাণ্ডার্ড কোন উচ্চারণ পাওয়া বুঝি অসম্ভব; ল্যাটিনের এই দিকটি আমাদের অসুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। উচ্চারণের বেলায় বেইলীর 'দি স্ট্যাণ্ডার্ড সাইক্লোপিডিয়া অব হর্টিকালচার' এবং দুজন ল্যাটিনবিদ্ বিদেশী অধ্যাপকের সাহায্য নিয়েছি। এবং এখানে প্রচলিত উচ্চারণ যতটা বজায় রাখা সম্ভব তার চেষ্টা করেছি। বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে এরকম সব গাছের উদ্ভিদবিদ্যার নাম রোমীয় হরফে বইটির পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। তাই উচ্চারণ সম্পর্কে দ্বিমত হবার অবকাশ থাকলেও ঠিক কোন্ গাছটিকে তা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার পক্ষে কোন অসুবিধা থাকছে না। এখানে ফুলগাছের আদিনিবাসের কথাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বেশ কিছু গাছ রয়েছে যাদের আদি বাসস্থান বেশ কয়েকটি দেশ জুড়ে, সাধারণত প্রধান দেশটির নাম উল্লেখ করেছি এদের বেলায়।

'ফুলের বাগান' মূলত ভিক্ষু বুদ্ধদেবের লেখা। বইটির বহু লেখা বিভিন্ন নামী পত্রপত্রিকায় ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক হিসাবে এ বইটির প্রকাশনা সম্পর্কিত সব দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার একার। বইটির ব্যাপারে বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকে উৎসাহ বা সাহায্য পেয়েছি, এঁদের সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। কলকাতার বিখ্যাত বীজ-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান 'সাটন অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড' বইতে ব্যবহারের জন্য বেশ কয়েকটি ব্লক দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

কি ভাবে ব্যবহার করলে এ বইটি সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিচে রাখছি :

ফুলগাছ সম্পর্কে কোন ভাল লেখা পড়ার পরেও কি ভাগে সারমাটি তৈরী হবে,

বাড়তি সার ঠিক কোন অবস্থায় দেওয়া দরকার বা তার পরিমাণ, জলের পরিমাণ ও তার দেবার ভাল সময় প্রভৃতি তত পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় না বলে আমাদের অভিজ্ঞতা। অথচ, ফুলবাগান করতে চাইলে প্রতিটি জিনিষ খুঁটিয়ে বোঝা দরকার। এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিটি অধ্যায়কে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করে লেখা হয়েছে। এছাড়া ভাষার বেলায় জোর দেওয়া হয়েছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলার উপরে। বইটিতে অনেক সময়ে মাটি ও সারমাটি, বাগান ও ফুলবাগান ব্যবহৃত হয়েছে সমার্থক হিসাবে; অথবা ফুলগাছ শব্দে ফুলগাছ ব্যতীত গাছকেও বোঝানো হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্যটি পড়লেই ঠিক কি অর্থে এদের ব্যবহার ঘটেছে তা ধরা পড়বে।

দ্বিতীয়ত, 'ফুলবাগানের প্রস্তুতি' ও 'পরিচর্যার গোড়ার কথা' অধ্যায় দুটি প্রথমে পড়ে নিলে ভাল। এ দুটি অধ্যায় অনেক পরিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'ফুলবাগান ঘিরে নানান চিন্তা' অধ্যায়টি ফুলের বাগানকে কেন্দ্র করে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে এই আশা নিয়ে লেখা। ফুলগাছ প্রভৃতির সংকর প্রজাতি উৎপত্তির উপরে বিভিন্ন জায়গায় জোর দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংকর প্রজাতির হাতেই ফুলবাগানের সত্যিকারের শ্রীবৃদ্ধির চাবিকাঠি রয়েছে।

তৃতীয়ত, বইটির পরিশিষ্টে (১) পারিভাষিক শব্দাবলী, (২) গাছের প্রচলিত নাম ও পাশে রোমীয় হরফে তাদের উদ্ভিদবিজ্ঞানের নাম, (৩) গাছের প্রাপ্ত বাংলা নাম এবং পাশে রোমীয় হরফে সেই সব গাছের উদ্ভিদবিদ্যার নাম, এবং (৪) গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, বুগেনভিলিয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট জনপ্রিয় গাছগুলির বাছাই প্রজাতির কয়েকটি তালিকা স্থান পেয়েছে। বাছাই প্রজাতির তালিকাগুলি গাছ নির্বাচনে সাহায্য করবে। বাড়তি সুবিধার কথা মনে রেখে এই তালিকাগুলিও রোমীয় হরফে করা হয়েছে। পরিশিষ্টে উদ্ভিদবিজ্ঞানের নামগুলি রোমীয় হরফে থাকায় অন্যান্য পুস্তকে বা গাছ-বিক্রেতার ক্যাটালগে এদের খুঁজে পাওয়া যাবে খুব সহজেই। পরিশিষ্টে একটি গ্রন্থপঞ্জীও স্থান পেয়েছে। এর প্রতিটি বই দ্বারা উপকৃত হয়েছি। বাংলায় লেখা বই দুটি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি তাদের পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই। গ্রন্থপঞ্জীর বইগুলি ফুলবাগানে আগ্রহী ব্যক্তি-মাত্রেরই ভাল লাগবে এটা বিশ্বাস করি।

কলকাতা

**মলয় দাশগুপ্ত**

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

সূচীপত্র

# ফুলবাগানের প্রস্তুতি

কোন এক মনীষী বহুকাল আগে বাগান করাকে সুখী হবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে নির্দেশ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। তবে একথা ঠিক কিনা তা উপলব্ধি করার ভার যাঁরা বাগান করেন তাঁদের উপরে। বাগান করে আনন্দ পাননি একথা এখনও কাউকে বলতে শুনিনি। তবে বাগান করার ভেতরেও ফুলের বাগান করে যতটা আনন্দ পাওয়া যায় অন্যান্য ধরনের বাগান করে ততটা আনন্দ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। নতুন কোন ফুল কিরকম ফুটেছে তা দেখার জন্য অনেক দিন ধরে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা বা অনেক সময় মাঝ রাতে এসেও দেখে যাওয়া নতুন ফুলটি কতটা ফুটলো, এ ধরনের অভিজ্ঞতা অনেকের। আবার অন্যকে নিজের আনন্দের ভাগীদার করতে এইসব ফুল সম্পর্কে উৎসাহভরে সবাইকে শোনানো, তা অন্যরা শুনতে আগ্রহী হোন বা নাই হোন, এ রকমও দেখা যায় প্রায়ই। তাই, এই মনীষী তাঁর এই কথা দিয়ে বিশেষ করে ফুলবাগানকেই বোধ হয় বুঝিয়েছিলেন।

এ কথা খুবই প্রচলিত যে বাগান কতটা ভাল হবে তা একান্তভাবে নির্ভর করে অর্থসম্বলের উপরে। কথাটিতে বেশ কিছুটা সত্যতা আছে ঠিকই কারণ অর্থব্যয় না করে বোধ হয় কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। তবে টাকা খরচের অনুপাতে বাগানের সৌন্দর্য বাড়বে একথা নিশ্চয়ই সত্য নয়। অর্থের সঙ্গে রুচির যোগ হলে তা সত্যিই ফুলবাগানকে সৌন্দর্যময় করে তুলবে। কিন্তু রুচিবোধকে প্রধান সম্বল করে খুব সাধারণ খরচেও সুন্দর বাগান করা সম্ভব। বছর কয়েক আগে যাদবপুর অঞ্চলে একটি ছোট সুন্দর বাগান দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। বাগানটিতে সম্যক্ রুচিবোধের পরিচয় ছিল এবং এটি গড়ে তোলা হয়েছিল নিতান্ত সাধারণ খরচে। এক সময়ে ফুলবাগান করা ছিল বড়মানুষীর পরিচায়ক। কিন্তু সে ধারণার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছে। সামর্থ্য সীমিত হলেও কিছু না কিছু ফুলগাছ বা অন্য গাছ চাষ সবাই করতে পারেন। ফুলবাগান যতই ছোট হোক না কেন. আনন্দ দেবার বেলায় তা অন্য যে কোন আয়তনের ফুলবাগানের সমান হয়ে দাঁড়াবে।

ফুলবাগানের কাজ সারা বছরের কাজ। কাজের চাপ কখনও বেশি এবং অনেক সময়ে খুবই সাধারণ। কাজের চাপ থাক বা নাই থাক ফুলবাগান কখনো অনাদৃত অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত নয়। কিছুদিন অনাদরে কাটাতে হলে সেই ফুলবাগানের আগেকার সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ নিয়মিত পরিচর্যা করলে দেখা যাবে যে, কাজের পরিমাণ কিছুই নয়। ফুলবাগানের সব কাজই সুচারু ভাবে হওয়া দরকার। নইলে অবহেলার প্রতিফল কোন না কোন সময়ে ঠিক পেতে হবে। ফুলবাগানের কোন কাজই কঠিন নয় তবে ভাল ফুলবাগান করতে প্রধান দরকার ফুলগাছ প্রভৃতি আমাদের আপনজন এই বোধ।

**বাগানের লে-আউট ॥**
ফুলবাগানের লে-আউট বা বিন্যাস কিভাবে হলে তা সবচেয়ে ভাল হবে সে বিষয়ে বহু মত রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সুচিন্তিত মতবাদ থাকলেও, বাগান যিনি করবেন তাঁর ব্যক্তিগত রুচির উপরে ফুলবাগান দেখতে ভাল হবে কিনা তা প্রধানত নির্ভর করবে। লে-আউট কি ভাবে করবেন তা স্থির করার আগে বিভিন্ন ফুলবাগান ঘুরে তাদের লে-আউট ভাল করে অনুধাবন করে নিলে এ কাজ সহজ হবে। লে-আউট

করতে যেসব গাছপালা নতুন ফুলবাগানে বসাতে চান তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাও একান্ত দরকার। ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে রুচিবোধের প্রাচুর্য ও লে-আউট সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলেও ভাল ফুলবাগান করা সম্ভব হবে না। কোন একটি গাছ তার তিন বছরের আকৃতিতে কোন ফুলবাগানের পক্ষে হয়তো খুবই সুশোভন, কিন্তু সেই গাছই দশ বছর পরে যখন প্রকাণ্ড আকৃতি পায় তখন সেটিই সেই বাগানের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় একান্ত বেমানান। তাই গাছ প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় কি আয়তন হবে তা মনে রেখে গাছ বেছে নিতে হবে। পুরানো বাগানের বেলায় তার আগেকার লে-আউট বজায় রেখে বাগান সংস্কারে মন দিলে ভাল ফুলবাগান করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠবে। কোন পুরানো গাছ একান্ত দরকার না পড়লে কাটবেন না।

বড় ফুলবাগানের বেলায় প্রকৃতিকে যতটা সম্ভব অনুকরণ এবং বাড়ির সামনের ছোট বাগানের বেলায় জ্যামিতিক রেখায় ফুলবাগানকে ভাগ করা অনেকে পছন্দ করেন। ফুলবাগান কি রকম করতে চান মনে মনে তার একটি পরিষ্কার ছবি এঁকে তা বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করবেন। তবে মনে যে ছবি আঁকবেন তা বাস্তবে পরিণত করা যেন সহজ হয়। প্রত্যেক ফুলবাগানেই অন্তত ছোট একটু লন থাকা ভাল কারণ বাগানের সৌন্দর্য বাড়াতে লনের একরকম কোন জুড়ি নেই। বাগানের প্রধান ও অপ্রধান পথগুলি একটু ঘুরিয়ে করলে তা বাগানকে আরও সুন্দর করে তুলবে এবং বাগানকে তার প্রকৃত আয়তনের চেয়ে বড় করে দেখাবে।

ফুলবাগানের লনে দুয়েকটি বাছাই গাছ ভাল মানালেও এর ভেতরে ফুলের কেয়ারি মোটেই মানায় না। ফুল ফোটা অবস্থায় এগুলি দেখতে খারাপ না লাগলেও কোপানো কেয়ারি অবস্থায় এগুলি দেখতে খুবই বিসদৃশ। গোলাপের জমিখণ্ডটিও কখনই ফুল-বাগানের প্রধান দর্শনযোগ্য জায়গায় হবে না। ফুল ফোটা অবস্থায় গোলাপের ক্ষেত দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু অন্য সময়ে এটি মোটেই ভাল দেখায় না। টেলিফোনের ইনসুলেটার প্রভৃতি দিয়ে অনেকে পথের পাশ সাজান, কিন্তু এতে ফুলবাগানের সৌন্দর্য বাড়ে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ফুলবাগান করার বেলায় একটি জিনিস বিশেষ মনে রাখার দরকার যে বাগানে কখনই গাছের ভিড় করা হবে না। বাগানের আয়তন অনুযায়ী যে কয়টি গাছ ভালভাবে করা যেতে পারে তার বেশি কখনই লাগাবেন না।

**সমতল বাংলায় ফুল ফোটে সারাবছর ধরে ॥**

প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে সমতল বাংলায় ফুল ফোটানো যায় সারাবছর ধরে। এ সুযোগ পৃথিবীর বহু দেশে নেই, ভারতেরও অনেক অঞ্চলে নেই। সমতল বাংলায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রচুর মরসুমী ফুল রয়েছে; শীতের মরসুমে আরও রয়েছে গোলাপ, ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকা—এই তিনটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুল। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কন্দজ ও দীর্ঘজীবী ফুলগাছ। ফুলগাছের সঙ্গী হিসাবে আরও রয়েছে বিভিন্ন বাহারি পাতার গাছ। এখানে এটাও দেখা যায় যে, পরিচর্যার কিছু হেরফের করলে বিদেশ থেকে আনা অনেক গাছ আরও ভাল চাষ করা সম্ভব। আমাদের উপরে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য খুবই রয়েছে কিন্তু দাক্ষিণ্য গ্রহণ করার উপযুক্ততা আমরা এখনও অর্জন করিনি এবং এটা করাই আমাদের সামনে এখন প্রধান কর্তব্য।

**যে জায়গায় বারো মাসই ফুল ফোটানো দরকার ॥**

ফুলবাগানের কিছু বিশিষ্ট জায়গা রয়েছে যেখানে সারা বছর ধরে ফুল ফোটাতে ইচ্ছে করে। শুধু টবের গাছ দিয়ে সাজানো হলে এ কাজ করা কঠিন নয় কিন্তু কেয়ারিতে স্বাভাবিক নিয়মে এটা করা বুঝি অসম্ভব। কারণ কেয়ারির আগের মরসুমের গাছ তুলে ফেলে জমি তৈরী করে পরের মরসুমের ফুলগাছের চারা লাগাতে বেশ কিছু সময় লাগবে। এবং চারাগাছ লাগাবার পরও অনেকদিন লাগবে তার ফুল ফুটতে। তাই আগের মরসুমের ফুল ফুটে যাওয়া থেকে পরের মরসুমের ফুল ফুটতে আরম্ভ করা পর্যন্ত কেয়ারিতে

কোন ফুল থাকছে না। সারা বছর ধরে ফুল দেয় এরকম কিছু দীর্ঘজীবী ও ওষধি গাছ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু শুধু তাদের দিয়ে রুচিমাফিক সাজানো চলে না। এই অবস্থায় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে ফুলগাছ লাগিয়ে এই সব কেয়ারিতে একরকম সারা বছরই ফুল ফোটানো যেতে পারে। কেয়ারিতে মরসুমী ফুল ফুটতে থাকা অবস্থাতেই অন্য ফুলের চারা ছোট টবে চাষ করে মোটামুটি বড় করে নিতে হবে। প্রধান তিনটি মরসুমের বিশিষ্ট গাছগুলি এবং প্রধান মরসুম ছাড়া অন্য সময়ের জন্য বছরের যে কোন সময়ে ফুল ফোটানো যায় এরকম মরসুমী ফুলগুলি এ কাজে বেছে নেওয়া ভাল। টবের বেলায় পনেরো সেণ্টিমিটার গামলাটব বেশি ভাল কাজ দেবে। কেয়ারিতে ফুল দেওয়া শেষ হতে চলেছে এই সময়ের ভেতরে টবের চারাগাছগুলি মোটামুটি বড় করে নিতে হবে। ভাল ফুল দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে এরকম মরসুমী ফুলগাছগুলি তুলে দিয়ে কেয়ারি খুব অল্প সময়ের ভেতরে আবার ফুল গাছ লাগাবার উপযুক্ত করে নিতে হবে। এবার ঐ ছোট টব থেকে মাটিসুদ্ধ ফুলগাছগুলি খুলে কেয়ারিতে বসিয়ে দেবেন। এই গাছগুলি অল্পদিনের ভেতরেই ফুল দিতে আরম্ভ করবে, ফলে কেয়ারিতে একরকম সারা বছর ধরেই ফুল পাওয়া সম্ভব হবে। ছোট টবে থাকা অবস্থায় গাছগুলিতে পাতার সার ব্যবহার করে আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে।

**ফুলের রঙ মিলিয়ে লাগানো ॥**

ফুলের রঙ মিলিয়ে লাগালে তা দেখতে আরও ভাল দেখাবে। মরসুমী ফুলের বেলায় ফুলের রঙ মিলিয়ে লাগানোর কিছুটা রেওয়াজ রয়েছে। এদের ছাড়া ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, সর্বজয়া প্রভৃতি যেসব ফুলগাছ কাছাকাছি অনেকগুলি লাগানো হয় তাদের বেলায়ও রঙ মিলিয়ে লাগালে তা চমৎকার দেখায়। কোন্ রঙ কোন্ রঙের পাশে খুব ভাল মানাবে বা কোন্ দুটি রঙ পাশাপাশি মানাবে না তা সেই সব গাছ পাশাপাশি চাষ না করে জোর করে কিছু বলা যায় না। সাধারণ অবস্থাতে ঘন লাল ও কালো রঙ দুটি পাশাপাশি মোটেই মানানসই নয়, কিন্তু ক্লায়ান্থাসের বেলায় এ দুটি রঙই পাশাপাশি অবস্থায় অপূর্ব মানানসই। ফুল পাশাপাশি চাষ না করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলেও এই নিয়মগুলি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। লালের পাশে কমলা রঙ, কমলা রঙের পাশে হলদে রঙ ও সবুজ রঙের পশ্চাদ্ভূমির সামনে হলদে রঙের ফুল বেশ মানায়। লাল বা কালচে রঙের মাঝে মাঝে সাদা রঙও বেশ ভাল, এবং এই একই ভাবে ভাল সাদা রঙের ভেতরে লাল বা কালচে লাল রঙের ফুলগুলি। অনেক জাতের ফুলের বিভিন্ন রঙের প্রজাতি রয়েছে, এদের অনেকটা সমধর্মী রঙগুলিকে পাশাপাশি লাগালে বেশ দেখাবে। চড়া রঙের ফুলগুলি যেগুলি সহজেই চোখে পড়ে, তাদের দেওয়া উচিত কেয়ারির দূরপ্রান্তে এবং কাছে দেওয়া উচিত হালকা রঙের ফুলগুলি। শুধু একটি রঙের একই ফুল কেয়ারিতে লাগাতে চাইলে একাজে বেশ উজ্জ্বল রঙের ফুলগুলি বেছে নেওয়া ভাল, এবং এসব জায়গায় হালকা নীল প্রভৃতি রঙের ফুল খুব একটা মানায় না।

**গাছ নেড়া করে ফুল না তোলা ॥**

আমাদের একটি ভাইসরয় প্রজাতির জবা গাছে তার ফুলের মরসুমে প্রতিদিন তিরিশ পঁয়ত্রিশটি ফুল ফুটে গাছটিকে অপূর্ব সুন্দর করে তুলতো। কিন্তু প্রতিদিনই এক ব্যক্তি নিজের ঘরের একখানি ছবিতে দিতে সব কয়টি ফুল তুলে নিয়ে যেতেন। কাউকে এই ফুলভরা গাছটি দেখাতে চাইলেও তার কোন উপায় ছিল না। পূজার জন্য গাছের সব ফুল তুলে নেওয়া অনেকেরই অভ্যাস। অথচ ফুলের সময়ে গাছে ফুল না থাকলে সারা বাগানটাই কেমন মনমরা হয়ে পড়ে। পূজার জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ফুল নিশ্চয়ই তোলা হবে; কিন্তু কিছু ফুল তোলা এবং গাছে কিছু ফুল রেখে দেওয়া এটাও তো করা যেতে পারে। এছাড়া, গাছের ফুল তো বিরাটের পূজায়ও লাগছে।

**অহেতুক ফুল ছেঁড়া ॥**

ফুল এবং অনেক সময়ে ফুলগাছও নষ্ট করার প্রবৃত্তি আমাদের পেয়ে বসেছে। মাঝে

মাঝে এটা এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে, অনেকে উপায়ান্তরবিহীন হয়ে ফুলের চাষই ছেড়ে দেন। অনেকে ফুলের চাষ শুধুই বিলাস বলে মনে করেন এবং এর যে বিভিন্ন অর্থকরী দিকও থাকতে পারে তা তাঁরা বুঝতে চান না। প্রধানত এর ফলেই ফুলগাছের ক্ষতি করতে অনেকের বাধে না। এছাড়া, অহেতুক ফুল ছেঁড়া অনেকের অভ্যাসও। অহেতুক ফুল ছেঁড়ার সার্থক শাস্তির সংখ্যা বোধ হয় মাত্র একটি। এ শাস্তিটির রূপ এই—এই দোষে দোষী ব্যক্তিকে দিয়ে বছরখানেক ফুলের চাষ বা পরিচর্যা করানো। এই এক বছরে তিনি ফুলকে ভালবেসে ফেলবেনই। এর পরে ফুল রক্ষা করতে এই ব্যক্তি নিজেই এগিয়ে আসবেন।

**জমি তৈয়ারী ও ড্রেন ॥**

জমি ঠিকমত তৈরী করার উপরে গাছ কিরকম জন্মাবে তা বিশেষ ভাবে নির্ভর করবে। জমি বা টবের সারমাটি ঠিকমত তৈরী না হলে তা থেকে অসুবিধা দেখা দেবেই। জমির মাটি সব সময়েই গভীর করে কোপানো দরকার। সমতল বাংলায় অনেক জায়গাতেই আগাছার খুব উপদ্রব, মাটি কুপিয়ে উল্টিয়ে দিয়ে তাতে গ্রীষ্মের কড়া রোদ খাওয়াতে পারলে এদের উপদ্রব অনেকটা কমবে। কেয়ারিতে দু'ভাবে সার মেশানো যায়, 'শীতের মরসুমী ফুল' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বৃষ্টির দিনে গাছের গোড়ায় জল জমলে গাছ মরে যাবে বা গাছের প্রভূত ক্ষতি হবে। এ অবস্থায় যাতে পড়তে না হয় সেজন্য প্রথম থেকেই বাড়তি জল বের করে দেবার ভাল ব্যবস্থা করা দরকার। ড্রেন এমন জায়গা থেকে বা এমন ভাবে করা উচিত যা ফুল-বাগানের সৌন্দর্যহানি ঘটাবে না। ড্রেন কোথায় ও কি ভাবে করবেন তা বাগানের লে-আউটের সময়েই ঠিক করে নেবেন।

**গাছ কেনা ও গাছের নম্বর ॥**

গাছ, বীজ, সার প্রভৃতি বিশ্বস্ত জায়গা থেকে যোগাড় করতে হবে ; এগুলি উচ্চ মানের না হলে বাগান করার সব পরিশ্রমই বৃথায় যাবে। উচ্চমানের গাছ ইত্যাদি কিনতে দাম অপেক্ষাকৃত বেশি পড়লেও তা আখেরে কাজ দেবে ভাল। আমাদের সস্তায় জিনিস কেনার ঝোঁক বড্ড বেশি। এভাবে ঠকছি কিন্তু তবুও সাবধান হতে চাই না। এরকম গাছ-বিক্রেতার অভাব নেই যারা ভাল ডালিয়ার কচিগাছ বলে বীজের অপাঙ্‌ক্তেয় ডালিয়া গাছ বা নামী আমের কলম বলে অতি নিকৃষ্ট আমের কলম ইচ্ছা করে দিয়ে থাকে। ছোট অবস্থায় এ সব গাছ দেখে কিছু বোঝা সম্ভব নয়। গাছের ফুল বা ফল দেখে জানতে পারি যে ঠকেছি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য যে, এদের গাছ বছরের পর বছর বিক্রীও হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এদের কাজের প্রতি আমাদের এক ধরনের সমর্থন রয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গাছ কিনতে হয়তো মূল্য অপেক্ষাকৃত কম লাগবে কিন্তু এভাবে ভাল বাগান কিছুতেই করা সম্ভব হবে না।

ফুলবাগানের গাছের কোনটির কি নাম তা সহজে খুঁজে পাবার ভাল ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। এ কাজ গাছের অবলম্বনের সঙ্গে সেই গাছের নাম বা গাছের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর বেঁধে করা যেতে পারে। একই সঙ্গে কোথায় কি গাছ লাগানো হয়েছে তার একটি নকশা এঁকে রাখা উচিত। গাছের জন্য নম্বরের ব্যবস্থা করলে খাতাতে সেই নম্বর ও তার পাশে গাছের নাম লিখে রাখবেন। আজকাল এলুমিনিয়ামের লেবেল সহজেই পাওয়া যায়, এগুলি নম্বর বা নাম লেখার পক্ষে বেশ কাজের। অনেকে দাবি করেন গাছের পাতা দেখে গাছ সঠিক ভাবে চিনতে পারেন বলে, এটা অল্প কিছু গাছের বেলায় সম্ভব হলেও অনেক গাছের বেলায় কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই গাছের নাম রাখার ভাল ব্যবস্থা করতেই হবে, এবং এ কাজ করতে হবে বাগান করার শুরু থেকেই।

**গাছের বংশবিস্তারের পদ্ধতি জানার প্রয়োজনীয়তা ॥**

প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করতে চাইলেও আমাদের দেশে এখনও ভাল বা সঠিক গাছ যোগাড় করা মোটেই সহজ নয়। ভাল গাছ পেতে অপেশাদার গাছ-বিক্রেতার কাছ থেকে

গাছ কেনা ভাল। তবে সবচেয়ে ভাল আমরা নিজেরাই যদি গাছের বংশবৃদ্ধির উপায়গুলি জেনে নিয়ে এদের বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করি এবং প্রয়োজনমত গাছ পালটাপালটি করি। এভাবে ভাল গাছ পাবার সমস্যা খুব ভাল ভাবেই মিটতে পারে।

**যন্ত্রপাতি ॥**

কি যন্ত্রপাতি লাগবে তা ফুলবাগানে কি কি করবো তার উপরে নির্ভর করবে। বীজ, গাছ ইত্যাদি বিক্রেতার কাছে অনেক সময়েই বাগান করার সব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে পাওয়া যায়। কি যন্ত্রপাতির কি ব্যবহার তাও তাঁদের কাছে সহজেই জানা যাবে। সিকেটার, চোখকলমের ছুরি, প্রেশার স্প্রেয়ার, ফুলকাটার কাঁচি ইত্যাদি একরকম সব ফুলবাগানেই দরকার পড়ে। সব যন্ত্রপাতিই যেন উচ্চমানের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন, এগুলি উচ্চমানের হলে তা অনেক বেশি দিন ধরে ভাল কাজ দেবে। সূক্ষ্ম ও দামী যন্ত্রপাতির অবসরের বেলায় সেগুলিতে ভেসিলীন লাগিয়ে রাখা দরকার যাতে তাদের ধার না পড়ে যায়।

**ফুলবাগান করার আনন্দ পেতে হলে ॥**

অনেকে ফুলবাগান করাটা ফ্যাশানের একটা অংগ বলে মনে করেন। এ'দের বাড়িতে বাগান থাকে ঠিকই কিন্তু সে বাগান সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া থাকে মালীর উপরে। ভাল কাজ জানে এ রকম মালী পাওয়া খুব কঠিন, তাই এই সব বাগান বড় একটা ভাল হতে দেখা যায় না। নিজে হাতেনাতে ফুলবাগানের কাজ না জানলে দেখিয়ে দেওয়াও যায় না বলে মালীকে দিয়ে যথেষ্ট কাজ পাওয়াও সম্ভব নয়। ফুলবাগানের বিভিন্ন ভারি কাজে মালীর সাহায্য নেওয়াতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু ফুলবাগানের সূক্ষ্ম কাজগুলিতেও আমরা যদি অংশ না নিই তাহলে বাগান করার পুরো আনন্দ কিছুতেই পাওয়া যাবে না। তাই নিজের স্বার্থেই ফুলবাগানের কাজে আমাদের হাত লাগাতে হবে।

# পরিচর্যার গোড়ার কথা

এই অধ্যায়ে আলোচিত পরিচর্যাগুলি এই বইয়ের বেশির ভাগ গাছের পক্ষেই প্রযোজ্য। যেহেতু এগুলি অনেক গাছের পক্ষেই সমান খাটে তাই বিভিন্ন অধ্যায়ে পুনরাবৃত্তি না করে এখানে এক জায়গাতে সবগুলি তুলে ধরা হয়েছে। তবে লন, অর্কিড, ক্যাকটাস, ছায়াঘরের গাছ, জলজ ফুলগাছ ও বনসাই-এর বেলায় এর অনেক নিয়ম খাটলেও তাদের এই অধ্যায়ের আওতার বাইরে রাখা হলো। তাদের বেলায় সেখানে যেরকম পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে সেরকম পরিচর্যা করা ভাল। অন্য কোন গাছের বেলায় এখানে যা যা বলা হয়েছে তার কোনটির কিছু বিপরীত বলা হয়ে থাকলে সেইটি অনুসরণ করা দরকার; যথা, ক্রায়ান্থাসের বেলায় অন্যত্র গোড়া খোঁচার বিপক্ষে বলা হয়েছে।

**বীজ বা কাটিং বসাবার মাটি শোধন করা ॥**

বীজ চারাবার বা কাটিং বসাবার মাটি ব্যবহার করার আগে তা অবশ্যই শোধন করে নেওয়া দরকার। শোধন করে না নিলে এ থেকে অনেক রকম অসুবিধা দেখা দিতে পারে। 'মরসুমী ফুলের বীজ চারানো ও এদের চারাগাছ' এবং 'চন্দ্রমল্লিকা' অধ্যায় দুটিতে কি করে শোধন করে নেওয়া যেতে পারে তার বিশদ আলোচনা করেছি। বীজ চারাবার বা কাটিং বসাবার মাটি প্রতিবার বীজ বা কাটিং বসাবার আগে শোধন করে নেবেন।

**জল দেওয়া ও স্প্রে করা ॥**

গাছে জল সবসময়ে সাবধানে দেওয়া দরকার। জল হবে পরিমিত, জল বেশি বা কম

হলে গাছের ক্ষতি এবং এর যে কোনটা বেশি রকমের হলে গাছ মারাও পড়তে পারে। গাছের জন্য সবসময়ে স্বাদু জল ব্যবহার করা উচিত। শীতকালে সকালে বা বিকালে জল দেওয়া যাবে, তবে এ সময়ে সন্ধ্যের দিকে জল দেওয়া উচিত নয়। গরমের দিনে বিকালের দিকে জল দেওয়া ভাল তবে এ সময়ে সকালের দিকেও জল দেওয়া যেতে পারে। গাছের গোড়া ভেজা থাকলে জল দেবেন না বা জলের অভাবে গাছের গোড়ার মাটি কখনও শুকনো খটখটে হতেও দেবেন না। দু'তিন ঘণ্টার ভেতরে জল না পেলে গাছের পাতা ঢলে পড়বে, এ অবস্থা গাছে জল দেবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল সময়। তবে গাছে ঠিক কখন জল দিলে ভাল তা বুঝতে গাছ করার কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, যদিও এই অভিজ্ঞতা অর্জন করা কিছুই কঠিন নয়। টবের গাছে টবের সব মাটি ভালভাবে ভেজে কিন্তু টব থেকে বেশি জল বেরিয়ে যায় না এরকম পরিমাণ জল দিতে হবে, এবং জমির গাছে জল দিতে হবে ভাসিয়ে, যাতে কয়েক দিনের ভেতরে আবার জল দিতে না হয়। অল্প বৃষ্টিতে অনেক সময়ে শুধু উপরের মাটি ভিজিয়ে দেয়, এ অবস্থায় এতে প্রয়োজনমাফিক জল দিতে হবে। টবের গাছে ও অন্যান্য গাছে জল দেওয়া দরকার ঝারি দিয়ে। সহজে হবে বলে অনেক সময়ে ঝারির মুখ খুলে রেখে ঝারি দিয়ে জল দেওয়া হয়, কিন্তু এটা কখনও করা উচিত নয়। পাইপ দিয়ে জল দেবার বেলায়ও এমন কিছু ব্যবস্থা করা দরকার যাতে গাছের গোড়ায় জল তোড়ে না পড়ে। যেসব টবের গাছের পাতা জল দেবার সমস্ত জায়গা ঢেকে থাকে তাদের বেলায় জল দিতে হবে এমন ভাবে যাতে টবের মাটিতে জল ঠিকমত পৌঁছয়। গাছের ফুল ফোটার আগে ও ফুল ফোটার সময়ে গাছের অপেক্ষাকৃত বেশি জল দরকার পড়বে। গাছকে জল পৌঁছে দেওয়া যেসব শেকড়ের বিশেষ কাজ, তারা মাটির উপরে গাছের ডাল যেরকম ছড়ায় গাছের গোড়া থেকে সেগুলি সাধারণত ততটা পর্যন্ত দূরে থাকে। তাই জমির গাছে এমন ভাবে জল দিতে হবে যাতে এই শেকড়গুলি সহজেই জল পায়।

গাছে জল স্প্রে করা খুবই উপকারী। তবে সব গাছে করা সম্ভব নয় বলে অন্তত অপেক্ষাকৃত সুখী গাছগুলিকে এর আওতায় নিয়ে আসবেন। জল সপ্তাহে দু'তিন দিন নিয়মিত স্প্রে করার ফলে গাছের ধুলোবালির সঙ্গে সঙ্গে পোকামাকড়ের উপদ্রবও কমবে, তাই গাছের স্বাস্থ্যও ভাল হবে। স্প্রে করা হবে পিচকারি বা প্রেশার স্প্রেয়ার দিয়ে। গাছে স্প্রে করা ভাল একেবারে ভোরবেলায়। দরকার বোধ করলে সন্ধ্যার দিকেও স্প্রে করা যেতে পারে কিন্তু বেশি রোদ রয়েছে এরকম অবস্থায় গাছে কখনই স্প্রে করা উচিত নয়।

**গাছের ওষুধ ॥**

গাছের রোগাদিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ভাইরাস রোগ, ফাঙ্গাস রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ। প্রত্যেক গাছে বহু রকমের অসুখ দেখা যায় কিন্তু এদেশে ফুলগাছের কি কি অসুখ হয় সে সম্পর্কে একরকম কোন গবেষণা হয়নি তাই এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। গাছের বেশির ভাগ ভাইরাস রোগের কোন চিকিৎসা নেই। এ রোগ হয়েছে বলে নিশ্চিত হতে পারলে সে গাছ মূলসহ উপড়ে পুড়িয়ে ফেলাই উচিত। তবে অসাধ্য ভাইরাস রোগ কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার ব্যবস্থাও এদেশে এখনও পর্যন্ত বিশেষ নেই। এই বইতে বিভিন্ন ফুলের চাষের আলোচনার বেলায় তাদের রোগ ও ওষুধের কথাও মোটামুটি বলা হয়েছে। রোগাক্রান্ত বিভিন্ন গাছের ও পোকামাকড়ের বর্ণনা এই বিষয়গুলির উপরে লেখা বইতে পাওয়া যাবে। এই বই থেকে ফুলের গাছের বেলায় এদের আক্রমণের রূপ কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। ফুলগাছের কি রোগে কি ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা এখানে সংক্ষেপে এবং খুব সাধারণভাবে বলা হলো। উইল্ট, ড্যাম্পিং অফ, ফুট রট, রুট রট, স্টেম রট প্রভৃতি ফাঙ্গাস রোগ মাটির মাধ্যমে প্রধানত আসে, তাই এই সব রোগের প্রকোপ কমাতে গাছ বা বীজ লাগাবার আগে মাটি শোধন করে নেওয়া দরকার। ড্যাম্পিং অফ, ফুট রট ও রুট রট রোগে চেশাণ্ট কম্পাউন্ড মোটামুটি ভাল কাজ দেবে। স্টেম রট, রাস্ট ও উইল্টের বেলায় বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই; তাই এই সব রোগে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। পাউডারি মিলডিউ ও রেড

স্পাইডার মাইটের বেলায় মাইক্রো-সালফ, মোরেস্টান, সালটাফ, সালকল ইত্যাদি ভাল কাজ দেবে এবং ডাউনি মিলডিউর বেলায় ফাইটোলান, ক্যাপটান, ব্লাইটক্স ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। এফিস, থ্রিপস প্রভৃতি কীটের বেলায় ফলিডল, ম্যালাথিয়ন, রোগর, সেভিন, বাসুডিন, লিনডেন ইত্যাদি ভাল কাজ দেবে; এবং বীটেল ও ক্যাটারপিলারের বেলায় ডি.ডি.টি স্প্রে করে সুফল পাবেন। উইয়ের আক্রমণে এলড্রিন, হেপটাক্লোর ইত্যাদি মোটামুটি ভাল কাজ দেবে। পোকামাকড়ের আক্রমণে একই ওষুধ অনেক দিন ধরে ব্যবহার করলে সেই সব ওষুধ কিছুদিন পরে আর তত ভাল কাজ দিতে চায় না। এই কারণে একই ক্ষমতাসম্পন্ন ভিন্ন ওষুধ মাঝে মাঝে পালটে ব্যবহার করা দরকার। গাছে কি অসুখ হয়েছে ধরতে না পারলে কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া ভাল।

**গোবরসার ও পাতাপচাসার বলতে কি বোঝায় ॥**
গোবরসার ও পাতাপচাসারের কথা বইতে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারমাটির গোবরসার বলতে বছর খানেকের পুরানো ও ভাল করে পচিয়ে নেওয়া গোবরকে এবং পাতাপচাসারের বেলায় ভাল করে পচিয়ে নেওয়া পাতাকে বোঝাবে। এ দুটি সার কি করে করতে হয় তা 'মাটি ও সার' অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

**গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হতে দেবেন না ॥**
ভাল বাড়ন্ত গাছের বৃদ্ধি কোন কারণে বড় রকমের বাধা পেলে তা গাছের খুব ক্ষতি করবে। পরে এই বাধা দূর হলেও তা আর তত ভাল ফুল ইত্যাদি দেবে না। তাই গাছের বৃদ্ধি যাতে এ ধরনের বাধা না পায় সেজন্য বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। গাছের বৃদ্ধি বাধা পায় অনুপযুক্ত সারমাটি, অনিয়মিত পরিচর্যা, রোগাদির আক্রমণ প্রভৃতি কারণে।

**জমি তৈরী করার বেলায় উপরের মাটি উপরে থাকবে ॥** ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা
জমির উপরের অংশের মাটি গাছ জন্মাবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। প্রভৃতির সারমাটি তৈরীর সাধারণ মাটি হিসাবে জমির উপরের কুঁড়ি সেণ্টিমিটার মাটি নেওয়া ভাল। যেসব গাছ লাগাতে গর্ত করতে হয় তাদের বেলায়ও উপরের মাটি উপরে রাখা উচিত—গর্ত করার সময়ে উপরের মাটি আলাদা করে সরিয়ে রাখলে এ কাজ সহজ হবে। তবে জংলীঘাস থাকলে উপরের পাঁচ সেণ্টিমিটার মাটি চেঁছে বাদ দিতে হবে যাতে ঘাসের বীজ ইত্যাদিও এই মাটির সঙ্গেই চলে যায়। যে সব কেয়ারিতে বছরের পর বছর মরসুমী ফুল লাগাচ্ছেন সেখানে উপরের মাটি উপরে না রাখলেও চলে যাবে।

**গর্ত করা ও সারমাটি ভরার পরে জল দেওয়া ॥**
গাছ লাগাবার জন্য গর্ত করার পরে অন্তত দিন সাতেক ধরে গর্তকে ভাল করে রোদ খাওয়ানো দরকার। গর্তে সারমাটি ভরে দেবার পরে তাতে কয়েক দিন অন্তর বেশি করে জল দেবেন যাতে সারমাটি ঠিকমত বসে যায়। এটি না করা হলে গাছ লাগাবার পরে সারমাটি হঠাৎ বসে গেলে গাছের খুব ক্ষতি হবে।

**গাছ শক্ত করে বসানো দরকার ॥**
টবের বা জমির সব চারাগাছ লাগাবার সময়ে গাছ লাগিয়ে তার গোড়ার মাটি বেশ ভাল করে চেপে মোটামুটি শক্ত করে দেওয়া দরকার। চন্দ্রমল্লিকার গোড়ার মাটি একটু বেশি করে চেপে দেওয়া ভাল এবং গোলাপ প্রভৃতি গাছের বেলায় পা দিয়ে চেপে গাছের গোড়া শক্ত করে দেওয়া হবে। গাছের গোড়ার মাটি চেপে মোটামুটি শক্ত করে দেওয়ায় গাছ ভাল বাড়বে।

**গাছ টব খুলে লাগানো ॥**

গাছ কেনার সময়ে টবে করা গাছ পেতে সবসময়ে চেষ্টা করবেন। এবং এ গাছের বৃদ্ধি যেন বেশ ভাল থাকে। টবে করা গাছ পেতে একটু খরচ বেশি পড়লেও এটাই কেনা ভাল। এই গাছ এবং আরও অনেক গাছ টব থেকে বড় টবে বা জমিতে পালটে লাগাবার দরকার পড়বে। না জানার জন্য অনেকে চারাগাছের টবটি ভেঙে গাছ বের করে নেন। কিন্তু এতে শুধু টবটিই নষ্ট হয় না, গাছেরও এতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। অথচ, গাছ আস্তে করে টব থেকে খুলে নেবার সহজ উপায় রয়েছে। টব থেকে গাছ খুলবার ঘণ্টা কয়েক আগে টবের মাটিতে এরকম পরিমাণে জল দেবেন যাতে গাছ খোলার সময়ে মাটি ভেজা-ভেজা থাকে। এর পরে টবসহ গাছ উল্টো করে ধরে (এতে গাছ জমির দিকে ঝুলে থাকছে) কোন শক্ত জায়গার কোণায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টবটির কানা সাবধানে ঠুকবেন। এতে মাটিসহ গাছটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে। গাছের মাটি যেরকম আছে তার কোন ব্যতিক্রম না করে গাছ টবে বা জমিতে লাগাতে হবে।

**চারাগাছ লাগিয়ে ঢেকে দেওয়া ॥**

যে কোন চারাগাছ লাগাবার পরের কয়েক দিন রোদের সময় তা ঢেকে দেওয়া ভাল। এমন ভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে চারাগাছ পুরো ছায়ায় থাকে কিন্তু আলোবাতাস পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়। সমতল বাংলায় কলাগাছের খোল ছোট করে কেটে তা দু'ভাঁজ করে মরসুমী ফুলের চারাগাছ ঢাকার কাজে লাগানো যেতে পারে।

**গাছের গোড়া খুঁচে দেওয়া ও মালসিং ॥**

গাছের গোড়ার মাটি দিন দশেকে একবার খুঁচে দেওয়া দরকার। এটা টবের গাছ ও বিভিন্ন মরসুমী ফুলের বেলায় করা একান্ত প্রয়োজন। মাটি এমন ভাবে খুঁচে দিতে হবে যাতে মাটি চাকা চাকা থাকে, কারণ মাটি একেবারে গুঁড়ো করে দিলে গাছের ক্ষতি। মাটি খুঁচে দেওয়া হবে তিন থেকে দশ সেণ্টিমিটার গভীর করে। জমির গাছে ভাসিয়ে জল দেবার চারপাঁচ দিন পরে খুঁচে দেওয়া ভাল। গাছের গোড়ার মাটি খুঁচে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গোড়ার জংলী ঘাসও বেছে দিতে হবে। গাছের গোড়ায় বা অন্য কোথাও জংলীঘাসের বীজ হতে দিলে তা রক্তবীজের বংশধরের মত দিন দিন বেড়ে যাবে এবং তখন তাদের বিনাশ করাও খুব কঠিন হয়ে পড়বে।

গাছের গোড়ায় আলতোভাবে কাটা খড়, ছাঁটা ঘাস, শুকনো পাতা, বড় দানার পাতা-পচাসার প্রভৃতি ছড়িয়ে দেবার পদ্ধতির নাম মালসিং। মালসিং-এর প্রধান ব্যবহার গাছের গোড়ার জল বেশি সময়ের জন্য ধরে রাখতে, তাই এর ব্যবহার গরমের দিনে বেশি। অনেক মালসিং-এর উপাদান রোদ থেকে বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের খাবারও যোগায়। মালসিং-এর উপাদান মাটির সঙ্গে মিশে মাটি না হয়ে গেলে তা বৃষ্টির দিনে সুখী গাছের গোড়া থেকে অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে।

**গাছের অবলম্বন ও গাছ বাঁধা ॥**

চারাগাছ লাগাবার ব্যবস্থা থেকে গাছের ভাল অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে হবে। চারাগাছ থেকেই অবলম্বন এমন হবে যা গাছ বড় হলেও তাকে সাহায্য করতে সক্ষম। যে কোন চারাগাছের বেলায় ছোট বাখারি অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করার খুব রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়েই এই বাখারি পালটিয়ে বড় বাখারি আর দেওয়া হয় না এবং ফলে গাছ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা, পালটিয়ে বড় বাখারি দেওয়া হলেও বাখারি ওঠানো ও বসানোর ফলে গাছের ক্ষতি হয়। তাই এমন বাখারি বা অন্য অবলম্বন চারাগাছ অবস্থাতেই লাগাতে হবে যা আর পালটানোর দরকার পড়ে না। এবং এতে সবুজ রঙ দিয়ে দিলে তা আরও ভাল দেখাবে।

গাছকে প্রথম থেকেই অবলম্বনের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে দিতে হবে। এবং এমন ভাবে বাঁধতে হবে যাতে এজন্য গাছের কোন ক্ষতি না হয়। মোলায়েম দড়ির একদিক

প্রথমে অবলম্বনের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে অন্য অংশ বাংলা সংখ্যা চার-এর (৪) মত করে আলগাভাবে গাছ ও ডালকে ঘুরিয়ে বেঁধে তা শক্ত করে অবলম্বনের সঙ্গে বেঁধে দেবেন। এভাবে বাঁধার কাজ এমন হবে যে ডাল বা গাছ হাওয়ায় অল্প নড়তে পারে কিন্তু অবলম্বন তাকে ভাল করে ধরে রাখে।

**সুযোগ থাকলে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেবেনই ॥**

মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেবার সুযোগ আগের থেকে বেড়ে থাকলেও এ সুযোগ এখনও অনেক জায়গাতেই নেই। মাটিতে কি ঘাটতি রয়েছে তা মাটি পরীক্ষা না করে বার করা সম্ভব নয়। অথচ মাটিতে বড় রকমের ঘাটতি থাকলে নির্দিষ্ট মাত্রায় সার দিলেও তাতে গাছ কিছুতেই ভাল জন্মাতে পারে না। তাই সুযোগ থাকলে মাটি পরীক্ষা করিয়ে তার ঘাটতি পূরণ করে নেবেনই।

**সারমাটি ব্যবহার করতে হবে ভেজা ভেজা অবস্থায় ॥**

সারমাটিতে গাছ লাগাতে হবে সারমাটি ভেজা ভেজা রয়েছে এই অবস্থায়। প্রয়োজন দেখা দিলে সারমাটিকে গাছ লাগাবার সময়ে এই অবস্থায় আনতে উপযুক্ত সময়ে তা জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। এ কাজ জল ছিটিয়েও করা যেতে পারে।

**বাড়তি সার গাছ ভালভাবে বাড়লে দেওয়া হবে ॥**

ভালভাবে বাড়ছে শুধুমাত্র এই অবস্থায় বাড়তি সার পেলে গাছ তা কাজে লাগাতে পারে। দুর্বল গাছের বেলায় বাড়তি সার সাহায্যের চেয়ে গাছের ক্ষতি করবে বেশি, তাই এদের বেলায় বাড়তি সার দেওয়া উচিত হবে না।

**টবের ও জমির গাছে বাড়তি গুঁড়ো সার দেওয়া ॥**

সব টবের গাছেই গুঁড়ো বাড়তি সার দেবার দরকার পড়ে। তরলসার নয় বোঝাবার জন্যই এখানে সারের আগে গুঁড়ো কথাটি ব্যবহার করছি। এই গুঁড়ো বাড়তি সার সব সময়ে টবের কানার কাছ থেকে দিতে হবে। প্রথমে টবের কানার কাছ থেকে ছয় সেণ্টি-মিটার গভীর ও তিন সেণ্টিমিটার চওড়া করে খালের মত করে তাতে গুঁড়ো বাড়তি সার সবদিকে সমান করে দিয়ে এই খাল মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। জমির গাছে সাধারণত গোড়ার বিশ সেণ্টিমিটার বা আরও দূর থেকে গোল করে খাল করে তাতে একই ভাবে সার দিতে হবে। জমির গাছের বেলায় সার ছড়াবার খাল গাছের আয়তন অনুযায়ী কমবেশি দূরে হতে পারে। গুঁড়ো বাড়তি সার দিতে হবে গাছের গোড়ার মাটির শুকনো অবস্থায়। গুঁড়ো মিশ্র সার বোঝাতে এই বইতে শুধু মিশ্র সার অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

**বাড়তি গুঁড়ো সার দেবার পরে জল ॥**

বাড়তি গুঁড়ো সার দেবার দিন ধরে পর পর তিন দিন ভাল করে টবের গাছে জল দিতে হবে। এবং জমির গাছে গুঁড়ো সার দেবার দিন ধরে দু'দিন ভাল করে জল দেবেন। জল টবের ও জমির গাছের গোড়া ভেজা থাকলেও দিতে হবে।

**তরলসার ব্যবহারের আগে গাছে জল দেওয়া ॥**

তরলসার ব্যবহারের সময়ে গাছের গোড়ার মাটি বেশ ভেজা-ভেজা থাকা দরকার। তাই এ সার ব্যবহারের কয়েক ঘণ্টা আগে গাছে স্বাভাবিক পরিমাণ জল দিয়ে নিতে হবে। তরলসার কখনও ঘন করা হবে না, করলে গাছের ক্ষতি হবে। তরলসার দেবার পরে আরও একবার গাছে জল দেওয়া যেতে পারে।

**ব্যবহৃত সারমাটি আবার ব্যবহার করা ॥**

ব্যবহার করা হয়েছে এরকম সারমাটি বারবার ব্যবহার করার দরকার অনেক সময়েই

দেখা দেয়। তবে একথা মনে রাখা ভাল যে, এটা আবার ব্যবহার করে তত ভাল ফল পাওয়া কঠিন। ব্যবহৃত সারমাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এরকম সারের গুণ থেকে যায় বলে তাতে অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত কম সার মেশাবার দরকার পড়ে।

**সারমাটি মেশাবার কাজে টবের ব্যবহার ॥**

সারমাটি তৈরীর বেলায় টব বা কোন নির্দিষ্ট মাপের পাত্র দিয়ে সার ইত্যাদি মেপে মেশালে কাজটি অনেক সহজ হয়ে উঠবে। এ কাজে প্লাস্টিকের বালতি ব্যবহার করলে ভাঙগার আশঙ্কা থাকবে না। বইতে টবের মাপের বেলায় সবসময়ে বেহালার টবকে বোঝানো হয়েছে।

**চামচ বলতে চায়ের চামচ ॥**

সারমাটি তৈরী করার কাজে অনেক সারের বেলায় চামচের মাপে তা মেশাতে বলা হয়েছে। এই চামচকে সব সময়ে সঠিক মানের চায়ের চামচ বুঝতে হবে।

**টব ও চারা ধুয়ে নেওয়া ॥**

টব প্রত্যেকবার ব্যবহার করার আগে ভাল করে ধুয়ে নেওয়া দরকার এবং এর সঙ্গে সঙ্গে টবের খোলামকুচি বা চারাও ধুয়ে নিতে হবে। সম্ভব হলে সাধারণ জলে ভাল করে ধুয়ে নেবার পরে টব ও চারা গরম জলে চুবিয়ে নেওয়া ভাল। টব ও চারা ভাল করে ধুয়ে নিলে রোগের সংক্রমণ অনেক কমবে।

**টবে চারা দেওয়া ॥**

টবের ফুটোর উপরে প্রথমে ধনুকের মত বাঁকা চারা এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে ফুটোর সঙ্গে চারা কিছুতেই মিশে না যায়। এতে বাড়তি জল বেরিয়ে যাবার পথ ভাল-ভাবেই খোলা থাকবে। এই বাঁকা চারার উপরে অন্য চারা দেবেন। চারা বলতে টব ভাঙা চারা, ঝামা ও ইটের টুকরোকে বোঝাবে। টবে কতটা চারা দিতে হবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন গাছের চাষ, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদির উপরে। খুব সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ছোট টবের বেলায় টবের তিনচার সেমি এবং বড় টবের বেলায় ছ'সাত সেমি জায়গা জুড়ে চারা দেওয়া চলে। জল শীঘ্র বের করে দিতে চাইলে চারা একটু বেশি দিতে হবে।

**টবের গাছের পরিচর্যা ॥**

বইতে বিভিন্ন জায়গায় টবের গাছের পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, রোদ ভালবাসে এরকম গাছের পরিচর্যা হবে 'ছাদের ফুলবাগান'-এর পরিচর্যার মত, যদিও জমিতে রাখা গাছের বেলায় ছাদের তাপ থেকে বাঁচাবার পরিচর্যার দরকার পড়বে না। হালকা ছায়া ভালবাসে এরকম গাছের বেলায় 'বারান্দা সাজাবার গাছ'-এর পরিচর্যার মত করতে হবে।

**ঝুলানো টবে গাছ ॥**

বেশ কিছু গাছ রয়েছে যা ঝুলানো টবে চাষ করার পক্ষে খুব ভাল। এদের ভেতরে ন্যাশটারসিয়াম ডাবল গ্লীম, ভারবিনা, ক্লায়ান্থাস, পিটুনিয়া কাসকেড, ফ্লক্স, জিনিয়া লিনিয়ারিস, একিমিনিস, এসপারাগাস স্প্রেঙ্গেরি, সেটক্রিসিয়া, ট্রাডেসকানটিয়া, পোথোস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঝুলানো টবের গাছ এরকম হওয়া দরকার যাদের ডাল টব থেকে সুন্দর ভাবে ঝুলে পড়ে এবং ফুলগাছের বেলায় তা এ অবস্থায় ভাল ফুলও দেয়। গাছের ডাল ঝুলে না পড়া পর্যন্ত টব নিচে রেখেই এদের চাষ করতে হবে। ঝুলানো টব নিচে রাখার বেলায় অল্প উঁচু থাম বা উলটানো টবের উপরে রাখা ভাল। এখানে ফুল হতে আরম্ভ করলে বা গাছ বেশ সুন্দর হয়ে উঠলে তা সাজাবার জায়গায় নিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

**টব কি ভাবে বা কোথায় রাখবেন ॥**

জমিতে যেসব টবের গাছ রাখা হবে তাদের বেলায় সাবধান হওয়া দরকার যাতে কেঁচো ইত্যাদি টবের নিচের ফুটো দিয়ে ঢুকে গাছের কোন ক্ষতি না করে। দুটি ইট পাশাপাশি এমন ভাবে বসাবেন যাতে দুটির মাঝে দুই সেন্টিমিটার ফাঁক থাকে, এ ভাবে রাখা প্রতি দুটি ইটের উপরে একটি করে টবের গাছ রাখা সবচেয়ে ভাল। এছাড়া, ছাই বা ঘেঁস একটু মোটা করে বিছিয়ে তার উপরেও টবের গাছ রাখা যেতে পারে। টবের গাছ সরাসরি জমিতে রাখলে কিছুদিনের ভেতরে টবের ফুটোর মুখ মাটিতে বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে টবের গাছের অতিরিক্ত জল বেরুনো কঠিন হয়ে পড়ে।

টবের ফুলগাছের ফুল ফোটা হয়ে গেলে সেগুলিকে এমন জায়গায় নিয়ে ভাল ভাবে রাখা দরকার যাতে তা সহজে নজরে না পড়ে। দীর্ঘজীবী ফুলগাছগুলির বেলায় এখানে রেখে তাদের প্রয়োজনমাফিক পরিচর্যা করে তাদের ফুল ফোটা অবস্থায় আবার সাজাবার কাজে ফিরিয়ে আনা হবে।

**ফুল শুকুতে থাকলে কেটে ফেলা ॥**

অপেক্ষাকৃত বেশি দিন ধরে ফুল ফোটাতে চাইলে গাছে কখনও ফুল শুকুতে দেবেন না। তাই শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করলেই ফুল কেটে ফেলবেন, এ কাজ একটু পরিশ্রমের হলেও এতে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

**গাছের ডাল কাটা ও আলকাতরা লাগানো ॥**

ছোট গাছ ছাঁটার পরে 'গোলাপ' অধ্যায়ে বর্ণিত প্রলেপ ছাঁটা জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া উচিত। বড় গাছের বড় ডাল কাটার বেলায় তা কাটা উচিত করাতের সাহায্যে। এবং এই কাটা জায়গায় আলকাতরার প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া দরকার। ছাঁটা বা কাটার পরে প্রলেপ না লাগালে এই ক্ষতস্থানের মাধ্যমে গাছের রোগাক্রান্ত হবার খুব আশঙ্কা থাকবে। গাছের গুঁড়িতে কোন কারণে গর্ত হয়ে থাকলে তা সিমেন্ট ইত্যাদির সাহায্যে ভাল করে বুজিয়ে দিতে হবে।

**গাছের গোড়া ঘিরে বসার জায়গা তৈরীর প্রসঙ্গে ॥**

অনেক সময়ে বড় গাছের গোড়া ঘিরে বসার জায়গা তৈরী করা হয় ইট সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে। বসার জায়গা এভাবে তৈরী করা দরকার যাতে গাছের গোড়া প্রচুর আলো-বাতাস পেতে পারে। গোড়ায় বা গোড়ার মাটিতে আলোবাতাস না পেঁছুলে গাছের খুব ক্ষতি হবে।

**টবের আয়তন ॥**

টবের আয়তন নিয়ে প্রচুর ঝগড়া হয়ে আসছে। এ ঝগড়া তুঙ্গে ওঠে ফুলের প্রতি-যোগিতার বেলায় যেখানে টবের আয়তন নির্দিষ্ট করে দেওয়া রয়েছে। মোটামুটি একই আয়তনের টব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আয়তনের টব বলে পরিচিত। এর ফলে কেউ কারু দাবি ছাড়তে রাজী নন। সার ইত্যাদি মেশাবার সময়েও টবের মোটামুটি সঠিক আয়তন জনা দরকার, নইলে গাছের পক্ষে সার কমবেশি হয়ে যেতে পারে। লিটার দাগ কাটা প্লাস্টিকের বালতির সাহায্য নিলে আমরা এই অনেক দিনের অসুবিধা থেকে রেহাই পেতে পারি। জলের পরিবর্তে সাধারণ গুঁড়োমাটি দিয়ে বালতি ভরে মাপ নেওয়া হবে। মাপ নেবার জন্য টবে মাটি ভরার বেলায় কোন খোলামকুচি দেওয়া হবে না, টবে মাটি ভরা হবে কাটা কাটা এবং সাধারণ গুঁড়ো মাটি টবে ও বালতিতে ভরা হবে আলতো ভাবে। চন্দ্রমল্লিকা ও অনেক মরসুমী ফুলে বেশি ব্যবহার আট ইঞ্চি টব, এর মাটি ধরার পরিমাণ সাড়ে তিন লিটার। ডালিয়ার জন্য বিশেষ করে ব্যবহার দশ ইঞ্চি টব, এতে মাটি ধরে ছয় লিটার। বারো ইঞ্চি টবের বেশ ব্যবহার রয়েছে গোলাপে, এর মাটির পরিমাণ নয় লিটার। এছাড়া, ছ' ইঞ্চি টবে দুই লিটার ও এগারো ইঞ্চি টবে মাটি ধরে আট লিটার।

# গৃহসজ্জায় ফুল

ঘর সাজাতে আমরা ফুলের ব্যবহার যে খুব করি তা নয়। বিশেষ দিনে বা বিশেষ পূজা পার্বণে ফুল দিয়ে আমরা কিছু সাজাই ঠিকই, কিন্তু ফুল যে ঘরের শোভা বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে এ বিষয়ে আমরা মোটেই সচেতন নই। তবে আনন্দের কথা, এ বিষয়ে আমাদের সচেতনতা যে আসছে তার লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। যদিও তা আসছে খুব ধীর গতিতে। আমাদের সমতল বাংলায় বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফুলের সমাবেশ। প্রচুর ফুলের সঙ্গে রয়েছে ফুলের বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য। গৃহসজ্জায় সচেতন যে-কোন দেশের পক্ষে এ অবস্থা একান্ত কাম্য।

গৃহসজ্জার প্রতি সচেতনতা খুব অল্প দিনের এবং তাও খুব স্বল্প সংখ্যকের ভেতরে সীমিত, তাই গৃহসজ্জা তথা পুষ্পসজ্জার কোন নিজস্ব রচনাশৈলী এদেশে এখনও গড়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং সবচেয়ে বেশি চলছে অন্যান্য দেশের বিভিন্ন পুষ্পসজ্জারচনাশৈলীর অনুকরণ। গৃহসজ্জার আমাদের একটি আলাদা রীতি গড়ে উঠতেই হবে কারণ এখানে যেসব পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুল পাওয়া যায় তার বেশ কিছু ফুল পাশ্চাত্ত্যে বা জাপানে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই শুধু অনুকরণ করে চলা স্বাভাবিক নয় এবং তা উচিতও হবে না। একটি দেশের পুষ্পসজ্জার রচনাশৈলী গড়ে ওঠে অনেক কিছু জিনিসকে কেন্দ্র করে। উপযুক্ত ফুল ছাড়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, ঘরবাড়ির গড়ন, ব্যক্তির রুচিবোধ প্রভৃতি এর ভিতরে প্রধান। এবং এগুলির ভিতরেও প্রধানতম স্থান রুচিবোধের। রুচির বেলায় বৈচিত্র্য থাকবেই এটা সর্বজনস্বীকৃত। শিল্পীর স্বকীয়তার স্বাক্ষর সৌন্দর্যময় হয়ে ফুটে উঠলে তবেই সে পুষ্পসজ্জা সবার মনে দাগ কাটে। এ দেশের নিজস্ব কোন রচনাশৈলী না থাকায় সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলারও নেই। তাই এ নিবন্ধে গৃহসজ্জার বিভিন্ন দিক তুলে ধরবো এবং মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করব কিভাবে অনেকে সাজাতে পছন্দ করেন তার প্রতি।

যে ফুলগুলি কাটা অবস্থায় ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে কয়েক দিন ধরে শুধু তাদেরই সংগ্রহ করা চলে বাজার বা দূর জায়গা থেকে। যেগুলি ভাল থাকে একদিন বা শুধু একবেলা তাদের যোগাড় করতে হবে নিজেদের বাগান থেকেই। ফুল সুপ্রভ রাখতে ফুল কেটেই ডাঁটির কাটা দিকটি ডুবিয়ে দিতে হবে জলের ভিতরে। দূর থেকে ফুল সুপ্রভ অবস্থায় সহজে আনতে খুব ভাল কাজ দেবে একটু মোটা পলিথিনের ছোট ব্যাগগুলি। ঐ ব্যাগে জল ভরে তার ভিতরে ডাঁটিগুলি ঢুকিয়ে তা ভাল করে বেঁধে দিতে হবে, এভাবে ফুল সব সময়েই তার প্রয়োজনীয় জল পেতে পারবে। ফুল ঘসে গেলে খারাপ দেখাবে তাই সদাই সতর্ক থাকা দরকার যাতে এগুলি ঘসে না যায়। ফুল কাটা উচিত সকালে বা বিকালে এবং ফুলের ডাঁটি কাটতে হবে তেরছাভাবে।

**ফুল ফোটা টবের গাছ দিয়ে সাজানো ॥**

কাটা ফুল ছাড়াও ফুল ফুটেছে এরকম টবের গাছ দিয়ে ঘর চমৎকার সাজানো চলে। একাজে এদের সঙ্গে পাতাবাহার ও অন্য বাহারি পাতার গাছেরও ব্যবহার রয়েছে। টবে করা স্বল্প আয়তনের সব কন্দজ গাছ ফুলফোটা অবস্থায় ঘর সাজাবার কাজের বেশ উপযুক্ত। বড় ফুলের হেমেন্থাস ও ছোট আকৃতির কিন্তু নধরদর্শন টবের কচিয়া পাশাপাশি সাজালে চমৎকার মানায়। এদের সাজানো চলে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং এগুলি এমন জায়গায় সাজাতে হবে যাতে তা ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। পাঁচ ইঞ্চি টবে চাষ করে ফুলফোটা অবস্থায় তা দিয়ে ঘরের জানালার পাশ প্রভৃতি জায়গা ঝলমলে করে তোলা সম্ভব। এ টবের জন্য মোটামুটি বড় ও উজ্জ্বল রঙের ফুলের গাছগুলি বেছে নেওয়া ভাল। চন্দ্রমল্লিকার বিভিন্ন প্রজাতি, গ্লোব আমারান্থ, গাঁদার স্বল্প আয়তনের প্রজাতিগুলি,

জিনিয়ার স্বল্প আকৃতির ডাবল ফুলের প্রজাতিগুলি, সিলোসিয়া প্লুমোসা লিলিপুট প্রভৃতির এ কাজে লাগার দাবি সর্বাগ্রগণ্য। চন্দ্রমল্লিকা ছাড়া আর সব গাছেই একই সঙ্গে অনেক ফুল হতে দেবেন। ছোট টবের চন্দ্রমল্লিকা ফুলদানির পুষ্পসজ্জার পরিবর্তেও ব্যবহার করা চলবে। খাপে খাপে লেগে যায় এবং কোন ফুটো নেই এরকম সুদৃশ্য টবের ভিতরে ছোট টবের গাছগুলি বসিয়ে দিলে টব থেকে জল চুঁইয়ে পড়ার ভয় থাকবে না। ফুটো নেই এরকম টব তৈরী করিয়ে নেওয়া যেতে পারে প্লাস্টিক, মাটি বা চীনামাটি দিয়ে। বাইরের এ টবগুলি বেশ ভাল দেখাবে যদি তা অল্প করে অলংকৃত হয়। ফুলফোটা টবের গাছগুলিকে রাতে বাইরে রাখা ও সকালের রোদ অবশ্যই খাওয়ানো দরকার।

**সাজানোর কাজে মরসুমী ফুল ॥**

সমতল বাংলায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি মরসুম মিলেই পুরো বছর। নির্দিষ্ট মরসুমের ফুল বা বছরের যে কোন সময়ে হয় এরকম ওষধি ফুলগাছের অনেক ফুল পাওয়া যাবে বছরের যে কোন সময়ে। শীতের মরসুমী ফুলের ভিতরে এস্টার, কারনেশান, ক্যালেণ্ডুলা, ন্যাশটারসিয়াম, লাভ-লাইজ-ব্লিডিং, লার্কস্পার, সুইট পী, সুইট সুলতান, আর্কটোটিস, এনটিরাইনাম, কর্নফ্লাওয়ার, জিপসোফিলা, পিমপেনেলা, লুপিন প্রভৃতি গৃহসজ্জার প্রথম সারির ফুল। এদের ভিতরেও প্রথম আটটি পুষ্পসজ্জায় আরও বেশি সমাদৃত এবং এগুলি ফুলদানিতে সুপ্রভও থাকে দুদিনের বেশি ধরে। এস্টার বোকে পাউডার-পাফ, ক্যানডিটাফট, হায়াসিন্থ-ফ্লাওয়ারড ও গাঁদার খুব ছোট আয়তনের প্রজাতিগুলির ফুলভর্তি গাছ কেটে শুধু সেটিই ফুলদানিতে বসিয়ে দিলে তার রূপান্তর ঘটবে সুন্দর পুষ্পসজ্জা হিসাবে। এদের জন্য ছোট ও স্বল্প উচ্চতার ফুলদানি ব্যবহার করা ভাল। আর্কটোটিস বিকালের দিকে গুটিয়ে গিয়ে আবার খুলবে পরের দিন কিছু রোদ পাবার পরে। রাতের বৈদ্যুতিক আলোতে ক্যালেনডুলা, ন্যাশটারসিয়াম, বড় গাঁদা ইত্যাদি চমৎকার মানায়। মরসুমী ফুলের এক্রোক্লিনিয়াম, গ্লোব আমারান্থ, স্ট্যাটিস, সিলোসিয়া প্লুমোসা ও হেলিক্রিসামের ফুল কেটেই ফুলদানিতে ব্যবহার করা চলে, বা এদের ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে যখন দরকার ব্যবহার করাও সম্ভব। মরসুমী বাহারি-পাতার গাছ এমারান্থাসের বড় ডাল কেটে তা ফুলদানির একমাত্র 'ফুল' হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি সুপ্রভ থাকবে দুদিনের বেশি সময় ধরে এবং এটিকে রাখা উচিত একটু দূরের জায়গায়।

**কন্দজ ফুল ॥**

রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, ডালিয়া, গ্লোরিওসা, এমারিলিস লিলি, হেলিকনিয়া ও দোলন চাঁপা ফুলদানির পক্ষে খুবই ভাল ফুল। এদের ভেতরে দোলন চাঁপা ছাড়া অন্য সব কয়টিই কয়েক দিন ধরে সুপ্রভ থাকে। দোলন চাঁপার খুব সমাদর এর সুগন্ধের জন্য, এবং এটিকে ব্যবহার করা চলবে শুধুমাত্র বিকালের পুষ্পসজ্জায়। রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস ও এমারিলিস লিলির ডাঁটির গোড়ার শেষ আধ ইঞ্চি অংশ প্রতিদিন কেটে ফেলে ফুল আবার ফুলদানিতে ব্যবহার করা উচিত, এতে ফুল বেশি ভাল থাকবে। গ্লাডিওলাসের ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি ফুলদানিতে থাকা অবস্থায়ও খুলতে থাকবে সহজ সুন্দরভাবে। গ্লোরিওসা, হেলিকনিয়া ও দোলন চাঁপা বর্ষার, এমারিলিস গ্রীষ্মের প্রথমের ফুল; রজনীগন্ধা প্রধানত এই দুই মরসুমের ফুল হলেও একে পাওয়া যেতে পারে সারা বছর ধরে, এবং ডালিয়া ও গ্লাডিওলাস ফুটবে শীতকালে।

**গুল্মের ফুল ॥**

গৃহসজ্জায় বহুবর্ষজীবী বিভিন্ন গুল্মের ফুলের অবদান অনস্বীকার্য। শীতের মরসুমে গুল্মের ফুল বেশি রকমের পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু গোলাপের বিপুল সম্ভার একথা একবারও মনে আসতে দেয় না। গোলাপ ছাড়া রয়েছে পয়েনসেটিয়া, এর ব্যবহার বেশি বড়দিনের সময়ে। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফোটে যে ফুলগুলি তাদের ভিতরে গন্ধরাজ ফর-

চুনিয়ানা, ফুরুষের সাদা ফুলের প্রজাতি এলবা ও অন্যান্য প্রজাতি, ক্লিরোডেনড্রন কেম্প-ফেরি, জবার সিঙ্গেল প্রজাতিগুলি, কাঞ্চন গল্পিনি, মুসায়েনডা এরিথ্রোফাইলা প্রভৃতি সাজাবার পক্ষে মোটামুটি ভাল। সারা বছর ধরে ফুল ফোটে এরকম গুল্মের ভিতরে ক্রসেনড্রা, করবী, প্লামবাগোর হালকা নীল রঙের ফুলগুলি, জ্যাট্রোফা, পেণ্টাস, রঙ্গন, রনডেলেটিয়া, ছোট কৃষ্ণচূড়া, ফ্রানসিশিয়া, গলফিমিয়া প্রভৃতি পুষ্পসজ্জায় সমাদর লাভের উপযুক্ত। জবা সিঙ্গেল ও কাঞ্চন গল্পিনিকে পুষ্পসজ্জার কাজে লাগানো যাবে শুধু সকাল বেলায়। বিভিন্ন রঙের শুধুমাত্র কয়েকটি সিঙ্গেল জবা দিয়ে ছোট ও স্বল্প উচ্চতার ফুলদানি সাজালে তা সৌন্দর্যময় হয়ে উঠবে খুব সহজেই। ক্লিরোডেনড্রন কেম্প-ফেরি বা পয়েনসেটিয়ার ফুলসহ বড় ডাল দিয়ে জালার আকৃতির বড় ফুলদানি সাজালে তা বেশ ভাল মানায়। পয়েনসেটিয়ার ভিতরে এর ডাবল ফুলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর; এর সব প্রজাতির ফুল কেটেই তার ডাঁটির কাটা দিকটি কিছু সময়ের জন্য ফুটন্ত গরম জলে ডুবিয়ে রাখা দরকার, ফুলকে সুপ্রভ থাকতে সাহায্য করার জন্য। রঙ্গন ফুল দেয় বেশি গ্রীষ্ম ও বর্ষায়, এর বিভিন্ন রঙের ফুল রয়েছে এবং এগুলি ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে বেশ কয়েক দিন ধরে।

**লতানো গাছের ফুল ॥**

লতানো গাছের ফুলের ভিতরে ক্লায়ান্থাস, ডাবল বুগেনভিলিয়া, এনটিগোনান, ক্লিমেটিস, হোমস্কিয়োলডিয়া, পাইরোস্টেজিয়া, মধুমালতী প্রভৃতিকে পুষ্পসজ্জায় ভাল লাগানো যায়। বুগেনভিলিয়া মাহারার ডাবল ফুলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর এবং এটি ফুলদানিতে থাকেও ভাল বেশ কয়েক দিন ধরে। ত্রিনিদাদ ছাড়া অন্য সিঙ্গেল বুগেনভিলিয়া খুব সাজাবার উপযুক্ত নয়। ফুলদানিতে ব্যবহার করার আগে বুগেনভিলিয়ার সব পাতা ঝরিয়ে দেওয়া দরকার। এনটিগোনানের ফুলের ঝুরি কাটতে হবে ফুলের ফুটনোন্মুখ অবস্থায়, এর পরে কাটলে ফুল তত ভাল থাকে না। পাইরোস্টেজিয়ার ডালের মাথায় ফুল ফোটে অনেক এবং তা ঝুলে পড়ে ফুলের ভারে। পুষ্পসজ্জায় এদের ডালকে স্বাভাবিক অবস্থার মত পেলব ভাবে লতিয়ে আনা উচিত এবং এর জন্য লম্বা গলা কুঁজোর আকৃতির ফুলদানি মানায় ভাল। ব্যবহারের আগে পাইরোস্টেজিয়ার বড় পাতাগুলি ঝরিয়ে দেওয়া ভাল। হোমস্কিয়োলডিয়া ফুলদানিতে ভাল থাকে বেশ কয়েক দিন ধরে। এর ফুলভর্তি খুব লম্বা ডাল একটু বড় ধরনের ফুলদানির পক্ষে বেশ মানানসই। বাহারি পাতার লতানো গাছ পোথোস অর্থাৎ মানি প্ল্যাণ্ট ঘরের ভিতরে মাসের পর মাস ভাল থাকে; অনেকে এদের জলপূর্ণ বোতলে চাষ করেন এবং তা ঘরের ভিতরে লতিয়ে বেয়ে উঠতে সাহায্য করেন।

**বড় গাছের ও অন্যান্য গাছের ফুল ॥**

ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা, গুলঞ্চ, সোনালী শিমুল, নাগলিঙ্গম, ক্যালিস্টিমন প্রভৃতি পুষ্পসজ্জার পক্ষে বেশ ভাল। গুলঞ্চের পুরো থোকা ও সোনালী শিমুলের ফুলভর্তি ডাল দিয়ে সাজানো উচিত এবং শেষেরটির জন্য জলের কুঁজোর আকৃতির বড় ফুলদানি বেশ মানানসই। নাগলিঙ্গম দিয়ে শুধু সকালে সাজানো চলে এবং এর জন্য খুব স্বল্প উচ্চতার ফুলদানি বেছে নেওয়া দরকার। ক্যালিস্টিমন ও গুলঞ্চ ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে কয়েক দিন ধরে। ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরাকে সাজাবার কাজে ব্যবহার করতে হবে ফুলসহ ডাল কেটে।

অন্যান্য গাছের ফুলের ভিতরে চন্দ্রমল্লিকা, জারবেরা, এনজেলোনিয়া পুষ্পসজ্জার কাজে খুবই উপযোগী। চন্দ্রমল্লিকা পাওয়া যাবে শুধু শীতকালে এবং অন্য দুটি সারা বছর ধরে। জারবেরা সন্ধ্যার দিকে গুটিয়ে যেতে পারে, কিন্তু একই ফুল আবার পরের দিন সকালে খুলবে। জলজ ফুল পদ্ম ও শালুকও বড় মুখের ফুলদানির পক্ষে খুবই মানানসই।

**যে ফুলগুলি পুষ্পসজ্জায় লাগানো যায় না ॥**

কিছু ফুল রয়েছে যা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু তাদের কিছুতেই পুষ্পসজ্জায় ব্যবহার করা চলে না। কারণ এ ফুলগুলি গাছ থেকে কেটে ঘরে আনতেই তা ঝিমিয়ে পড়বে যদিও সেই ফুলই না কাটলে গাছে সুপ্রভ থাকে কয়েক দিন ধরে। এগুলির ভেতরে এলাম্যানডা, কর্ডিয়া, এমহার্স্টিয়া, কমব্রেটাম, কেশিয়া ও পেট্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

**মালা গাঁথার ফুল ॥**

গৃহসজ্জায় ফুলের মালারও ব্যবহার রয়েছে। মালা দিয়ে বিশেষ কোন জায়গা সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা যায় খুব সহজেই। মালা তৈরীর কাজে রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই, শিউলি, বকুল, এনটিরাইনাম, পাইরোস্টেজিয়া, গাঁদা, সন্ধ্যামণি, লঙ্কাজবা প্রভৃতির খুবই সমাদর। এদের ভেতরেও এই তালিকার প্রথম পাঁচটি তাদের সুগন্ধের জন্য আরও বেশি সমাদৃত। মালা গাঁথার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং নিপুণ শিল্পীর হাতের মালা সত্যিই চেয়ে চেয়ে দেখার মত। সন্ধ্যামণি ও পাইরোস্টেজিয়া দিয়ে বিনা সুতোয় (অর্থাৎ সুতো বা এ ধরনের কোন কিছু ছাড়াই) মালা গাঁথা সম্ভব। লঙ্কাজবা, পাইরোস্টেজিয়া ও এনটিরাইনামের মালা রজনীগন্ধার মোটা মালার মত পাশাপাশি ভাবে গাঁথা দরকার। হালকা হলদে রংয়ের এনটিরাইনামের মালা বৈদ্যুতিক আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।

**পুষ্পসজ্জার বিশিষ্ট ফুলগুলি ॥**

পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুলগুলির ভিতরে কয়েকটি ফুল এ কাজে বিপুল সমাদৃত। এদের সৌন্দর্যের উচ্চ মান সম্পর্কে কোন ভিন্নমতের অবকাশ নেই এবং এরা প্রত্যেকেই ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে অনেক সময় ধরে। এ বিপুল সমাদৃত ফুলগুলির নাম গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, গ্লোরিওসা, জারবেরা ও ক্লায়ান্থাস। এ তালিকার গোলাপ ও রজনীগন্ধার সঙ্গে পুষ্পসজ্জার ফুল হিসাবে আমাদের মোটামুটি পরিচয় রয়েছে, এবং খুব অল্প পরিচয় রয়েছে গ্লাডিওলাসের সঙ্গে। তবে এ তিনটির ভেতরে উঁচুদরের ফুল পাওয়া যায় একমাত্র রজনীগন্ধার, অন্য দুটির যে ফুল সমতল বাংলার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তাদের মান কিছু ভাল নয়। গোলাপের ভিতরে আরও বেশি সমাদর এর সুগন্ধি ফুলগুলির। গোলাপ দিয়ে সাজাবার বেলায় একটু বড় ডাঁটির বা ডালের ফুল দিয়ে পুষ্পসজ্জা তৈরী করলে তা আরও ভাল দেখাবে। গ্লাডিওলাস বা রজনীগন্ধার শুধু কয়েকটি স্টিক দিয়ে তৈরী পুষ্পসজ্জা আরও বেশি মানায়। গ্লাডিও-লাসের বেলায় এ কাজ রং মিলিয়ে করা যেতে পারে খুব সহজেই। হালকা রঙের জারবেরা দিয়ে সাজানো পুষ্পসজ্জা দেখতে খুবই সুন্দর। ক্লায়ান্থাস ও গ্লোরিওসার ফুল এদের গড়নের অভিনবত্ব কারণে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পুষ্পসজ্জার কাজে সমাদর চন্দ্রমল্লিকার ছোট ফুলগুলির, কিন্তু এদেশে এরা এখনও প্রায় অনুপস্থিতের তালিকায়। একই কথা প্রযোজ্য ডালিয়ার স্মল ক্যাকটাস, স্মল ডেকরেটিভ ও পম্পন প্রজাতিগুলি সম্পর্কে—পুষ্পসজ্জার কাজে যাদের বিভিন্ন দেশে সমাদর গোলাপের মতই। ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকার পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুলগুলি পাওয়া গেলে এ কাজে এদের সমাদর বেড়ে যাবে অনেক গুণে।

'নৈবেদ্যের কলা' পর্যায়ের ফুল দিয়ে পুজো করতে বা পুজোর বেদি সাজানোতে আমরা অভ্যস্ত হলেও ভাল পুষ্পসজ্জায় এই নিম্নমানের ফুল একেবারেই অপাংক্তেয়। তাই ভাল করে ঘর সাজাতে সত্যিকারের ভাল ফুল একান্ত প্রয়োজন।

**পুষ্পসজ্জা প্রসঙ্গে আরও দুয়েকটি কথা ॥**

মুখোমুখি বসে কথা বলার টেবিলের ফুলদানির পুষ্পসজ্জা সব সময়ে ছোট ও স্বল্প উচ্চতার হওয়া দরকার। হালকা সবুজ রঙের ফুলদানিতে সাদা রঙের ফুল মানায় খুব ভাল। এবং ফুলভরা ডাল দিয়ে পুষ্পসজ্জার কাজে হালকা রঙের সাধারণ ফুলদানিই বেশি মানানসই। অনেক ফুল দিয়ে পুষ্পসজ্জার প্রান্তসীমায় হালকা রঙের ফুলের বেশি

ব্যবহার হওয়া উচিত এবং মাঝখানে ঘন রঙের ফুলের। বড় ফুলদানির বেলায় বেশি ফুল বা বড় ফুল দিয়ে এবং ছোট ফুলদানির বেলায় অল্প ফুল দিয়ে পুষ্পসজ্জা করা ভাল। পুষ্পসজ্জার উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশ এর গভীরতা হওয়া দরকার, নইলে অনেক ক্ষেত্রে এটি নেড়া নেড়া দেখাতে পারে। ফুল ভাল খুলছে কিন্তু খুলে যাওয়া শেষ হয়নি এরকম ফুল পুষ্পসজ্জার কাজে বেছে নেবেন। ফুল গাছ থেকে কাটার সময় যতটা সম্ভব ডাঁটি লম্বা রেখে কাটতে হবে, এবং পুষ্পসজ্জার কাজে কতটা ডাঁটি রাখা দরকার দেখে তা আবার সঠিক মাপে কাটতে হবে। এই কাটার কাজ করতে হবে বালতির জলের ভিতরে যাতে এয়ার-লক হবার আশঙ্কা না থাকে। ফুল সাজাবার পরে ফুলদানিতে জল ভরে দিতে ভুলবেন না। তামার পাত্রের ঠান্ডা জলে ফুল সবচেয়ে ভাল থাকে বলে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই ফুলদানিতে কিছু তামার পয়সা ফেলে রাখা যেতে পারে। পুষ্পসজ্জার ফুলকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে ফ্লোরাল পিনহোল্ডার ও টুকরো তারের জাল ব্যবহার করার দরকার পড়বে অনেক সময়েই। পুষ্পসজ্জার নিচে এগুলির পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যাওয়া দরকার যাতে এগুলি দেখা না যায়। পুষ্পসজ্জায় পাতা ইত্যাদির ব্যবহারও প্রচুর। অরোকেরিয়া কুকী, ঝাউ, এসপারাগাস, দেবদারু, ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা, রামধন চাঁপা, ফার্ন, গ্লাডিওলাস, বুগেনভিলিয়া, স্কারলেট কুইন ভেরীগেটা, কামিনী, পোথোস, হেমারোকেলিস ইত্যাদি পাতা বা ছোট ডাল, এবং কাশফুল, ঘাসফুল ও বীজ ধরেছে এরকম ঘাসফুলের পুষ্পসজ্জায় বিশেষ সমাদর।

বাইরে সূর্যস্নাত অবস্থায় খুব সুন্দর হলেও কিছু রঙের ফুল ঘরের ভিতরে বড়ই নিষ্প্রভ। এদের ভেতরে ঘন পারপেল, কালচে লাল ও অন্যান্য ঘন লাল প্রধান। বৈদ্যুতিক আলোতে সবচেয়ে ভাল দেখায় বিভিন্ন পর্দার হলদে ও কমলা-হলদে রঙের ফুলগুলি। এবং এ আলোতে ভাল দেখায় না এরকম দলে রয়েছে সেই ফুলগুলি যাদের রং মোভ, লাইল্যাক বা নীল। সবুজ রঙের ফুল গাছে সবুজ পাতার ভিতরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বেমানান, কিন্তু পুষ্পসজ্জায় এগুলিই অদ্ভুত মানানসই। সবুজ রঙের ফুল পাওয়া যাবে জিনিয়া এনভি, ডোডোনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা গ্রীন গডেস প্রভৃতি ফুলের মাধ্যমে। ঘরের ভিতরে সূর্যের আলোকচ্ছটায় নীল বা ভাওলেট রঙের ফুল দেখায় বেশ ভাল। এ রঙের পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুল পাওয়া যাবে এনজেলোনিয়া, ডুরাণ্টা, ফ্রানসিশিয়া, কর্নফ্লাওয়ার, লার্কস্পার, নীল শালুক ইত্যাদি ফুলে। পুষ্পসজ্জার বিশেষ উপযুক্ত রঙের ফুলগুলি পাওয়া যাবে বহু ফুলের ভিতরে, এদের ভিতরেও উজ্জ্বল হালকা পিঙ্ক রঙের ফুলগুলি ও সুপার স্টার গোলাপের মত ভারমিলিয়ান-অরেঞ্জ রঙের ফুলগুলি দিনে এবং রাতেও মানায় চমৎকার।

# মাটি ও সার

ফুলবাগান ভাল করে তৈরী করা বহুলাংশে নির্ভর করবে মাটি ও সারের উপরে। গাছের বিভিন্ন অবস্থায় পরিমাণমত উপযুক্ত সার দরকার যাতে তা ভাল ফুল ইত্যাদি দেবার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে মাটির অবস্থা এরকম হতে হবে তা যেন মাটিতে যেসব সার দেওয়া হচ্ছে তা গাছকে পেঁাছিয়ে দিতে পারে। মাটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে তার প্রকৃতি অনুযায়ী; এ বিষয়ে বোস ও মুখার্জির 'গার্ডেনিং ইন ইনডিয়া' বইটিতে ভাল আলোচনা রয়েছে। বিভিন্ন গাছের জন্য বিভিন্ন পি-এইচ ভ্যালুর মাটি সবচেয়ে ভাল। মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে কোন বিশেষ গাছের প্রয়োজনমত সেই মাটির ঘাটতি পূরণ করে নেওয়া দরকার, মাটিতে কিসের ঘাটতি রয়েছে তা পরীক্ষা না করে কারু পক্ষে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। 'স্পার্টিন' নামের একটি মিশ্র উপাদান একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরী করে থাকেন এবং এঁরা এ দাবিও করেন যে, এটির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘাটতি রয়েছে এরকম মাটিকে প্রয়োজনমাফিক পি-এইচ ভ্যালুতে পেঁাছে

দেবে। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন ফুলগাছের চাষ সম্পর্কে আলোচনায় সেই সব গাছের উপযুক্ত সারমাটি কি ভাবে তৈরী হবে তা বলা হয়েছে। এসব জায়গায় মাটি বলতে বিশেষ করে দোঁয়াশ মাটিকে বোঝানো হয়েছে। এটা দেখা যায় যে, বেশির ভাগ গাছ দোঁয়াশ মাটিতে জন্মায় ভাল। বাগানের মাটি দোঁয়াশ না হলে তাকে দোঁয়াশ মাটিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা ভাল। বেলে মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে গোবরসার, পাতাপচাসার, এঁটেল মাটি, আবর্জনাসার, কচুরিপানা, পুকুরের পাঁকমাটি ও চুন ব্যবহার করে তা দোঁয়াশে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এবং এঁটেল মাটিকে দোঁয়াশ করার চেষ্টা করা যেতে পারে প্রয়োজনমাফিক গোবরসার, পাতাপচাসার, বালি, কাঠের, ঘুঁটের, তুষের বা আবর্জনা পোড়ানো ছাই ও চুন মিশিয়ে। কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করলে এঁটেল বা বেলে মাটি আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হবে দোঁয়াশ মাটিতে। চুন উপরের এই দু'ধরনের মাটির বেলায় দু'ভাবে কাজ করে; এটি এঁটেল মাটিকে সাহায্য করবে বিচ্ছিন্ন হতে এবং একীভূত হতে সাহায্য করবে বেলে মাটিকে।

চুন ॥

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে সমতল বাংলার মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে চূণ রয়েছে, তাই সারমাটিতে চুন মেশাবার অনেক সময়েই দরকার পড়ে না। কিন্তু একই জমিতে বছরের পর বছর ফুলগাছ চাষ করা হলে তাতে দু'তিন বছর অন্তর চুন অবশ্যই মেশানো দরকার। এছাড়া অনেক গাছ রয়েছে যারা সারমাটিতে চুন পছন্দ করে, এদের বেলায় প্রত্যেক বছর অল্প করে চুন মেশানো উচিত। বিভিন্ন ধরনের চুন মাটিতে মেশানো চলে, এদের ভেতরে তেজ মরে যাওয়া পাথরচুন গুঁড়ো করে মেশানো অনেকে পছন্দ করেন। সারমাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে চুন থাকা একান্ত আবশ্যক, এর অভাবে সারমাটির সার গাছ ঠিকমত নিতে পারবে না। চুন বর্ষার ঠিক আগে মেশানো ভাল, এবং চুন সব সময়েই সারমাটিতে মেশাতে হবে বেশ সাবধানে। অনেক সারের সঙ্গে চুন সরাসরি মেশানো চলে না তাই এটি মেশাতে হয় আগে বা পরে। অনেক রাসায়নিক সারও অনেক রাসায়নিক সারের সঙ্গে সরাসরি মেশানো চলে না। গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের 'কমপ্লিট গার্ডেনিং ইন ইনডিয়া' বইয়ের 'ম্যানিওর এ্যান্ড দেয়ার ইউজ' অধ্যায়ে উপস্থাপিত রেখাচিত্রটি কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টি মেশানো উচিত নয় তা বুঝতে সাহায্য করবে। দু'তিন বছর অন্তর এক স্কোয়ার মিটার জমিতে একশো দশ থেকে দুশো গ্রাম হারে চুন দেওয়া যেতে পারে। জমিতে চুন মেশাবার ভাল সময় বর্ষার দিনগুলিতে।

সার ॥

ফুলগাছ ও অন্যান্য গাছে জৈব সার ও রাসায়নিক সার এই দুয়েরই ব্যবহার রয়েছে। জৈবসার কাজ দেয় অনেক দিন ধরে এবং সারমাটি তৈরী করতে জৈবসার ব্যবহার করা একান্ত দরকার। সারমাটিতে জৈবসার ব্যবহার না করে ফুল ফোটানো হয়তো যেতে পারে কিন্তু এ ভাবে উঁচুদরের ফুল ফোটানো বুঝি অসম্ভব। জৈবসার মিশ্রিত সারমাটিতে চারাগাছ লাগাবার পরে বাড়তি সার হিসাবে জৈব বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চলবে। তবে দীর্ঘজীবী গাছে এমোনিয়াম সালফেট জাতীয় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই বোধ হয় ভাল।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। টবের গাছে রাসায়নিক সার দিলে টবে নোনা ধরে সহজেই। এ সার ব্যবহারে ফুলের সঠিক রঙ আসে না অনেক সময়ে। কোন কোন গাছে রাসায়নিক সার একেবারেই ব্যবহার করা চলে না এবং বহুবর্ষজীবী গাছে এর ব্যবহারের কুফল ফলতে দেখা যায় অনেক সময়ে। এ অভিযোগগুলি সম্পর্কে কোন গবেষণা বিশেষ হয়নি এবং রাসায়নিক সারেরই এই সবের জন্য পুরো দায়িত্ব কিনা তাও জোর করে বলা যায় না, তবে এ ধারণা অনেকের মনেই প্রবল। জৈবসার ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত থাকা চলে এবং ভাল ফলও পাওয়া যায়। তবে রাসায়নিক সারের কয়েকটি বিশেষ সুবিধার দিকও রয়েছে। এর ব্যবহারে জৈবসারের মত দুর্গন্ধ

হবার সম্ভাবনা নেই। এর খরচও অপেক্ষাকৃত কম এবং রাসায়নিক সার যোগাড় করাও সহজ। শহরের জীবনে এবং সাধারণ বিত্তবানদের জীবনে এ সুবিধাগুলি ফেলে দেবার নয়।

সারের দরকার গাছের খাদ্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ প্রভৃতি যোগান দেবার জন্য। নাইট্রোজেন গাছ সতেজ ও গাছের পাতা ঢলঢলে করে তুলবে এবং ফুলও ভাল হতে সাহায্য করবে। তবে নাইট্রোজেন বেশি পড়লে ক্ষতির আশঙ্কাও প্রচুর। এ অবস্থায় গাছ বড় হবে, কিন্তু ফুলের উৎকর্ষ মোটেই খুলবে না এবং ফুলও আসবে দেরিতে। ফসফরাস গাছের শেকড় ছড়াতে সাহায্য করবে, ফলে সমস্ত গাছের স্বাস্থ্য ভাল হবে। তাছাড়া এ সার ফুলের উৎকর্ষ বাড়াবে এবং গাছে ফুল ফোটাবে বেশি দিন ধরে। ফসফরাস কিন্তু বেশি পড়লেও গাছের খুব ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই; নাইট্রোজেন বেশি হলে ফসফরাসের ব্যবহার নাইট্রোজেনের ক্ষতির মাত্রা কমাতে সাহায্য করবে। পটাশও গাছ বাড়াতে সাহায্য করবে; তবে এর বিশেষ কাজ ফুল বেশিদিন সুপ্রভ রাখা, ফুলের উন্নত রঙ আনা ও অনেক কন্দজ ফুলগাছের কন্দকে পুষ্ট হতে সাহায্য করা। ফসফেট ও পটাশ গাছের রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে। সব গাছেরই উপযুক্ত পরিমাণে ও উপযুক্ত সময়ে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ দরকার। এ ছাড়া কিছু ট্রেস এলিমেণ্টেরও প্রয়োজন যা অনেক সময়েই মাটিতেই পাওয়া যায়। সার দেবার সময়ে গাছ যাতে সবগুলি প্রয়োজন-মাফিক পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

**জৈব সার ॥**

সমতল বাংলায় জৈবসারের প্রধান উপকরণ গোবরসার, পাতাপচাসার, সরষের খোল, হাড়ের গুঁড়ো প্রভৃতি। বিভিন্ন গাছে গোবরসার ও খোলসারের বহুল ব্যবহার। এ দুটিই মূলত নাইট্রোজেন-প্রধান হলেও সুষম-সারের বেশ কিছু গুণ এদের রয়েছে, তাই শুধু এ দু'টির সাহায্যে গাছ করলেও মোটামুটি ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব। তরলসার হিসাবেও এ দু'টির প্রয়োগ বিশেষ সমাদৃত। সরষের বা অন্য খোলসার গুঁড়ো করে মাটিতে মেশাবেন এবং গোবরসার ব্যবহার করবেন বছর খানেক সময় দিয়ে পচিয়ে নিয়ে। কোন গোলাকার জমিখণ্ডের মাটি তিরিশ সেণ্টিমিটার গভীর করে তুলে নিয়ে সেখানে কাঁচা গোবর জমাবেন। জমাবেন এমন ভাবে যাতে মাঝখানের গোবর সবচেয়ে উঁচু থাকে এবং মাঝখান থেকে ঢলে নেমে এসে মাটিতে মেশে। গর্তের কোন জায়গা খালি রাখবেন না, খালি রাখলে সেখানে জল জমে গোবর পচার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। গর্তের তোলা মাটি দিয়ে গোবরের উপরে একটি পাতলা আস্তরণ করে দেবেন। গোবর জড়ো করবেন ছায়া জায়গায় এবং সম্ভব হলে গোবর যাতে বর্ষাতে না ভেজে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বছর খানেকের মাথায় এই গোবর ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। কাঁচা গোবরে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা আধ ভাগ। বিভিন্ন ধরনের খোলে নাইট্রোজেন রয়েছে শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগ এবং ফসফরাস দেড় থেকে দু'ভাগ।

মুরগীর সার মাস আটেকের পুরানো হলে ব্যবহার করার বিধি। এ সারের পরিমাণ বেশি হলে গাছের পাতা পুড়ে যাবার ভয় রয়েছে। মুরগীপালন দিন দিন বাড়ছে, তাই এ সার পাওয়া আজকাল অপেক্ষাকৃত সহজ। এ সারও ব্যবহার করবেন গুঁড়ো করে। মুরগীর সারে শতকরা প্রায় দু'ভাগ নাইট্রোজেন, এক ভাগ ফসফরাস ও আধ ভাগ পটাশ রয়েছে। পাতাপচাসার সব গাছের পক্ষে উপকারী, যদিও এতে সারের গুণ খুবই অল্প। বাগানের কোন ছায়া জায়গায় গর্ত করে তাতে পুরানো পাতা ফেলে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। তাড়াতাড়ি যাতে পচে সেজন্য গর্তের পাতা জল দিয়ে কয়েকবার ভিজিয়ে দিতে হবে। বছর খানেকের মাথায় এ সার ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। তখন একে গুঁড়ো করে মাটিতে মেশাবেন। হাড়ের গুঁড়োও পাতাপচাসারের মত সব গাছের পক্ষে খুব উপকারী, এবং এটিতে সুষম-সারের অনেক গুণও রয়েছে। এ দু'টি সারের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলেও গাছের কোন ক্ষতি করে না। হাড়ের গুঁড়ো খুব আস্তে আস্তে কাজ দেয় বলে গাছের অনেক দিন উপকারে লাগে। তবে একই কারণে হাড়ের গুঁড়ো মেশাবার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এর থেকে কোন কাজ পাওয়া যায় না। এ অসুবিধা দূর করার

জন্য স্টীমড্ হাড়ের গুঁড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে। হাড়ের গুঁড়োয় রয়েছে শতকরা তিন ভাগ নাইট্রোজেন ও কুড়ি ভাগ ফসফরাস। অন্যান্যদের ভেতরে মিশ্র জৈবসার স্টেরামীল ও র‍্যালীমীল ব্যবহার করা যেতে পারে। এ দুটিই সুষম-সার। এগুলি শুধুমাত্র জৈবসার মিশিয়ে তৈরী বলে পরিচিত হলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। স্টেরামীল বাজারে আসার প্রথম দিকে এ সার ব্যবহার করে অত্যন্ত ভাল ফল পেয়েছি। অন্যকে নিজের অভিজ্ঞতার ভাগীদার করতে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধে স্টেরামীলের উচ্ছ্বসিত গুণগান করেছিলাম। কিন্তু দুয়েক বছর পরে যে স্টেরামীল বা র‍্যালীমীল বাজারে পেয়েছি তাদের গুণগান করার মত কোন গুণ পাইনি। তাহলেও অন্যান্য সারের সঙ্গে মিশিয়ে এ মিশ্রসারগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

**তরল জৈবসার ॥**

তরল জৈবসার হিসাবে ব্যবহার বেশি কাঁচা গোবরের। টাটকা গোবর চটে বা মোটা কাপড়ে পুটলির মত করে বেঁধে তা একটি শক্ত লাঠির সাহায্যে কোন জলপূর্ণ পাত্রে জলের ভেতরে ঝুলিয়ে রাখুন। তিনচার দিন পরে এই জল তরলসারে পরিণত হবে। সমান পরিমাণে কাঁচা গোবর ও সরষের খোল পচিয়েও তরলসার তৈরী করা যেতে পারে। পচানো এই সারে এবং দরকার পড়লে গোবরের তরলসারে জল মেশাবেন এমন পরিমাণে যাতে ব্যবহারযোগ্য তরলসারের রঙ হবে ঠিক পাতলা চায়ের ক্বাথের মত। ফিশমীল, ব্লাড-মীল, গুয়ানো, মুরগীর সার প্রভৃতিরও তরল সার হিসাবে ব্যবহার রয়েছে। এদের পনেরো থেকে পঁচিশ গ্রাম পাঁচ লিটার জলের হারে মেশানো হয়ে থাকে, এবং এদের জলে মেশাবার চব্বিশ ঘণ্টা পরে ব্যবহার করা বিধি। গরুর চোনা গাছ বাড়বার মুখে ব্যবহার করা ভাল, এটির সঙ্গে দশ-পনেরো গুণ জল মিশিয়ে নেওয়া দরকার। তরলসার ঘন অবস্থায় ব্যবহার করলে তার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে। দরকার পড়লে তরলসার ছেঁকে নিতে হবে। এবং এ সার ব্যবহার করবেন গাছের গোড়ার মাটি ভিজে থাকা অবস্থায়। এজন্য তরলসার ব্যবহার করার কয়েক ঘণ্টা আগে গাছের জমিতে সাধারণভাবে জল দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

তরলসার গাছে ব্যবহারের উপযোগী করতে গাছের গোড়া আগে খুঁচে দিতে হবে। এ সার আকাশ পরিষ্কার রয়েছে এরকম দিনে ব্যবহার করা দরকার। ভালভাবে বাড়ছে না এরকম গাছে তরলসার কখনই দেওয়া উচিত নয়। এবং তরলসার ব্যবহার করার কয়েকদিনের ভেতরে গাছের গোড়া আবার খুঁচে দিতে হবে। এই অনুচ্ছেদের নিয়মগুলি রাসায়নিক তরলসারের বেলায়ও সমান প্রযোজ্য।

**সবুজ সার ॥**

সবুজ সার বা গ্রীন ম্যানিওর জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। চাষের বেলাতে সবুজ সারের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত হলেও ফুল চাষের বেলায়ও এটি ভাল কাজ দেবে। এছাড়া বর্ষাকালে কেয়ারির জমিতে ফুল চাষ করা না হলে তা জংলীঘাসে ভরে যায়। এ অবস্থার সুরাহা করতেও এই সব কেয়ারিতে ধনচে, শণ বা অন্য কোন সবুজ-সারের বীজ বোনা দরকার। মে-জুন মাসে ধনচে বীজ ছড়িয়ে দেবার পরে গাছে ফুল আসার আগে তা তুলে গোছা গোছা করে কেয়ারির বিভিন্ন জায়গায় বিঘতখানেক মাটির নিচে চাপা দিতে হবে। ধনচে মাটির নিচে পচতে সময় নেবে মাসদুয়েক, তাই কেয়ারি ফুলগাছের জন্য ব্যবহার করার উপযুক্ত সময় হাতে রেখে এ কাজ করবেন। মাটির নিচের ধনচে গাছ বেশ কয়েক পশলা বড় বৃষ্টি পাবার পরে এর যে অংশগুলি পচতে অনেক সময় নেয় তা বেছে ফেলে দেওয়া ভাল। এটা উই যাতে গাছের না-পচা অংশের লোভে না আসে সেজন্য করা দরকার।

**জৈব কম্পোস্ট সার ॥**

কম্পোস্ট সারের প্রধান উপাদান পাতাপচাসারের মত হলেও এটি শেষেরটির চেয়ে অনেক বেশি উপকারী। দরকার বোধ করলে কম্পোস্ট সার গোবর ও পাতাপচাসারের

বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিন হাত চওড়া ও তিন হাত লম্বা পরিমাণ জায়গায় প্রথমে পনেরো সেণ্টিমিটার উঁচু করে শুকনো বা কাঁচা পাতা ও শাকসবজির ফেলে দেওয়া অংশ হালকা ভাবে জড়ো করবেন। এই জড়ো করা পাতা ইত্যাদি ঝারির সাহায্যে গোবরজল বা চোনা দিয়ে ভিজিয়ে দেবেন। এর পরে এই পাতার উপরে তিন সেণ্টিমিটার পুরু করে কাঁচা গোবর এবং এই গোবরের উপরে তিন সেণ্টিমিটার পুরু করে মাটি বিছিয়ে দিতে হবে। গোবর বা মাটি অল্প জলে মিশিয়ে কাদা কাদা করে নিলে বিছিয়ে দিতে সুবিধা হবে। এই মাটির উপরে বড় দুমুঠো হাড়ের গুঁড়ো ও একমুঠো এমোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দেবেন। একই দিনে এই পনেরো সেণ্টিমিটার থাকের উপরে আরও গুটি তিনেক পনেরো সেণ্টিমিটার থাক একই ভাবে তৈরী করা দরকার এবং তারপরে সব কয়টি থাক ঘিরে ছয় সেণ্টিমিটার পুরু একটি মাটির প্রলেপ দিয়ে দেবেন। কম্পোস্টের ঢিবি তৈরী করা হবে এভাবে যাতে উপরের দিকের থাকগুলি লম্বায় ও চওড়ায় ক্রমশ ছোট হয়। ঢিবি তৈরীর তিন সপ্তাহ পরে ঢিবি ভেঙে পাতা ইত্যাদি ভাল করে মিশিয়ে আবার নতুন ঢিবি করে দেবেন। ঢিবির পাতা ইত্যাদি এই সময়ে ভাল করে গোবর জল দিয়ে ভিজিয়ে দেবেন এবং সম্পূর্ণ ঢিবিতে কিছুটা সুপারফসফেট মেশাবেন। আবার তিন সপ্তাহ অন্তর ঢিবি ভেঙে নতুন ঢিবি করতে হবে এবং একই সঙ্গে গোবর জল দিয়ে কম্পোস্ট ভিজিয়ে দিতে হবে। মাস চারেক পরে এই কম্পোস্টের সার ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। কম্পোস্ট করার কাজে কচুরিপানা ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাবেন। কচুরিপানা মেশাতে হবে কাঁচা অবস্থাতে। কম্পোস্ট ছায়া জায়গায় করতে হবে এবং বর্ষার সময়ে এতে যাতে জল না পড়ে তারও ব্যবস্থা করা দরকার। কম্পোস্ট করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে. গ্রিনডালের 'এভরিডে গার্ডেনিং ইন ইনডিয়া' বইটিতে কম্পোস্ট সম্পর্কে ভাল আলোচনা রয়েছে।

**রাসায়নিক সার ॥**

রাসায়নিক সারের মাত্রা বেশি হলে গাছের উপকারের চেয়ে অপকারের আশঙ্কা বেশি। এর ব্যবহারের বেলায় যথেষ্ট সাবধান না হলে গাছের মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়। সারের মাত্রা ঠিক কতটা হবে তা কেউ জোর করে বলতে পারেন না, কারণ জলবায়ু, মাটি ইত্যাদির উপরে সারের মাত্রা একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া এখানে কেউ রাসায়নিক সারের মাত্রা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন বলে জানি না। তাই অল্প মাত্রায় সার দিয়ে আরম্ভ করে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মাত্রা ঠিক করে নেবেন। সন্দেহ জাগলে সব সময়েই সারের মাত্রা কম করবেন যাতে গাছের কোন ক্ষতি না হয়। সন্দেহ রয়েছে এরকম অবস্থায় বরঞ্চ প্রথমে অল্প কয়টি গাছে পরীক্ষামূলক ভাবে সার দিয়ে আশানুরূপ ফল পেলে অন্যান্য গাছেও একই মাত্রায় সার দেবেন।

নাইট্রোজেন রয়েছে এমোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, ডাই-এমোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি সারে। ক্রমানুসারে এদের নাইট্রোজেনের ভাগ শতকরা কুড়ি, চুয়াল্লিশ ও আঠারো। এদের ভেতরে আমাদের পছন্দ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট। এর একটা বড় সুবিধার দিক রয়েছে, এটা ব্যবহার করলে আলাদা করে ফসফেট সার দিতে হয় না।

ফসফরাস পাওয়া যাবে সুপারফসফেট ও ডাই-এমোনিয়াম ফসফেটে। এদের ফসফেটের ভাগ যথাক্রমে ষোলো থেকে কুড়ি ও আটচল্লিশ। পটাশ পাওয়া যাবে সালফেট অব পটাশ ও মিউরেট অব পটাশে। এদের পটাশের ভাগ যথাক্রমে শতকরা পঞ্চাশ ও পঞ্চাশ থেকে ষাট। জৈব সারের ভেতরে প্রধানত কাঠের ছাইতে কিছুটা পটাশ পাওয়া যায়, কিন্তু এর পটাশের স্বল্পতার জন্য শুধু জৈব সারের অনুরাগীদেরও পটাশের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। পটাশের এই দুটি সারের ভেতরে সালফেট অব পটাশ গাছের পক্ষে বেশি উপযোগী।

উপরের এই সারগুলি ছাড়া বাজারে বিভিন্ন মিশ্র-সার পাওয়া যায়। যদিও এর কোনটিই ফুলগাছের জন্য তৈরী নয় তবুও নির্দেশ অনুযায়ী এদের ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।

**রাসায়নিক তরলসার ॥**

রাসায়নিক তরল সারের বেলায়ও পরিমাণ সম্পর্কে খুব সাবধান হতে হবে; সারের পরিমাণ কম হলে খুব ক্ষতি নেই, কিন্তু বেশি যেন কখনই না হয়। এবং জৈব তরলসার ব্যবহারের যেসব নিয়ম তা এর বেলায়ও পুরোপুরি ভাবে মেনে চলতে হবে। গুঁড়ো রাসায়নিক সারের মত তরলসারে সারের পরিমাণও নিজে নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঠিক করে নেওয়া দরকার। চারাগাছ লেগে গেলে তার স্বাস্থ্য আরও ভাল করতে নাইট্রেট অব সোডা অথবা এমোনিয়াম সালফেটের তরলসার সপ্তাহে একদিন করে দেওয়া যেতে পারে। এদের প্রথমটিকে একবার এবং পরের সপ্তাহে দ্বিতীয়টিকে, এভাবে পালটাপালটি করে ব্যবহার করা ভাল। এই দুটির বেলাতেই পাঁচ লিটার জলে দশ গ্রাম সার এই হারে মেশানো যেতে পারে। গাছে কুঁড়ি এলে দু'ভাগ এমোনিয়াম সালফেট, দু'ভাগ সুপারফসফেট ও একভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে এই মিশ্র সারের দশ গ্রাম পাঁচ লিটার জলের হারে মিশিয়ে তা গাছে সপ্তাহে একবার বা দুবার করে দেওয়া যেতে পারে। একভাগ ইউরিয়া, দু'ভাগ সালফেট অব পটাশ ও তিনভাগ সুপারফসফেট মিশিয়ে, চায়ের চামচের দুচামচ এই মিশ্র সার পাঁচ লিটার জলের হারে মিশিয়ে এই তরল সার ব্যবহার করেও অনেকে ভাল ফল পেয়েছেন। এ তরলসার ব্যবহার করা উচিত গাছে কুঁড়ি আসার পরে এবং দেওয়া উচিত সপ্তাহে একদিন বা দুদিন। তরলসার ব্যবহার করার আগে গাছে সাধারণ ভাবে জল দেওয়া হবে যাতে এ সার ব্যবহারের সময়ে গাছের গোড়া ভেজা থাকে। এবং গাছের পাতায় রাসায়নিক তরলসার কখনই পড়তে পারবে না।

**পাতার সার ॥**

পাতার সার বা ফলিয়ার ফিড দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি বহুবর্ষজীবী গাছেও দেওয়া চলবে। পাতার সার রাসায়নিক সার দিয়ে তৈরী হলেও এর সুষ্ঠু প্রয়োগে গাছের ক্ষতি হবার আশংকা নেই। পাতার সার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 'ফুলবাগান ঘিরে নানান চিন্তা' ও 'গোলাপ' অধ্যায় দুটিতে করা হয়েছে।

# গাছের বংশবৃদ্ধি

গাছের বংশবৃদ্ধির সহজ উপায়গুলি জানা থাকলে যে কোন গাছের সংখ্যা আমরা সাধারণ খাটুনিতেই বাড়িয়ে নিতে পারি। এভাবে একরকম বিনা খরচে অথবা নামমাত্র খরচে আমাদের আরও বেশি গাছ চাষ করার সুযোগ মিলবে। তাছাড়া নামী বা দামী গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারলে মূল গাছটি কোন কারণে মারা গেলেও তা খুব বড় ক্ষতি বলে মনে হবে না। বাড়তি গাছ থাকলে তাদের পরিবর্তে কোন নতুন গাছ যোগাড় করতে পারি অথবা বিক্রী করে কিছু অর্থলাভ করতে পারি।

গাছের বংশবিস্তারের উপায় দুটি। বীজ দিয়ে এবং গাছের কোন অংশ ( ডাল, ডালের কোন অংশ অথবা পাতা দিয়ে) দিয়ে নতুন গাছ তৈরী করা। কোন কোন গাছের সাধারণত বীজ হয় না, আবার কোন কোন গাছের অংশ দিয়ে নতুন গাছ সাধারণত তৈরী করা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধির উপায় মাত্র একটি হয়ে দাঁড়ায়। পাতা দিয়ে গাছের বংশবিস্তার সমতল বাংলায় পাথরকুচি প্রভৃতি দু'চারটি গাছে মাত্র সম্ভব। তাই এর প্রয়োজনীয়তা আমরা বড় অনুভব করি না।

গাছের কোন অংশ দিয়ে নতুন গাছ তৈরীর প্রক্রিয়াকে কলম করা বলে। এটি বীজ থেকে নতুন গাছ করার থেকে অনেক বেশী সুবিধের। বীজ থেকে করা গাছ সবসময়ে মূল গাছের মত নাও হতে পারে। ডালিয়া, গোলাপ, জবা, আম প্রভৃতি গাছের বেলায় মূল গাছের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বীজের নতুন গাছ জন্মাবে না; এমন কি যেসব গাছের বীজ



I.O.E.B.Y West Bengal
Date........ 5AC9
9744

থেকে একই রকম গাছ আশা করা যায়, তাদের বেলায়ও কিছু কিছু ব্যতিক্রম অনেক সময়েই দেখা যায়। কোন কোন বীজের কাঞ্চন, কেশিয়া ফিশ্চুলা বা টেকোমা গাউডিচাউডিতে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে সেটি অন্যান্য গাছের চেয়ে ফুল দেয় অনেক বেশি। কোন্ গাছটি বেশি ফুল দেবে, তা চারা অবস্থায় বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বেশি ফুল দিচ্ছে বা অন্যান্য দিক দিয়ে উন্নত এরকম গাছ থেকে যদি কলম করে নিতে পারি তাহলে দেখব যে, কলমের গাছটি মূল গাছের সব বৈশিষ্ট্যগুলিই পেয়েছে। এছাড়া কলমের গাছের অন্য সুবিধেও রয়েছে। কলমের গাছ বীজের গাছের চেয়ে আয়তনে ছোট এবং বীজের গাছের থেকে অনেক আগে ফুল বা ফল দেয়।

কাটিং বা ডাল কেটে লাগানো, গুটি বা গুলকলম, দাবাকলম এবং চোখকলম—এই চার রকম কলম বিশেষ প্রচলিত। চোখকলম আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশি করা হয় এবং এর বহুল প্রয়োগের ফলে জোড়কলমের চল একরকম উঠে যাচ্ছে। দাবাকলম বা গুটিকলম সংখ্যায় একটু বেশি করলে গাছের ফুলের বা ফলের সংখ্যা কমে যেতে দেখা যায়। যাঁরা এই দুটি কলম বেশি করে করেন, তাঁরা অনেকেই শুধুমাত্র কলম করবেন বলে কিছু গাছ আলাদা করে চাষ করেন এবং এটাই করা বাঞ্ছনীয়। গাছ ছাঁটার কাজে কেটে ফেলা ডাল দিয়ে কাটিং করলে গাছের কোন ক্ষতি নেই ; কিন্তু অন্য সময়ে কাটিং করলে সেজন্যও আলাদা করে গাছ করা দরকার। চোখকলমে এই অসুবিধে নেই এবং চোখকলমে সহজে অনেক বেশি নতুন গাছ করা সম্ভব। এসব কারণে যেসব গাছের বেলায়, যথা গোলাপ, জবা ইত্যাদি, চার রকমের কলমই করা চলে সেখানে চোখকলমে গাছ করাই শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া।

**বীজ থেকে চারাগাছ ॥**

কোন কোন দীর্ঘজীবী গাছের বীজ পাকলেই চারাতে হয়, আবার অনেক গাছের বীজ পাকার বছর খানেকের ভেতরে চারানো চলে। যে বীজগুলি পাকলেই চারানো উচিত, সেগুলি বীজ পাকার উপরে চারাবার সময় নির্ভর করবে। আর যেগুলি অনেকদিন পর্যন্ত চারানো চলে, সেগুলি শীতের শেষে অথবা বর্ষার মাসদেড়েক আগে চারাবেন ( মরসুমী ফুলের বীজের পরিচর্যা অনেকটা আলাদা, তাদের সম্পর্কে আলাদা আলোচনা করেছি। ) মাঝামাঝি বর্ষায় এই সব গাছ তুলে লাগাবার মত হলে এদের তেরো সেণ্টিমিটার বা পাঁচ ইঞ্চি টবে লাগাবেন। পাঁচ ইঞ্চি টবের সারমাটি তিনভাগ সাধারণ মাটি ও একভাগ পুরানো গোবর দিয়ে তৈরী করবেন। বৃষ্টির দিনেই গাছ তুলে লাগাবার উপযুক্ত সময়, তাই অন্যান্য সময়ে করা গাছও এই সময়ে তুলে বসাবেন। এই টবে অন্তত মাস দুয়েক থাকার পরে চারাগাছ জমিতে লাগাবার উপযুক্ত হবে।

বীজতলার মাটি দু'ভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ পাতাপচাসার ও একভাগ লালবালি মিশিয়ে তৈরী করবেন। মাটি ও পাতাপচাসার ভাল করে গুঁড়ো করে নেবেন। দামী ও দুষ্প্রাপ্য বীজ ফেলবেন গামলা-টবে। চারা না ওঠা পর্যন্ত বীজতলায় জল এমন ভাবে দেওয়া দরকার যাতে জমি সব সময়ে ভেজা ভেজা থাকে। চারা উঠলে পরে অল্প অল্প করে বেশি সময়ের জন্য চারা গাছে রোদ লাগাবেন, চারা না ওঠা পর্যন্ত বীজতলায় আদৌ রোদ লাগাবার দরকার নেই। বীজ চারাবেন পাতলা করে এবং বীজ চারিয়ে বড় বীজে বেশি পুরু এবং ছোট বীজের বেলায় পাতলা করে মিশ্রিত মাটি বীজের উপরে ছড়িয়ে দেবেন।

**কাটিং ॥**

কাটিং করার সবচেয়ে ভাল সময় যে গাছ যখন ছাঁটতে হয় তখন। এছাড়া ভাল সময় বর্ষার প্রথম (ডালিয়া বা চন্দ্রমল্লিকার কাটিং-এর কথা এদের সম্পর্কে অধ্যায় দুটিতে রয়েছে।) কাটিং-এর জমি ভাল করে কুপিয়ে গুঁড়ো করে তাতে জল দিয়ে কাদা কাদা করে নিতে হবে। গাছের ডালগুলি আধহাত লম্বা করে ঠিক পর্বের ( নোড ) নিচ দিয়ে কাটবেন এবং সম্ভব হলে ডালের পাতাগুলি ঝরিয়ে ( সাধারণ গাছের বেলায় এর দরকার নেই ) দেবেন। কাটিংগুলি বসাবেন তেড়্ছা করে এবং দেখবেন যেন খুব ঘন ঘন বসানো না

হয়। বছর খানেকের পুরনো ডাল কাটিং-এর জন্য বেছে নেবেন এবং কাটিং-এর চার থেকে আট আঙ্গুল পরিমাণ মাটিতে বসাবেন। কাটিং-এর শেকড় এলে বর্ষাকালের ভেতরেই তুলে পাঁচ ইঞ্চি টবে লাগানো হবে। এর জমিতে এমনভাবে জল দেবেন যাতে সবসময়েই ভেজা ভেজা থাকে।

এছাড়া শুধু লালবালিতেও কাটিং করা যেতে পারে। সাধারণ টব বা গামলা-টব বালি ভর্তি করে তাতে কাটিং বসিয়ে দেবেন। কাটিং সোজা করেই বসাতে পারেন এবং একটু বেশ ঘন করেও বসানো যেতে পারে। জল এমনভাবে দেবেন, যাতে বালি সব সময়ে ভেজা-ভেজা থাকে। এই টব হালকা ছায়া জায়গায় রাখবেন। কাটিং-এ ভালভাবে শেকড় এলেই তা তুলে পাঁচ ইঞ্চি টবে লাগাতে হবে। বাঙ্গালোরে দেখেছি নরমডালের জায়গানসিয়া (এই গাছে চোখকলম করা হবে) গোলাপের কাটিং এভাবে তৈরী করে। চোখকলম করার জন্য যে গাছের কাটিং করা হচ্ছে, তাতে শেকড় এলে সেগুলি তুলে ইঞ্চি আটেক দূরে দূরে চোখকলমের জমিতে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং গাছ এই জমিতে লেগে গেলে সেখানে চোখ-কলম করা হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে আজকাল এরকম 'মিস্ট্ চেম্বার' হয়েছে যেখানে এক রকম যে কোন গাছের—এমন কি আমেরও—কাটিং দিয়ে নতুন গাছ তৈরী হচ্ছে তবে এ ধরনের ব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

কাটিং-এর অসুবিধার দিকও আছে। যত ভাল করে করা হোক, বেশ কিছু কাটিং-এ শেকড় আসে না। তাছাড়া ভাল জাতের জবা, গোলাপ, বুগেনভিলিয়া ইত্যাদির কাটিং-এ গাছ হতে চায় না। তবুও সাধারণ জাতের গাছের বংশবিস্তারের পক্ষে এটিই সবচেয়ে কম খরচের ও সহজতম উপায়।

**গুটিকলম ॥**

বছর দশেক আগে পর্যন্ত বাগান সম্বন্ধে যেসব বই বেরিয়েছে, তাতে গুটিকলম কি করে করতে হয় তার বর্ণনা পড়ে অনেকেই অতি সঙ্গত কারণে গুটিকলম করতে চাইবেন না। কিন্তু এর ভেতরে গুটিকলমের পদ্ধতির প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে এটা করা এখন খুবই সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম বর্ষা গুটিকলম করার বিশেষ উপযুক্ত সময়। বছর খানেকের পুরানো ডালের কোন পর্বের নিচ থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ, ডালের আগা থেকে গোড়ার দিকের, ছাল ছুরি দিয়ে ভালভাবে ছাড়িয়ে নিন। এ কাজ খুব সাবধানে করবেন যাতে ডালের কাঠে কোন আঘাত না লাগে। ডালের আগার দিকের যেখান থেকে কাটতে আরম্ভ করেছিলেন সেখান থেকে নিচের ইঞ্চি-খানেক ছাল বার করা কাঠে অল্প কিছুটা সেরাডিক্স বি-টু পাউডার আলতোভাবে কিন্তু ভাল করে ঘষে দিন। এর পরে ভাল করে কাদা করে নেওয়া এক দলা দোঁয়াশ মাটি (এ মাটিতে কোন রকম সার মেশাবেন না) সেরাডিক্স লাগানো জায়গা ও আরও ইঞ্চিখানেক সংলগ্ন আগার ডাল জুড়ে গোল করে চেপে লাগাবেন। এবং এই মাটিকে ঘিরে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ইঞ্চিদশেক এ রকম দুশো গেজের পলিথিন পেপার জড়িয়ে দিয়ে এর দুদিক ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিন। বেঁধে দেবার পরে অবস্থা দাঁড়াবে এই, ডালের গোড়ার দিকের আধইঞ্চি কাঠ বার হয়ে থাকবে এবং এর ঠিক উপরের ইঞ্চি দুয়েক ডাল থাকবে মাটির ভেতরে। যাতে ডাল জুড়ে না যায় তাই এই কিছুটা কাঠ বার করে রাখা। বাঁধার মাসখানেকের ভেতরে গুটিকলমে শেকড় আসবে এবং তা পলিথিনের কাগজের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাবে। বাঁধা থেকে কলমে শেকড় আসা পর্যন্ত অন্য কোন পরিচর্যার দরকার নেই। গুটিকলম ও দাবাকলম দুবারে কাটা ভাল—শেকড় এলে প্রথমে অর্ধেক গভীর করে কাটবেন এবং এর দিন দশেক পরে পুরোপুরি কেটে নেবেন। গুটিকলম কেটে পাঁচ ইঞ্চি টবে বসাবেন। বর্ষাকাল ছাড়া গুটিকলম করলে মাটির গুলের উপরে ভিজে মস্ জড়িয়ে তার উপরে পলিথিন পেপার বাঁধবেন। তাছাড়া দামী গাছের বেলায়ও মস্ ব্যবহার করা ভাল। জবা, পাতাবাহার ইত্যাদি অনেক গাছের নতুন গাছ করতে গুটিকলমের ব্যবহার।

**দাবাকলম ॥**

দাবাকলমের সবচেয়ে বড় সুবিধে যে এটি বছরের যে কোন সময়েই ভালভাবে করা

চলে। বর্ষাকালে করলে জল দেবার প্রয়োজন পড়ে না, নাহলে টবের মাটি যাতে ভেজা ভেজা থাকে সেভাবে জল দিতে হবে। জল গরমের দিনে প্রত্যেক দিন এবং অন্যান্য সময়ে দুদিনে একবার দিলেই চলে। দাবাকলম সাধারণত জমির কাছাকাছি ডালেই করা হয়, টব উপরে তুলেও দাবাকলম করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে পরিশ্রম ও খরচ দুই-ই বেশি। দাবাকলম করার জন্য আপনার দরকার একটি ধারালো ছুরি, গুঁড়ো সাধারণ মাটি ভরা পাঁচ ইঞ্চি বা আরও ছোট টব, বিঘতখানেক লম্বা একইঞ্চি মোটা বাখারি বা বাঁশের টুকরো যার মাঝখানে একটা গাঁট রয়েছে, আধলা ইট ও নারকেলের কাঠি। বাঁশের টুকরোটির একটা দিক গাঁট পর্যন্ত ফেড়ে নেবেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, দাবাকলমের কাজে বছর খানেকের পুরানো ডালই উপযুক্ত। কিন্তু বুগেনভিলিয়াতে আমরা বহুল পরীক্ষা করে দেখেছি যে মাস দু-তিনের কচি ডালেও খুব ভালভাবে দাবাকলম করা যায়। মুসায়েনডা, কাঞ্চন গল্পিনি, রঙ্গন সিঙ্গাপোরেনসিস ইত্যাদির মাস পাঁচেকের ডালে দাবাকলম করেও ভাল ফল পেয়েছি। বুগেনভিলিয়ার নতুন গাছের জন্য দাবাকলম করা সবচেয়ে ভাল। কচি ডালে বুগেনভিলিয়ার দাবাকলম করতে খুব ছোট টব হলেও চলে যাবে, তবে পরে নতুন গাছ বড় টবে পালটানো দরকার। এছাড়া দাবাকলম পালটে বড় টবে লাগাবার দরকার নেই।

যে ডালে দাবাকলম করবেন তার নিচের জমিতে ছোট টবটি আধাআধি ঢুকিয়ে দেবেন। টবে প্রথমে দু-চারটি চারা দিয়ে তার উপরে গুঁড়ো মাটি দিয়ে টবের অর্ধেকটা ভরাবেন। এর পরে ডালটিকে আস্তে আস্তে দুলিয়ে ধনুকের মত বাঁকাবেন, এমন ভাবে বাঁকাবেন যাতে ধনুকের পেট আধভরা টবের মাটি স্পর্শ করে। ডালের যে অংশটি মাটি ছুঁয়েছে সে জায়গাটি, ডালটি ছেড়ে দিয়ে, দাবাকলমের বিশেষ ধরনের কাটার কাজে ব্যবহার করবেন। বিশেষ ধরনের কাটার জায়গাটিতে প্রথমে ছুরি বসিয়ে চাপ দিয়ে ডালটি যতটা মোটা তার ঠিক অর্ধেক পর্যন্ত ছুরি চালান, এরপরে ছুরি দিয়ে ডালের এক ইঞ্চি লম্বা পরিমাণ অংশ পাশাপাশি ভাবে ফেড়ে ফেলুন, যাতে এই ফেড়ে ফেলা এক ইঞ্চি ডালের অংশ যেন হাঁ করে থাকে। ডাল ফাড়া হবে গোড়ার দিক থেকে আগার দিকে এবং ডালটির ফাড়া অংশ সব সময়েই ঠিক সম্পূর্ণ ডালটির অর্ধেক মোটা হবে। ফেড়ে দেবার পরে অবস্থা দাঁড়াবে এই যে, ডালের অর্ধেক মোটা এক ইঞ্চি পরিমাণ ফাড়া অংশ শুধুমাত্র আগার দিকের ডালের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। একথা মনে রাখতে হবে, ডালটি এমনভাবে ফাটাচ্ছেন যাতে হাঁ-করা অংশটি ডালটি আবার ধনুকের মত বাঁকালেই টবের মাটি স্পর্শ করে। এই কাটা বা ফাটানোর কাজটি দাবাকলমের সবচেয়ে কঠিন কাজ, তাই এ কাজটি খুব সাবধানের সঙ্গে করতে হবে। ডাল ফাটানো হলে ডালের যেখান থেকে হাঁ করা আরম্ভ হয়েছে সেখানে এক ইঞ্চি লম্বা নারকেলের কাঠি আড়াআড়ি ভাবে শক্ত করে আটকে দেবেন—যাতে ডালটি জুড়ে যাবার কোন সুযোগ না পায়। এরপরে ডালটিকে আবার সাবধানে বাঁকিয়ে হাঁ করা অংশটি টবের মাটির সাথে লাগিয়ে ডালের উপরে আরও মাটি দিয়ে টব ভর্তি করে দিন। এবং ডালটির আগার দিকটি ফাটানো বাঁশের কাঠির ভেতরে রেখে কাঠিটি টবের ভেতরে এমনভাবে বসিয়ে দিন যাতে ডালটি ছিটকে না উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও সাবধান হবার জন্য আধলা ইটটি টবের মাটির উপরে বসিয়ে দিন, ইট বসাবার আরও সুবিধে যে এতে টবের মাটি দেরি করে শুকুবে। দাবাকলমে শেকড় আসতে সময় লাগবে মাসখানেক থেকে মাস দুয়েক। দাবাকলম গুটিকলমের মত দুবারে কাটবেন এবং কেটে নেবার মাস দুয়েক পরে জমিতে বা বড় টবে লাগাতে পারেন।

**চোখকলম ॥**

বছর কয়েক আগেকার ঘটনা। এক বিদেশিনী ভদ্রমহিলা খুব মুষড়ে পড়েছেন। ভারতবর্ষে বোধ হয় তিনিই বিখ্যাত গোলাপ ক্রোনেনবুর্গ প্রথম এনেছেন এবং এই ঘটনার দিন পর্যন্ত অন্য কারু কাছে এ গোলাপ আছে বলে জানা যায়নি। কিন্তু তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে উইয়ে ক্রোনেনবুর্গ গাছটির গোড়া এমনভাবে খেয়েছে যে দুয়েক দিনের ভেতরেই গাছটি মারা যাবে। কি করে এই দুষ্প্রাপ্য গাছটি বাঁচানো যায় তিনি কিছুতেই ভেবে

পাচ্ছিলেন না। এ সময়ে মনে পড়ল যে তাঁর এক অল্প পরিচিত ভদ্রলোক চোখকলম করতে পারেন বলেছিলেন। তিনি তক্ষুনি সেই ভদ্রলোককে তাঁর অসুবিধার কথা জানাতে ভদ্রলোক জানালেন, সে সময়টি চোখকলমের খুব অনুকূল না হলেও চোখকলম করে তিনি ক্রোনেন-বুর্গ গাছটি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন বলেই আশা করেন। ভদ্রমহিলাটির অনুরোধে ভদ্র-লোকটি ক্রোনেনবুর্গের সব কয়টি উপযুক্ত চোখ তুলে তা অন্যান্য গোলাপ গাছগুলিতে চোখকলম করে দিলেন। ক্রোনেনবুর্গ মূলগাছটি দুদিনের ভেতরে মারা গেল ঠিকই, কিন্তু সামনের বছর সারা বাগান ভরেই ক্রোনেনবুর্গ ফুটতে লাগল।

চোখকলমের সুবিধের দিক অনেক। মূলগাছের যে ডালটিতে একটি মাত্র জোড়কলম সম্ভব হতো এবং বাঁধতে যে সময় লাগতো, তাতে পাঁচটি চোখকলম লাগানো ও বাঁধা সম্ভব। প্রধানত এই কারণে গোলাপের বংশবৃদ্ধি জোড়কলমের পরিবর্তে চোখকলমের সাহায্যে হচ্ছে এবং আমের বেলায়ও একই পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। কুলগাছে চোখকলমের ( সাধারণ চোখ-কলমের চেয়ে এটি একটু অন্য রকমের ) অদ্ভুত ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। বাঙ্গালোরে যেসব ভারী সুন্দর জবা পাওয়া যায় তার গুটিকলমের গাছ সমতল বাংলায় ভাল বাঁচছে না, কিন্তু চোখকলমের গাছ অনেক বেশি বাঁচছে। চোখকলমের আরও একটি মস্তবড় সুবিধে এই, অনেক-দূর থেকেও চোখসহ ডাল এনে নিজের বাগানে তা দিয়ে চোখকলম করতে পারেন। এ সুবিধে অন্য কোন কলমে একরকম নেই।

চোখকলমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং একটা বড় অসুবিধার দিকও আছে যে, কেউ হাতেকলমে না শেখালে এ বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। চোখকলম কারু কাছ থেকে শিখতে আপনার ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না। কিন্তু বই পড়ে বা ছবি দেখে এটা করতে পারা একরকম অসম্ভব। যেহেতু লিখে বোঝানো যাবে না, তাই ওপথে না গিয়ে চোখকলমের অন্যান্য দিকগুলিই শুধু আলোচনা করছি।

এ কলম করার সাজসরঞ্জাম খুবই সাধারণ। চোখকলম করার বিশেষ ধরণের ছুরি ( সাটন বা পুনার পোচার কাছে পাবেন ) এবং কমপক্ষে দুশো গেজের পলিথিন পেপার থেকে আধ ইঞ্চি চওড়া করে কেটে দেওয়া ফিতে। ছুরি দিয়ে ভাল জাতের গাছ থেকে চোখ ( নতুন ডাল বেরুবে এরকম ডালের কুঁড়ি অবস্থাকে চোখ বলে। চোখ তোলার কাজ অনেকে ব্লেড দিয়েও করেন ) তুলে তা একই জাতের সাধারণ গাছে ছুরির সাহায্যে বসিয়ে পলিথিন ফিতে দিয়ে বেঁধে দেওয়া চোখকলম করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। যে গাছ বছরের যে সময় বিশেষভাবে বাড়তে থাকে, সে সময়ে সেই সব গাছের চোখকলম করা উচিত। গোলাপ গাছ শীতকালে এবং জবাতে গরমের প্রথমে চোখকলম করবেন। চোখ যে গাছে লাগানো হবে সে গাছ এমন হবে যে, অল্প যত্নেই সে গাছ জোরালো হয়ে ওঠে এবং যাতে সহজেই চোখকলম কার্যকরী হয়। চোখ লাগাবার জন্য গোলাপের সাধারণ প্রজাতি এডওয়ার্ড রোজ ও জায়গান্‌সিয়া, জবার প্রজাতি কৃষ্ণা (এটি ঘন লাল ও ছোট ডাবল ফুলের) ও বুগেনভিলিয়ার প্রজাতি স্পেক্টাবিলিস ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণ প্রজাতিগুলির আট ইঞ্চি থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা কাটিং করে তাতে শেকড় এলে চোখকলম করবার জমিতে তুলে লাগাবেন। এখানে এই গাছগুলি এমনভাবে লাগাবেন, যাতে প্রত্যেকটি গাছে সহজেই কলম করা সম্ভব হয়। চোখকলম করবেন গাছের যত গোড়ায় সম্ভব। চোখকলম লাগলো কিনা তা দিন পনেরোর ভেতরে বুঝতে পারবেন এবং যদি হয়নি বুঝতে পারেন তখন আবার একই গাছে চোখকলম করতে পারেন। তাছাড়া চোখকলম করার পরে চোখকলমের ওপরে ডালটি কোন এক জায়গায় দুমড়ে দেবেন। গোলাপের কাঁটা ফেলতে মোটা চট তিন-চার ভাঁজ করে তা দিয়ে জোরে গাছ ঘষে দেবেন। চোখকলমের সাহায্যে একই গাছে অনেকগুলি ভাল জাতের চোখ বসানো সম্ভব হলেও একটি গাছে একটি চোখ বসানোই রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে।

# ঘরোয়া ফুলবাগান

ঘরের সংলগ্ন এক ফালি জায়গা থাকলে সেখানেই ফুলবাগান গড়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরকে সুন্দর করে তোলা, পূজা ও গৃহসজ্জার ফুল পাওয়া এবং সর্বোপরি বাগান করার আনন্দ এই সব কিছুরই যোগান দিতে পারে এই ঘরোয়া ফুল-বাগান। এই ফুলবাগানের কতগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে: (১) ঘরোয়া ফুলবাগানে গাছের সংখ্যা অল্প, কারণ ফুলগাছের জন্য বেশি জায়গা দেবার প্রশ্নই ওঠে না; (২) এখানের জন্য এরকম ফুলগাছ বেছে নেওয়া হয় যাদের পরিচর্যার পাট কম; এবং (৩) এরকম ফুলগাছ ঘরোয়া ফুলবাগানে বেশি সমাদৃত যারা অনেকদিন ধরে ফুল দেয় বা ফুল দেয় সারাবছর ধরে। ঘরোয়া ফুলবাগানে বেশি গাছ লাগানো সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু একটু গুছিয়ে নিয়মমাফিকভাবে করলে ঘরোয়া ফুলবাগান দেখতে খুবই সুন্দর দেখাবে এবং বাগান করার পূর্ণ আনন্দ এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

ঘরোয়া ফুলবাগানের জন্য ঘরের সামনের দিক বেছে নেওয়া দরকার। অনেকে ঘরোয়া সবজি বাগানের সঙ্গেই ফুলবাগান মিশিয়ে দেন। কিন্তু এটা না করে দুটিকে আলাদা আলাদা জায়গায় করা উচিত। ঘরোয়া ফুলবাগানের জায়গা কম তাই এ বিষয়ে খুবই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এখানে ফুলগাছের ভিড় না হয়ে পড়ে। ঠিক যে কয়টি ফুলগাছ ইত্যাদি লাগালে সবগুলি ভাল করে বাড়ার সুযোগ পাবে শুধু সেই কয়টি ফুলগাছ লাগানো হবে। পায়ে-চলা পথের পাশে জমিতে প্রথমে লাগাবেন মরসুমী ফুল, তারপরে আয়তনে যে যত বড় তার স্থান তত পেছনে। লতানো ফুলগাছ তুলে দেওয়া যেতে পারে ঘরোয়া ফুলবাগানের বেড়াতে। এ বাগানের কিছু অংশে ঘরের ছায়া পড়ার সম্ভাবনা খুবই, এরকম ছায়া জায়গায় পাতাবাহার বা অন্য কোনো বাহারি পাতার গাছ লাগানো হবে। ঘরোয়া ফুলবাগানে বড় ফুলগাছ লাগাবার সুযোগ কম, তবে যেখানে সুযোগ রয়েছে সেখানে অন্তত একটি বড় ফুলগাছ লাগানো উচিত। ঘরোয়া ফুলবাগানে বড় ফুলগাছ লাগাবার সুযোগ থাকলে বরুণ ফুলগাছটি এ বাগানে স্থান পাওয়ার বিশেষ দাবি রাখে। এ গাছটির একটি বড় সুবিধার দিক রয়েছে। শীতকালে বরুণের কোন পাতা থাকে না, ফলে এ সময়ে ঘরে বা উঠানে রোদ আসার কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এবং গ্রীষ্মকালে গাছভরে পাতা থাকায় ভাল ছায়া দেবে; এছাড়া গ্রীষ্মের প্রথমে গাছ ছেয়ে থাকা ফুলের শোভা তো রয়েছেই।

**গাছ লাগানো ও সার ॥**

ঘরোয়া ফুলবাগানের বিভিন্ন গাছের প্রকৃতি বিভিন্ন, তাই সব গাছের একই পরিচর্যা সম্ভব নয়। তবে সাধারণ কতগুলি নিয়ম সব গাছের বেলায় কমবেশি প্রযোজ্য। মরসুমী ফুলের জমি চল্লিশ সেণ্টিমিটার গভীর করে কোপাতে হবে এবং তিনভাগ মাটি ও দুভাগ গোবরসার মিলিয়ে সারমাটি তৈরী করবেন। সম্ভব হলে দুহাত চওড়া ও দুহাত প্রস্থ জমিতে হাড়ের গুঁড়ো মেশাবেন এক আঁজলা। বাল্বের গাছের জমিও তৈরী করবেন একই ভাবে। ছোট গুল্ম, অপরাজিতা ও ইপোমিয়ার জন্য গর্ত হবে এক হাত গভীর ও এক হাত চওড়া; এবং বড় গুল্ম ও অন্যান্য লতানো গাছের জন্য গর্ত হবে দেড়হাত গভীর ও দেড়হাত চওড়া। এদের জন্য সারমাটির ভাগ হবে দুভাগ মাটি ও একভাগ গোবরসার। সম্ভব হলে ছোট গুল্মে এক আঁজলা এবং বড় গুল্মে দুই আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো মেশাবেন। সারমাটি মিশিয়ে গর্তে ফেলার কাজ গাছ লাগাবার মাসখানেক আগে করতে পারলে ভাল। বর্ষার প্রথমে দীর্ঘজীবী গাছের গোড়ার চারিদিক কুপিয়ে মাটিতে গোবরসার ও হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দেবেন, গোবরসারের পরিমাণ হবে চব্বিশ সেণ্টিমিটার টবের এক থেকে দুই টব এবং হাড়ের গুঁড়ো এক থেকে দুই আঁজলা। মরসুমী ফুলের গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছে রাসায়নিক সার দেবেন না; ডালিয়া এবং অন্য কোন কোন গাছে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চললেও ঘরোয়া ফুলবাগানে তা না দিলেই ভাল। মরসুমী ফুলগাছ লাগাবার দিন

কুড়ি পরে তিনচামচ সরষের খোল বা আধ থেকে একচামচ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট এবং আবার দিন কুড়ি পরে দুচামচ সরষের খোল দুচামচ সুপারফসফেটের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক থেকে দুচামচ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট গাছের গোড়ার একবিঘত দূর থেকে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন। ডালিয়া লাগাবার সারমাটি মরসুমী ফুলের মতই করা হবে। এ গাছ লাগাবার দিন কুড়ি পরে এবং আবার দিন পনেরো পরে বড় একমুঠো করে সরষের খোল; এবং কুঁড়ি এলে পরে আধমুঠো সরষের খোল ছোট একমুঠো সুপারফসফেটের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় একবিঘত দূর থেকে দেবেন। গোলাপ উঁচু জমিতে লাগাতে হবে, সারমাটি হবে গুল্মের মত এবং কার্তিকে ছাঁটার পরে গুল্মের বাড়তি সারের মতই সার দেবেন। গাছের পরিচর্যা খুব ভাল করে করতে চাইলে এই বইয়ে বিভিন্ন গাছের যে বিশদ পরিচর্যা দেওয়া রয়েছে তা ভাল করে দেখে নেবেন।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

দীর্ঘজীবী গাছ বর্ষাকালে অথবা শীতকালের শেষ দিকে লাগাবেন। সন্ধ্যামণি, অপরাজিতা, এনটিগোনন, সর্বজয়া, রজনীগন্ধা, পিটুনিয়া, জিনিয়া, গিলার্ডিয়া, সূর্যমুখী, গাঁদা ইত্যাদি একরকম সব সময়েই লাগানো চলে। ডালিয়া লাগাবেন আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণে এবং গোলাপ শেষ বর্ষায় বা শীতের প্রথমে। শীতের মরসুমী ফুলের বীজ চারাতে হবে ভাদ্র মাসে, গ্রীষ্মের মাঘ মাসে এবং বর্ষার বৈশাখ মাসে, এবং চারাগাছের চারটি পাতা খুললে তা তুলে জমিতে লাগানো হবে। জমির গাছে জল দেবার সময়ে বেশ ভাল করে ভিজিয়ে দেবেন এবং বাড়তি সার দেবার দিন ধরে পর পর তিনদিন ভাল করে জল দেবেন। গাছের গোড়া মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দিতে হবে, গোড়াতে কখনই জঙ্গল হতে দেওয়া হবে না এবং পোকামাকড়ের উপদ্রবে রোগর বা অন্য কিছু ব্যবহার করতে হবে।

**ঘরোয়া ফুলবাগানের বিশিষ্ট গাছগুলি ॥**

ঘরোয়া ফুলবাগানে লাগানো যেতে পারে একরকম যে কোন গাছই। তবে এখানে জায়গা অল্প বলে নিজের পছন্দমত কিছু গাছ বেছে নিয়ে লাগাতে হবে। নিচে কিছু গাছের নাম দেওয়া হলো যাদের পরিচর্যা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং যাদের ফুলও খুব ভাল। নিচের তালিকা ঘরোয়া ফুলবাগানের উপযুক্ত গাছ বেছে নিতে সাহায্য করবে।

গোলাপের ভেতরে রাজা রামমোহন রায়, রাণী ঝানসি, জয়, তুহিন, এলিট, পিকচার, মনটিফুমা, আমেরিকান হোম, হিজ ম্যাজেস্টী, কনফিডেন্স, চার্লসটন, শ্যাটালিয়ন রোজ, দি কুইন এলিজাবেথ, লালবাহাদুর। ডালিয়ার ভেতরে কিনিয়া, কেলভিন, কেলভিন রোজ, জ্যানটাইন, ক্রয়ডন মাস্টারপীস, ক্রয়ডন মনার্ক, ব্ল্যাক আউট, ব্ল্যাক আউট স্পোর্ট, ভিক্ষু-স মাদার, ভোলারাম, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও জলি। জবার ভেতরে মাই বিউটি, অস্ট্রেলিয়ান রোজ, ভাইসরয়, মেজর গেজ, আলিপুর বিউটি, সেন্টিনারী ও ড্যাফোডিল। সবসময়ে বা অনেক দিন ধরে ফুল দেয় এরকম গাছের ভেতরে এলাম্যানডা, ক্রসেনড্রা, গলফিমিয়া, রনডেলেটিয়া, বেল, ক্যালিয়ানড্রা স্পেসিওসা ও ব্রিতাইপস, টেকোমা গাউডিচাউডি, অ্যাট্রোফা পানডুরাফোলিয়া, ছোট কৃষ্ণচূড়া, রঙ্গন সিঙ্গাপোরেনসিস ও ডাফি, লেমোনিয়া, গন্ধরাজ ফরচুনিয়ানা ও ভিত্চি, প্লামবাগো, টগর, স্থলপদ্ম ও অনেকবার ফুল দেয় এরকম শিউলি। কন্দজ ফুলগাছের ভেতরে রজনীগন্ধা, সর্বজয়া, সন্ধ্যামণি, কুপারেন্থাস, দোলন চাঁপা, এমারিলিস ও হেমেন্থাস। লতানো গাছের ভেতরে অপরাজিতা, ইপোমিয়া, এনটিগোনান, বুগেনভিলিয়া মাহারা ও পার্থ, চামেলি, ক্যাম্পসিস গ্রানডিফ্লোরা ও ঝুমকো। এবং মরসুমী ফুলের যে কোন ফুলই ভালভাবে করা যেতে পারে ঘরোয়া ফুলবাগানে।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION * Govt. of West Bengal

# ছাতের ফুলবাগান

শহরের জীবনে ফুলবাগান করার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রধান এবং অনেক সময়ে একমাত্র উপায় বাড়ীর ছাদ বা বারান্দাকে ফুলবাগানে রূপান্তরিত করা। জমিতে বাগান করার সুযোগ থাকলেও নানারকম কারণে ছাদে ফুল চাষ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। যে কারণেই করা হোক না কেন, ভাল করে করলে ছাদের ফুলবাগানে কোন অপূর্ণতা বোধই থাকে না। এ বিষয়ে ছাদের ফুলবাগান বনসাইয়ের সঙ্গে তুলনীয়। সার্থক বনসাই প্রকাণ্ড মহীরুহকে যেন সত্য সত্যই ঘরের ভেতরে এনে দেয়, তেমনি সার্থক ছাদের ফুলবাগান একবারও একথা মনে উঁকি দিতে দেবে না যে জমিতে করলে ফুলবাগান যেন আরও ভাল দেখাত। ভাল করে ফুলের চাষ ছাদে করা কঠিন নয়, তবে এর পেছনে লেগে থাকা দরকার।

ছাদের ফুলবাগানের কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। ছাদে প্রচুর পরিমাণে রোদ পড়ে বলে রোদ ভালবাসে শুধু এরকম ফুলগাছের চাষ এখানে করা চলে। দূর থেকে সহজেই চোখে পড়ে এরকম ফুলের সমাদর ছাদের ফুলবাগানে খুবই বেশি। একাজে বিভিন্ন বুগেনভিলিয়া, হলদে রঙের বিভিন্ন ফুল; এবং চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়ার মত বড়ফুলের ফুলগাছের প্রচুর ব্যবহার। এছাড়াও ছাদে যেসব ফুলের সৌন্দর্য খুব কাছ থেকে ভাল করে উপভোগ করা যায় এরকম ফুলগাছের বহুল চাষ। এদের ভেতরেও যাদের সুগন্ধ রয়েছে যথা গোলাপ, বেল, রজনীগন্ধা ইত্যাদি বিশেষ সমাদৃত।

রোদ ভালবাসে ও টবে করা যায় এরকম সব গাছই ছাদের ফুলবাগানে চাষ করা চলে, তাই স্বাভাবিক কারণে উপযুক্ত গাছের তালিকা খুব দীর্ঘ। কিন্তু ছাদের ফুলবাগানে জায়গা খুবই সীমিত, সেখানে গাছের ভিড় হলে তা কিছুতেই সুন্দর দেখাবে না। এ কারণে ছাদে শুধু নিজস্ব রুচিমাফিক কিছু বাছাই গাছের চাষ হওয়া উচিত। রচনার শেষ অংশে বিভিন্ন বাছাই গাছের তালিকা দেওয়া হয়েছে, এগুলি নিজস্ব রুচিমাফিক গাছ বাছাই করার কাজে সাহায্য করবে।

**সারমাটি ॥**

ছাদের ফুলবাগানের বিভিন্ন ফুলগাছের প্রকৃতি বিভিন্ন। তাই একই ধরনের সারমাটি দিয়ে সব ফুলগাছের বেলায় আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। তবু খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে তিনভাগ দোআঁশ মাটি, দুভাগ গোবরসার ও একভাগ পাতাপচাসার মিশিয়ে সব গাছের মোটামুটি উপযুক্ত সারমাটি করা চলতে পারে। ছাব্বিশ সেণ্টিমিটার বা দশ ইঞ্চি টবের উপযুক্ত এই সারমাটিতে আরও এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো মেশানো দরকার। সারমাটি সাধারণ গুঁড়ো করে ব্যবহারের মাসখানেক আগে মিশিয়ে নেওয়া উচিত এবং তা এই একমাসের ভেতরে আরও কয়েকবার নেড়েচেড়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতির সারমাটি ইত্যাদি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য গাছের তালিকার সঙ্গে দেওয়া হলো। তবে এই সব ফুল বেশ উন্নত মানের করে করতে চাইলে এই সব বিভিন্ন ফুলের চাষ কিভাবে করা দরকার তাও ভাল করে দেখে নিতে হবে।

আজকাল শহরে মুরগীর প্রতিপালন রয়েছে, তাই মুরগীর সার সহজে পাওয়া যেতে পারে। মুরগীর সার ব্যবহার করবেন মাস আটেক পুরানো হলে এবং এর পরিমাণ কখনই সমস্ত সারমাটির এক-চতুর্থাংশের বেশি হবে না। এ সার বেশ গুঁড়ো করে অন্যান্য সারমাটির সঙ্গে মেশাবেন। মুরগীর সার গোবরসারের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ; সেক্ষেত্রে সারমাটির ভাগ হবে মুরগীর সার একভাগ এবং দোআঁশ মাটি ও পাতাপচাসার দেড়ভাগ করে। এছাড়া সারমাটির দুভাগ গোবরসার ও একভাগ পাতাপচাসারের পরিবর্তে তিনভাগ কম্পোস্ট সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

**গাছ লাগানো ও গাছ পালটানো ॥**

টবের খোলামকুচি বা চারার পরিমাণ সাধারণত টবের ছ-সাত সেণ্টিমিটার জায়গা জুড়ে হবে। দীর্ঘজীবী গাছের বেলায় চারার উপরে দুই সেণ্টিমিটার পুরু করে নারকেলের ছোবড়া হালকা করে বিছিয়ে দেবেন; সারমাটি যাতে ধুয়ে না যায় সে বিষয়ে এটি সাহায্য করবে। ছোবড়া দেওয়া দরকার শুধু ছাদের টবের গাছের বেলায়। চারা বা ছোবড়ার উপরে সারমাটি এরকম পরিমাণে দিতে হবে যাতে গাছ লাগাবার পরেও তিন থেকে পাঁচ সেণ্টিমিটার টবের উপরের জায়গা খালি থাকে। গাছ ছোট নার্শারী টব থেকে খুলে লাগাবার বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গাছের যতটা কাণ্ড নার্শারী টবের মাটির উপরে ছিল ঠিক ততটাই যেন নতুন টবের সারমাটির উপরে থাকে। টবের উপরের খালি জায়গায় গ্রীষ্মকালে কাটা খড় বা অন্য কিছু দেবার দরকার পড়বে এবং বর্ষা আরম্ভ হলে খড় সরিয়ে এ জায়গা বাড়তি সারমাটি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। দীর্ঘজীবী গাছ লাগাবার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল এবং মরসুমী গাছ তাদের মরসুম অনুযায়ী।

দীর্ঘজীবী গাছের শেকড়ে বছর দেড়েকের ভেতরে টব ভরে যাবে। তাছাড়া সারমাটির সারাংশ গাছ এর আগেই খেয়ে নেবে। তাই গাছের সারমাটি মাঝে মাঝে পালটে দেওয়া একান্ত দরকার। নতুন করে সম্পূর্ণ সারমাটি পালটে দেবার কাজ বছরে একবার করতে পারলে ভাল কিন্তু এটা হয়ে ওঠা সব সময়ে সম্ভব নয়। গাছের সারমাটি প্রতি বছর পালটাতে না পারলে টবের সারমাটির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সাবধানে উপর থেকে তুলে সেখানে নতুন তৈরী সারমাটি দিয়ে দিতে হবে প্রতি বছর। এ ভাবে বছর তিনেক চলতে পারে কিন্তু তার পরে পুরো সারমাটি পালটে দেওয়া খুবই দরকার। গাছ পালটে বসানো ও সারমাটি আংশিক পালটে দেবার কাজ করবেন বর্ষাকালে অল্প অল্প বৃষ্টির দিনে। সারমাটি পুরো পালটাবার সময়ে গাছের শেকড় ও ডালপালা প্রয়োজনমত ছেঁটে দেবেন। শেকড় ছাঁটবেন সবসময়ে তেরছা ভাবে।

**বাড়তি সার ॥**

বাড়তি সার প্রত্যেক গাছেই প্রয়োজনমত দিতে হবে। এদের প্রধানত দুভাগে ভাগ করা
যেতে পারে—প্রধানত জৈব বা তার বিকল্প রাসায়নিক সার ও পাতার সার। এ সবগুলিই
দেবার বেলায় এদের প্রয়োগের নিয়ম যথাযথ পালন করতে হবে। ফুল আরও ভাল করতে
তরল সার দেওয়া সাধারণ নিয়ম কিন্তু ছাদের টবের গাছে তরল সার দেওয়া দরকার একরকম
সারাবছর ধরে, সম্ভব হলে দীর্ঘজীবী গাছে সারাবছর ধরেই এই সার দেবেন।

দীর্ঘজীবী গাছের বেলায় প্রধানত জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। এই গাছে ফুল
আসার মাসখানেক আগে ও বর্ষার প্রথমে ছোট দুমুঠো মিশ্র সার দেবেন। পূর্ণমাত্রা কুঁড়ি
ধরে তার আটভাগ ষ্টেরামীল বা র‍্যালীমীল, চারভাগ সরষের খোল, চারভাগ সুপারফসফেট,
তিনভাগ হাড়ের গুঁড়ো ও একভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে এই মিশ্রসার তৈরী করে
নেবেন। বারো ইঞ্চি টবের স্বাস্থ্যোজ্জল গাছের জন্য এই সার দেবেন ছোট দুমুঠো এবং
অন্যান্য গাছের জন্য টবের সারমাটির পরিমাণ ও গাছের স্বাস্থ্য অনুযায়ী। গাছের স্বাস্থ্য
ভাল না হলে বাড়তি সার কিন্তু কোন সাহায্য না করে তার বরঞ্চ ক্ষতি করবে। বেশির
ভাগ কন্দজ গাছে ( ডালিয়ার চাষ অন্যান্য কন্দজ গাছের চেয়ে অনেক আলাদা তাই এদের
বেলায় এ কথা প্রযোজ্য নয় ) বাড়তি সার হিসাবে শুধুমাত্র জৈব তরলসার দেওয়া উচিত।
অন্যান্য সব গাছে বাড়তি সার ছাড়াও ফুল ফোটার মাসখানেক আগে থেকে জৈব তরলসার
ব্যবহার করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। জৈব বা রাসায়নিক মিশ্র সার টবের সব দিকের
কানার কাছের কিছুটা মাটি খাল করে তুলে সেখানে সার ছড়িয়ে তা আবার মাটি দিয়ে
ঢেকে দিতে হবে। গুঁড়ো সার ব্যবহারের দিন দশেক পরে তরলসার সেই গাছে ব্যবহার
করা চলবে।

রাসায়নিক সারের সবচেয়ে বড় সুবিধা যে এর ব্যবহারে একরকম কোন গন্ধ হয় না।
কিন্তু এ সারের যথাযথ ব্যবহার না ঘটলে তাতে বিপরীত ফল ফলার সম্ভাবনা প্রচুর।
সারের পরিমাণ ঠিক কি হওয়া উচিত, তা অনেক কিছু জিনিসের উপরে নির্ভর করে

বলে এ বিষয়ে কোন কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করে এদের সঠিক মাত্রা বের করে নিতে হবে এবং এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কোন কিছু নেই। তবুও দশ ইঞ্চি টবের গাছের কথা মনে রেখে নিচের কথাগুলি খুব সাধারণ ভাবে বলছি; এইভাবে সার প্রয়োগ আরম্ভ করে যথাযথ মাত্রা নিজেই ঠিক করে নেবেন। মরসুমী গাছে গাছ লাগাবার দিন কুড়ি পরে এবং আবার দিন পনেরো পরে একচামচ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট দেবেন। এর দিন পনেরো পরে এবং আবার গাছে কুঁড়ি এলে দুচামচ সুপারফসফেট ও একচামচ সালফেট অব পটাশ প্রতিবারে দেবেন। গাছে কুঁড়ি এলে সপ্তাহে একবার রাসায়নিক তরলসার দেবেন। দুভাগ করে এমোনিয়াম সালফেট ও সুপারফসফেট এবং একভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে তার দশ গ্রাম পাঁচ লিটার জলে গুলে এই তরলসার তৈরী করা হবে।

পাতার সার ছাদের ফুলবাগানের পক্ষে অপরিহার্য। এ সার দুটি পাতার উপরে ও নিচে দুদিকেই স্প্রে করবেন। স্প্রে করা হবে বিশেষ করে শীতকালে এবং মেঘে ঢাকা দিনে। কি করে পাতার সার তৈরী করবেন তা 'গোলাপ' নামের ও 'ফুলবাগান ঘিরে নানান চিন্তা' অধ্যায় দুটিতে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। দুটি পাতার সারের সঙ্গেই একরকম সব কীটঘ্ন ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করা চলে কিন্তু দুটি পাতার সারকে একসঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করা পুরো-পুরি নিয়মবিরুদ্ধ। পাতার সারের মাত্রা কমবেশি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখবেন। এ সার ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সারের ব্যবহারের কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না।

**জল দেওয়া ॥**

গাছ লাগানো থেকে দিন সাতেক পর্যন্ত এমনভাবে জল দেবেন যাতে টবের সারমাটি সবসময়ে ভেজাভেজা থাকে। এর পর থেকে জল দেবেন টবের মাটি একরকম শুকিয়ে গেলে। টবের ভেতরের মাটি শুকিয়ে এসেছে কিনা বুঝতে কোন শক্ত লাঠি দিয়ে টবের গায়ে আঘাত করলে আঘাতের শব্দে তা অনেকটা বোঝা সম্ভব হবে। আশু জল দরকার অবস্থায় আঘাতের শব্দ হবে টং টং করে। গাছে যখনই জল দেবেন তা এমন পরিমাণে দেবেন যাতে টবের সারমাটি সব ভাল করে ভিজে যায় এবং মাত্র অল্প কিছু জল টবের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসে। জৈব বা রাসায়নিক গুঁড়ো মিশ্রসার প্রয়োগের দিন ধরে এমন-ভাবে জল দিতে হবে যাতে তিনদিন ধরে টবের মাটি বেশ ভেজা থাকে। তরলসার দেবার ঘণ্টাখানেক আগে আবার তরলসার দেবার পরে গাছে জল দেবেন। গাছে জল দেবেন সকালে বা বিকালে এবং দরকার বোধ করলে দুবেলাই। গ্রীষ্মকালে বিকেলে গাছে জল স্প্রে করে ধুয়ে দিতে পারলে ভাল। গাছে সবসময়ে স্বাদু জল ববহার করা দরকার। পলিথিনের সরু জল দেবার পাইপ বাজারে পাওয়া যায়, এটি ব্যবহার করলে জল দেবার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

**টবের কথা ॥**

বিভিন্ন দীর্ঘজীবী গাছের জন্য তিরিশ সেণ্টিমিটার বা বারো ইঞ্চি বা আরও বড় টব, গোলাপের জন্য বারো ইঞ্চি টব, ডালিয়া ও বিভিন্ন মরসুমী ফুলের জন্য চব্বিশ সেণ্টি-মিটার বা নয় ইঞ্চি টব এবং চন্দ্রমল্লিকার জন্য কুড়ি সেণ্টিমিটার বা আট ইঞ্চি টব ব্যবহার করবেন। বড় টবে ছোট গাছ বা ছোট টবে বড় গাছ দুইই খুব বেমানান। ব্যবহার করার আগে টব ও চারা ভাল করে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

**রোদ ও তাপের হাত থেকে বাঁচানো ॥**

ছাদের ফুলবাগানের প্রধান অসুবিধা অত্যধিক রোদ। উপরে গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য এবং নিচে উত্তপ্ত ছাদের আর এক দফা তাপ। এই দুইয়ে মিলে গাছকে ঝলসে দিতে চায়। সুখী প্রকৃতির গাছগুলির অবস্থা তো এ সময়ে খুবই খারাপ, কষ্টসহিষ্ণু গাছগুলির অবস্থাও কিছু ভাল নয়। গ্রীষ্মের সূর্যের হাত থেকে বাঁচাতে এ সময়ে টবের গাছের মাটির উপরে তিন থেকে পাঁচ সেণ্টিমিটার পুরু খড় বা অন্য কিছু দিয়ে মালসিং-এর ব্যবস্থা করবেন।

খড় বেছাতে হবে আলতোভাবে যাতে গাছের গোড়ার আলোবাতাস পেতে কোনো অসুবিধা না হয়। মালসিং-এর খড় কাটা দরকার পাঁচ সেণ্টিমিটারের মত লম্বা করে। ছাদের তাপ থেকে বাঁচাতে অন্য একটি পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। এবং এটা শুধু ছাদের টবের গাছের বেলাতেই করার দরকার পড়বে। ফুটো নেই এরকম কোন পাত্রে অন্তত পনেরো সেণ্টি-মিটার পুরু করে বালি ভরে তার উপরে টবের গাছটিকে একটু চেপে বসানো হবে। টবে জল দেবার সময়ে এই বালিপূর্ণ বাইরের টবটিতেও জল দিতে হবে এবং বালি শুকিয়ে গেলে তা আবার ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। বাইরের এই পাত্রটি এলুমিনিয়াম বা মাটির পাত্র হতে পারে। বাইরের টবের ভেতরে টবের গাছ রাখা দেখতে সুন্দর দেখাবে না ঠিকই কিন্তু ছাদের তাপ থেকে গাছকে রক্ষা করতে বালিভরা টবটি বেশ ভাল কাজ দেবে। বালি না দিলে শুধু জল দিলে তা বেশি সময়ের জন্য গাছকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করবে ঠিকই, কিন্তু এতে গাছেরও ক্ষতি হবে। বর্ষাকালে উপরের খড় ও নিচের বালিভরা পাত্র সরিয়ে নিতে ভুলবেন না।

**পাখি ও গাছের অসুখ ইত্যাদি ॥**

ছাদের ফুলবাগানে পাখির উপদ্রব অনেক জায়গাতেই রয়েছে। এদের উপদ্রব কমাতে বিঘতখানেক লম্বা ও দুই সেণ্টিমিটার সরু করে পলিথিন পেপার কেটে তা সুতোয় এঁটে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে যা অল্প হাওয়াতেই দোলে। পলিথিন পেপারের জায়গায় পানের দোকান প্রভৃতি সাজাতে যে রঙবেরঙের রাঙের প্রচুর ব্যবহার তাও কাজে লাগানো যেতে পারে। পোকামাকড়ের উপদ্রবে রোগর, সেভিন এবং ছত্রাক রোগে ক্যাপটান, মোরেণ্টান ইত্যাদি ভাল কাজ দেবে।

**ছাদের ফুলবাগানের উপযুক্ত গাছ ॥**

ছাদের ফুলবাগানে ফুলগাছের ভিড় করা চলবে না। নিচের তালিকার গাছগুলি ছাদের ফুলবাগানের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এগুলি আপনার গাছ বেছে নেবার কাজে সাহায্য করবে।

গুল্ম : (১) এডেনিয়াম, (২) ক্যালিয়ানড্রা স্পেসিওসা, (৩) ক্রসেনড্রার সব কয়টি প্রজাতি, (৪) গলফিমিয়া, (৫) গন্ধরাজ ভিতচী, (৬) জুঁইয়ের অনেক প্রজাতি (৭) জ্যাট্রোফা রোজিয়া, (৮) প্লামবাগো, (৯) রণডেলেটিয়া, (১০) গোলাপের হাইব্রিড টি, গ্রানডিফ্লোরা ও ফ্লোরিবানডা ॥ গোলাপের গাছ ছাঁটবেন শীতের প্রথমে বর্ষা থেমে গেলে, ছাঁটার পরে মিশ্র জৈব সার দেবেন। এই সব গাছগুলি বারো ইঞ্চি টবে করা যেতে পারে।

বড় গুল্ম ও গাছ : (১) ব্রায়া, (২) ফুরুস, (৩) পয়েনসেটিয়ার সব প্রজাতি, (৪) গুটিকলমের টেকোমা গাউডিচাউডি, (৫) রঙ্গনের সব প্রজাতি (৬) গুটিকলমের সোনালী শিমুল, (৭) প্লুমেরিয়ার সব প্রজাতি (৮) জবার সব প্রজাতি॥ এ গাছগুলি বারো ইঞ্চিরও বড় টবে লাগাতে হবে। জবাগাছের ডাল ছাঁটার দরকার নেই। বড় গাছগুলির বেলায় কলমের গাছ যোগাড় করতে হবে কারণ এদের বীজের গাছ টবে ভাল হবে না।

লতানো গাছ : (১) বুগেনভিলিয়া, (২) ক্লিমেটিস, (৩) মর্নিং গ্লোরী ও (৪) ক্লায়ান্থাস॥ এ গাছগুলি নয় বা দশ ইঞ্চি টবে করবেন। বুগেনভিলিয়া লতা গাছ হলেও টবে এটির ব্যবহার গুল্ম হিসাবে। এটি ছাঁটবের মে মাসে। ক্লায়ান্থাস ফুল হিসাবে অপূর্ব। এর গোড়ায় জল জমলে বাঁচবে না, তাছাড়া এর গোড়া খুঁচে না দেওয়াই ভাল। মর্নিং গ্লোরী মরসুমী পর্যায়ের গাছ।

মরসুমী ফুল : একরকম সব গাছই করা যাবে। প্যানজি, পিটুনিয়া, ভারবিনা ইত্যাদি কম উচ্চতার গাছ করবেন গামলা টবে। অন্যান্য গাছের বেলায় উচ্চতা অনুযায়ী টব বেছে নেবেন। একই জাতির গাছ অনেকগুলি করছেন না বলে বীজ থেকে চারা না তুলে ভাল বিক্রেতার কাছ থেকে অল্প পরিমাণে চারাগাছ যোগাড় করবেন।

কন্দজ ফুলগাছ : (১) এমারিলিসের সব প্রজাতি, (২) হেমেন্থাস, (৩) গ্লাডিও-

লাস, (৪) গ্লোরিওসা, (৫) রজনীগন্ধা ও (৬) ডালিয়া॥ ডালিয়া লাগাবেন নয় বা দশ ইঞ্চি টবে এবং অন্যান্যগুলি আট বা নয় ইঞ্চি টবে। ডালিয়া ও রজনীগন্ধায় বাড়তি জৈব মিশ্র সার দেওয়া যাবে এবং ডালিয়ার বেলায় রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা চলবে। অন্যান্য কন্দজ ফুলগাছে বাড়তি সার হিসাবে শুধু জৈব তরলসার দেওয়া ভাল।

অন্যান্য ফুলগাছ : (১) জিরেনিয়াম, (২) জারবেরা, (৩) শাপলা, (৪) চন্দ্রমল্লিকা॥ গরুকে ভাব দেবার গামলা বা তন্দুরীর গামলায় শাপলা বা শালুকের চাষ করা যেতে পারে। গামলার দুদিকে সিমেন্টের প্রলেপ দিলে তা টিকবে অনেকদিন। শাপলার চাষের জন্য পাঁকমাটি ও গোবরসার ব্যবহার করবেন। চন্দ্রমল্লিকা করবেন আট ইঞ্চি টবে, এবং এর আগে পাঁচ ইঞ্চি টবে করে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের ভেতরে আট ইঞ্চি টবে পালটে লাগাতে পারলে ভাল। গোড়ায় জল জমলে চন্দ্রমল্লিকার মরে যাবার সম্ভাবনা, এছাড়া সারের পরিমাণ বেশি হলে গাছের মাথা মোটা হয়ে ফুল আসবে না। কুঁড়ি আসার আগে পর্যন্ত সার বরঞ্চ কম করে দেবেন যাতে গাছের মাথা মোটা না হতে পারে।

বাহারি পাতার গাছ : (১) অরোকেরিয়া কুকী, (২) ফিলিসিয়াম ডোর্সিপয়েন্স, (৩) বকুল ভেরীগেটা, (৪) বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা, (৫) কাঁচিয়া ও (৬) এমারান্থাস॥ বৈচিত্র্য আনতে বাহারি পাতার চাষ ছাদের ফুলবাগানের পক্ষেও প্রয়োজন। এদের ভেতরের এমারান্থাস ও কাঁচিয়া মরসুমী পর্যায়ের গাছ।

# ডালিয়া

ডালিয়ার মাতৃভূমি মেক্সিকো। এখানে এটি পরিচিত ছিল এককৎলি বা ককক্সোচিৎল নামে। ডালিয়ার বীজ বাইরের জগতে প্রথম আসে স্পেনে, এবং সেখানে ধর্মযাজক ক্যাভানাইলস-র চেষ্টায় এর নতুন নামকরণ হয় সুইডেনের উদ্ভিদবিদ্ আন্দ্রিয়াস গুস্তাভ ডাল-এর নামানুসারে ডালিয়া। ডালিয়া ভারতে এসেছে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দি রয়্যাল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া-র আনুকূল্যে। সমতল বাংলায় এটির চাষ প্রথম হলেও এখানে অনেক দিন পর্যন্ত এর চাষ মোটেই ছড়ায়নি। এখানে প্রধান সমস্যা দেখা দিল আগামী বছরের জন্য ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখাকে কেন্দ্র করে। দেখা গেল, বাইরের দেশের পদ্ধতি অনুসরণ করে শৈলাবাসগুলিতে ডালিয়া সহজেই বাঁচিয়ে রাখা যায়। আগামী বছরের জন্য কিন্তু এই পদ্ধতি সমতল বাংলায় একরকম কোন কাজেই লাগে না। ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখা সহজ সম্ভব না হওয়ায় এর চাষের প্রসার ঘটারও কোন সুযোগ রইল না। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এটা দেখা গেল যে ফুল দিয়েছে এরকম ডালিয়া গাছ চেষ্টা করে আগামী মরসুমের জন্যও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু এর একটা অসুবিধার দিকও দেখা দিল। গত বছরের বেঁচে থাকা গাছ থেকে তৈরী কাঁচগাছে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কুঁড়ি এসে যায় বলে এদের ফুল আশানুরূপ ভাল হয় না। ডালিয়া নিয়ে প্রথম লেখকের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ হয়েছে। লেট কাটিং করে আগামী বছরের জন্য ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখা, ডালিয়ার উন্নত সংকর প্রজাতি তৈরীর উপযোগী পদ্ধতি, কাটিং কাটার উন্নততর পদ্ধতি, ডালিয়ার বিভিন্ন রোগাদির পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি করা সম্ভব হয়েছে এর ফলশ্রুতি হিসাবে (লেখকের অন্য বই 'ডালিয়া' ; অথবা ২০শে নবেম্বর ১৯৬৬-র আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৭০-র দি ইন্ডিয়ান জার্নাল অব অরনামেন্টাল হর্টিকালচার ও ডিসেম্বর-মে ১৯৭০-৭১-র হর্টিকালচারাল বুলেটিনে প্রকাশিত প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য)। লেট কাটিং করে গাছ বাঁচিয়ে রেখে তাদের থেকে আগামী বছরে ডালিয়ার উন্নত কাঁচগাছ প্রচুর পরিমাণে করা সম্ভব। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে আগামী বছরের জন্য ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখা এখন আর মোটেই সমস্যা নয়।

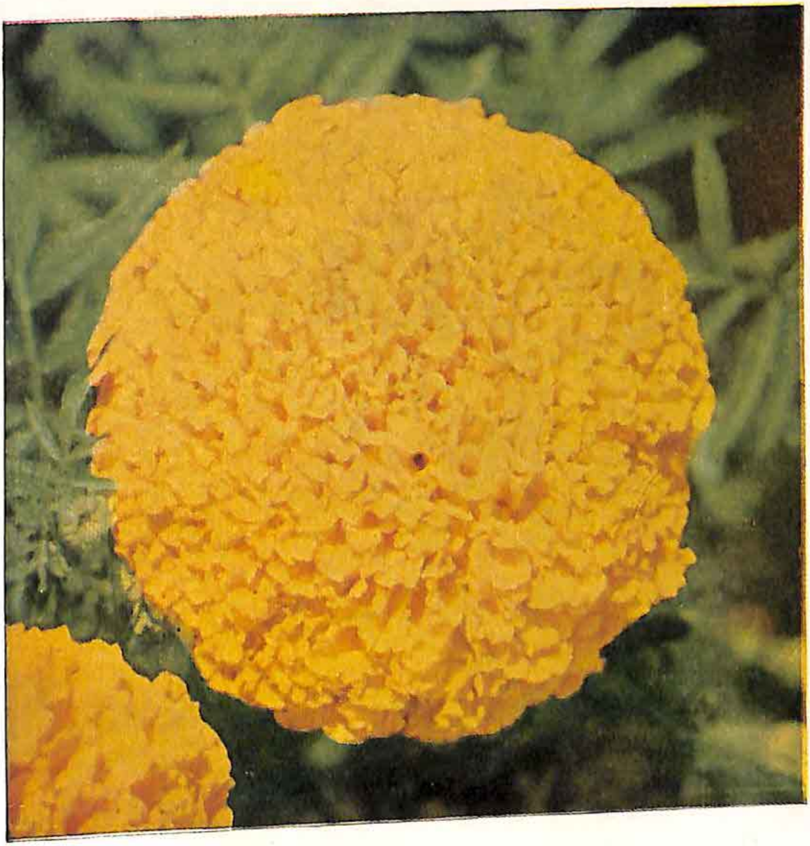
গত কয়েক বছরে ডালিয়ার চাষ এখানে অনেক বেড়ে গেছে এবং একথাও বোধ হয়



কারনেশান



বড় ফুলের চন্দ্রমল্লিকা



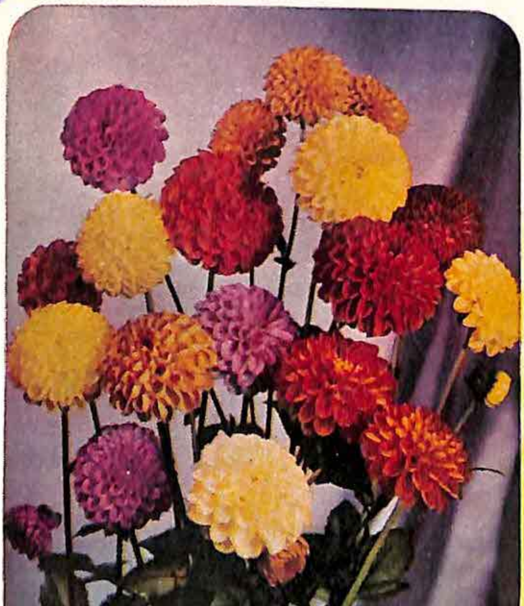
গাঁদা আফ্রিকান জয়েন্ট

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal



প্যানজি

TE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal



ছোট ফুলের ডালিয়া

সত্য যে ডালিয়া সমতল বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুল। তবুও একথা মানতেই হবে, সমতল বাংলায় ডালিয়ার যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তার তুলনায় ডালিয়ার প্রসার কিছুই হয়নি। অন্যান্য দেশে পম্পন, স্মল ও মিডিয়াম ক্যাকটাস, এবং স্মল ও মিডিয়াম ডেকরেটিভ ডালিয়াগুলি তাদের গুণগত বিচারে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু এ দেশে এই সব ডালিয়া একরকম পাওয়াই যায় না। এদেশে পাওয়া যায় বেশ কিছু জায়াণ্ট ডেকরেটিভ ডালিয়া কিন্তু এদের ভেতরে সত্যিকারের উন্নত মানের ফুলের সংখ্যা খুব কিছু বেশি নয়। তবে খুব ইদানীং সমতল বাংলাতেই বেশ কয়েকটি মিডিয়াম, স্মল ও মিনিয়েচার সংকর প্রজাতি ডালিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এবং এটা নিশ্চয়ই ডালিয়ার ভবিষ্যৎ এখানে যে উজ্জ্বল তার সুনিশ্চিত পরিচয়। ডালিয়ার চাষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ডালিয়ার চাষ হওয়া উচিত এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক প্রজাতি থাকা দরকার যাতে প্রত্যেকে তাঁর পছন্দমত গাছগুলি বেছে নিতে পারেন। বিভিন্ন শ্রেণীর ডালিয়া ও ডালিয়ার অনেক প্রজাতি পেলে এ ফুলের সমাদর অনেক গুণে বেড়ে যাবে।

**শ্রেণী বিভাগ ॥**

ডালিয়ার আদি প্রজাতিগুলি ছিল সবই সিঙ্গেল এবং দেখতে অতি সাধারণ। ডালিয়ার উন্নত সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে সাহায্যকারীদের নিরলস সাধনায় ডালিয়া তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীতেই ডালিয়ার শ্রীবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে এবং এটি এখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ফুল। ডালিয়াকে বিভিন্ন মূল শ্রেণী, শাখা শ্রেণী ও শাখা-শাখা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে ডেকরেটিভ, ক্যাকটাস ও পম্পন এই তিনটি মূল শ্রেণীর ডালিয়ার সমাদর সবচেয়ে বেশি। ডেকরেটিভ ও ক্যাকটাস মূল শ্রেণীকে আবার তাদের আয়তন ও আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন শাখাশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পাপড়ির গড়ন বা আকৃতি অনুযায়ী ডেকরেটিভ ডালিয়াকে ভাগ করা হয়েছে ফর্মাল ডেকরেটিভ ও ইনফর্মাল ডেকরেটিভে। ক্যাকটাস ডালিয়াকেও তাদের পাপড়ির গড়ন অনুযায়ী ভাগ করা হয় সেমি-ক্যাকটাস, ইনকার্ভড ক্যাকটাস ও স্ট্রেট ক্যাকটাস হিসাবে। কোন কোন দেশে এই পাঁচটি বিভাগকেই মূলশ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সব ডালিয়াকে আবার তাদের আয়তন অনুযায়ীও শাখা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। জায়াণ্ট ডেকরেটিভ দশ ইঞ্চি বা দুশো ষাট মিলিমিটার থেকে আরম্ভ করে আরও বড় হতে পারে। 'ক্রয়ডন মনার্ক' জায়াণ্ট ফর্মাল ডেকরেটিভ শাখা শ্রেণীর ও 'ক্রয়ডন মাষ্টারপীস' জায়াণ্ট ইনফর্মাল ডেকরেটিভ ডালিয়া। লার্জ ডেকরেটিভ ডালিয়া হবে আট থেকে দশ ইঞ্চি বা দুশো কুড়ি থেকে দুশো ষাট মিলিমিটারের ভেতরে, 'আর্থার হ্যাম্বলী' এই ধরনের ডালিয়া। মিডিয়াম ডেকরেটিভ ডালিয়া ছ'ইঞ্চি থেকে আট ইঞ্চি বা একশো সত্তর থেকে দুশো কুড়ি মিলিমিটারের ভেতরে হতে হবে ; সমতল বাংলায় সৃষ্টি হয়েছে 'ভিক্ষু-স মাদার' এর একটি উদাহরণ। স্মল ডেকরেটিভ হতে হবে চার থেকে ছ'ইঞ্চি বা একশো পনেরো থেকে একশো সত্তর মিলিমিটারের ভেতরে ; সমতল বাংলায় হয়েছে 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ' এ ধরনের ফুল। মিনিয়েচার ডেকরেটিভ হতে হবে চার ইঞ্চি বা একশো পনেরো মিলিমিটারের ভেতরে ; ক্যাকটাস, সেমি-ক্যাকটাস দুটিকেও ঠিক একই ভাবে আয়তনের বিচারে ভাগ করা হয়েছে। এদের বেলায় উপরের শাখাশ্রেণীর নামের ডেকরেটিভের জায়গায় শুধু ক্যাকটাস ইত্যাদি বসিয়ে নিতে হবে। 'আর্ট লিঙ্ক লেটার' জায়াণ্ট সেমি-ক্যাকটাসের; 'ড্রেকেনবার্গ' লার্জ ইনকার্ভড ক্যাকটাসের ; 'জুয়ানীতা' মিডিয়াম স্ট্রেট ক্যাকটাসের, এবং 'চিয়ারীও' স্মল সেমি-ক্যাকটাস ডালিয়ার উদাহরণ। পম্পন ডালিয়ার ব্যাস সব সময়েই দুই ইঞ্চির ভেতরে হতে হবে, এর ফুলের গড়ন হবে সম্পূর্ণ গোল এবং পাপড়ির গড়ন মৌচাকের খোপের মত। ডেকরেটিভ, ক্যাকটাস ও পম্পন এই তিনটি সর্বজনপ্রিয় মূল শ্রেণী ছাড়া কোয়ারেট ডালিয়া, ডাবল শো এ্যাণ্ড ফ্যানসি ডালিয়া, ডোয়ার্ফ বেডিং ডালিয়া, এনিমোন ফ্লাওয়ারড ডালিয়া প্রভৃতি মূল শ্রেণীগুলিও মোটামুটি সমাদৃত। ফামব্রিয়েটেড, বা সংক্ষেপে ফিম্, ডালিয়া দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যদিও কোন দেশে এখনও এদের আলাদা শ্রেণী বলে স্বীকৃতি মেলেনি। এদের পাপড়ির অগ্রভাগ লম্বাভাবে সুন্দর করে কাটা কাটা, এবং

এদের অনেক শ্রেণীর ডালিয়ার ভেতরে দেখা যায়। 'লেস মেকার', 'টেরী' এই ধরনের ডালিয়া।

**টব ও কেয়ারির কথা ॥**

ডালিয়ার টব রাখতে হবে এমন জায়গায় যেখানে গাছ সারাদিন রোদ পায়। ডালিয়ার জন্য সঠিক মাপের ন'ইঞ্চি বা চব্বিশ সেণ্টিমিটার টব ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল। এতে গাছ, টব ও ফুলের সামঞ্জস্য বেশ ভাল থাকে এবং এই টবের গাছ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়াও সহজ। কেয়ারিও করবেন সারাদিন রোদ পড়ে অথবা অনেক সময় ধরে রোদ পড়ে, এবং যেখানের কাছাকাছি কোন বড় গাছ নেই এরকম জায়গায়। কেয়ারি হাত দেড়েক চওড়া করে তৈরী হবে যাতে মাত্র দু'সারি গাছ পাশাপাশি লাগানো চলে। অনেক গাছ লাগাতে হলে দুটি কেয়ারির মাঝে দেড়হাত ফাঁক রেখে পাশাপাশি অনেক কেয়ারি তৈরী করা যেতে পারে। কেয়ারির মাটি কোপাতে হবে তিরিশ থেকে প'য়তাল্লিশ সেণ্টিমিটার গভীর করে। কুপিয়ে মাটি গুঁড়ো করে নিতে হবে এবং একই সঙ্গে ঘাসের শেকড় প্রভৃতি বেছে দেওয়া হবে। যেসব কেয়ারিতে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডালিয়ার কাঁচগাছ লাগানো হবে সে কেয়ারিগুলি পাশাপাশি জমি থেকে একটু উঁচু করে তৈরী করা দরকার এবং এই সময়ের পরে কাঁচগাছ লাগাবার কেয়ারি করবেন পাশাপাশি জমির থেকে একটু নিচু।

**সারমাটি ও বাড়তি সার ॥**

টবের ডালিয়ার সারমাটি তৈরী করতে দোআঁশ মাটি আটভাগ, গোবরসার আটভাগ ও চারভাগ পাতাপচাসার প্রথমে মিশিয়ে দশইঞ্চি টবের এক টব পরিমাণ এই তিনটি মেশানো উপাদানে আরও মেশাবেন হাড়ের গুঁড়ো দু'মুঠো, সুপারফসফেট ছ'চামচ ও সালফেট অব পটাশ তিনচামচ। এই সবগুলি মেশাবার দিন পনেরো পরে আরও মেশাবেন এই একটব পরিমাণ সারমাটিতে দু'চামচ কলিচুন। মাটি সাধারণ গুঁড়ো করে নিতে হবে এবং গোবর-সার ও পাতাপচাসার ভাল করে গুঁড়ো করে নেওয়া দরকার। সারমাটি কাঁচগাছ লাগাবার মাসখানেক আগে তৈরী করে তা আবার মাঝেমাঝে নেড়েচেড়ে ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। কাঁচগাছ লাগাবার দিন পনেরো পরে একমুঠো করে নিম্নোক্ত মিশ্র সার টবের কানার কাছ থেকে বা গাছের গোড়ার এক বিঘত দূর থেকে প্রত্যেক গাছে দিয়ে দেবেন। এই মিশ্রসার তৈরী করবেন তিনভাগ সরষের খোল ও দু'ভাগ স্টেরামীল মিশিয়ে। এই সার দেবার দিন কুড়ি পরে এবং গাছে কুঁড়ি এলে আবার দ্বিতীয় নম্বর মিশ্রসার প্রত্যেক গাছে দেওয়া হবে একমুঠো করে। দ্বিতীয় নম্বরের মিশ্রসার তৈরী করবেন পাঁচভাগ স্টেরামীল, তিনভাগ সুপারফসফেট ও দুভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে। কুঁড়ি কিছুটা বড় হলে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন করে জৈব তরলসার দেবেন।

জমির ডালিয়ার জন্য কেয়ারির গুঁড়ো করা মাটির উপরে দশ সেণ্টিমিটার পুরু করে গোবরসার বিছিয়ে তা ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, দেড়হাত চওড়া ও দুহাত লম্বা কেয়ারিতে দুমুঠো হাড়ের গুঁড়ো, একমুঠো সুপারফসফেট ও ছ'চামচ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে দেবেন। জমির মাটি গুঁড়ো করার সময়ে উল্লিখিত পরিমাণ জমিতে একশো কুড়ি গ্রাম চুন মিশিয়ে দেওয়া ভাল। এর বিকল্পে, যে সব জায়গায় কাঁচ-গাছ লাগানো হবে সে জায়গাগুলি তিরিশ সেণ্টিমিটার ব্যাস ও চল্লিশ সেণ্টিমিটার গভীর গর্ত করে তা ডালিয়ার টবের সারমাটি দিয়ে ভরে সেখানে কাঁচগাছ লাগানো যেতে পারে। জমির গাছে টবের গাছের মত একই পদ্ধতিতে ও একই বাড়তি সার দেবেন। ডালিয়ার বাড়তি সার হিসাবে জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সারও দেওয়া যেতে পারে, এবং রাসায়নিক সার সাধারণত জমির ডালিয়াতেই দেওয়া হয়। কাঁচগাছ লাগাবার দিন পনেরো পরে প্রতি গাছে আধচামচ থেকে একচামচ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট এবং আবার দিন পনেরো পরে দেবেন ঐ একই সার এক থেকে দুই চামচ হিসাবে। এর পরে গাছে কুঁড়ি এলে নিচের মিশ্র সার দেবেন দু'চামচ করে,—এই মিশ্র সার তৈরী হবে দু'ভাগ এমোনিয়াম সালফেট, দুভাগ সুপারফসফেট ও একভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে। এই সব বাড়তি

সারই গাছের গোড়ার বিঘতখানেক দূর থেকে গোল করে মাটি পাঁচ সেণ্টিমিটার গভীর করে তুলে সার গর্তের ভেতরে ছড়িয়ে তা মাটি চাপা দিয়ে দিতে হবে। কুঁড়ি কিছুটা বড় হবার পরে সপ্তাহে একবার বা দুবার জৈব বা রাসায়নিক তরলসার দেওয়া হবে। ডালিয়া যে কোন মাটিতে চাষ করা গেলেও পি-এইচ ভ্যালু ছয় থেকে সাড়ে ছয় এরকম সারমাটিতেই এটি সবচেয়ে ভাল জন্মায়।

**নবেম্বর থেকে ডালিয়া ফোটানো ॥**

একটু চেষ্টা করলে নবেম্বরের প্রথম দিক থেকেই উঁচুদরের ডালিয়া ফোটানো সম্ভব। এ সময়ে ফুল ফোটাতে ডালিয়ার কচিগাছ লাগাতে হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে। সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে ভাল কচিগাছ পেতে লেট কাটিং করে বাঁচিয়ে রাখা গাছ খুব ভাল কাজ দেবে। অন্যান্য উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা গাছ থেকে নবেম্বরের প্রথম থেকে ফুল ফোটাবার উপযুক্ত কচিগাছ পাওয়া খুবই কঠিন। নবেম্বর থেকে ফুল ফোটাতে পারলে সমতল বাংলায় ভাল মানের ডালিয়া ফোটানো যাবে পুরো চার মাস ধরে যেখানে বর্তমানে ডালিয়া ফোটানো হয় মাত্র মাস দুয়েক ধরে। দুমাসের জায়গায় চার মাস ধরে ফুল ফোটাতে পারা নিঃসন্দেহে একটি মস্তবড় লাভ। এছাড়া, কাটিং করার বেলায়ও লাভ রয়েছে। নবেম্বর থেকে যেসব গাছে ফুল ফুটছে তাদের একেবারে নিচের দিকের কচিডাল সহজেই কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। এই কাটিং-র তৈরী কচিগাছও একই মরসুমে অন্যান্য গাছের সমান ভাল ফুল দেবে।

**স্টপিং ও ডিজ্‌বাডিং ॥**

জমির গাছে বেশি ফুল এবং টবের গাছে অল্প কিন্তু খুব উঁচু মানের ফুল ফোটানো সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কোন বাধা নেই, তবে জমির গাছে বেশি ফুল ফোটানো অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু টবের বেলায় তা নয়। গাছে কিরকম ফুল নেওয়া হবে ও তাদের মান কি রকম হবে তা স্টপিং ও ডিজ্‌বাডিং-র উপর বিশেষ করে নির্ভর করে। মিডিয়াম, স্মল, মিনিয়েচার ও পম্পন ডালিয়ার চাষ একসঙ্গে অনেক ফুল পাবার জন্য, তাই এদের বেলায় প্রতি ডালের শুধুমাত্র মাঝের বড় কুঁড়িটি রেখে সংগী কুঁড়িগুলি ভেঙে দেওয়া হবে। এবং এদের ভেতরের পম্পনের বেলায় স্টপিং করার কোন দরকার পড়ে না। বেশি ফুল ফোটানো হবে এরকম গাছের বেলায় আরও এক দফা বাড়তি মিশ্র সার ফুল ফোটার মাঝে দেওয়া দরকার। লার্জ ও জায়াণ্ট ডালিয়ার বেলায় নিচে দেওয়া পদ্ধতি অনুসারে স্টপিং ও ডিজবাডিং করবেন।

জমির গাছ পঁচিশ সেণ্টিমিটারের মত বড় হলে তার মাথা নখ দিয়ে খুঁটে ভেঙে দেবেন। ফলে যেসব নতুন ডাল ছাড়বে তাদের উপরের ভাল চারটি ডালকে বাড়তে দেওয়া হবে এবং অন্যগুলি ভেঙে ফেলা হবে কচি অবস্থায়। এই সব ডালে যখন কুঁড়ি আসবে তখন বড় কুঁড়িটি এবং সেই ডালের একেবারে নিচের দিকে একটি সতেজ কচিডাল রেখে দিয়ে অন্য সব কুঁড়ি ও ডাল ভেঙে ফেলতে হবে। এর ফলে, প্রথম দফায় গাছ তার চারটি বড় ডালে একটি করে ফুল দেবে এবং দ্বিতীয় দফায় রেখে দেওয়া ডালে একটি করে ফুল দেবে। এ ভাবে একটি গাছ মরসুমে আটটি মোটামুটি ভাল ডালিয়া দেবে। প্রথম দফার চারটি ফুল ফোটার বেশ কিছুদিন পরে ফুটছে বলে দ্বিতীয় দফার চারটি ফুলও মোটামুটি ভালই হবে। প্রথম দফার ফুল ফুটে যাবার পরে গাছে আর এক দফা বাড়তি গুঁড়ো সার দেবেন। টবের গাছে কুঁড়ি এলে মাঝের বড় কুঁড়িটি রেখে অন্য সব কুঁড়ি ও ছোট ডাল কচি অবস্থাতে ভেঙে ফেলতে হবে। গাছে মাত্র একটি ফুল হওয়াতে তা স্বভাবতই যথাসম্ভব বড় হবে। টবের গাছে কিছু বেশি ফুল পেতে চাইলে ডাল ভাঙার সময়ে সব ডাল না ভেঙে একেবারে নিচের দিকের কচি ও সতেজ একজোড়া ডাল রেখে দেবেন। এতে প্রথম ফুলটি বেশ উঁচু মানের হবে এবং এটি ফুটে যাবার পরে এই দুটি ডাল আরও দুটি মোটামুটি ভাল ফুল দেবে। সব গাছের কুঁড়ি ও বাড়তি ডাল ভাঙার কাজ খুব সাবধানে করা দরকার, এবং এ কাজ একদিনে না করে কয়েক দিন ধরে করা উচিত।

**ডালিয়ার সংকর প্রজাতি সৃষ্টি ও স্পোর্ট ॥**

দি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইনডিয়ার ১৯৭৩-র জানুয়ারীর ফুলের প্রদর্শনীতে যে ফুলটি সর্বশ্রেষ্ঠ ডালিয়ার সম্মান লাভ করেছে তার সৃষ্টি ঘটেছে সমতল বাংলাতেই। এটির নাম 'ভিক্ষু-স মাদার', এটি মিডিয়াম ডেকরেটিভ শ্রেণীভুক্ত এবং এটির সৃষ্টিতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়েছেন এই বইটির অন্যতম লেখক। ভারতে এই বিষয়ের উপরে প্রথম কাজ করার সুযোগ আমাদের হয়েছে এবং খুব অল্প কাজ করতে পেরেও খুব ভাল ফল পেয়েছি। একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এরকম অন্যান্য ফুলগুলির ভেতরে স্মল ডেকরেটিভ শ্রেণীর 'সারদা দেবী', 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ', লার্জ ডেকরেটিভ 'ভোলারাম', জায়ণ্ট ডেকরেটিভ 'ভিক্ষু-স বিবেক' বেশ উঁচুদরের ফুল।

একথা এখনও খুব প্রচলিত যে এদেশে ডালিয়ার উন্নত সংকর প্রজাতি তৈরী করা যায় না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ একথা জোর করে বলতে পারি, ও কাজ করা সমতল বাংলায় অত্যন্ত সহজ। এটি এখানে এত সহজ যে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দিলে তারাও এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে। পাশ্চাত্যে অনেক নামকরা ডালিয়ার সংকর প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ঘরোয়া বাগানে, এ দেশেও এ কাজ ডালিয়ার স্বার্থে আশু হওয়া দরকার। পুরানো ডালিয়া প্রজাতি গাছের স্বাস্থ্য সহজেই খারাপ হয়ে যায়, ফলে তারা আর আগের মত ফুল দেয় না। তাছাড়া, আজকাল, বিদেশ থেকে নতুন প্রজাতি একরকম আসে না। তাই ভাল ডালিয়া করতে চাইলে সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে আমাদেরই হাত লাগাতে হবে। সংকর প্রজাতি তৈরীর কাজে আনন্দ ডালিয়ার ভাল ফুল ফোটানোর চেয়ে অনেকগুণে বেশি। অন্যতম লেখকের 'ডালিয়া' বইতে সংকর প্রজাতি সৃষ্টির এ দেশের উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সংকর প্রজাতি ছাড়াও অন্য এক উপায়ে ডালিয়ার নতুন প্রজাতি তৈরী হয়ে থাকে। প্রকৃতির খেয়ালে ডালিয়ার কোন কোন গাছে বা একই গাছের কোন কোন ডালে হঠাৎ ভিন্ন রঙের ফুল দেয়। এরকম ভিন্ন রঙের ফুল হতে বেশি দেখা যায় ঠিক শীতের শেষে গরমের দিনে। প্রধানত লেট কাটিং-এর সাহায্যে ভিন্ন রঙের ফুল দিচ্ছে এরকম ডালের পাশের ডালকে কাঁচগাছে পরিণত করতে হবে। এই নতুন তৈরী গাছ এই ভিন্ন রঙের ফুল নিয়মিত দিতে থাকলে একে আলাদা প্রজাতি হিসাবে গণ্য করা চলবে। এভাবে তৈরী নতুন প্রজাতি বা ডালিয়ার স্পোর্টের সংখ্যা কম নয়। সমতল বাংলায়ও 'ব্ল্যাক আউট স্পোর্ট', 'দণ্ডপানি স্পোর্ট', ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ' এই তিনটি ভাল ডালিয়া স্পোর্টের উদ্ভব হয়েছে; এদের শেষেরটির স্থিতি আনতে আমরা সাহায্য করেছি।

**কাটিং ও কাঁচগাছ ॥**

সমতল বাংলায় ডালিয়ার বংশবিস্তার প্রধানত কাটিং পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এবং ডালিয়ার কাটিং করার পদ্ধতি মূলত চন্দ্রমল্লিকার কাটিং করার মত। কাটিং বসাবার উপাদান ও অন্যান্য পরিচর্যা এদের মত হলেও ডালিয়ার কাটিং-এর ক্ষেত্রে বৃষ্টি লাগানো চলবে না। সেপ্টেম্বর থেকে ডালিয়ার কাঁচগাছ লাগাতে চাইলে অগাস্টের মাঝামাঝি থেকে কাটিং বসাতে হবে, এবং একই মরসুমে ফুল পেতে কাটিং করা চলবে নবেম্বরের প্রায় শেষ পর্যন্ত। কাটিং করার ভাল সময় খুব সকাল বেলা ও শেষ বিকেল বেলা। কাটিং হিসাবে ব্যবহার করতে হবে দশ সেণ্টিমিটারের মত লম্বা কাঁচডালকে এবং কাটিং কেটেই তা খুব তাড়াতাড়ি কাটিং বসাবার উপাদানে লাগাতে হবে। কাটিং কাটা হবে গাঁটের দশ মিলিমিটার উপরে, গাঁট ছেড়ে দেবার জন্য কাটিং কেটে নেবার পরে এ থেকে নতুন ডাল ছাড়বে এবং সেগুলিও ঠিক একই ভাবে কাটিং করা হবে। কাটিং গাঁটের উপর থেকে কাটলে তার গাছে ভাল ফুল পাওয়া যায় না বা তার বাল্ব ভাল থাকে না এরকম কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা একান্তই অমূলক। কাটিং কেটে তাতে সেরাডিক্স বি-ওয়ান লাগাতে হবে। সেরাডিক্স লাগিয়ে তৈরী গাছের বাল্ব ভাল থাকে না বলে যে ধারণা রয়েছে তার পেছনেও কোন ভিত্তি নেই।

কাটিং লাগাবার দিন পনেরোর ভেতরে তাতে শেকড় আসা উচিত। এতে পাখির নখের

মত তিন-চারটি শেকড় হলে তা সাবধানে উঠিয়ে সাত সেণ্টিমিটার টবে প্রথমে লাগাতে হবে। এর পর থেকে আস্তে আস্তে বেশি রোদ খাইয়ে বাইরে লাগাবার মত করে একে তৈরী করে নিতে হবে, এ কাজে দিন সাতেক সময় লাগে। ডালিয়ার গাছের এই ছোট টবে থাকার অবস্থাকে কাঁচগাছ বলে এবং গাছের ভাল ফুল দেওয়া অনেকাংশে নির্ভর করবে এই সময়ের পরিচর্যার উপরে।

**ডালিয়া আগামী মরসুমের জন্য রাখা ॥**

লেট কাটিং, গোড়ার বাল্ব হয়েছে এরকম গাছ বাঁচিয়ে রাখা, বাল্ব তুলে রাখা প্রভৃতি উপায়ে ডালিয়া সামনের মরসুমের জন্য রক্ষা করা হয়। এবং এই সব পদ্ধতির ভেতরে লেট কাটিং করে বাঁচিয়ে রাখা সবচেয়ে ভাল উপায়। অপর দিকে, তুলে রেখে সুখী জাতের বাল্ব ভাল রাখা খুবই কঠিন। তবে সব কয়টি পদ্ধতি একই সঙ্গে অনুসরণ করা উচিত কারণ যে পদ্ধতিতেই রাখা হোক না কেন, সমতল বাংলায় ডালিয়ার একটা অংশ মারা পড়বেই। লেট কাটিং অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ থেকে কাটিং করে তা সাবধানে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। টবে করা গাছ যেমন আছে তেমনিই থাকবে এবং জমির গাছ ফুল দেওয়া শেষ করলে তা মাটিসহ সাবধানে তুলে টবে লাগিয়ে রাখতে হবে। টবের এই দুই ধরনের গাছ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন নিয়মিত জল দিয়ে যেতে হবে, গাছ নিজে নিজে মরে গেলে তাতে জল দেওয়াও বন্ধ হবে। বর্ষার দিনে যাতে এই টবের গাছে জল বেশি না হয়ে যায় বা গাছ মরে যাওয়া বাল্বে জল না পড়ে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার।

**কাটিং পেতে গাছের পরিচর্যা ॥**

গতবছরের রেখে দেওয়া গাছ বা বাল্ব থেকে সেই মরসুমে ওঠা একটু বড় গাছ কাটিং পাবার কাজের উপযুক্ত করে তৈরী করতে তা মূলগাছের মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। এর পরে নিচ থেকে যে নতুন ডাল ছাড়বে তা কেটে কাটিং করা হবে। এই সব গাছ মাঝখান থেকে কেটে না ফেলে উপরের কাঁচডালকে কাটিং হিসাবে ব্যবহার করলে তাতে অনেক বেশি কাটিং পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু এই সব কাটিং থেকে ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব নয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা এ ধরনের কাটিং থেকে করা কাঁচগাছ বিক্রী করে থাকেন এবং প্রথম অবস্থায় এর সম্পর্কে কিছু নিশ্চিত করে বোঝাও সম্ভব নয়। বাল্ব থেকে বেরুনো নতুন গাছ কেটে সরাসরি কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। লেট কাটিং-এর গাছ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভাল কাটিং পাওয়া সম্ভব। উপযুক্ত পরিচর্যায় রাখলে এদের থেকে করা সব কাটিং-ই বেশ ভাল ফল দেবে।

**জল দেওয়া ইত্যাদি ॥**

টবের ডালিয়াতে প্রয়োজনমত জল দিতে হবে; একদিন অন্তর জল দিলে এ কাজ অনেক সময়ে ভালভাবে চলে যায়। ডালিয়ার কেয়ারিতে সব সময়ে ভাসিয়ে জল দিতে হবে যাতে জল দিতে হয় দিন সাতেক অন্তর। ফুল ফোটার সময়ে এমনভাবে জল দেবেন যাতে গাছের গোড়া সব সময়ে ভেজা ভেজা থাকে। ডালিয়ায় পোকামাকড়ের আক্রমণে ফলিডল ও পাউডারি মিলডিউ রোগে মোরেস্টান বেশ ভাল কাজ দেবে। এদের ভাইরাস রোগের বেলায় কোন চিকিৎসা নেই। ভাইরাস রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে আক্রান্ত গাছ অন্যান্য ডালিয়া গাছের থেকে বেশ দূরে চাষ করা উচিত।

**অন্যান্য কথা ॥**

শীতে যে কোন ফুলের প্রদর্শনীতে গেলে দেখা যাবে যে ডালিয়া একাই আসর সরগরম করে রেখেছে। প্রদর্শনীতে ডালিয়া অনেক এলেও এদের উৎকর্ষগত মানের উপরে এখনও পর্যন্ত বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে না, ফলে অনেক নিচুমানের ফুলও উঁচুমানের ফুল হিসাবে পরিচিত হয়ে চলছে। এদেশে ডালিয়ার ফুল আয়তনে বড় হলেই তা ভাল ফুল বলে ধরা হয়। অথচ, কোন দেশেই শতকরা দশ থেকে কুড়ি পয়েণ্টের বেশি গুরুত্ব এ ফুলের

আয়তনকে দেওয়া হয় না। আয়তনকেই বড় বলে দেখি বলে ফুলের শতকরা আশী পয়েণ্টের উৎকর্ষের উপরে আমাদের কোন নজর নেই; এর ফলে এখানকার ডালিয়ার উৎকর্ষগত মান কিছুতেই ভাল হতে পারছে না। এদেশের প্রতিযোগিতায় অনেক সময়ে এমন ত্রুটিপূর্ণ ডালিয়া আসে যাদের ঐ সব ত্রুটির জন্য বিদেশের কোন ভাল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেই দেওয়া হবে না। কিন্তু এই সব ফুল এদেশে প্রতিযোগিতায় শুধু অংশ নেয় তাই নয়, এদের এই অমার্জনীয় ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতিযোগিতার উচ্চ সম্মান লাভ করে। নিচে দেওয়া ফুলের এই তিনটি অমার্জনীয় ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ সাবধান থাকা দরকার:

(১) পম্পনের বেলায় ফুলের ব্যাস কিছুতেই দুইঞ্চির বড় হতে পারবে না এবং এদের কেন্দ্র ফুল পুরানো না হলে খুলতে পারবে না;

(২) ডেকরেটিভ ক্যাকটাস ডালিয়া প্রদর্শনী চলাকালীন কেন্দ্র খুলতে পারবে না, এবং

(৩) ফুলকে ঋজু রাখতে কোন কিছুর সাহায্য নেওয়া চলবে না, অর্থাৎ ফুলের ডাঁটি সুদৃঢ় হতে হবেই। প্রতিযোগিতায় সম্মানলাভকারী ফুলগুলি বড় ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং একই সঙ্গে উৎকর্ষমূলক বিচারে তারা যেন সত্যই উঁচুদরের হয়।

ডালিয়াতে গোলাপের মত পাতার সার ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। টবের ডালিয়ার পক্ষে 'গোলাপ' অধ্যায়ে বর্ণিত দ্বিতীয় নম্বরের পাতার সারটি খুবই উপকারী।

পাশ্চাত্য দেশে পুষ্পসজ্জার কাজে ডালিয়া গোলাপের মতই সমাদৃত। এদেশেও এ কাজে ডালিয়ার ব্যবহার বাড়ছে তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ দেশে পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ডালিয়ার প্রজাতি পাওয়া যেত মাত্র দুয়েকটি। ইদানীং সমতল বাংলাতেই এ কাজের উপযুক্ত কয়েকটি ডালিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশ থেকে আসা ডালিয়ার ভেতরে 'চিয়ারীও', 'ডাস্টন স্টোন' ও 'গেলা' ; এবং এদেশে তৈরী ডালিয়ার ভেতরে 'ভিক্ষু-স মাদার', 'সারদা দেবী', 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ', 'জলি' পুষ্পসজ্জার পক্ষে বেশ ভাল ফুল।

# গোলাপ

গোলাপের চাষ অত্যন্ত প্রাচীন কিন্তু কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেন না কবে ও কোথায় এর চাষ প্রথম আরম্ভ হয়েছে। ওয়েষ্ট জার্মানীর হিল্‌ডেসহাইম ক্যাথিড্রালের একটি বিশেষ গোলাপ গাছ সম্পর্কে খ্যাতি যে, সেটি হাজার বছরেরও বেশি পুরানো। ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে ও বিভিন্ন দেশে গোলাপের কিছু প্রজাতি পাওয়া যায় যা পুরোপুরি বন্য। এগুলির ফুল সৌন্দর্যের বিচারে কিছু আহামরি নয় কিন্তু এ ধরনের বন্য গোলাপই আজকার উন্নত গোলাপের আদিজননী। জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ইত্যাদি দেশে গোলাপের উন্নত থেকে উন্নততর সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজ চলে আসছে অনেক দিন ধরে। এই চেষ্টার ফলে আজ গোলাপ বোধ হয় জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুল। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জলবায়ুতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা গোলাপের খুব বেশি, তবে এটা দেখা যায় যে কোন কোন জলবায়ুতে কোন কোন শ্রেণীর গোলাপ সহজেই খুব ভাল জন্মায়। রোজা সেণ্টিফোলিয়া শ্রেণীর গোলাপ সমতল বাংলায় ফোটানো বুঝি অসম্ভব, অথচ এই শ্রেণীর গোলাপ খুব ভাল ফুল দেবে তীব্র ঠাণ্ডার জায়গায়। কিছুদিন থেকে ভারতেও সংকর প্রজাতি গোলাপের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সংকর প্রজাতির সৃষ্টির মাধ্যমে হয়তো এরকম প্রজাতির সৃষ্টি ঘটবে যা আমাদের জলবায়ুর পক্ষে আরও বেশি উপযুক্ত।

**গোলাপের শ্রেণীভেদ ॥**

গোলাপের প্রজাতির সংখ্যা অগুন্তি এবং প্রতি বছরই এদের সঙ্গে আরও অনেক

নতুন প্রজাতি যোগ হচ্ছে। এদের বিভিন্ন প্রজাতিকে তাদের ফুল ফোটার ধরন, ফুলের আয়তন, গাছের প্রকৃতি ইত্যাদির বিচারে কতগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই শ্রেণীদের নাম হাইব্রিড টি, ফ্লোরিবানডা, মডার্ণ শ্রাবস, ক্লাইম্বার, মিনিয়েচার, হাইব্রিড পারপিচুয়াল, টি, ডোয়ার্ফ পলিয়েনথা, নয়সেটিট র‍্যামবেলার, রোজা সেণ্টিফোলিয়া, মাস্ক, মস্ প্রভৃতি। গোলাপের এই শ্রেণীদের ভেতরে প্রথম দুটি শ্রেণীর গোলাপ সমতল বাংলায় চাষের পক্ষে বেশি উপযুক্ত এবং এ দুটিই পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় শ্রেণী। এ দুটি ছাড়া এর পরের সাতটি শ্রেণীর গোলাপ এখানে কমবেশি চাষ করা চলে। গত পনেরো বছরে গোলাপের সংকর প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটেছে এবং এটা বেশি হয়েছে হাইব্রিড টি, ফ্লোরিবানডা ও মিনিয়েচার গোলাপের ক্ষেত্রে। মিনিয়েচার আমাদের অনেকের কাছে এখনও অপরিচিত ; এগুলি কুঁড়ি সেণ্টিমিটার বা আরও ছোট টবে করা যেতে পারে। টি শ্রেণীর গোলাপের বিশেষ খ্যাতি অনেক দিন ধরে ফুল দেবার জন্য এবং হাইব্রিড পারপিচুয়ালের খ্যাতি গন্ধ, বড় ফুল ও গাছ কষ্টসহিষ্ণু বলে। এ দুটি শ্রেণীর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এমন ভাবে যাতে দুটিরই গুণগুলি সংকর প্রজাতিগুলিতে বর্তায়, এভাবে সৃষ্টি হয়েছে হাইব্রিড টি-র। উৎপত্তির সময় থেকেই এটি গোলাপের শিরোমণি কিন্তু এর সত্যিকারের জয়জয়কার বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। হাইব্রিড টি উচ্চতায় মাঝারি, গাছ ঝোপালো এবং ফুল দেয় অনেক দিন ধরে ; এদের ফুল ডাবল, আয়তনে বেশ বড় এবং প্রতি ডালে ফুল ফোটে একটি দুটি করে। ফ্লোরিবানডার উৎপত্তি হয়েছে হাইব্রিড টি-র অনেক পরে কিন্তু এগুলি এখন জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে হাইব্রিড টি-র প্রধান প্রতিযোগী। ফ্লোরিবানডার উৎপত্তি ঘটেছে হাইব্রিড টি ও ডোয়ার্ফ পলিয়ানথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। হাইব্রিড টি-র মত এদের ফুল প্রধানত ডাবল, ফুলের আকৃতি অনেকটা হাইব্রিড টি-র মত, গাছ সাধারণত উচ্চতায় ছোট এবং ছোট ছোট ফুলগুলি ফোটে ডোয়ার্ফ পলিয়ানথার মত থোকায়। এগুলিও ফুল দেয় অনেক দিন ধরে। ইদানীং নতুন কিছু প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে যাদের ফুল হাইব্রিড টি-র মত বড় কিন্তু ফোটে অনেকটা ফ্লোরিবানডার মত থোকায় ; এগুলি গ্রানডিফ্লোরা নামে গোলাপের নতুন শ্রেণী হতে চলেছে। হাইব্রিড টি ও ফ্লোরিবানডার প্রচুর ভাল প্রজাতি ভারতেও কিনতে পাওয়া যায়, তাই সবার পছন্দসই গোলাপের প্রজাতি যোগাড় করা কিছু কঠিন নয়।

**গোলাপ লাগাবার সময় ॥**

সমতল বাংলায় বছরে দুটি সময়ে গোলাপ লাগানো চলে। বর্ষা পুরোপুরি থেমে গিয়ে শীত পড়লে নবেম্বরে গোলাপ লাগাবার চল এখানে বেশি। এ ছাড়া শেষ বর্ষায় অর্থাৎ অগাষ্ট সেপ্টেম্বরেও গোলাপ লাগানো হয়ে থাকে। শীতকালে লাগানো গোলাপের চারাগাছ মরে কম এবং এটাই এর সবচেয়ে বড় সুবিধা ; এছাড়া এ সময়ের লাগানো গোলাপের চারাগাছের পরিচর্যার পাটও কম। শেষ বর্ষায় গোলাপ লাগাতে চাইলে বর্ষা আরম্ভ হবার আগে থেকেই জমি তৈরী করে রাখা উচিত। এ সময়ের গোলাপ লাগাবার জমি পাশাপাশি জমি থেকে উঁচু হতে হবে এবং গাছ লাগিয়ে তার গোড়া ভাল করে চেপে বেঁধে দিতে হবে যাতে বর্ষার বাড়তি জল সহজেই গাছের গোড়া থেকে গড়িয়ে যায়। শীতকালে লাগানো চারাগাছের ফুল পাওয়া যাবে আগামী শীতে কিন্তু শেষ বর্ষায় লাগানো চারাগাছ অল্প হলেও কিছু ফুল দেবে শীতকালে মাস চারপাঁচেক পরেই। বর্ষায় লাগানো চারাগাছ বাঁচার হার অপেক্ষাকৃত কিছু কম তবে তাড়াতাড়ি ফুল পেতেই এদের লাগানো হয়। গোলাপের চারাগাছ লাগাবার পরে তার ফুল তাড়াতাড়ি দেখতে চাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং এর প্রয়োজনও রয়েছে। ফুল ফুটলে ভুল প্রজাতি লাগানো হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে, ভুল প্রজাতি হলে তা তুলে তার জায়গায় সঠিক প্রজাতি লাগানো যাবে শীতের মরসুমে। চারাগাছ মাত্র মাস পাঁচেক পরে লাগানো হচ্ছে তাই পাশাপাশি গাছের আয়তনে খুব হেরফের না হওয়ায় বিসদৃশ দেখাবার সম্ভাবনা নেই। ভেবে দেখলে অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শেষ বর্ষায় গোলাপের চারাগাছ লাগানো বেশি ভাল।

**উপযুক্ত চারাগাছ ও গোলাপের বংশবৃদ্ধি ॥**

চোখকলমের তৈরী বছর খানেকের পুরানো গোলাপের চারাগাছ জমি বা বড় টবে লাগাবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোলাপের বংশবৃদ্ধির জন্য কাটিং, গুটিকলম, দাবাকলম, জোড়কলম, চোখকলম প্রভৃতি পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়। এদের ভেতরে চোখকলম দিয়ে গোলাপের বংশবিস্তার সবচেয়ে ভাল। চোখকলম করা খুব সহজ এবং গোলাপের চাষ করতে চাইলে চোখকলম অবশ্যই শিখে নেওয়া উচিত। সমতল বাংলায় গোলাপের চোখকলম করার কাজে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী বেশ ভাল সময়।

তেরো সেণ্টিমিটার টবে তৈরী গোলাপের চারাগাছ পেলে সবচেয়ে ভাল, এ ধরনের চারাগাছ বাঁচবে সংখ্যায় অনেক বেশি এবং টব খুলে লাগানো হচ্ছে বলে চারাগাছের বৃদ্ধির কোথাও ছেদ পড়ছে না। আজকাল অনেকে চারাগাছের গোড়ার মাটি ধুয়ে গাছ পাঠান। এই ব্যবস্থায় গাছ এসে পেঁছায় ভাল অবস্থায় কিন্তু লাগাবার পরে কোন কারণে এদের একটা বড় অংশ মারা পড়ে। এর কারণ এটা হওয়া অসম্ভব নয় যে এ গাছগুলি হাওয়াতে সহজেই নড়ে যায় এবং এভাবে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**রাসায়নিক সার ও গোলাপ ॥**

গোলাপ সম্পর্কে বিদেশী ও ভারতীয় লেখকদের বই ওলটালে দেখা যাবে যে সবাই রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিধান দিচ্ছেন। কিন্তু সমতল বাংলায় গোলাপ গাছের গোড়ায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করার পরে অনেক সময়েই গাছ মারা পড়ে। এটা বেশি হয় রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করার বেলায়। পুরোদস্তুর গবেষণা না করে রাসায়নিক সারই গাছের মৃত্যুর কারণ এ কথা জোর করে বলা যায় না তবে মিশ্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করার পরে কিছুদিনের ভেতরে অনেক স্বাস্থ্যবান গাছ মারা গেছে এ অভিজ্ঞতা অনেকের। এ ছাড়াও দেখা গেছে, রাসায়নিক সার ব্যবহার করাতে সেই মরসুমে বেশ ভাল ফুল পাওয়া গেছে কিন্তু ফুল দেবার কিছুদিন পরে অনেক গাছ মারা পড়েছে। তথাকথিত মিশ্র জৈবসার ( আসলে এর অনেকগুলিতেই রাসায়নিক সার মেশানো রয়েছে ) ব্যবহার করেও একই রকমের ফল ফলতে দেখা গেছে। সরাসরি কোন যোগ থাক বা না থাক এই অবস্থায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে অনেকে ভয় পান। অল্প পরিমাণে সুপারফসফেট ও সালফেট অব পটাশ ব্যবহারে গাছকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় না, তাই এ দুটি ইচ্ছা করলে গোলাপ চাষের বিকল্প পদ্ধতির বেলায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাতার সার হিসাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বেলায় অবশ্য কোন অসুবিধা নেই।

**সারমাটি ও বাড়তি সার ॥**

প্রথম বা সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী সারমাটির ভাগ হবে এরকম—সাতভাগ মাটি, গুঁড়ো গোবরসার পাঁচভাগ এবং তিনভাগ সাধারণ গুঁড়ো আধপোড়া মাটি। এই নির্দিষ্ট হারে এই তিনটি উপাদান মেশানো একটি গর্তের উপযুক্ত পরিমাণ সারমাটিতে আরও মেশাবেন এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো ও দুমুঠো সরষের খোল। নবেম্বর মাসে গাছ ছেঁটে দেবার দিন তিনেকের ভেতরে গাছের গোড়া খুলে দেবেন, তবে এক বছরের কম বয়সের গাছের গোড়া খোলার দরকার নেই। গাছের গোড়া থেকে তিরিশ চল্লিশ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত গোল করে গোড়ার জমি পনেরো সেণ্টিমিটার গভীর করে খুলে দিতে হবে। গোড়ার মাটি খুঁড়ে তোলার বেলায় সাবধানে খুঁড়বেন যাতে গাছের কোন আঘাত না লাগে বা এর কোন বড় শেকড় কাটা না পড়ে। গাছের গোড়া খোলা অবস্থায় থাকবে দিন দশেক। গোড়া খুলে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে শেকড় হিম ও রোদ পেলে গাছের উপকার হবে। গোড়া খুলে রাখার সময়ে হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গাছের গোড়ায় জল জমলে গাছের ক্ষতি হবে। তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলেই গোড়ায় মাটি ভরে দেওয়া এবং বৃষ্টির পরে তা আবার তুলে নেওয়া ভাল। গাছের গোড়ার তোলা মাটি গুঁড়ো করে তাতে গাছের আয়তন ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী পনেরো সেণ্টিমিটার টবের দেড় থেকে তিন টব গুঁড়ো গোবরসার, একশো থেকে দেড়শো গ্রাম স্টীমড্ হাড়ের গুঁড়ো, আট চামচ সুপারফসফেট, চার চামচ সালফেট

অব পটাশ এবং যোগাড় করা সম্ভব হলে এক চামচ সিকুয়েষ্ট্রিন প্লাস মিশিয়ে তা দিয়ে গোড়া খোলার দিন দশেক পরে গোড়া বুজিয়ে দিন। গোড়া খোলা থাকার সময়ে কোন জল দেবেন না বা গোড়া বুজিয়েই জল দেবেন না। জল দিতে আরম্ভ করবেন গাছে নতুন ডাল বেরুতে আরম্ভ করলে। গাছে কুঁড়ি দেখা দিলে দুমুঠো কাঁচা গোবর গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দেওয়া ভাল। ভাল ফুল পেতে তরলসার নিয়মিত দেওয়া দরকার এবং এ বেলাও জৈব তরলসার দেওয়া ভাল। ফুল ভাল করতে কুঁড়ি বড় হতে আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে সরষের খোল বা সরষের খোল ও গোবরের তরলসার ফুল খুলতে আরম্ভ করা পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। গাছের স্বাস্থ্য ভাল করতে গাছ ছাঁটার শেষে সার দেবার পর থেকে সরষের খোলের খুব পাতলা তরলসার গাছে কুঁড়ি আসা পর্যন্ত অনেকে দিয়ে থাকেন। বিকল্প পদ্ধতির বেলায়ও একই ভাবে তরলসার দিতে হবে।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

সারাদিন রোদ পায় এবং কাছাকাছি কোন বড় গাছ নেই এরকম জমি গোলাপ চাষের জন্য বেছে নিতে হবে। টবের গোলাপ রাখার জায়গাও এমন হবে যা যথেষ্ট রোদ পায়। গোলাপের জমি এমন হতে হবে যেখানে বর্ষাকালেও জল দাঁড়াবে না। গাছের গোড়ায় জল বসলে গোলাপ কখনই ভাল জন্মাবে না। চারাগাছ বসাবার জায়গা ঠিক করে হাইব্রিড টি গোলাপের জন্য গর্ত করবেন দুহাত গভীর ও দেড়হাত ব্যাস করে এবং ফ্লোরিবানডার জন্য হাত দেড়েক গভীর ও একহাত ব্যাস করে। পাশাপাশি যে কোন দুটি হাইব্রিড টি লাগাবেন আড়াই হাত অন্তর এবং দুটি ফ্লোরিবানডা হাত দুয়েক অন্তর। গর্তের মাটি দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ না হলে অন্য জায়গা থেকে এ ধরনের মাটি নিয়ে আসা ভাল। গোলাপ অনেক ধরনের মাটিতেই করা সম্ভব তবে যেসব মাটির পি-এইচ ভ্যালু ছয় থেকে সাড়ে সাত সেসব মাটিতে এরা আরও ভাল জন্মায়।

চোখকলমের চারাগাছের জোড়ের অংশটি রাখবেন মাটির থেকে তিন সেণ্টিমিটার উপরে এবং জোড়কলমের জোড়ের অংশটি পাঁচ সেণ্টিমিটার মাটির ভেতরে। সমতল বাংলায় জোড়কলমের চারাগাছের শেকড় থাকে মাটির শক্ত গুলের ভেতরে। গোড়ার এই গুল আঙুলের চাপে ফাটিয়ে বা কোন কিছু না করে চারাগাছ বসানো, এই দুটি সুস্পষ্ট ভিন্নমত রয়েছে। গোড়ার মাটি ধুয়ে ফেলা চারাগাছ এসে পৌঁছবার পরে সেগুলি লাগাবার আগে অন্তত বারো ঘণ্টা কাদাগোলা জলে গাছের শেকড় চুবিয়ে রাখার নিয়ম। এ গাছগুলিকে লাগিয়ে শক্ত অবলম্বনের সংগে এমন ভাবে বাঁধতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই গাছের শেকড়ের নড়াচড়া না ঘটে। এবং প্রয়োজনবোধে এ গাছগুলির জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে প্রথম দিন সাতেকের জন্য। এই গাছের চারপাশ আর্দ্র রাখতে পলিথিনের বড় ব্যাগ দিয়ে নতুন লাগানো গাছ মুড়ে দিতে পারেন। অন্যান্য পদ্ধতিতে করা চারাগাছের জন্যও প্রথম কয়েক দিন ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। চারাগাছ লাগাতে হবে বিকাল বেলায় এবং গাছ লাগিয়ে তার গোড়া বেশ শক্ত করে পা দিয়ে চেপে দেবেন। মাটি ধোওয়া শেকড়ের চারাগাছের শেকড় ছড়িয়ে ধরে উপর দিয়ে সাবধানে মাটি দিয়ে গর্ত ভরতে হবে। চারাগাছ লাগাবার জন্য করা গর্তের ভেতরের জমিকে অন্তত দিন সাতেকের রোদ খাওয়ানো দরকার এবং গাছ লাগাবার অন্তত মাসখানেক আগে এই গর্ত সারমাটি দিয়ে ভরে দেবেন। উইয়ের হাত থেকে গাছ বাঁচাতে শতকরা চার ভাগ শক্তির ডি. ডি. টি প্রতি গর্তে তিন গ্রাম হারে দেবেন, এর প্রকোপ বেশি হলে মাস দুয়েক অন্তর এটি দিয়ে যেতে হবে। এলড্রিন বা হেপটাক্লোরও উইয়ের বেলায় ভাল কাজ দেবে। চারাগাছ লাগাবার পরে মাস তিনচারেক ধরে গাছে কুঁড়ি এলে তা ভেংগে দেবেন যাতে ফুলের বদলে গাছের স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে। বছর দুতিন অন্তর গোলাপের জমিতে চুন দিতে হবে। চারা-গাছের জোড়ের নিচ দিয়ে জংলী গাছের ডাল বেরুতে আরম্ভ করলেই তা ভেঙে দিতে হবে। গাছের গোড়া সবসময়ে পরিষ্কার থাকবে এবং জমির গাছে দুবার জল দেবার মাঝখানে গাছের গোড়া খুঁচে দিতে হবে। শীতকালে ফুল দেবার সময়ে এটা করা বিশেষ দরকার। সমতল বাংলায় গোলাপকে দুদফায় ভাল ফুল দিতে দেখা যায়। ছাঁটার পরে

প্রথম দফায় ফুল এবং পুরানো ফুল ঠিকমত কেটে দিলে ভাল ফুল দেবে আর এক দফায়। প্রথম দফার ফুল ফুটে যাবার পর থেকে আবার নিয়মিত তরলসার দিয়ে যেতে হবে দ্বিতীয় দফায় ভাল ফুল পাবার জন্য। ফুল তুলবার বেলায় বা ফুটে যাওয়া ফুল সাত সেন্টিমিটারের মত লম্বা ডালসহ কাটা দরকার, কারণ ফুলের ঠিক নিচের কচিডাল থেকে ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব নয়। গাছে মরা ডাল দেখলেই কেটে ফেলবেন।

**গোলাপ চাষের বিকল্প পদ্ধতি ॥**

বিকল্প পদ্ধতিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি। এই পদ্ধতি অনুসারে গাছের গোড়া খুলে দেবার দরকার নেই, জমি উঁচু করে নেবার জন্য তাতে জল জমার কোন ভয় থাকছে না এবং গাছের গোড়ায় সবসময়ে জৈবসার ব্যবহার করার চেষ্টা করা হবে। সাধারণ পদ্ধতি থেকে এটি যেসব ক্ষেত্রে আলাদা শুধু সেগুলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, এদের অন্যান্য পরিচর্যা সাধারণ পদ্ধতির মতই হবে। সমতল বাংলায় গোলাপ গাছের গোড়ায় সহজেই জল দাঁড়িয়ে গাছ খারাপ করে দেয়। এই পদ্ধতিতে জল দাঁড়াবার আশংকা একরকম নেই বলে এতে গোলাপের চাষ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠবে।

পাশাপাশি দুসারি বা বড় জোর তিনসারি গোলাপ লাগানো সম্ভব এরকম কেয়ারির চারদিকে দাগ দিয়ে এই দাগ ধরে তিনচার ইট উঁচু দেয়াল তুলতে হবে। ইটের লেখার দিক জমিতে আলতোভাবে বসবে এবং এদের উপরেও ইট বসবে একইভাবে। কোন অবস্থাতেই সিমেণ্ট বা অন্য কিছু দিয়ে ইটের সঙ্গে ইট জুড়ে দেবেন না। এই তথাকথিত দেয়াল ওঠার আগে কেয়ারির জমি ভালভাবে কুপিয়ে দেবেন। কুপিয়ে দেবার সময় সাত সেন্টিমিটার গভীর জমির উপরের স্তরের মাটি তুলে আলাদা করে রাখবেন। কেয়ারি ঘিরে দেয়াল ওঠার পরে এর ভেতরটা মাটি এনে এমনভাবে ভরে দেবেন যাতে মাটি উপরের ইট থেকে কিছুটা উঁচু হয়ে থাকে। ইটের দেয়াল দেখতে খারাপ লাগলে এটা ঢাকতে এর বাইরের পাশে শীতকালে এনটিরাইনাম প্রভৃতি ফুল লাগাতে পারেন। গাছ লাগাবার জন্য গর্ত করতে হবে উপরের মাটি থেকে মূল জমি পর্যন্ত গভীর করে এবং গর্তের ব্যাস হবে দেড়হাত। এই গর্তের তোলা মাটিতে মেশাবেন ছাব্বিশ সেন্টিমিটার টবের এক টব গুঁড়ো গোবরসার, তিনমুঠো সরষের খোল এবং এক বড় আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো। চারাগাছ লাগাবার অন্তত মাসখানেক আগে এই মাটি দিয়ে গর্তের উপরের দশ সেন্টিমিটার অংশ ছেড়ে গর্ত ভরে দেবেন। গর্তের উপরের দিকের দশ সেন্টিমিটার অংশ ভরতে জমির উপরের স্তরের তুলে রাখা মাটি কাজে লাগবে। এ মাটিতে কোন সার মেশানো হবে না এবং এটা ভাল করে গুঁড়ো করে নিতে হবে। চারাগাছ লাগাবার সময়ে এই মাটি গাছের গোড়ায় এমনভাবে দেবেন যাতে শেকড় থেকে নিচে ও পাশের দিকে সাত সেন্টিমিটার করে এই মাটি থাকে। চারাগাছের শেকড় যাতে প্রথমেই সারমাটির সংস্পর্শে না আসে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। এটা করতে চারাগাছ লাগাবার সময়ে সারমাটির ভেতরে গর্ত করে তা এই মাটি দিয়ে ভরে দেবেন এবং তার উপরে চারাগাছ বসাবেন। লাগাবার বছরে গাছের গোড়ায় আর কোন বাড়তি সার দেবার দরকার নেই। এর পরের বছর থেকে গাছ ছাঁটার পরে গোড়ার মাটিতে মিশিয়ে দেবেন একমুঠো থেকে দুমুঠো সরষের খোল, দুমুঠো থেকে চারমুঠো ষ্টীমড্ হাড়ের গুঁড়ো এবং এক থেকে তিন আঁজলা গুঁড়ো গোবরসার গাছ ছাঁটার পরে সার দেবার প্রস্তুতি হিসাবে গোড়ার মাটি কুপিয়ে গুঁড়ো করে নেবেন তবে গাছের দশ সেন্টিমিটারের ভেতরের মাটিতে যেন কোন কোপ না পড়ে সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে। এই দশ সেন্টিমিটারের ভেতরের মাটি যেমন আছে তেমনিই থাকবে। গাছের স্বাস্থ্য অনুযায়ী সারের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে। শুধু জৈবসার ব্যবহার করতে পারলে ভাল কিন্তু পটাশের জন্য কাঠের ছাই প্রভৃতি যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ইচ্ছা করলে উপরের বাড়তি সারের সঙ্গে আটচামচ সুপারফসফেট, চারচামচ সালফেট অব পটাশ ও একচামচ সিকুয়েষ্ট্রিন প্লাস মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই সব গাছের বেলাতেও নতুন ডাল ছাড়তে আরম্ভ না করা পর্যন্ত জল দেবেন না

**পাতার সার ॥**

গোলাপে পাতার সার বা ফলিয়ার ফিডের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। পাতার সার পুরোপুরি রাসায়নিক সার মিশিয়ে তৈরী হলেও এদের সুষ্ঠু প্রয়োগে গাছের কোন ক্ষতি হতে দেখা যায় না। তবে সারের মাত্রা যাতে বেশি না হয় সে সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হতে হবে। পাতার সার দেবেন শুধু শীতকালে এবং এগুলি স্প্রে করবেন পরিষ্কার দিনের ভোরবেলা সকাল আটটার ভেতরে। দুটি আলাদা পাতার সার ব্যবহার করা হয়, একটি গাছের স্বাস্থ্য ও ফুল ভাল করতে এবং দ্বিতীয়টি ট্রেস এলিমেণ্টের যোগান দিতে। প্রথম পাতার সারটি নিচের দুটির যে কোন একটি উপায়ে তৈরী করে নিতে পারেন। ইউরিয়া, ডাই-এমোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ও ডাই-পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট প্রতিটি দশ গ্রাম করে মিশিয়ে তা দশ লিটার জলের হারে গুলে দেবেন। অথবা সমান ওজনের পটাসিয়াম নাইট্রেট ও এমোফস ( নাইট্রোজেন ১১ ও ফসফেট ৪৮ শক্তির ) মিশিয়ে তার আড়াই গ্রাম এক লিটার জলের হারে স্প্রে করবেন। এই প্রথম পাতার সারটি স্প্রে করবেন দিন দশেক অন্তর। দ্বিতীয় পাতার সারটি ব্যবহার করবেন মাসে একবার অথবা দুমাসে একবার। ম্যাগনেসিয়াম সালফেট কুড়ি গ্রাম, ম্যাংগানিজ সালফেট পনেরো গ্রাম, ফেরাস সালফেট দশ গ্রাম ও বোরাক্স পাঁচ গ্রাম হারে মিশিয়ে এর দু'গ্রাম এক লিটার জলের হারে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। প্রথম পাতার সারটি 'জলদি গ্রো' ও দ্বিতীয় পাতার সারটি 'সিকুয়েষ্ট্রিন প্লাস' নামে তৈরী অবস্থায়ও পাওয়া যায়। দুটি পাতার সারের সঙ্গেই কীটনাশক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করা চলে কিন্তু দুটি সারকে কখনও একসঙ্গে মেশানো চলবে না। এক লিটার স্প্রে-র উপাদানে এক থেকে দু'গ্রাম লিকুয়িড সোপ মিশিয়ে নিলে পাতার সার পাতায় বেশ ভাল করে লাগবে। স্প্রে সব সময়ে খুব সাবধানে করতে হবে যাতে পাতার দুদিকেই পাতার সার ভালভাবে লাগে কিন্তু ফুলে যেন না লাগে, ফুলে পাতার সার লাগলে তাতে দাগ ধরে যাবে। পাতার সার টবের গোলাপের পক্ষে অপরিহার্য এবং জমির গোলাপের পক্ষেও এটি খুবই উপকারী। বিকল্প পদ্ধতিতে গোলাপ চাষের বেলায় জৈব পটাস যোগাড় করা খুবই কষ্টকর, পাতার সার এই ঘাটতির অনেকটা সামাল দেবে।

**প্রদর্শনীর উপযুক্ত ফুল ॥**

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাইলে যে গোলাপগুলি যত্ন করে চাষ করলে আরও ভাল ফুল দেয়, সেগুলি চাষের জন্য বেছে নিতে হবে। দু'চারটি প্রদর্শনী দেখলেই কোনগুলি এ কাজের বেশি উপযুক্ত সে সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা জন্মাবে। প্রতিযোগিতার উপযুক্ত ফুল পাবার জন্য গাছ ছাঁটার সময়ে গাছ একটু বেশি করে ছাঁটতে হবে—গাছে বড় ডালের সংখ্যা কম থাকবে এবং বড় ডালের গোড়ার ডালও থাকবে খুব কম সংখ্যায়। হাইব্রিড টি-র প্রত্যেক ডালে শুধুমাত্র একটি করে ফুল ফুটতে দেওয়া হবে, এবং অন্যান্য কুঁড়ি ভেঙে ফেলা হবে তাদের খুব কচি অবস্থায়। এ গাছগুলির বেলায় তরলসার নিয়মিত দিয়ে যেতেই হবে।

**টবের গোলাপ ॥**

টবের গোলাপের সারমাটি প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী করবেন এবং এতে আরও মিশিয়ে নেবেন পনেরো সেণ্টিমিটার টবের এক টব ব্যবহৃত চা পাতা। হাইব্রিড টি ও ফ্লোরিবানডার জন্য তিরিশ সেণ্টিমিটার বা আরও বড় টব ব্যবহার করতে হবে। এই টবে এই যে, এদের ফুল স্বাভাবিক অবস্থাতেই খুব কাছ থেকে দেখা যায়। এটাও অনেক ফুল দেবার, তাদের টবে লাগাবার কাজে বেছে নেওয়া দরকার। বর্ষার প্রথমে টবের গাছের উপরের মাটি দশ সেণ্টিমিটার করে তুলে সেখানে নতুন সারমাটি ভরে দেবেন। শীতকালে গাছ ছাঁটার পরে তিন মুঠো গুঁড়ো গোবরসার ও একমুঠো ষ্টীমড্ হাড়ের গুঁড়ো মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এর পরে পুরো শীতকাল ধরে একমাস অন্তর একমুঠো করে ষ্টীমড্ হাড়ের গুঁড়ো গাছে দিয়ে যাওয়া দরকার। টবের গাছে সারা বছর ধরে জৈব তরলসার নিয়মিত ভাবে দিতে হবে।

**ষ্ট্যাণ্ডার্ড রোজ ॥**

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা ট্রি রোজ দিন দিন আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সমতল বাংলায় এর চল এখনও বেশি না হলেও অদূর ভবিষ্যতে এগুলি জনপ্রিয় হবেই তা জোর করে বলা যায়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড রোজ বলতে গোলাপের কোন আলাদা শ্রেণীকে বোঝায় না ; গোলাপের চোখকলম নিচে না করে এগুলির বেলায় বেশ উঁচুতে করা হয় এবং এখানেই একে ঝোপালো হতে সাহায্য করা হয়। গাছ আয়তনে ছোট হলেও এটি আকৃতি নেয় বড় গাছের, তাই, এর নাম ট্রি রোজ বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড রোজ। এ গাছগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এদের ফুল স্বাভাবিক অবস্থাতেই খুব কাছ থেকে দেখা যায়। এটাও অনেক সময়ে দেখা যায় যে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের গাছ জমিতে লাগানো একই প্রজাতির গাছ থেকে ফুল দেয় বেশি। ফুল-ষ্ট্যাণ্ডার্ড করতে জংলীগাছে চোখকলম করা হয় সাধারণত এক মিটার উচ্চতায় এবং হাফ-ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বেলায় সাধারণত সত্তর সেণ্টিমিটার উচ্চতায়। হাফ-ষ্ট্যাণ্ডার্ড করতে ফ্লোরিবানডার বেশি ব্যবহার এবং ফুল-ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বেলায় বেশি ব্যবহার হাইব্রিড টি ও ফ্লোরিবানডার। ষ্ট্যাণ্ডার্ড করার কাজে এরকম প্রজাতিগুলি বেছে নিতে হবে যারা ফুল দেয় বেশি এবং সহজেই ঝোপালো হয়ে ওঠে। এ গাছগুলিকে ভালভাবে দাঁড় করাতে বছর তিনচারেক সময় লাগবে। সমতল বাংলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড করতে জংলীগাছ হিসাবে এডওয়ার্ড রোজ ব্যবহার করা ভাল। দুটি ফুল-ষ্ট্যাণ্ডার্ড গাছের ভেতরের দূরত্ব হবে হাত চারেক এবং দুটি হাফ-ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ভেতরের দূরত্ব হবে হাত আড়াই থেকে তিন। এডওয়ার্ড রোজের কাটিং লাগাবার বেলায় এর পনেরো কুড়ি সেণ্টিমিটার গোড়া মাটির ভেতরে ঢুকিয়ে লাগানো উচিত। প্রথম থেকেই এগুলি ভাল ভাবে বাঁধতে হবে এবং অবলম্বনের বেলায় এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে যা অনেক দিন টেকে। ঝোড়ো হাওয়াতে চোখকলমের জায়গা থেকে গাছটির খুলে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই গাছের উপরের অংশটির বাঁধার ব্যবস্থা খুবই ভাল হতে হবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড রোজ লাগাবেন পায়ে-চলা পথের ধারে, গোলাপের কেয়ারির পেছনের সারিতে অথবা শুধুমাত্র ষ্ট্যাণ্ডার্ড রোজের কেয়ারিতে। এদের নিচের দিকটা অনেক সময়ে ফাঁকা ফাঁকা দেখায় ; এদের গোড়ায় শীতের মরসুমে প্যানজি লাগালে গোলাপ, প্যানজি প্রভৃতি মিলিয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড রোজ দেখতে খুব সুন্দর দেখাবে।

**গোলাপের সংকর প্রজাতির সৃষ্টি ॥**

গোলাপের সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে গত পনেরো বছর ধরে। ফলে আজকের ফুলের রঙ আরও ভাল, গাছের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি, কিছু কিছু নতুন রঙের গোলাপের সৃষ্টি হয়েছে এবং আরও কিছু নতুন রঙের গোলাপ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও গোলাপের সংকর প্রজাতি তৈরীর কাজ চলছে কিছুদিন ধরে। এই সব প্রচেষ্টার যে ফল পাওয়া গেছে তা খুবই আশাপ্রদ— এর ভেতরেই বেশ কিছু সংকর প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে যাদের ফুল খুবই উঁচুমানের। আমাদের তৈরী 'স্বামী শিবানন্দ' গোলাপের প্রজাতিটিও বেশ ভাল ফুল। এটাও দেখা গেছে যে ভারতের জলবায়ুর দাক্ষিণ্যের কারণে সংকর প্রজাতি তৈরীর কাজ পাশ্চাত্যের থেকে অনেক সহজ। সমতল বাংলায়ও কিছু ভাল সংকর প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। গোলাপের বীজ অনেক সময়ে গাছেই হয়ে থাকে, এদের দিয়েও ভাল সংকর প্রজাতির গোলাপ পাওয়া সম্ভব তবে সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিলে আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ নীল রঙের গোলাপ তৈরীর চেষ্টা চলছে। এ কাজে যোগ দিয়েছে ভারতও। এ দেশেই যদি প্রথম নীল গোলাপের সৃষ্টি হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই গৌরবের বিশেষ কারণ হবে। গোলাপের সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে লেখকের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, এ কাজ ডালিয়ার মত সহজ না হলেও খুব কিছু কঠিনও নয়।

**গাছ ছাঁটা ॥**

অনেক গাছের মত গোলাপও নতুন ডালে ফুল দেয় ভাল। গোলাপ গাছ ছাঁটার প্রধান উদ্দেশ্য এটাই। সমতল বাংলায় গোলাপ ছাঁটা হয় একবার এবং এটা করার ভাল সময় নবেম্বর মাসে একটু ঠান্ডা পড়লে। কি ভাবে ছাঁটা উচিত এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে এবং এ সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। তবে ছাঁটার কতগুলি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে কোন ভিন্নমতের অবকাশ নেই। এগুলির সাহায্যে এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা গড়ে তুলতে হবে। মরা, রোগগ্রস্ত বা জড়াজড়ি করে রয়েছে এরকম সরু ডালগুলি সব শ্রেণীর গোলাপের বেলায় ছেঁটে দিতে হবে। হাইব্রিড টি-র বড় ডালগুলি মুঠোখানেক লম্বা রেখে ছাঁটা যেতে পারে এবং এই সব বড় ডালের বাইরের দিকে ছড়ানো দুতিনটি সতেজ ডাল রেখে অন্য সব ডাল ছেঁটে দিতে হবে। এই ছোট ডালগুলিও পনেরো সেণ্টিমিটারের মত লম্বা রেখে উপরের অংশ ছেঁটে ফেলতে হবে। ফ্লোরিবানডা ও ডোয়ার্ফ পলিয়ানথার বেলায় সাধারণ নিয়মগুলি মানা ছাড়া বড় ডালের মাথাগুলি হালকা করে ছেঁটে দেবেন। ক্লাইম্বার ও মিনিয়েচারের বেলায় সাধারণ নিয়ম মেনে ছাঁটলেই চলবে এবং ষ্ট্যান্ডার্ডের বেলায় গাছ যাতে সবদিকে সমান ঝোপালো হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ছাঁটতে হবে। সব ছাঁটাই ধারালো সিকেটার দিয়ে করবেন। ছাঁটা হবে তেরছা ভাবে, নিচের চোখের ছয় মিলিমিটার উপর দিয়ে। বাৎসরিক ছাঁটা ছাড়াও মরা ডাল দেখলেই তা ছেঁটে দিতে হবে। এই দ্রব্যগুলি মিশিয়ে তার প্রলেপ ডালের কাটা মুখ-গুলিতে ভাল করে লাগিয়ে দেওয়া দরকার—চার ভাগ কপার কার্বনেট, চার ভাগ রেড লেড, পাঁচ ভাগ লিনসীড অয়েল এবং অত্যন্ত অল্প করে ডি. ডি. টি ও বি. এইচ. সি। কাটা জায়গা থেকে যাতে রোগ সংক্রমণ না হয় সেজন্য এই প্রলেপ লাগানো বিশেষ দরকার।

**জল দেওয়া ॥**

জমির গাছে যখনই জল দেবেন গাছের গোড়া বেশ ভাল করে ভিজিয়ে জল দেবেন। জল এরকম পরিমাণে দেবেন যাতে গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একবার ও শীতকালে দিন দশেকে একবার দিলেই চলে যায়। চারাগাছ লাগাবার পরেই ভাসিয়ে জল দিতে হবে। গুঁড়ো সার দেবার দিন ধরে পর পর তিনদিন জল দিতে হবে টবের গাছে। এছাড়া টবের গাছে জল দেবার দরকার পড়লেই জল দিতে হবে, জলের পরিমাণ হবে এরকম যাতে টবের মাটি পুরো ভিজে যায় কিন্তু টবের ফুটো থেকে জল বেশি বেরিয়ে যেতে না পারে। তরলসার দেবার বেলায় যেরকম জল দিতে হয় তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

**গোলাপের রোগাদি ও প্রতিকার ॥**

গোলাপে কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও রোগের পরিমাণ খুব কম নয়, তবে সময় মত চেষ্টা করলে এদের হাত থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। পোকামাকড়ের আক্রমণে ফলিডল বা এই ধরনের কোন ওষুধ এবং পাউডারি মিলডিউতে মোরেষ্টান ইত্যাদি বেশ ভাল কাজ করে। গোলাপের বিভিন্ন রোগের ভেতরে ডাইব্যাক ও ব্ল্যাক স্পট বিশেষ ক্ষতি করে। ডাইব্যাক রোগে গাছের ডাল মাথা থেকে শুকুতে আরম্ভ করে এবং এর ফলে গাছ অনেক সময়ে মারা পড়ে। এরকম হতে আরম্ভ করলে ডালের সতেজ জায়গা থেকে ছেঁটে দিয়ে সেখানে গাছ ছাঁটার পরের প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। এই প্রলেপ ডাইব্যাক রোগ অনেকটা আটকাবে। ব্ল্যাক স্পট রোগ সারানোও বেশ কঠিন। এতে গাছের পাতায় কালো কালো ফোটা হয় এবং এর ফলে আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে। দিন পনেরো অন্তর ক্যাপটান স্প্রে করে এর বেলায় অনেকটা উপকার পাওয়া যাবে। এই দুটি রোগের বেলায় গাছে বাড়তি কিছু পটাশ দেওয়া ভাল। ডাইব্যাক রোগে ব্লাইটক্স গুঁড়ো দুচামচ ও রোগর দুই সি. সি. একযোগে পাঁচ লিটার জল গুলে ব্যবহার করতে পারেন। গাছের গোড়ার জমিতে অল্প করে ফিউরাডন মাস তিনেক অন্তর দিলে তা গাছকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

**রাসায়নিক সার প্রয়োগ পদ্ধতি ॥**

গোলাপে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে চাইলে এই ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে দুচারটি গাছে প্রয়োগ করে সন্তোষজনক ফল পাবার পরে অন্য গাছে এটা দেবেন। নবেম্বরে গাছ ছাঁটার পরে গাছের গোড়াতে যে সারমাটি দিচ্ছেন তাতে নিচের এই মিশ্র সারটিও মেশাবেন। গাছ অনুযায়ী এই মিশ্র সার মেশাবেন দুই থেকে চার চামচ। পটাশিয়াম নাইট্রেট দুভাগ, সালফেট অব পটাশ দুভাগ ; এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, আয়রণ-কেলেটস ও বোরো-সিলিকেট এই তিনটির প্রতিটি এক-চতুর্থ ভাগে মিশিয়ে এই গুঁড়ো মিশ্র সার তৈরী হবে। গোলাপের জন্য তরলসার তৈরী হবে এই ভাগে : দুই চামচ করে সালফেট অব এমোনিয়া ও সালফেট অব পটাশ এবং পাঁচ চামচ সুপারফসফেট দশ লিটার জলে গুলে নিয়ে। ব্যবসার ভিত্তিতে গোলাপ চাষের বেলায় পর্যাপ্ত জৈবসার যোগাড় করা কঠিন হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের উপরে বাধ্য হয়েই নির্ভর করতে হবে।

# চন্দ্রমল্লিকা

চন্দ্রমল্লিকা বা ক্রিসেন্থিমাম-এর আদি বাসস্থান সম্ভবত চীনদেশ। কিন্তু এর শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রধানত জাপানের কাছে সমস্ত জগৎ ঋণী। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে কোরিয়া ঘুরে চন্দ্রমল্লিকা জাপান এসে পৌঁছয়। চন্দ্রমল্লিকা এখানে রাজন্যবর্গ ও অন্যান্যদের এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এটি জাপানের জাতীয় পুষ্পের সম্মান লাভ করে। জাপান থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, এবং গ্রেট ব্রিটেন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতে চন্দ্রমল্লিকার শুভাগমন। জাপানে জাতীয় পুষ্প হিসাবে গণ্য হওয়ার সময় থেকে সংকর প্রজাতি তৈরীর মাধ্যমে চন্দ্রমল্লিকার বিবর্তন শুরু হয়। এর আরও উন্নত সংকর প্রজাতি সৃষ্টির সাধনা চলছে এবং এ সাধনার হোতা জাপান, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সবুজ চন্দ্রমল্লিকার উল্লেখ একমাত্র গল্পতেই পাওয়া যেত। কারণ এ ধরনের চন্দ্রমল্লিকা সৃষ্টি সত্যিই সম্ভব বলে কেউ মনে করেনি। কিছুদিন আগে সবুজ চন্দ্রমল্লিকা 'গ্রীন গডেস'-এর উৎপত্তি ঘটায় এখন আর কেউ এ ধরনের রঙের ফুল কল্পনা-বিলাস বলে মনে করেন না। সুগন্ধি চন্দ্রমল্লিকা সৃষ্টি করার খুব সাধারণ কিছু চেষ্টা হয়েছে এবং এর ফলে মৃদু সুগন্ধ রয়েছে এরকম কিছু চন্দ্রমল্লিকা আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। জাপানে চন্দ্রমল্লিকা গাছকে ট্রেনিং-এর সাহায্যে একরকম যে কোন আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়, এবং এখানে একটি বিশেষ ধরনের চন্দ্রমল্লিকার ফুলের ব্যবহার কিনা খাদ্য হিসাবে!

ভারতে চন্দ্রমল্লিকার চাষ মোটামুটি পুরানো হলেও এর প্রসার খুব একটা কিছু হয়নি। এখানে চন্দ্রমল্লিকার ভাল ফুল ফোটানো খুব কিছু কঠিন নয়। কিন্তু এর চাষ করতে আরম্ভ করার আগে চন্দ্রমল্লিকার প্রকৃতি ও চাহিদা ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। এটা না করলে চন্দ্রমল্লিকা চাষে কৃতকার্যতা লাভ করা একরকম অসম্ভব। ভাল ফুলের চাষ এদেশে এখনও রহস্য বিদ্যার স্তরে রয়ে গেছে এবং মূলত এই কারণেই এর চাষের যথেষ্ট বিস্তার ঘটেনি। বাংলা ও বিহারের প্রান্তসীমার কিছু জায়গায় একসময়ে চন্দ্রমল্লিকার বেশ ভাল চাষ ছিল কিন্তু সাজাবার ফুলের চাহিদা কমে যাওয়াতে এ চাষও একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। চন্দ্রমল্লিকার উপরে এখানে কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। বাঙ্গালোরে সারাবছর চন্দ্রমল্লিকা ফোটাবার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এটা কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে। ভারতের কোন একটি

শৈলাবাসে চন্দ্রমল্লিকার পরাগ সংগমে সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করা হচ্ছে এরকম দাবি করা হয়। কিন্তু যতদূর জানি এখানে বাইরের দেশ থেকে বীজ এনে চারা করা হয়ে থাকে। সমতল বাংলাতেও চন্দ্রমল্লিকার কিছু ছোট ফুলের প্রজাতির গাছে সহজেই বীজ পাওয়া যায়, এবং চেষ্টা করলে হয়তো এখানেও এদের উন্নত সংকর প্রজাতি তৈরী করা যেতে পারে। খুব ইদানীং দুয়েকটি বড় ফুলের চন্দ্রমল্লিকার সংকর প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে— এটা প্রমাণ করছে যে ভাল ফুলের চন্দ্রমল্লিকার নতুন প্রজাতি আমরাও চেষ্টা করলে করতে পারি।

চন্দ্রমল্লিকার চাষ সম্পর্কে দুটি জিনিস মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত, গাছের গোড়ায় জল বেশি হলে গাছ মরে যাবে, তাই বর্ষাকালে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে গাছ বাঁচানো কঠিন। এ সময়ে বারান্দায় বা বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না কিন্তু খোলামেলা জায়গায় টবের গাছ রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, সারের পরিমাণ বেশি হলে গাছের মাথা মোটা হয়ে তাতে আর ভাল ফুল ধরবে না, ফলে সব খাটুনি বৃথায় যাবে। এটা যাতে না হয় সেজন্য গাছে পরিমিত সার বারে বারে দিতে হবে। চন্দ্রমল্লিকার চাষ বড্ড খাটুনির বলে মনে হলেও খাটুনির পরিমাণ ভয় পাবার মত কিছু নয়। তাছাড়া চন্দ্রমল্লিকার ফুল ফুটলে সব খাটুনিই সার্থক বলে মনে হবে।

চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়ি হতে ফুল ফুটতে সময় লাগে মাস দুয়েক। তবে একথা শুধু খুব সাধারণ ভাবে বলা চলে কারণ প্রজাতি অনুযায়ী এ সময় কমবেশি হয়। পাশ্চাত্যে ক্রিসমাসের সঙ্গে মিলিয়ে চন্দ্রমল্লিকা ফোটাবার প্রচলন রয়েছে খুবই। আমাদের এখানেও এটা করার চেষ্টা হয়ে থাকে। কোন প্রজাতির গাছ কোন সময়ে লাগিয়ে আমাদের দেশের জলবায়ুতে ঠিক কোন সময়ে ফুল পাওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার মত কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। এটি করতে চাইলে কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা চালাতে হবে। এবং যেহেতু প্রতিটি প্রজাতির প্রকৃতি কিছু না কিছু আলাদা তাই যে প্রজাতিগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে শুধুমাত্র সেইগুলি সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারব। একাজটি করা সম্ভব হলে মরসুমের যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রমল্লিকা ফোটানো সহজ হয়ে উঠবে। তবে এ কাজ অনেকে মিলে করা দরকার, কোন একজনের পক্ষে একাজ নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুকঠিন।

**চন্দ্রমল্লিকার শ্রেণীবিভাগ ॥**

ফুল ফোটার বৈশিষ্ট্য, ফুলের আকৃতি, ফুল ফোটার সময়, গাছের প্রকৃতি ইত্যাদির বিচারে চন্দ্রমল্লিকার সব প্রজাতিকে কিছু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শ্রেণীভুক্ত করার প্রধান উদ্দেশ্য প্রদর্শনীতে এদের প্রদর্শন সহজ করা, যাতে একই ধরনের ফুলগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতার নিয়ম আলাদা তাই শ্রেণীবিন্যাসের কিছুটা হেরফের সব দেশেই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ চন্দ্রমল্লিকা আসে গ্রেট ব্রিটেন থেকে। এবং আমাদের নিজস্ব কোন শ্রেণীবিন্যাস নেই বলে আমরা গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল ক্রিসেন্থিমাম সোসাইটির শ্রেণী-বিভাগ মোটামুটি অনুসরণ করে থাকি। লার্জ এগজিবিশানে ( এর অন্য নাম জাপানীজ ), এগজিবিশান ইনকার্ভড, লার্জ এগজিবিশান ইনকার্ভিং, রিফ্লেক্সড, ডেকরেটিভ, ইনকার্ভিং ডেকরেটিভ, পম্পন, কোরিয়ান, এনিমোন, সিঙ্গল, চার্ম, স্পাইডারি ইত্যাদি চন্দ্রমল্লিকার প্রধান শ্রেণী। এর অনেকগুলি প্রধান শ্রেণীকে আবার বিভিন্ন শাখাশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনে চন্দ্রমল্লিকার ফুল ফোটার সময় অনুযায়ী আর্লি ফ্লাওয়ারিং বা আউটডোর ও নবেম্বর ফ্লাওয়ারিং বা ইনডোর এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আমাদের এখানে যেসব চন্দ্রমল্লিকা পাওয়া যায় তা সবই একরকম ইনডোর ফ্লাওয়ারিং প্রজাতির। এখানে জমিতে চন্দ্রমল্লিকা খুব ভাল ফোটানো সম্ভব হলেও এটা এখনও চল হয়ে ওঠেনি। আর্লি-ফ্লাওয়ারিং চন্দ্রমল্লিকা পেলে জমিতে এদের চাষ বোধ হয় সহজ হয়ে উঠবে। উল্লিখিত বিভিন্ন প্রধান শ্রেণীর ভেতরে প্রথম চারটি শ্রেণীর চন্দ্রমল্লিকাই এখানে দেখা যায় এবং অন্যগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই অল্প যদিও ছোট ফুলের

কিছু প্রজাতি খুবই ইদানীং এদেশে এসেছে। লার্জ এগার্জিবিশান ফুলগুলির পাপড়ি ঝুলে পড়ে তবে ঝুলে-পড়া পাপড়ির আগাগুলি উপরের দিকে উঠে আসে, এবং এ শ্রেণীর ফুলের পাপড়ি যেন কোন নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো নেই। এই শ্রেণীর 'গ্রীন গডেস' আমাদের বিশেষ পরিচিত। এগার্জিবিশান ইনকার্ভড ফুল গোল যেন ঠিক ছোট বলের মত। 'স্নোবল' এই শ্রেণীর ফুল। লার্জ এগার্জিবিশান ইনকার্ভিং-এর ফুল অনেকটা গোল হলেও পুরো গোল নয় ও এদের বাঁধুনিও বলের মত সুসংবদ্ধ নয়, যথা 'আলফ্রেড সিম্পসন'। এবং রিফ্লেক্সড্ ডেকরেটিভের পাপড়ি সুসংবদ্ধ ভাবে নিচের দিকে নেমে আসে। 'করোনেশান পিঙ্ক' এই শ্রেণীর ফুল।

**চন্দ্রমল্লিকা লাগাবার ও টব পাল্টাবার সময় ॥**

সমতল বাংলায় চন্দ্রমল্লিকার ভাল ফুল ফোটে নবেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং চন্দ্রমল্লিকা সাধারণত লাগানো হয়ে থাকে জুলাইয়ের শেষ দিক থেকে। এ সময়ে তিন ইঞ্চি বা সাত সেণ্টিমিটার টবে তৈরী কাঁচগাছ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নিজেদের করা কাটিং-এ ভাল শেকড় এলে তাও প্রথমে তিন ইঞ্চি টবে লাগাতে হবে। তিনইঞ্চি টবে গাছ দিন পনেরো কুড়ি থাকার পরে গাছ পালটে পাঁচইঞ্চি টবে লাগানো দরকার। এ কাজ অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের ভেতরে করতে পারলে ভাল। পাঁচইঞ্চি টবে গাছ প্রায় মাসখানেক থাকার পরে তা আবার পালটে কুড়ি সেণ্টিমিটার বা আটইঞ্চি টবে অথবা ইচ্ছা করলে আরও বড় টবে লাগানো দরকার। আটইঞ্চি টবে পালটাবার কাজ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের ভেতরে করা যেতে পারে। কাটিং করার সময় ও প্রজাতির প্রকৃতির উপরে প্রধানত গাছের ফুল ফোটার সময় নির্ভর করে, তাই উল্লিখিত সময়ের কিছু আগে বা পরে গাছ লাগানো ও টব পালটানো সম্ভব হলেও ডিসেম্বরে ভাল ফুল পাবার জন্য এই সময়ে এই কাজগুলি করা একরকম নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বৃষ্টি পুরোদমে চলতে থাকলে আটইঞ্চি টবেতে গাছ কিছুদিন দেরি করে লাগানো উচিত। গাছ পাঁচইঞ্চি টব থেকে আটইঞ্চি টবেতে এমনভাবে পালটাতে হবে যাতে উপরের পাঁচ সেণ্টিমিটার পরিমাণ জায়গা খালি থাকে।

চন্দ্রমল্লিকার গাছ এক টব থেকে আর এক টবে পালটে লাগাবার ঘণ্টা চারেক আগে গাছের গোড়ায় মাঝারি পরিমাণে জল দিয়ে নিতে হবে যাতে টব থেকে খুলবার সময়ে মাটি যেন ঝরে না পড়ে। গুটি তিনচার করে ফুটো রয়েছে এরকম পাঁচইঞ্চি টব ও আটইঞ্চি টব চন্দ্রমল্লিকার জন্য ব্যবহার করা ভাল। তিনইঞ্চি টবে দুয়েকটি চারা, পাঁচইঞ্চি টবে দুতিন ইঞ্চি পরিমাণে চারা এবং আটইঞ্চি টবে দুতিন ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা জুড়ে চারা দেবার দরকার। পাঁচইঞ্চি টবের চারা ঝামা ইটের টুকরো হলে ভাল। এ চারা আটইঞ্চি টবের বেলায়ও ব্যবহার করা চলবে। পাঁচইঞ্চি টবে এমন সময়ে গাছ থাকছে যখন প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে, তাই এ সময়ের টবের চারা এরকম হওয়া দরকার যা টবের মাটি থেকে বাড়তি জল তাড়াতাড়ি বের করে দিতে সাহায্য করবে। গাছসহ টবকে উল্টো করে কোন কিছু শক্ত জিনিসে টবের কানা সাবধানে ঠুকলে মাটিশুদ্ধ গাছ টব থেকে বেরিয়ে আসবে। পুরানো টবের চারা মাটি থেকে সরিয়ে দিয়ে মাটিশুদ্ধ গাছ নতুন বড় টবে বসিয়ে দেবেন। পাঁচইঞ্চি ও আটইঞ্চি টবের চারার উপরে ইঞ্চিখানেক পুরু করে এ ধরনের সারমাটি বিছিয়ে দেবেন যা সহজে জল শুষে নেবে। এ সারমাটি দুভাগ বড় দানার পোড়ামাটি, দুভাগ বড় দানার গোবরসার ও বড় দানার একভাগ পাতাপচাসার মিশিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। গোবরসার ও পাতাপচাসার সাধারণ চালুনিতে চেলে নেবার সময়ে যে বড় দানাগুলি চালুনি থেকে বেরোয় না সেগুলি এই সারমাটি তৈরী করতে ব্যবহার করবেন। টব বারবার না পালটে একবারে তিনইঞ্চি থেকে আটইঞ্চি টবেও গাছ লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে তবে মাঝের পাঁচইঞ্চি টবে পালটে লাগাবার কতগুলি সুবিধার দিক রয়েছে। গাছ এতে লম্বায় ছোট হবে এবং কয়েক বারে বাড়তি সারমাটি পাচ্ছে বলে গাছের মাথা মোটা হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এছাড়া বর্ষার দিনে পাঁচইঞ্চি টবের গাছগুলি বর্ষার আওতা থেকে সরিয়ে বারান্দা বা এরকম কোন জায়গায় সহজে রাখা যেতে পারে

যা আটইঞ্চি টবের বেলায় গাছ অনেক জায়গা নেয় বলে করা কঠিন।

**কাটিং করা ॥**

চন্দ্রমল্লিকার কাটিং করা আরম্ভ হবে জ্বলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে অথবা আরও আগে। গত মরস্বমের তেড় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা গাছের স্বাস্থ্যবান নতুন ডাল থেকে আটদশ সেণ্টিমিটারের কাটিং কাটতে হবে। কাটিং আঙ্গবুলের চাপে ম্বলডাল থেকে ভেঙে নেবেন অথবা কাটবেন কোন পাতার এক সেণ্টিমিটার নিচ থেকে। মাটির ভেতর থেকে নতুন উঠেছে এরকম কচি ডাল পেলে সেগ্বলি কাটিং-এর পক্ষে সবচেয়ে ভাল। কাটিং-এর নিচের দিকের তিনচারটি পাতা হাত দিয়ে ঝরিয়ে দিয়ে এতে সেরাডিক্স বি-ওয়ান লাগিয়ে তা লালবালি বা এর কোন বিকল্প উপাদানে বসিয়ে দিন। কাটিং-এর দ্বই সেণ্টিমিটার পরিমাণ অংশ এই উপাদানের ভেতরে থাকবে, এবং কাটিং বসিয়ে তার গোড়ার বালি শক্ত করে চেপে দিতে হবে। লালবালি বা সাদাবালি অথবা বিকল্প হিসাবে তিনভাগ লালবালি ও একভাগ পাতাপচাসার মিশিয়ে অথবা অন্য কিছ্ব কাটিং বসাবার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। তবে যে উপাদানই ব্যবহার কর্বন না কেন সেটিকে ব্যবহারের আগে শোধন করে নেওয়া দরকার। উপাদানটিকে আগ্বনে মোটাম্বটি ভেজে নিলে কাজ চালাবার মত শোধন করে নেওয়া হবে। তবে এ ভাজা এমন হবে না যাতে উপাদানটি প্বড়ে যায়। কাটিং বসিয়ে বেশ ভাল করে জল দেবেন এবং এর পর থেকে এমনভাবে জল দেবেন যাতে বালি সবসময়েই ভেজা ভেজা থাকে। কাটিং করা হবে এমন জায়গায় যেখানে আলোবাতাস যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু সরাসরি রোদ পড়ে না। এদের শেকড় আসতে আরম্ভ করলে ভোরের রোদ অল্প করে লাগানো ভাল। ঝির ঝির বৃষ্টি বা বৃষ্টির ছাট লাগলে কোন অবস্থার কাটিং-এরই ক্ষতির আশঙ্কা নেই, যদিও বেশি বৃষ্টি এদের নিশ্চয়ই ক্ষতি করবে। কাটিং লাগাবার দ্বতিনদিন অন্তর কাটিং-এ দেবার জলের সঙ্গে পরিমাণমত ফাইটোলান বা ব্লাইটক্স মিশিয়ে দেবেন। প্রয়োজন বোধ করলে কাটিং-এও পোকামাকড়ের বা অন্যান্য ওষ্বধ স্প্রে করতে হবে।

**সারমাটি ও বাড়তি সার ॥**

কাটিং-এ শেকড় এলে তা সাবধানে তুলে তিনইঞ্চি টবে লাগাতে হবে। তিনইঞ্চি টবের সারমাটি দ্বভাগ পাতাপচাসার, দ্বভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ গোবরসার এবং এর সঙ্গে কিছ্বটা লালবালি মিশিয়ে তৈরী করবেন। পাঁচইঞ্চি ও আটইঞ্চি টবের সারমাটি তৈরী করবেন এই ভাগে—তিন ভাগ সাধারণ মাটি, তিন ভাগ পাতাপচাসার ও গোবরসার চারভাগ; এই তিনটি উপাদান মিশিয়ে তার ন'ইঞ্চি টবের প্বরো একটব মাটিতে আরও মেশাতে হবে ছ'চামচ স্বপারফসফেট, তিনচামচ সালফেট অব পটাশ, বড় একম্বঠো স্টীমড হাড়ের গ্বঁড়ো এবং এই সবগ্বলি মেশাবার দিন দশেক পরে ন'ইঞ্চি টবের প্বরো একটব উপরের সারমাটিতে আরও মেশাবেন দ্বই থেকে তিনচামচ কলিচ্বন ও একম্বঠো রেড়ির খোল। চন্দ্রমল্লিকার সব পর্যায়ের সারমাটির যে সব উপাদানগ্বলি গ্বঁড়ো করা চলে তা গ্বঁড়ো করে আট সেণ্টিমিটার ফ্বটোর চাল্বনিতে চেলে নিতে হবে। সারমাটি তৈরী করবেন ব্যবহার করার মাসখানেক আগে এবং তৈরী করার পরে সারমাটি ভাল করে মিশিয়ে নিতে মাঝে মাঝে উলটে পালটে দেবেন। চন্দ্রমল্লিকার সারমাটির পি-এইচ ভ্যাল্ব সাড়ে ছয় থেকে সাত হলে ভাল।

চন্দ্রমল্লিকার শেকড় খাবারের খোঁজে উপরের দিকে ভেসে ওঠে তাই এ গাছের বেলায় মাঝে মাঝে বাড়তি সার দেওয়া দরকার। পাঁচইঞ্চি বা তেরো সেণ্টিমিটার টবে গাছ পালটে দেবার দিন দশেক পরে এবং এর পরে আবার দিন সাতেক অন্তর এই মিশ্রসারের চায়ের চামচের একচামচ প্রতি গাছে দেবেন—স্টেরামীল পাঁচভাগ, স্বপারফসফেট তিনভাগ ও সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে এই মিশ্রসার তৈরী করতে হবে। পাঁচইঞ্চি টবে পালটাবার দিন কুড়ি পরে চন্দ্রমল্লিকার স্টপিং করতে হবে, এটা এর নির্দিষ্ট পদ্ধতি অন্বযায়ী করবেন। পাঁচইঞ্চি টবে গাছ মাসখানেক থাকার পরে কুড়ি সেণ্টিমিটার বা

আটইঞ্চি টবে গাছ পালটে দেওয়ার রীতি, কিন্তু বৃষ্টির কারণে পালটাতে না পারলে পাঁচইঞ্চি টবের গাছে কুঁড়ি এসে যাবার সম্ভাবনা। এরকম হলেও বিশেষ কিছু ভাববার নেই, তবে আটইঞ্চি টবে গাছ না পালটানো পর্যন্ত কুঁড়ি আসার পরে বিশেষ সারমাটি দেবেন না। পাঁচইঞ্চি টবে দিন সাতেক অন্তর যেরকম একচামচ করে মিশ্রসার দেওয়া হচ্ছিল, এ সময়েও তাই চলবে। স্বাভাবিক সময়ে আটইঞ্চি টবে পালটাবার পরে গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা দিলে উপরের পাঁচ সেণ্টিমিটার খালি জায়গায় তিন সেণ্টিমিটার পুরু করে বিশেষ সারমাটি বিছিয়ে দেবেন। এই বিশেষ সারমাটি তৈরী করবেন আটইঞ্চি টবের জন্য তৈরী সারমাটি ছ'ভাগ, স্টেরামীল তিনভাগ, এবং আধভাগ করে সুপারফসফেট ও সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে। আটইঞ্চি টবে পালটানো থেকে কুঁড়ি না আসা পর্যন্ত কোন সার দেবার দরকার নেই। পাঁচইঞ্চি টবে কুঁড়ি আসা গাছগুলিকে আটইঞ্চি টবে পালটে লাগাবার দিন সাতেক পরে এই বিশেষ সার দেওয়া হবে। বিশেষ সার দেবার দিন দশেক পরে একবার এবং আবার দিন পনেরো কুড়ি পরে চায়ের চামচের আধচামচ করে সালফেট অব পটাশ ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট টবের কানার কাছের মাটি খুঁচে তাতে ছড়িয়ে দেবেন। ফুল আরও ভাল করতে বিশেষ সারমাটি দেবার দিন দশেক পর থেকে সপ্তাহে একবার বা দুবার কাঁচা গোবরের তরল সার দিতে হবে। চন্দ্রমল্লিকার ফুল খুলতে আরম্ভ করলে গাছে আর কোনরকম সার দেওয়া চলবে না।

চন্দ্রমল্লিকাতে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চলে। তবে রাসায়নিক সারের পরিমাণ ঠিক কি হবে তা জলবায়ু ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরে নির্ভরশীল। একই সঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার যে রাসায়নিক সারের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলে তা গাছের ক্ষতি করবে। চন্দ্রমল্লিকাতে একভাগ ইউরিয়া, দুভাগ সালফেট অব পটাশ এবং তিনভাগ সুপারফসফেট মিশিয়ে এই মিশ্রসারের চায়ের চামচের দু'চামচ পরিমাণ পাঁচ লিটার জলে গুলে তা ব্যবহার করে অনেকে ভাল ফল পেয়েছেন। এছাড়া 'গোলাপ' অধ্যায়ে বর্ণিত প্রথম পাতার সারটি গাছে কুঁড়ি দেখা দেবার পরে সপ্তাহে একবার এবং দ্বিতীয় পাতার সারটি সবশুদ্ধ দুবার দিয়ে দেখতে পারেন।

তিনইঞ্চি টবের গাছ বা শেকড়যুক্ত কাটিং একসঙ্গে আট ইঞ্চি টবে লাগালে এ গাছে কুঁড়ি দেখা না দেওয়া পর্যন্ত বাড়তি কোন সার দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ এ সময়ে সারের পরিমাণ বেশি হলে গাছের মাথা মোটা হবার আশঙ্কা রয়েছে। কুঁড়ি দেখা দেবার পর বিশেষ সারমাটি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সার দেওয়া হবে একই ভাবে। টব পালটাবার পর গাছ ভাল করে না ধরে যাওয়া পর্যন্ত কোন সার দেওয়া চলবে না। এবং চন্দ্রমল্লিকার সারমাটি প্রত্যেক বছর নতুন করে তৈরী করে নিতে হবে, এর বেলায় পুরানো সারমাটি কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়।

**স্টপিং ও ডিজ্‌বাডিং ॥**

গাছের মাথা একটি বিশেষ সময়ে ভেঙে দেবার পদ্ধতিকে স্টপিং বলে। স্টপিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য গাছের সবচেয়ে ভাল ফুল পাওয়া। কোন অবস্থায়, কোন সময়ে এবং কতবার স্টপিং করলে কোন প্রজাতির গাছের সবচেয়ে ভাল ফুল পাওয়া যাবে তা বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক করা হয়। কিন্তু আমাদের জলবায়ুতে এটা কখন বা কতবার করলে ভাল সে সম্পর্কে কোন পরীক্ষা হয়নি। এখানে গাছ পাঁচইঞ্চি টবে থাকা অবস্থায় অগাস্টের শেষে বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে একবার স্টপিং করা চল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছের উচ্চতা যখন ছ'ইঞ্চি থেকে আটইঞ্চি তখন স্টপিং করা হয়ে থাকে. এর ভেতরে গাছে কুঁড়ি এলে তাতেও একই ভাবে স্টপিং করতে হবে। গাছের মাথার শেষ বড় পাতাজোড়ার উপরের দুই সেণ্টিমিটার অংশটি নখ দিয়ে খুঁটে ফেলে দেবেন। এ কাজ এমন ভাবে করতে হবে যাতে এই পাতাজোড়ার গোড়া থেকেও নতুন ডাল ছাড়তে পারে। মাথা ভেঙে দেবার পরে গাছে অনেক নতুন ডাল বেরুবে, এদের থেকে একটি, তিনটি অথবা যে কয়টি ইচ্ছা রেখে বাকিগুলি কচি অবস্থায় ভেঙে ফেলা উচিত। তবে টবের গাছে সাধারণত উপরের একটি ডালই রাখা হয়। স্টপিং করার দুচারদিন পরে

টব পালটে লাগাবার পক্ষে কোন বাধা নেই।

চন্দ্রমল্লিকার প্রত্যেক ডালে একসঙ্গে প্রচুর কুঁড়ি আসে। এর সবগুলিকে ফুল হতে দিলে গাছ ফুলে ভর্তি হয়ে যাবে কিন্তু কোন ফুলই বিশেষ বড় হবে না। ফুল বড় করতে তাই প্রত্যেক ডালের মধ্যমণি বড় কুঁড়িটি রেখে অন্য কুঁড়িগুলি কচি অবস্থায় ডিজ্‌বাডিং বা ভেঙে দিতে হবে। এই বাড়তি কুঁড়িগুলি অল্প অল্প সংখ্যায় কয়েক দিন ধরে ভাঙতে হবে, সব একদিনে ভাঙলে ফুলের আকৃতি খারাপ হবার আশঙ্কা রয়েছে। কোরিয়ান, পম্পন ও স্প্রে চন্দ্রমল্লিকার ডিজ্‌বাডিং করা হয় না।

**খুব ছোট টবের চন্দ্রমল্লিকা ॥**

একটি বইতে খুব ছোট টবে করা মোটামুটি উঁচুদরের চন্দ্রমল্লিকার ছবি দেখে এ কাজ এখানেও করার খুব ইচ্ছা জাগে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এগুলি কি ভাবে করে তার কোন বিবরণ খুঁজে পাইনি। পরে নিজস্ব পদ্ধতিতে এ নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি এবং মোটামুটি কৃতকার্যও হয়েছি। প্রধানত এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছোট টবের চন্দ্রমল্লিকার কথা লিখছি।

ফুলদানি সাজাবার ও অন্যান্য গৃহসজ্জার কাজে চন্দ্রমল্লিকার বহুল ব্যবহার। কাটা অবস্থাতেই ফুলদানিতে এ ফুল বেশ কয়েকদিন ধরে সুপ্রভ থাকে। ছোট টবে ফোটা ফুল টবের বা জমির চন্দ্রমল্লিকার মত সুপ্রভ থাকবে সপ্তাহ দুয়েক বা আরও বেশি দিন ধরে। এই ছোট টবে ফোটা চন্দ্রমল্লিকাটি টবসহ টেবিলের বিভিন্ন জায়গায় বা ঘরেরও বিভিন্ন জায়গায় রাখা যেতে পারে। এই সব গাছে মাত্র একটি করে ফুল ফোটানো হবে এবং এদের কয়েকটিকে একত্রে রাখার চেয়ে এক একটি করে ফুলসহ গাছ আলাদা আলাদা জায়গায় রাখলে ভাল দেখাবে। ঘরের ভেতরে সাজাবার বেলায় টবটিকে এমন একটি টব বা অন্য কোন পাত্রের ভেতরে রাখা দরকার যাতে ফুলের টবটি এর ভেতরে মাপে মাপে বসে যায়। এই বাইরের দিকের টবটিতে কোন ফুটো থাকবে না এবং এটি সুচিত্রিত হলে ফুলের সৌন্দর্য আরও খুলবে। কিন্তু বাইরের এই টবের রঙটি চড়া হলে ফুলটি নিষ্প্রভ দেখাবার সম্ভাবনা। এই টব মাটির, চীনামাটির বা অন্য কোন কিছুর হতে পারে। সাজাবার বেলায় ফুলের টবটির মাটির উপরে আলতোভাবে বিছিয়ে দেওয়া হবে সবুজ রঙের মস্‌, এতে মাটি সুন্দর ভাবে ঢাকা পড়বে এবং একই সঙ্গে ঢাকা পড়বে ভেতরের ফুলের টবটিও। পড়ার ভয় থাকছে না।
বাইরের টবে ফুটো না থাকায় কোথাও মাটি চুইয়ে জলের দাগ পড়ার ভয় থাকছে না। ফুলের জন্য

চন্দ্রমল্লিকার গাছ ষ্টপিং করার পরে গাছে অনেক নতুন ডাল ছাড়বে। ফুলের জন্য
নির্দিষ্ট কয়েকটি ডাল রাখা ছাড়াও আরও একটি দুটি ডালকে সাতআট সেণ্টিমিটার
লম্বা হয়ে বাড়তে দেবেন। এবং এই বাড়তি ডালগুলি দিয়ে নতুন করে কাটিং করে খুব
ছোট টবে লাগাবার গাছ তৈরী করা হবে। যে গাছগুলি লম্বায় ছোট ও সহজেই ফুল
দেয় সেগুলিকে ছোট টবে করার কাজে বেছে নেওয়া ভাল। কাটিং-এ শেকড় এলে তা
দু'ইঞ্চি টবে বা খুব ছোট টবে লাগিয়ে একটু শক করে নিয়ে দিন পনেরো পরে যে টবে
ফুল চান সেই টবে লাগাবেন। চারইঞ্চি টব এ কাজের বেশ উপযুক্ত। এই চারইঞ্চি টবে
চারা দেওয়া হবে একটি বা দুটি, চারার উপরে ইঞ্চি দুতিন সারমাটি দিয়ে দু'ইঞ্চি টবের
গাছটি তার উপরে সাবধানে লাগাবেন। এর পর থেকে দিন দশেক অন্তর একই সারমাটি
আধইঞ্চি পুরু করে টবের সারমাটির উপরে দিয়ে যেতে হবে। গাছে কুঁড়ি এলে বিশেষ
সারমাটি এক ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া দরকার। চারইঞ্চি টবে লাগাবার দিন পনেরো
পর থেকে গোবরের তরলসার সপ্তাহে দুবার দেবেন। দু'ইঞ্চি টবের সারমাটি হবে সাধারণ
তিনইঞ্চি টবের মত এবং চারইঞ্চি টবের সারমাটি আটইঞ্চি টবের মত। গাছ চারইঞ্চি
বা পাঁচইঞ্চি টবে লাগাবার পর এমনভাবে বাড়তি সারমাটি দিয়ে যাবেন যাতে বিশেষ
সারমাটি দেবার পরে টবের মাটির উপরে আধইঞ্চিটাক জায়গা মাত্র খালি থাকে। বিশেষ
সারমাটি দেবার পরে শুধুমাত্র তরলসার দিয়ে যাওয়া হবে এবং ফুল খুলতে আরম্ভ
করলে তাও বন্ধ হয়ে যাবে। টবের মাটি কিছুটা শুকিয়ে এলেই জল দেবেন। এ গাছগুলি
রাখা হবে এমন জায়গায় যেখানে সকালের রোদ পুরো পায় কিন্তু দুপুর ও বিকালের

রোদ না লাগে, এবং গাছ যেন আলোবাতাস প্রচুর পায় কিন্তু কখনও বৃষ্টির কবলে না পড়ে। অন্যান্য পরিচর্যা সাধারণ চন্দ্রমল্লিকার মতই করবেন। শীতের হিম খাওয়াবার জন্য গাছগুলি রাতে বাইরে রাখা দরকার। সাজানোর কাজে লাগছে এরকম গাছগুলিকেও হিম ও সকালের রোদ খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ছোট টবের গাছে শুধু একটি করে ফুল হতে দেবেন।

বাইরের দেশে খুব ছোট টবের চন্দ্রমল্লিকার গাছ ছোট রাখতে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য নেওয়া হয়। ইদানীং কলকাতার দি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইনডিয়ার আনুকূল্যে এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে রাসায়নিক দ্রব্যটি বি-নাইন নামে বাজারে পাওয়া যায় সেটি চন্দ্রমল্লিকা গাছে প্রয়োগ করলে গাছ ছোট রাখার কাজে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। পাঁচ সি. সি. বি-নাইন ও পঁচানব্বই সি. সি. জল হারে মিশিয়ে এটি স্প্রে করতে হবে পাতার দুদিকেই। চারইঞ্চি টবে লাগাবার দিন সাতেক পরে এবং আবার দিন কুড়ি পরে এটি স্প্রে করা যেতে পারে। খুব ছোট টবে চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, তবে একথা সত্য যে এটি প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে আসছে।

**জমির চন্দ্রমল্লিকা ॥**

জমিতে চন্দ্রমল্লিকার চাষের রেওয়াজ খুব না থাকলেও জমিতে এ ফুল চমৎকার ফোটানো চলে। জমির ও টবের চন্দ্রমল্লিকার চাষের মূলত কোন প্রভেদ না থাকলেও জমিতে চাষের বেলায় কয়েকটি বিষয়ে একটু বেশি সাবধান হওয়া দরকার। চন্দ্রমল্লিকার জন্য এমন জমি বেছে নিতে হবে যা পাশাপাশি জমির চেয়ে হাতখানেক উঁচু ও গড়নে কূর্মপৃষ্ঠের মত। এরকম জমি না থাকলে তা ইট দিয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে গোলাপ লাগাবার জমির মত করে নেবেন। জমি কুপিয়ে পরিষ্কার করে গাছ লাগাবার নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে একমুঠো গভীর ও প্রায় একমুঠো ব্যাস গর্ত করে তা আটইঞ্চি টবের সারমাটি দিয়ে ভরে দেবেন। গাছ তিনইঞ্চি টবে নির্দিষ্ট সময় রেখে জমিতে বসাতে হবে। বসাবার সময়ে গাছের গোড়া উঁচু ও চেপে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে যাতে ঘন বর্ষায়ও গোড়ায় জল বসতে না পারে; বর্ষায় গোড়া আলগা হয়ে গেলে গোড়া আবার বেঁধে দেওয়া উচিত। বর্ষায় কিছু গাছ মারা যেতে পারে, এই খালি জায়গাগুলি টবে করা একই আয়তনের গাছ দিয়ে ভরে দেওয়া দরকার। বর্ষাকালে গাছের গোড়া না খুঁচে শুধু কাস্তে দিয়ে গোড়ার ঘাস কেটে দিতে হবে। এমন কি ঘন বর্ষা ধরে না গেলে জমির গাছে কোন বাড়তি সারও দেবেন না, কারণ সার দিতে গেলে গাছের গোড়া খুঁচে দেবার দরকার পড়বে। ঘন বর্ষা ধরে গেলে এদের সব পরিচর্যা টবের চন্দ্রমল্লিকার পরিচর্যার মত করবেন। জমির গাছেতে শুধু একটি ফুল না নিয়ে বেশি সংখ্যায় ফুল নেওয়া ভাল। চন্দ্রমল্লিকার যেসব প্রজাতি সহজে ডালপালা ছাড়ে ও অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু সেগুলি জমিতে লাগাবার কাজে বেশি উপযুক্ত। এছাড়া, পাঁচইঞ্চি টবে গাছ মোটামুটি বড় করে বৃষ্টির প্রকোপ কেটে গেলে পরে তাদের জমিতে লাগানো যেতে পারে। এ গাছগুলি তিনইঞ্চি থেকে সরাসরি জমিতে লাগানো গাছের মত ভাল না হলেও এর বেলায় জমি উঁচু করে নেবার দরকার পড়বে না। অল্প কিছুদিনের ভেতরে আমেরিকা থেকে অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু কিছু প্রজাতি এসেছে। এগুলি জমিতে চাষের পক্ষে বেশ ভাল।

**জল দেওয়া ॥**

চন্দ্রমল্লিকায় জল বেশি হলে গাছ মারা পড়ার সম্ভাবনা, তাই গাছ যাতে পরিমিত জল পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এ বিষয়ে বেশি সাবধান হওয়া দরকার বর্ষার দিনে। টবের মাটি ভেজা থাকলেও উপরের মাটি শুকিয়ে যাওয়াতে এটা মনে হতে পারে যে গাছে তক্ষুনি জল দেওয়া দরকার। অথচ এ অবস্থায় জল দেওয়া হলে গাছের নিশ্চিত ক্ষতি হবে। জল দেবার প্রয়োজন রয়েছে কিনা বুঝতে লাঠির মাথা কাঠের হাতুড়ি গোছের তৈরী করে তা দিয়ে টবের গায়ে ঠোকা যেতে পারে। ঠোকার সময়ে টং টং করে শব্দ হলে

জল দেবার দরকার রয়েছে এবং ঢ্যাপ ঢ্যাপ শব্দ হলে মাটিতে জল আছে বুঝতে হবে। জমির গাছে বর্ষার দিনে জল দেবার বিশেষ দরকার পড়বে না। বর্ষা থেমে গেলে জমির গাছে এভাবে ভাসিয়ে জল দিতে হবে যাতে এতে আবার জল দেবার দরকার পড়ে দিন সাতেক পরে। ফুল ফোটার সময়ে গাছের গোড়ার মাটি সব সময়ে ভেজা ভেজা রাখতে হবে। যে কোন গুঁড়ো সার ও বিশেষ সারমাটি টবের গাছে দেবার পরে সার দেবার দিন ধরে পর পর তিনদিন জল দেওয়া দরকার। খুব ছোট টবের চন্দ্রমল্লিকা গাছে শুধু টবের সারমাটি পুরোপুরি ভেজে এরকম পরিমাণে জল দেবেন।

**সামনের মরসুমের জন্য গাছ বাঁচিয়ে রাখা ॥**

চন্দ্রমল্লিকার গাছ সামনের বছরের জন্য বাঁচিয়ে রাখা কিছু কঠিন নয়। গাছে ফুল ফোটার পরে বা আগেও মাটির নিচ থেকে সাকার অর্থাৎ তেড় ছাড়ে। এগুলিকে শেকড়সহ আলাদা করে নিয়ে সরাসরি লাগানো চলে, অথবা প্রয়োজন পড়লে কাটিং হিসাবে ব্যবহার করে শেকড় গাজিয়ে নেওয়া যায়। যেসব ছোট ডাল ভেঙে ফেলার দরকার পড়ে সেগুলিও কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এই সব ছোট ডাল ভেঙে ফেলতে হয় ডিজবাডিং-এর অঙ্গ হিসাবে, এই সব ডালে অনেক সময়ে ছোট কুঁড়িও এসে যায় কিন্তু কুঁড়ি এসে গেলেও এগুলি কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। ফুল ফুটে গেছে এরকম গাছ সারা-বছর বাঁচিয়ে রাখলে তাও সামনের বছরের কাটিং করার কাজে ব্যবহার করা চলবে। সাকার বা কাটিং দিয়ে তৈরী নতুন গাছগুলি উঁচু জমিতে বা আটইঞ্চি টবে লাগাবেন। এদের জন্য ব্যবহার করা হবে আটইঞ্চি টবের জন্য নির্দিষ্ট সারমাটি। নিয়মিত জল, গাছের গোড়া নিয়মিত খুঁচে দেওয়া ও মাঝে মাঝে ওষুধ স্প্রে করা,—সামনের মরসুমের জন্য রাখা হবে এই রকম গাছের এই তিনটি পরিচর্যা পাওয়া একান্ত দরকার।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

গাছে ফুল ফোটার আগে তেড় এলে তা কেটে ফেলতে হবে। শীতের দিনেও মাঝে মাঝে জোর বৃষ্টি হতে পারে, এ সময়ে টবের গাছ বারান্দায় নিয়ে যাবার সুযোগ না থাকলে সেগুলিকে শুইয়ে দেবেন এবং বৃষ্টি হয়ে যাবার পরে তুলে দেবেন। টবের গাছ রাখবেন কয়লার ছাই বিছিয়ে তার উপরে, অথবা দুটি ইট একইঞ্চি ফাঁক করে পাশাপাশি বসিয়ে তাদের উপরে। টবের গাছ পালটে অন্য টবে লাগাবার পরে নতুন টবে লাগানো গাছগুলি দিন কয়েকের জন্য হালকা ছায়ায় রাখবেন। টবের ও জমির গাছের গোড়া মাঝে মাঝে খুঁচে দিতে হবে। ফুল ফোটার মুখে ফুলের বোঁটা অংশটিকে ভাল করে অবলম্বনের সঙ্গে বাঁধা দরকার যাতে ফুল ঝুলে না পড়ে। এই সময়ে নরম সুতো বা সুতলী দিয়ে তা অবলম্বন ও বোঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাঁধা উচিত। চন্দ্রমল্লিকার গাছ বসাবার পরে গাছের গোড়ার মাটি হাত দিয়ে চেপে বসিয়ে দেবেন। চন্দ্রমল্লিকা গাছের মাথা মোটা হলে সেই মাথায় আর ফুল হবে না। এ অবস্থায় গাছ ভালই বেড়ে চলে এবং গাছে পাতার সংখ্যাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়। চন্দ্রমল্লিকার কতগুলি প্রজাতির সহজেই মাথা মোটা হয়ে যায়। মাথা মোটা হলে এই মাথা ভেঙে দেবেন এবং এর পরে বেরুনো সব নতুন ডালে ফুল হতে দেবেন। চন্দ্রমল্লিকার ফুল খুলবার পরে তাতে আর কড়া রোদ না লাগানো ভাল।

চন্দ্রমল্লিকায় বিভিন্ন রোগ হতে পারে এবং এছাড়া বহু কীটপতঙ্গের উৎপাত রয়েছে। কীটপতঙ্গের হাত থেকে বাঁচাতে ডিডিটি পাউডার, ফলিডল, ম্যালাথিয়ন প্রভৃতির ব্যবহার, এবং ছত্রাক রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার ক্যাপটেন, বোর্দো মিক্সচার, লোনাকল ইত্যাদির। অনেকে দিন দশেক অন্তর ফলিডল বা ম্যালাথিয়ন নিয়মিত ব্যবহার করেন। ওষুধেও রোগ সারছে না দেখলে সে গাছ তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে যাতে এ রোগ অন্য গাছেও না ছড়িয়ে পড়ে। গাছে স্প্রে করার সময়ে স্প্রে-র ছিটে যেন ফুলে না লাগে, ছিটে লাগলে ফুলে দাগ ধরে যাবে।

**ছোট ফুলের চন্দ্রমল্লিকা ॥**

খুব ইদানীং ছোট ফুলের চন্দ্রমল্লিকার কিছু প্রজাতি এসেছে এবং এরা এসেই সবার মন জয় করে নিয়েছে। প্রচুর ছোট ছোট ফুলে গাছ ভর্তি হয়ে থাকে এবং এদের চাষ খুব সহজ। এদের ভেতরে পম্পন, চার্ম, এনিমোন প্রভৃতি শ্রেণীর ফুল রয়েছে, তবে এদের প্রজাতিগত নাম সবই হারিয়ে গেছে। জমিতেও এরা খুবই ভাল জন্মায়, পুরো লম্বা কেয়ারিতে শুধু এদের লাগালে তা খুব সুন্দর দেখাবে। এদের বীজও খুব সহজে জন্মায় এবং এর ভেঁতরেই ছোট চন্দ্রমল্লিকার কিছু ভাল প্রজাতির এদেশে সৃষ্টি হয়েছে। টবে এদের চাষের বেলায় একই টবে তিনটি করে ছোট ফুলের চন্দ্রমল্লিকার গাছ লাগাতে পারেন। টবের এই তিনটি গাছই এক প্রজাতির এবং একই সঙ্গে করা কাটিং হতে হবে। এই গাছগুলির ডালপালাকে এমন ভাবে বাড়তে দেবেন যাতে তা টব অনেকটা ঢেকে ফেলে। টবে তিনটি গাছ লাগানোর কারণে মাঝখানটা ফাঁকা হবার ভয় তত থাকছে না। এদের বার তিনেক ডালের মাথা ভেঙে দিয়ে ঝোপালো করতে হবে এবং অনেক ফুল যাতে এক সঙ্গে ফোটে সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। জমিতেও একই প্রজাতির অনেকগুলি গাছ পাশাপাশি লাগালে ভাল। পুষ্পসজ্জার পক্ষেও এ ফুলগুলি বেশ মানানসই।

# জবা

গাছটি না দেখলে বিশ্বাস করতে রাজী ছিলাম না যে জবা গাছ এত বড় হতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে শিলং-এর এক বড় রাস্তার পাশে একে নিতান্ত অনাদরের ভেতরে বিপুল গৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। গাছটি উচ্চতায় পনেরো হাতের মত লম্বা এবং এর গুঁড়ি ও প্রধান ডালগুলি বেশ মোটা মোটা। গাছটি রোজা সাইনেনসিস জাতের জবার একটি অতি সাধারণ প্রজাতি। প্রকৃতির খেয়ালে এটি এত বড় হয়েছে বলে মনে হলো। তা না হলে জবা গাছ সাধারণত হাত দশেকের ভেতরেই হয়ে থাকে এবং সুখী জাতের গাছগুলি হাত পাঁচেকের উপরে একরকম বাড়তেই চায় না।

ফুলদানি সাজাবার কাজে জবাফুল কিছুদিন আগেও ছিল একেবারেই অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু ইদানীংকার অনেক সিঙ্গেল জবা দিয়ে খুব সুন্দর করে ফুলদানি সাজানো চলে। খাঁটি নীল বা সবুজ রঙের জবা বাদে অন্য প্রায় সব রঙের জবা এবং বেশ কিছু দু-রঙা জবাও দেখতে পাওয়া যায়। সাদা জবার ভেতরে 'হাওয়াই হোয়াইট' শুধু একটি বিশিষ্ট ফুল নয়, ভারতে পাওয়া যায় এরকম জবার ভেতরে এরই একটু মৃদু সুগন্ধও রয়েছে। শুধু জবার বাগান ছাড়া পথের দুধারে এবং লনের মাঝে মাঝে দুয়েকটি জবা গাছ খুবই মানানসই দেখায়। লনের সবুজ ঘাসের মাঝখানে হলদে রঙের সিঙ্গেল জবা সবচেয়ে ভাল মানাবে। জবার সব কয়টি শ্রেণী এসেছে বোধ হয় বিদেশ থেকে। কিন্তু এ ফুল আমাদের এত আপনার যে এ ফুলকে একান্ত ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জবা একে বিদেশী ফুল এবং তায় গন্ধ নেই কিন্তু তবু পূজার ফুল হিসাবেই এটির বিশেষ সমাদর। শ্রীশ্রীকালী পূজায় লাল জবা না হলে চলেই না।

**জবার শ্রেণীবিভাগ ও সংকর প্রজাতি ॥**

জবা বা হিবিসকাস-এর চারটি প্রধান শ্রেণী রয়েছে। এদের ভেতরে জবা রোজা সাইনেনসিস আমাদের সবার বিশেষ পরিচিত। এটি এসেছে চীনদেশ থেকে কিন্তু তা কোন সুদূর অতীতে তা কেউ বলতে পারে না। জবার সিরিয়াকাস শ্রেণীর গাছগুলি শৈলাবাসেও ভাল ফুল দেয়, এবং এদের ভেতরেও সিঙ্গেল ও ডাবল ফুল পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর ফুলগুলি দেখতে অনেকটা হলিহকের মত। জবা সিজোপেটালাস এখানে ঝুমকো জবা নামে পরিচিত, এদের প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম। সিজোপেটালাসের আদি বাসস্থান ট্রপিকাল

আফ্রিকা। জবা মিউটাবিলিস এখানে স্থলপদ্ম বলে পরিচিত। এটি জবা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও আমরা একে জবার থেকে আলাদা বলেই ধরে থাকি।

জবার জগতে যুগান্তর এনেছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। মৃদু সুগন্ধযুক্ত হাওয়াই হোয়াইট হাওয়াইতে একরকম বিনা যত্নে জন্মায়। এখানে অসংখ্য সংকর প্রজাতির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বছর জবার আরও উন্নততর সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। হাওয়াইতে তৈরী কিছু সংকর প্রজাতির জবা আমাদের দেশের বাঙ্গালোর অঞ্চলে এসেছে। এ জবাগুলি দেখতে সত্যই অপরূপ। এবং এদের ডাবল প্রজাতির চেয়ে সিঙ্গেল প্রজাতিগুলি দেখতে আরও বেশি সুন্দর। হাওয়াই থেকে আনা কোন কোন জবার ফুলের ব্যাস বারো ইঞ্চি বা তার চেয়েও বড়। হাওয়াইতে রোজা সাইনেনসিস শ্রেণীর জবাকেই সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে বিশেষ ভাবে লাগানো হয়েছে। নতুন আনা গাছগুলিকে বাঙ্গালোরে সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়েছে এবং তাতে সুফলও পাওয়া গেছে। অনেকের মতে এই নতুন সংকর প্রজাতিগুলি হাওয়াই থেকে আনা মূলগাছগুলি থেকে বেশি কষ্টসহিষ্ণু।

সমতল বাংলাতেও জবার নতুন প্রজাতি তৈরীর অল্প কিছু চেষ্টা হয়েছে। দি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়াতে এটি প্রথম চেষ্টা করা হয়েছিল বেশ অনেক বছর আগে। অধুনালুপ্ত প্রজাতি 'ক্যামেরণি'-কে ব্যবহার করা হয়েছিল বীজ ধরার কাজে। তবে এ চেষ্টা খুব সফল হয়েছিল একথা বলা চলে না। এখানে জবার সংকর প্রজাতি তৈরী করার সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, এখানে জবার বীজ হতে চায় না। জবা ফুল একটু পুরানো হলেই তা নিজে নিজেই ডাঁটির মাঝখান থেকে আলাদা হয়ে পড়ে যায়। হাওয়াই বা বাঙ্গালোরের জবাগুলির বেলায়ও একই কথাই প্রযোজ্য। তবে 'মেজর গেজ' নামে পরিচিত একটি প্রজাতিতে মাঝে মাঝে বীজ হতে দেখা যায়। এটিকে মাতৃ-গাছ হিসাবে ব্যবহার করে সমতল বাংলায় কিছু নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে এখানেই জবার ভাল সংকর প্রজাতির সৃষ্টি ঘটবে।

**পরিচর্যা ॥**

সারাদিন রোদ পায় এবং বর্ষায় জল জমে না এ রকম জমি জবা লাগাবার জন্য বেছে নিতে হবে। জবা গাছের জন্য গর্ত হাত দেড়েক গভীর এবং গর্তের মুখ হাত দেড়েক চওড়া হবে। এ গর্তের সারমাটি হবে এরকম—সাধারণ মাটি পাঁচভাগ, স্লাজ দুভাগ, পাতা-পচাসার দুভাগ ও হাড়ের গুঁড়ো একভাগ। স্লাজ না পাওয়া গেলে তার জায়গায় বছর খানেকের পুরানো গোবরসার ব্যবহার করা যেতে পারে ; গোবরসার ও পাতাপচাসার দুইই গুঁড়িয়ে সাধারণভাবে ছেঁকে নেবেন। লাগানো গাছ ধরে যাওয়া পর্যন্ত একদিন অন্তর এবং গাছ ভাল করে লেগে গেলে সপ্তাহে একদিন বেশ ভাল করে গোড়া ভাসিয়ে জল দিতে হবে। গাছ যাতে ভাল করে জল পায় সেজন্য গরমের দিনে গাছের গোড়ার মাটি থালার মত করে বেঁধে দেবেন এবং মাটি বেশি দিনের জন্য ভেজা রাখতে ইঞ্চি দেড়েক পুরু করে লনের ছাঁটা ঘাস বা অন্য কিছু মালসিং হিসাবে থালার উপরে বিছিয়ে দেবেন। বর্ষাকালে থালা ভেঙে দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভাল করে বেঁধে দিতে হবে যাতে গোড়াতে জল একেবারেই দাঁড়াতে না পারে। শীতকালে গাছে দিন দশবারো অন্তর জল দিলেই চলবে। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে গাছের গোড়া নিয়মিত খুঁচিয়ে দিতে হবে এবং গাছের গোড়ায় কখনই জংলী ঘাস হতে দেবেন না। জবা গাছ বছরের যে কোন সময়ে লাগানো চলে, তবে শীতের প্রথমে লাগালে খাটুনি ও গাছের ক্ষতির আশংকা অপেক্ষাকৃত কম।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে জবা সংখ্যায় প্রচুর ও ভাল ফুল দেয়। তাই এ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাড়তি সার দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফেব্রুয়ারীর শেষে প্রতি গাছের গোড়ার মাটিতে দু'ঝুড়ি স্লাজ গোড়ার একহাত দূর থেকে দিয়ে দেবেন। এবং মার্চ মাসের মাঝা-মাঝি গাছের গোড়ার চল্লিশ সেন্টিমিটার দূর থেকে গোল করে খাল কেটে তাতে চারপাঁচ মুঠো ষ্টেরামীল দিয়ে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। একই ভাবে মাস দেড়েক অন্তর একই পরিমাণের ষ্টেরামীল দেওয়া যাবে। গাছে যখনই সার দেবেন, সার দেবার দিন ধরে পর পর তিনদিন গাছে জল দিতে হবে। শীতকাল জবার বিশ্রামের সময়, তাই এ সময়ে কোন

বাড়তি সার দেবার দরকার নেই। জোরালো হয়ে না ওঠা পর্যন্ত নতুন লাগানো গাছে কোন সার দেবার দরকার হবে না। গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখা ও গোড়া খুঁচে দেওয়া নিয়মিত করা দরকার।

**টবের গাছ ॥**

সমতল বাংলায় টবে জবার চাষের খুব একটা রেওয়াজ না থাকলেও বাঙ্গালোর অঞ্চলে দেখেছি জবা টবেই অপেক্ষাকৃত ভাল জন্মায়। এদের জন্য বেশ বড় টব বেছে নিতে হবে এবং সিমেন্টের বড় টব হলে সবচেয়ে ভাল। টবের গাছের জন্য সারমাটি জমির জবার হারেই তৈরী করবেন। এবং বাড়তি সার স্লাজের পরিমাণ কমিয়ে আধঝুড়ি ও ষ্টেরামীলের পরিমাণ কমিয়ে দুমুঠোয় আনতে হবে। গ্রীষ্মের একেবারে প্রথমে টবের গাছের উপরের মাটি যতটা বেশি সম্ভব পালটে দিয়ে সেখানে নতুন তৈরী সারমাটি দিয়ে দেবেন। এ কাজ খুব সাবধানে করতে হবে যাতে গাছের কোন আঘাত না লাগে।

টবের গাছের বেলায় পাতার সার বা ফলিয়ার ফিড ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যাবে। গোলাপের বেলায় এটি যেভাবে তৈরী করা হয়, এর বেলায়ও পাতার সার দুটি একই ভাবে তৈরী ও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে জবার গাছে শুধু মেঘলা দিনে সকাল বেলা পাতার সার স্প্রে করবেন। শীতের দিনে এদের বিশ্রামের সময় তাই এ সময়ে পাতার সার দেওয়া উচিত নয় এবং গরমের রোদের দিনে এটি ব্যবহার করলে গাছের পাতার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

**জবার বংশবৃদ্ধি ও গাছ ছাঁটা ॥**

কাটিং, গুটিকলম, দাবাকলম ও চোখকলম এই চারটি উপায়েই জবার বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে দাবাকলম ও গুটিকলম এর বংশবৃদ্ধির কাজে বেশি ব্যবহৃত। কাটিং-এর সাহায্যে ভাল প্রজাতির জবার বংশবিস্তার করা খুবই কঠিন। যেগুলি খুব সুখী জাতের সেগুলির বেলায় চোখকলমের গাছ সবচেয়ে ভাল জন্মায়। বাঙ্গালোরে যেসব নতুন প্রজাতির জবা এসেছে বা তৈরী হয়েছে, সেগুলির চোখকলমের তৈরী গাছ সমতল বাংলায় অপেক্ষাকৃত ভাল জন্মায়। কিছু কিছু ভাল জবার নরম ছোট ডাল লালবালিতে কাটিং বসিয়েও ভাল ফল পাওয়া গেছে। এই কাটিং-এর পরিচর্যা চন্দ্রমল্লিকার কাটিং-এর পরিচর্যার মত হবে।

জবা গাছ ছাঁটলে এবং গাছ এই ছাঁটা সহ্য করতে পারলে ফুল আরও ভাল হয় ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ গাছ ছাঁটার পরে আর ভাল ডালপালা ছাড়তে চায় না। তাই জবাগাছ না ছাঁটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব সুখী প্রজাতিগুলির মরা ডালগুলি কেটে ফেলা, অন্যান্য সুখী গাছ অল্প করে ছাঁটা, এবং যে প্রজাতিগুলি সহজেই বাড়ে তাদের একটু বেশি করেও ছাঁটা চলে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও গাছ শীতের প্রথমে ছাঁটা হবে। গাছ ছাঁটার পরে চারপাঁচ মুঠো করে হাড়ের গুঁড়ো প্রতি গাছে দেওয়া হবে। টবের জবাগাছ ছাঁটবেন না, সুখী গাছের মত এদের শুধু মরা ডালগুলি কেটে দেবেন। টবের পক্ষে গাছ লম্বা হয়ে যাচ্ছে মনে করলে ডালের মাথা ভেঙে দেবেন যাতে নিচ থেকে নতুন ডাল ছাড়ে।

**গাছের রোগাদি ॥**

জবা গাছের রোগাদি সম্পর্কে একরকম কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি, তাই এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। জবাগাছের ভাইরাস বা ফাঙ্গাস রোগ হলে তা সারানো একরকম অসাধ্য বা দুঃসাধ্য, তাই যাতে গাছে রোগ না হয় সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। রেড স্পাইডার, বর্ষাকালে বীটেল এবং ফাঙ্গাস রোগ মিলডিউর আক্রমণ জবাগাছে খুবই দেখা যায়। কীটনাশকের ভেতরে ফলিডল এবং ফাঙ্গাস রোগের ওষুধ থিওভিট বা এদের বিকল্প কোন ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। ওষুধ ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল না পেলে, সুস্থ গাছে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকায় অনেকে রোগাক্রান্ত গাছটি সমূলে তুলে বা রোগাক্রান্ত ডালটি কেটে পুড়িয়ে ফেলা শ্রেয় মনে করেন। নিয়মিত হাত দিয়ে ধরে কেরোসিন তেলে ফেললে সহজেই বীটেলের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে। বীটেলের

আক্রমণে অনেক সময়ে স্বাস্থ্যবান জবাগাছও মারা পড়ে, তাই এদের সম্পর্কে প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে।

# বুগেনভিলিয়া

চৌরঙ্গীর আই-সি-আই বিল্ডিংসের ঝুলানো বারান্দা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফুল দিয়ে সাজাবার চেষ্টাকে এ পথ দিয়ে যেতে আসতে মনে মনে তারিফ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবেছি, কি গাছ দিয়ে এ ধরনের জায়গাকে খুব সুন্দর করে সাজানো যেতে পারে। ভাবতে গিয়ে বুগেনভিলিয়ার কথাই প্রথমে মনে এসেছে এবং অনেক ভেবেও এ কাজে এর সমকক্ষ কোন গাছ বের করতে পারিনি। অনেক গাছই আছে যা দিয়ে এরকম জায়গা সাজানো চলতে পারে কিন্তু অন্য কোন গাছ বুগেনভিলিয়ার মত উপরের রোদ ও ছাদের গরম সহ্য করতে পারে না। এছাড়া বুগেনভিলিয়ার ফুলের জমকালো রঙ এবং গাছভরা ফুল অনেক দূর থেকেও চোখে পড়বেই পড়বে। ঝুলানো বারান্দা সাজাবার কাজে বুগেনভিলিয়া বোধ হয় সত্যই অদ্বিতীয়।

**বুগেনভিলিয়ার ক্রমবিকাশ ॥**

ফ্রান্সের তৎকালীন বিখ্যাত নাবিক দ্য বুগেনভিল জলপথে পৃথিবী পরিক্রমা করেন ১৭৬৬-১৭৬৯ খিষ্টাব্দে। এই পরিক্রমার সময়ে ব্রাজিলের জঙ্গলে আজকের বুগেন-ভিলিয়ার কিছু আদিজননীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং তাদের সংগ্রহ করে স্বদেশে নিয়ে আসেন। ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার বছরে এই সংগৃহীত গাছগুলির জাতিগত নামকরণ হলো সংগ্রহীতার নামে 'বুগেনভিলিয়া'। বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বাগানে ছড়িয়ে পড়তে এর অনেক সময় লেগেছে। সমতল বাংলায় বুগেনভিলিয়া প্রথম আসে কলকাতায়। এটি আসে ১৮৬০ খিষ্টাব্দে এবং এই প্রজাতিটির নাম বুগেনভিলিয়া গ্লাবরা। প্রধানত সংমিশ্রণের ফলে বুগেনভিলিয়ার এখন বহু ধরনের প্রজাতি পাওয়া সম্ভব। এদের সব সংকর প্রজাতি বুগেনভিলিয়ার প্রথম দিকের তিনটি গাছ—গ্লাবরা, স্পেক্টাবিলিস ও পেরুভিয়ানা-র কাছে কমবেশি ঋণী। গ্লাবরা-র বৈশিষ্ট্য এটি আর্দ্র আবহাওয়ায় জন্মায় ভাল, এর পাতা মসৃণ ও ফুলের রঙ হালকা মোভ। স্পেক্টাবিলিসের পাতা বড়, পাতার উপর দিকে নরম রোঁয়া রয়েছে, এদের কাঁটার সংখ্যা বেশি, ফুলের রঙ একধরনের পারপেল এবং ফুল ফোটার সময়ে গাছে একরকম পাতা থাকে না। পেরুভিয়ানার ফুলের রঙ হালকা ম্যাজেণ্টা, এদের পাতা মসৃণ ও পাতা আয়তনে বেশ বড়। গ্লাবরা ও স্পেক্টাবিলিস বা এদের সংকর প্রজাতির সংমিশ্রণে বেশিভাগ নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। সংমিশ্রণ অনেক বেশি ক্ষেত্রেই হয়েছে প্রকৃতির খেয়ালে, তাই কোন্ দুটি প্রজাতির সংমিশ্রণে কোন্ সংকর প্রজাতিটির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এদেশেও বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে বেশ কিছু ভাল সংকর প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। ইদানীং সমতল বাংলাতেও সংকর প্রজাতি তৈরী করার কিছু চেষ্টা চলছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, মিসেস ফ্রেজার, ত্রিনিদাদ, কয়াতা ইত্যাদি প্রজাতিতে বীজ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। সংকর প্রজাতি তৈরীর প্রচেষ্টা এখানেও ভবিষ্যতে বাড়বে বলে মনে হয়।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাদাফুলের বুগেনভিলিয়া ছিল অলীক কল্পনা মাত্র। এ ধারণা সবার মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল যে এ রঙের বুগেনভিলিয়া কখনই হতে পারে না। কিন্তু গত পনেরো বছরের ভেতরে সাদা ফুলের বেশ কয়েকটি বুগেনভিলিয়া পাওয়া গেছে। শুধু সাদাফুলের মেরী পামারের স্পোর্ট পাওয়া গেছে এই সমতল বাংলাতেই। বাহারি পাতার বুগেনভিলিয়া সম্পর্কেও এ ধারণা প্রবল ছিল যে এগুলি ভাল বাড়ে না।

কিন্তু স্কারলেট কুইন ভেরীগেটা ও মেরী পামার ভেরীগেটা এদের সম্পর্কে এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছে। তবে বুগেনভিলিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এর ডাবল ফুলের প্রজাতিগুলি। এগুলির ফুলের আবরণীর সংখ্যা অনেক এবং এর কোন কোনটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। সিঙ্গেল বুগেনভিলিয়ার ডাল থেকেই এই সব ডাবল বুগেনভিলিয়ার সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির খেয়ালে। এই সব আপাত অসম্ভব ঘটনা ঘটে যাবার ফলে ভবিষ্যতের বুগেনভিলিয়ার কোন নতুনত্বেই বোধ হয় কেউ আর তত বিস্মিত হবেন না।

**সারমাটি, বাড়তি সার ও অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

বছরের যে কোন সময়ে বুগেনভিলিয়া লাগানো চলে। সারাদিন রোদ পড়ে এরকম জায়গায় এ গাছ লাগাবেন। টবের বুগেনভিলিয়াও সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গায় রাখতে হবে, ছাদ সাজাবার জন্য করা গাছগুলি ছাদেই থাকবে। জমির বুগেনভিলিয়ার জন্য দুহাত গভীর ও দেড়হাত চওড়া গর্ত করা দরকার। বুগেনভিলিয়ার জন্য সারমাটি প্রথমে ছ'ভাগ সাধারণ মাটি ও চারভাগ গোবরসার মিশিয়ে তৈরী করবেন। এই দুটি উপাদান মেশানো চব্বিশ সেণ্টিমিটার বা ন'ইঞ্চি টবের একটব মাটিতে আরও মেশাবেন এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো, একমুঠো সরষের খোল, ছ'চামচ সুপারফসফেট ও তিনচামচ সালফেট অব পটাশ। এই একই সারমাটি টবের গাছে ও জমির গাছের জন্য ব্যবহার করা হবে। যত্নে রাখা বুগেনভিলিয়া শীতকালে ফুল দেয় গাছ ভরে এবং সারাবছর কোন যত্ন না পেলেও গাছে এ সময়ে কিছু না কিছু ফুল আসবে। জমির গাছে শীতকালে ভাল ফুল পেতে গেলে অক্টোবরের শেষে গাছেব গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত মিশ্র সার গাছের আয়তন অনুযায়ী দশ থেকে পনেরো মুঠো করে দেবেন। এই মিশ্র সার তৈরী হবে ছ'ভাগ স্টেরামীল, তিনভাগ সুপারফসফেট ও একভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে। ড্রামের টবের বড় গাছে এই মিশ্র সার দেবেন মুঠো তিনেক পরিমাণে এবং ন'ইঞ্চি টবের গাছে এক থেকে দেড়মুঠো করে। অনেক দিন ধরে ফুল পেতে এই মিশ্র সার এই একই পরিমাণে সব টবের গাছে মাস দেড়েক অন্তর দেওয়া যেতে পারে। জমির গাছের গোড়ায় এক হাত দূর থেকে গোল করে এবং টবের গাছের কানার কাছ থেকে গোল করে এই মিশ্রসার দিতে হবে। এবং সার দেবার দিন ধরে পর পর তিনদিন গাছ ভাল করে জল দিতেই হবে। প্রত্যেক বছর বর্ষার প্রথমে টবের গাছের উপরের দিকের যতটা সম্ভব গতবছরের পুরানো সারমাটি ফেলে দিয়ে সেখানে নতুন তৈরী করা সারমাটি দেওয়া দরকার। এ কাজ বছর দেড়েক বয়সের গাছের বেলা থেকে করা দরকার, এবং এ কাজ করতে হবে বেশ সাবধানে যাতে গাছের গোড়ায় কোন চোট না লাগে। সারমাটি পালটাবার সময়ও তিনদিন পর পর জল দিতে হবে। জমির বুগেনভিলিয়াতে জল দেবেন ভাসিয়ে এবং টবের গাছে প্রত্যেকদিন অথবা দুদিনে একবার জল দিলেই চলবে। বুগেনভিলিয়া খুবই কষ্টসহিষ্ণু গাছ এবং এতে রোগের আক্রমণ বড় দেখা যায় না। গাছের গোড়া নিয়মিতভাবে খুঁচে দিতে যেন ভুল না হয়।

টবের গাছে মিশ্রসার দেবার দিন পনেরো পর থেকে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে মাছপচা তরলসার দিতে পারলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। এই মাছপচা তরলসার ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতিতেও খুব ভাল কাজ দেয় কিন্তু বুগেনভিলিয়ার বেলায় এটি সবচেয়ে ভাল কাজ দেবে। এই তরলসার তৈরী করতে সমান ভাগে মৌরলা মাছ ও গোবর মাটির কলসীতে ভরে তাতে কিছুটা জল দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিতে হবে। মাছ যাতে তাড়াতাড়ি পচে সেজন্য একমুঠো এমোনিয়া সালফেট এতে মিশিয়ে দেবেন। মাছ পচার গন্ধ কমাতে মাছের সঙ্গে গোবর মেশাতে হবে এবং মৌরলা মাছের অভাবে অন্য মাছ বা মাছের ফেলে দেওয়া অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে। মাছ, গোবর ইত্যাদি মেশাবার পরে কলসীর মুখটি ভাল করে এঁটে দিতে হবে এবং শেয়াল প্রভৃতিতে যাতে এটি নষ্ট না করে সেজন্য কলসীটি মাটিতে পুঁতে তার উপরে কাঁটাগাছের ডাল বিছিয়ে দেবার দরকার পড়তে পারে। মাস ছয়েক পরে এ সার ব্যবহার করার উপযুক্ত হবে। এটি অন্যান্য তরলসার যেভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেভাবে দেবেন।

**বুগেনভিলিয়া সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা ॥**

টবের বুগেনভিলিয়ার পরিচর্যা সম্পর্কে বিকল্প একটি মত রয়েছে। এ মত অনুসারে গাছে জল দেওয়া কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ রাখা হবে। জল না পেয়ে গাছের সব পাতা ঝরে যাবে, এ সময়ে টবের কানা ঘেঁষে দুমুঠো বা আরও বেশি সুপারফসফেট বাড়তি সার হিসাবে দেওয়া হবে এবং এর পর থেকে জলও দেওয়া হবে নিয়মিতভাবে। এ পরিচর্যায় ফুল মোটামুটি পাওয়া যাবে, কিন্তু উল্লিখিত পরিচর্যায় এর চেয়ে অনেক ভাল ফুল হবে। আগের পদ্ধতিতে টবে চাষ করে অনেক প্রজাতির বুগেনভিলিয়ায় বছরে মাস আটেক ধরে ফুল পাওয়া সম্ভব।

বুগেনভিলিয়ার ফুল বলতে আমরা রঙীন কাগজের মত যে জিনিসগুলিকে বুঝি সেগুলি কিন্তু আসলে ফুল নয়, তবে কিনা এগুলির জন্যই বুগেনভিলিয়ার এত সমাদর। এগুলিকে ফুলের জমকালো রঙের আবরণী (ইংরাজীতে ব্রাক্ট) বলা যেতে পারে। এই আবরণীর ভেতরে দেখতে অতি সাধারণ ছোট ফুলগুলি লুকিয়ে থাকে। বুগেনভিলিয়া ভারতে এসেছে প্রধানত সাউথ আমেরিকা ও সেণ্ট্রাল আফ্রিকা থেকে। এবং এটি এদেশে এত সহজে জন্মায় যে বুগেনভিলিয়া ভারতের নিজস্ব গাছ নয় একথা সহজে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

প্রকৃতির খেয়ালে অনেক সময় কোন বুগেনভিলিয়া প্রজাতির একটি ডাল মূলগাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ফুল বা পাতা দিতে আরম্ভ করে। এই ডালটিকে কলম করে আলাদা করে নিতে পারলে একটি নতুন প্রজাতি পাবার সম্ভাবনা, এবং এ ভাবে বুগেনভিলিয়ার অনেক নামী প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। ডাবল বুগেনভিলিয়ার সৃষ্টিও হয়েছে এইভাবে। একই ভাবে মিসেস এইচ-সি বাক্ থেকে মিসেস মেরী পামারের, এবং আবার এটি থেকে মিসেস মেরী পামার ভেরীগেটার ও শুধু সাদা ফুলের মিসেস মেরী পামারের সৃষ্টি। কোন ডালকে পালটে যেতে দেখলে সেটিকে দাবাকলমের সাহায্যে আলাদা করে নিতে চেষ্টা করবেন।

ঘন ম্যাজেণ্টা রঙের বুগেনভিলিয়ার রঙ অত্যন্ত চড়া। এজন্য অন্যান্য বুগেনভিলিয়ার মাঝে এটিকে করলে এটি আর সব ফুলকে নিষ্প্রভ করে তুলবে। তাই এ ধরনের গাছ একটু আলাদা জায়গায় করা ভাল। ম্যাজেণ্টা রঙের বুগেনভিলিয়া দূরের গাছে তুলে দিলে অথবা জলাশয়ের পাড়ে করলে তা ভাল মানাবে। এই রঙের বুগেনভিলিয়া বড় বাগানের পক্ষে বেশি উপযোগী।

ফুলদানির ফুল হিসাবে বুগেনভিলিয়ার কোন কদর নেই কারণ এগুলি কেটে ফুলদানিতে দেবার কিছু সময়ের ভেতরে ঢলে পড়ে। কিন্তু ডাবল ফুলের বুগেনভিলিয়া-গুলি ফুলদানিতে মোটামুটি ভাল থাকে। এদের ভেতরেও মাহারা প্রজাতিটি ফুলদানি সাজাবার কাজে সত্যিই বেশ ভাল। বুগেনভিলিয়ার ফুলভরা ডাল ফুলদানিতে সাজাবার আগে ডালটির সব পাতা ঝরিয়ে দেবেন, এতে ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে ভাল থাকবে।

**বুগেনভিলিয়া কোথায় লাগাবেন ॥**

সাধারণ আয়তনের টবের বুগেনভিলিয়া ফুলফোটা অবস্থায় যে কোন জায়গায় নিয়ে সাজানো সম্ভব। জমির বুগেনভিলিয়া যে কোন রোদের জায়গায় নিশ্চয়ই লাগানো যেতে পারে, কিন্তু কতগুলি বিশেষ জায়গায় লাগালে এদের সৌন্দর্য আরও বেশি খুলবে। বুগেনভিলিয়া আসলে লতানো প্রকৃতির গাছ হলেও একে গুল্ম হিসাবে চাষ করার খুবই চল রয়েছে। এ গাছ দিয়ে চমৎকার হেজ্ও করা সম্ভব। হেজ্ দেখতে আরও সুন্দর হবে যদি তা বুগেনভিলিয়ার কোন ভেরীগেটা প্রজাতি দিয়ে করা হয়। বুগেন-ভিলিয়াকে লতানো গাছ হিসাবে ব্যবহার করার বেলায় এদের বাঁধার কাজ খুব ভাল হওয়া দরকার। এগাছ নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে খুব ভাল ভাবে করা সম্ভব।

কোঠাবাড়ির ক্যান্টিলিভার-পোর্টিকোতেঃ—ক্যান্টিলিভার-পোর্টিকোতে তুলে দেবার কাজে বুগেনভিলিয়ার সমান উপযুক্ত কোন গাছ নেই। পোর্টিকোর উপরের জায়গায় ইট

পেতে তার উপরে বাঁশের বড়-ফাঁকওয়ালা চাটাই বিছিয়ে তার উপরে বুগেনভিলিয়াকে উঠতে সাহায্য করতে হবে। এটা না করলে গাছ ভাল করে উপরে ছড়াতে চাইবে না এবং বেশি গরমের দিনে গাছের ক্ষতি হবে। পোর্টিকোর দুদিক থেকে দুটি গাছ তুলবেন এবং এ দুটি বিভিন্ন রঙের হলে ভাল। পোর্টিকোতে তোলার কাজে বুগেনভিলিয়ার প্রজাতি পার্থ বিশেষ উপযুক্ত। পোর্টিকোতে তোলা বুগেনভিলিয়ার গোড়া থেকে পোর্টিকো পর্যন্ত গাছের মূলকাণ্ডটি ছাড়া অন্য কোন ডাল না থাকলে আরও ভাল দেখাবে। পোর্টিকোতে তুলে দেওয়া গাছ না ছাঁটলেও চলতে পারে।

পথের দুপাশে বড় টবে :— বুগেনভিলিয়ার অনেক প্রজাতি টবে বেশি ও ভাল ফুল দেয়। বড় টবগুলি সিমেণ্টের হলে সবচেয়ে ভাল ; বিকল্পে কেরোসিন তেল ইত্যাদির বড় ড্রাম মাঝখান দিয়ে কেটে দুটি টব তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। অল্প চওড়া রাস্তা বা পায়ে-চলা পথের ধারে এই বড়টবের বুগেনভিলিয়াগুলি বেশি মানাবে।

গাছে তুলে দেওয়া বুগেনভিলিয়া :— বড় শক্ত গাছে তুলে দেওয়া বুগেনভিলিয়া ফুল ফোটা অবস্থায় খুবই সুন্দর। তবে গাছে তুলে দেওয়া বুগেনভিলিয়া অনেক সময়ে আশ্রয়দাতাকে এমনভাবে চেপে ধরে যে আলোর অভাবে এই বড় গাছটিই মারা পড়ে। তাই প্রত্যেক বছর বুগেনভিলিয়া লতাটিকে বেশ ভাল করে ছেঁটে দিতে হবে, এবং এমন বড়গাছে বুগেনভিলিয়াটিকে তোলা উচিত হবে যে আশ্রয়দাতা গাছটি মারা পড়লেও বাগানের যেন খুব ক্ষতি না হয়। বুগেনভিলিয়া দূরের গাছে তুলে দিলে তা আরও ভাল দেখাবে।

লোহার কাঠামোর উপরে :— বুগেনভিলিয়ার গাছ ডালপালা ভাল করে ছড়ালে খুবই ভারি হয়ে ওঠে। তাই এদের অবলম্বন লোহার বা কংক্রিটের হওয়া দরকার। তিনটি লোহার খুঁটি এমনভাবে বসাবেন যেন এগুলি একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরী করে। খুঁটিগুলির মাথা জমির তিনচার হাত উপর পর্যন্ত হবে এবং এগুলির মাথার উপরে লোহার রড দিয়ে এমনভাবে ছেয়ে দেবেন যাতে এর উপরে গাছ ছড়িয়ে পড়তে পারে। বুগেনভিলিয়াটিকে এই কাঠামোর উপরে ছাতার মত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করা যেতে পারে। লোহার খুঁটিগুলি সবুজ রঙ করে দিলে ভাল। এ কাজে অপেক্ষাকৃত কম বাড়ে এরকম গাছ বেশি উপযুক্ত।

গ্যারাজের ছাদ ও বাগানের তোরণের উপরে :— এই দুই জায়গার জন্য লাগানো বুগেনভিলিয়ার পরিচর্যা প্রধানত ক্যানটিলিভার-পোর্টিকোর গাছের মত হবে।

বড় গুল্ম হিসাবে :— সমতল বাংলায় বুগেনভিলিয়া খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং এগুলি খুব দৃঢ়মূল নয় বলে ঝড়ে এ গাছ মাটিতে পড়ে যায় সহজেই। তাই এদের বেলায়ও লোহার খুঁটি অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত এবং গাছ বেশি করে ছাঁটাও দরকার।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হিসাবে :— বুগেনভিলিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড হাত তিনচার উঁচু করবেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ডের আকৃতি অবিকল খুলে রাখা ছাতার মত হবে। গাছের একটিমাত্র ডালকে উপরের দিকে বাড়তে দেবেন এবং অন্য সব ডাল কচি অবস্থায় ভেঙে দেবেন। বাড়তে দেওয়া ডালটি হাতিতনেক লম্বা হলে এটির মাথা ভেঙে দিয়ে শুধু ডালের এক বিঘত জায়গায় নতুন ডাল ছড়াতে সাহায্য করা দরকার। এই নতুন ডালগুলির সাহায্যে গাছের মাথাটিকে ছড়ানো ছাতার আকৃতি দেওয়া হবে। এ কাজ করতে ডালগুলিকে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রায়ই ছাঁটতে হবে এবং ডালকে নির্দিষ্টভাবে ছড়াতে সাহায্য করাও দরকার পড়বে। গাছের মাথা কখনই খুব বেশি ঝোপালো করবেন না, এর জন্য ছাঁটার কাঁচি যখনই দরকার কাজে লাগাতে হবে। গাছ তিনচার বছর বয়সের হলে তা নিজের পায়ের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, তবুও কোন ঝুঁকি না নিয়ে লোহার শক্ত অবলম্বনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড করতে পিঙ্কি, শ্রীমতী বিজলী, স্প্লেনডেন্স ইমপ্রুভড প্রভৃতি প্রজাতিগুলি যেগুলি বাড়ে কম সেগুলি ব্যবহার করা ভাল।

**গাছ ছাঁটা ও গাছের বংশবিস্তার ॥**

বুগেনভিলিয়া নতুন ডালে ভাল ফুল দেয়। তাই এদের বছরে একবার ছাঁটা দরকার।

ছাঁটার কাজ করা দরকার মে মাসে। বুগেনভিলিয়া শীতকালে বেশি ফুল দেয়, তাই ছাঁটার কাজ নির্দিষ্ট সময়ের পরে করলে সে গাছে ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব হবে না। টবের গাছ ছাঁটবেন খুব হাল্কাভাবে এবং ছাঁটার দিন সাতেক পরে সাধারণ টবের গাছে একমুঠো ও সিমেণ্টের বড়টবের গাছে দুতিন মুঠো সরষের খোল দেবার ব্যবস্থা করবেন। গুল্ম হিসাবে যে গাছ করছেন সেগুলি এবং গাছে তুলে দেওয়া বুগেনভিলিয়া বেশ বেশি করে ছাঁটতে হবে ; কিন্তু ক্যানটিলিভার-পোর্টিকোতে বা এই ধরনের জায়গায় তুলে দেওয়া বুগেনভিলিয়া বেশি ছাঁটার দরকার নেই।

কাটিং, গুটিকলম, দাবাকলম ও চোখকলম, এই চারটি উপায়েই বুগেনভিলিয়ার বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব। সমতল বাংলায় প্রধানত গুটিকলম ও দাবাকলমের মাধ্যমে এর বংশবিস্তার করা হয়, এবং এ দুটির ভেতরেও দাবাকলমে বেশি ভাল ফল পাওয়া যায়। তিনচার মাস থেকে বছর খানেকের পুরানো ডালে দাবাকলম করে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। বুগেনভিলিয়ার প্রজাতি রেফালজেনস ও আরও কিছু কিছু প্রজাতির বংশবৃদ্ধি বেশ কঠিন। এদের শীতকালে কাটিং বা দাবাকলম করলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যাবে।

# কন্দজ ফুলগাছ

রজনীগন্ধা, সর্বজয়া ও ডালিয়া ছাড়া কন্দজ ফুলগাছের চাষ সমতল বাংলায় খুবই কম। এই জলবায়ুতে বেশ কিছু কন্দজ ফুলগাছ করা যায় না ঠিকই কিন্তু ভাল ভাবে চাষ করা যায় এরকম কন্দজ ফুলগাছের সংখ্যাও খুব কম নয়। তবুও এদের প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাবের কারণ বোঝা কঠিন। এই ঔদাসীন্যের ফলশ্রুতি হয়েছে এই যে, কোন্ কোন্ অল্প পরিচিত কন্দজ ফুলগাছের চাষ এখানে ভাল ভাবে করা চলে সে সম্পর্কে সঠিক খবর পাওয়া একরকম অসম্ভব। নার্শিসাস প্রথম বছর ভাল ফুল দিলেও এর পরে আর ফুল দিতে চায় না যদিও গাছ হয় ভালই। ফ্রিজিয়ারও ফুল হতে চায় না যদিও গাছ জন্মায় সহজেই। আবার ক্লিভিয়ার ফুলও কেউ কেউ পেয়েছেন বলে বলতে শুনেছি যদিও এটি সমতল বাংলায় ফোটানো সম্ভব নয় বলেই আমার দৃঢ় ধারণা। একরকম সব সমাদৃত কন্দজ ফুলগাছই মোটামুটি দামী, এ অবস্থায় গাছে বছরের পর বছর ফুল ফুটবে কিনা নিশ্চিত হতে না পারলে সে সব কন্দজ ফুলগাছের প্রসার ঘটা সম্ভব নয়। এই অনিশ্চয়তা কাটাবার একমাত্র উপায়, যে গাছগুলি এখানে হতে পারে বলে মনে হয় তাদের নিয়ে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। একমাত্র এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব; তবে এ কাজ অনেকে মিলে না করলে তা হবার কোন সম্ভাবনা নেই। খুব ইদানীং কলকাতায় একটি টুলিপও ফোটানো সম্ভব হয়েছে, এ খবর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমাদের আগ্রহ আরও বাড়াবে।

শৈলাবাসগুলিতে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বেশির ভাগ কন্দজ ফুলগাছই ভাল জন্মায়। একবার লাগিয়ে দেবার পর নার্শিসাস, গ্লাডিওলাস, লিলি প্রভৃতি ফুলগাছ কোন যত্ন ছাড়াই বছরের পর বছর ভাল ফুল দিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়বে। শৈলাবাস-গুলির মত অনেক বেশি রকমের কন্দজ ফুলগাছ করা সম্ভব না হলেও এদের অনেকেই সমান সুন্দর ফুল দিয়ে থাকে এখানেও। গ্লাডিওলাস, এমারিলিস প্রভৃতি কন্দজ ফুলের ভেতরে সবচেয়ে সমাদৃত। এগুলি থেকে সমতল বাংলায় শৈলাবাসগুলির মত সমান ভাল ফুল পাওয়া খুবই সম্ভব। রজনীগন্ধা সহজেই সবার মন জয় করে নেবে, এ গাছ শৈলাবাসগুলিতে করা খুবই কঠিন কিন্তু এখানে খুব অল্প যত্নে আমরা এর ভাল ফুল পেতে পারি। এবং ডালিয়া বোধ হয় সমতল বাংলাতেই সবচেয়ে ভাল ফুল দিয়ে থাকে।

একরকম সব কন্দজ ফুলগাছগুলিই জমিতে চাষ করা চলে। জমিতে একই সঙ্গে

অনেকগুলি একই জাতির গাছ লাগানো ভাল, এতে এদের শোভা আরও বেশি খুলবে। যে গাছগুলি বাড়তি যত্ন পেলে আরও ভাল ফুল দেবে সেগুলি টবে চাষ করার জন্য বেছে নেবেন। গ্লাডিওলাস, এমারিলিস, ইউকোরিস, ডালিয়া, হেমেন্থাস ইত্যাদি চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। পুষ্পসজ্জার কাজে রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, এমারিলিস, গ্লোরিওসা, ডালিয়া, দোলন চাঁপা ইত্যাদির বিশেষ সমাদর।

একথা সত্য যে বেশির ভাগ কন্দজ ফুলগাছের দাম একটু চড়া, এবং একথা আরও বেশি সত্য বিশেষ সুন্দর ফুলগুলির বেলায়। কিন্তু এই চড়া দাম হবার পেছনে এদের প্রতি আমাদের অকারণ উপেক্ষা প্রধানত দায়ী। এক সময়ে ডালিয়ার চাষ সমতল বাংলায় খুব প্রচলিত ছিল না। তখন ডালিয়া ছিল মহার্ঘ। কিন্তু ধীরে ধীরে ডালিয়ার চাষ এদেশে বেড়েছে এবং এ গাছ এখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম দামে পাওয়া সম্ভব। এই একই সম্ভাবনা অন্যান্য কন্দজ ফুলগাছের বেলায় কমবেশি রয়েছে। কন্দজ ফুলগাছের দাম একটু বেশি পড়লেও এদের একটি মস্তবড় সুবিধার দিক রয়েছে। যত্ন করে রাখলে একই কন্দজ ফুলগাছ বা তার থেকে তৈরী নতুন গাছ নির্ধারিত সময়ে ফুল দেবে বছরের পর বছর।

**সাধারণ পরিচর্যা ॥**

কন্দজ ফুলগাছের সংখ্যা অনেক এবং এদের প্রকৃতিও বিভিন্ন, তাই এদের একই পরিচর্যা হতে পারে না। এখানে খুব সাধারণ ভাবে পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে এবং এগুলি বেশির ভাগ কন্দজ ফুলগাছের বেলাতেই প্রযোজ্য। যেসব গাছের পরিচর্যার বিশেষ তফাত রয়েছে তা তাদের বিশদ পরিচয়ের বেলায় নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ফুল আরও ভাল করতে কোন বিশেষ পরিচর্যার দরকার থাকলে তাও বিশদ পরিচয়ের বেলায় উল্লেখ করেছি। ডালিয়ার পরিচর্যা সম্পূর্ণ আলাদা, এটির চাষ কিরকম হওয়া দরকার তা 'ডালিয়া' অধ্যায়টিতে পাবেন। কন্দজ ফুলগাছের টবের ও জমির সারমাটি হবে একই ধরনের। তিনভাগ করে গোবরসার, পাতাপচাসার, সাধারণ মাটি, এবং একভাগ সাদা বালি মিশিয়ে সারমাটি প্রথমে তৈরী করবেন। কুড়ি সেণ্টিমিটার টবের একটব এই সারমাটিতে আরও মেশাতে হবে একমুঠো করে হাড়ের গুঁড়ো ও কাঠের ছাই। বেশির ভাগ কন্দ এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে এর মুখটি শুধু সারমাটির উপরে থাকে। কন্দজ ফুলগাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা দিলে জৈব তরলসার সপ্তাহে একদিন করে ফুল খুলতে আরম্ভ করবার আগে পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। গুয়ানো-র তরলসার একাজে বেশ ভাল ফল দেবে, এর একচামচ দশ লিটার জলে মিশিয়ে তরলসার তৈরী হবে। ফুল ফোটার সময়ে কোন রকম সার দেওয়া চলবে না। কিন্তু ফুল শুকিয়ে এলে সেই ফুলগাছে আবার সপ্তাহে একদিন করে তরলসার দিয়ে যেতে হবে যতদিন না গাছের পাতা শুকিয়ে আসছে। গ্লাডিওলাস, এমারিলিস, হেমেন্থাস প্রভৃতি যে সব গাছের কন্দ যত বেশি পুষ্ট হবে তা তত ভাল ফুল আগামী বছরে দেবে, তাই শুধু এরকম গাছের বেলাতেই এই পরিচর্যা করা দরকার। সর্বজয়া, দোলন চাঁপা প্রভৃতি কন্দজ ফুলগাছে এই পরিচর্যার খুব কিছু প্রয়োজন নেই। ডালিয়া ও অন্য দুয়েকটি কন্দজ ফুলগাছে ছাড়া অন্য গাছে একেবারেই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চলবে না। জমির গাছে জল দেবেন সাধারণত সপ্তাহে একবার। জল ভাসিয়ে দেবেন না কিন্তু তা পর্যাপ্ত হতে হবে। টবের গাছেও জল এমন ভাবে দিতে হবে যাতে মাটি ভেজে কিন্তু জল বিশেষ বেরিয়ে না যায়, টবের মাটি শুকিয়ে এলেই জল দেওয়া দরকার। ফুল ফোটার সময়ে গাছের গোড়া সব সময়ে ভেজা ভেজা রাখতে হবে এবং গাছের গোড়া খুঁচে দিতে হবে মাঝে মাঝে।

কন্দজ ফুলগাছের সুখী গাছগুলির বেলায় কন্দ বসাবার জায়গায় সারমাটির উপরে কিছু বালি বিছিয়ে দেওয়া ভাল। এটা গাছের ভাল শেকড় আসতে সাহায্য করবে। এই সব কন্দ লাগাবার পর থেকে গাছ ভালভাবে বাড়তে আরম্ভ না করা পর্যন্ত জল দিতে হবে খুব অল্প করে। সুখী গাছগুলি যদি ভাল ভাবে না বাড়ে তাহলে তার সে বছর ফুল হতে না দেওয়াই ভাল। ফুল হতে দিলে সাধ্যের অতিরিক্ত ক্ষয়ের জন্য কন্দটি দুর্বল

হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যতে তা আর তত ভাল ফুল দেবে না। তাই এইসব ক্ষেত্রে ফুলের কুঁড়ি এলেই তা ভেঙে দেওয়া উচিত। গাছে এদের ফুল অপেক্ষাকৃত বেশি দিন সুপ্রভ রাখতে ফুল খুললে তার পরাগস্থলীগুলি সন্না দিয়ে তুলে ফেলা যেতে পারে।

কন্দজ ফুলগাছ ফুল দেবার পরে সাধারণত বেশ কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নেয়। গাছ মরে গেলে তার কন্দ তুলে সাবধানে সামনের বছরের জন্য রেখে দিতে হবে, এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে সমতল বাংলায় অনেক গাছ সারা বছর ধরেই সজীব থাকে। এসব গাছের অনেকগুলির বেলায় জোর করে গাছকে বিশ্রাম দেওয়া ভাল। এতে আগামী ফুলের উৎকর্ষ বাড়বে। কন্দসহ গাছ মাটি থেকে তুলে কিছুদিনের জন্য ছায়ায় এমনি রেখে বিশ্রাম দিয়ে তারপরে আবার লাগিয়ে দেওয়া হবে। অথবা বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে জমির কন্দজ গাছে কিছু দিনের জন্য জল দেওয়া বন্ধ রেখে। রজনীগন্ধা ও সর্বজয়াকে প্রথম উপায়ে এবং বিশ্রাম নেয় না এরকম অন্যান্য গাছগুলিকে দ্বিতীয় উপায়ে বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে। জমিতে বা টবে রয়েছে এরকম কন্দজ ফুলগাছ ফুল দেবার পরে মরে যেতে আরম্ভ করলে তাতে জল দেওয়া বন্ধ করা দরকার। গাছের কুঁড়ি বেরুবার সময় হয়ে এলে তাতে জল দিতে আরম্ভ করবেন। যেসব কন্দজ ফুলগাছের পাতা ছাড়ার আগে ফুলের কুঁড়ি আসে সেগুলি টবে বা জমিতে লাগাবেন ফুলের কুঁড়ি আসার অন্তত মাসখানেক আগে। বাল্ব বা কন্দ লাগাবার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার যাতে বাল্ব ও মাটির মাঝখানে কোন ফাঁক না থাকে। ফাঁক থাকলে বাল্ব পচে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। কন্দজ ফুলের বংশবিস্তার প্রধানত কন্দকে ভাগ করে নিয়ে। খুব সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, যেসব গাছের পাতা মরে যায় তাদের বিশ্রামের সময়ে এবং যাদের পাতা মরে না তাদের ফুল ফুটে যাবার পরে কন্দ ভাগ করা উচিত। কন্দজ ফুলগাছে রোগাদির আক্রমণ কম তবে শূককীটের যথেষ্ট উপদ্রব রয়েছে। শামুকের উপদ্রবও রয়েছে এবং এদের সংখ্যা বেশি হলে এর আক্রমণ প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন।

**এমারিলিস ॥**

সৌন্দর্যের বিচারে কন্দজ ফুলগাছের ভেতরে এমারিলিসের স্থান বেশ উঁচু। গাছ করা ও এদের বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখা বেশ সহজ। হিপিয়াষ্ট্রাম ও এমারিলিস উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে আলাদা হলেও এগুলি সবই এমারিলিস হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ-জনের কাছে। এদের প্রজাতির সংখ্যা অনেক এবং ইকুয়েডর-এর মত কষ্টসহিষ্ণু প্রজাতিগুলি যত্ন না পেলেও বছরের পর বছর ভাল ফুল দেয়। এমারিলিসের বিভিন্ন প্রজাতির ভেতরে ডাচ হাইব্রিড সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। এবং ডাচ হাইব্রিডের ভেতরে বহু সুন্দর রঙের ফুলও পাওয়া যায়। সত্য বলতে সৌন্দর্যে এদের সঙ্গে অন্য কোন এমারিলিসের তুলনা চলে না। এমারিলিসের সুখী প্রজাতিগুলিকে টবে এবং শুধু সকালের রোদ পায় এরকম জায়গায় করা ভাল। এমারিলিসের বাল্ব আঁটোসাঁটো হয়ে বসে এরকম টবে লাগাতে হবে, এতে ফুলের উৎকর্ষ বাড়বে। এদের লাগাতে হবে এমন ভাবে যাতে বাল্বের মুখের উপরে মাটি থাকে দশ মিলিমিটার পরিমাণ। এমারিলিসের ফুলের কুঁড়ি আগে আসে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাতাও। গাছ টবে লাগাবেন ডিসেম্বরের শেষে এবং কুঁড়ি না আসা পর্যন্ত গাছে জল দেবেন খুব অল্প করে। এমারিলিসের ফুল ফোটার সময় মার্চ ও এপ্রিল, এর প্রত্যেক ডাঁটিতে ফুল ফোটে দুটি থেকে চারটি। এটি পায়ে-চলা পথের দুপাশে, শুধু এমারিলিসের কেয়ারিতে ও লনের পাশে লাগাতে পারেন। কষ্টসহিষ্ণু জাতের এমারি-লিসের পাতা মরে যাবার পরেও বাল্ব তোলার দরকার নেই। তবে গাছের গোছা বড় হলে তা ভাগ করে লাগাতে হবে। টবের গাছের পাতা মরে গেলেও বাল্ব না তুলে টবে একই ভাবে রেখে দেওয়া যেতে পারে। টবের গাছের পাতা মরে যেতে আরম্ভ করলে জলের পরিমাণও কমতে থাকবে এবং পাতা মরে গেলে জলও বন্ধ হবে। ডিসেম্বরের শেষে এই টবের উপরের দিকের কিছু মাটি সাবধানে তুলে নিয়ে সেখানে নতুন তৈরী সারমাটি দিয়ে দেবেন। এমারিলিসের গাছ ও ফুল উচ্চতায় হাত দেড়েকের ভেতরে। বড় বাল্বের পাশের ছোট বাল্ব আলাদা করে লাগিয়ে এদের বংশবৃদ্ধি। এর অন্যতম আদি বাসস্থান পেরু।

এমারিলিসের দেশী নাম কিরীটিনী।

**ইউকোরিস ॥**

ইউকোরিস গ্রানডিফ্লোরার ফুলে চমৎকার গন্ধ। ফুলের রঙ ধবধবে সাদা এবং ফুল বেশি ফোটে শীতকালে। গাছ হালকা ছায়া ভালবাসে এবং রোদ মোটেই সহ্য করতে পারে না। এদের বাড়ীর উত্তর-পূর্ব দিকে রাখা ভাল এবং প্রয়োজন বোধে এগুলি রাখতে হবে কয়লার ছাই বিছিয়ে তার উপরে। ইউকোরিসের চাষ শুধু টবে করবেন। গাছ তুলে বসানো মোটেই পছন্দ করে না তাই গাছের গোছা বেশ বড় না হলে আলাদা করে লাগাবেন না। এটি উচ্চতায় হাতখানেক। ইউকোরিসের এক একটি ডাঁটিতে ফুল ফোটে চারপাঁচটি করে। এটি এসেছে কলম্বিয়া থেকে এবং এর বাংলা নাম সিতচম্পা।

**কুপারেন্থাস ॥**

ফুল দেখতে অনেকটা এমারিলিসের মত কিন্তু খুব ছোট। বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটে প্রায় সারাবছর ধরে, তবে শীতকালে কম এবং বর্ষাকালে ফোটে বেশি। বর্ষাকালে কিছুদিন অন্তর ফুল ফোটে এক ঝাঁক করে। ফুলসহ গাছ বিঘত খানেক উচ্চতায়। লনের পাশে বা পায়ে চলা পথের পাশে কুপারেন্থাস লাগানো যেতে পারে। গাছ লাগাবেন দশ সেণ্টিমিটার অন্তর এবং একসঙ্গে অনেক গাছে ফুল ফুটলে তা চমৎকার দেখাবে। বছর তিনেক অন্তর এ গাছের গোছা ভাগ করে লাগানো উচিত। কুপারেন্থাসের সৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়।

**গ্লাডিওলাস ॥**

গ্লাডিওলাস ফুলের রাজকীয় ভাব সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গ্লাডিওলাস পাওয়া যায় একরকম সব রঙের, এবং এদের প্রজাতির সংখ্যাও প্রচুর। এদের ভেতরে এখন সবচেয়ে বেশি সমাদৃত ডাবল গ্লাডিওলাস। সাজাবার কাজে গ্লাডিওলাসের খুবই সমাদর। এ কন্দজ ফুলগাছটির ফুল দিতে সময় নেয় আড়াই থেকে চার মাস। দিন পনেরো অন্তর কিছু কিছু বাল্ব লাগালে অনেক দিন ধরে গ্লাডিওলাসের ফুল পাওয়া সম্ভব। এভাবে সমতল বাংলায় অক্টোবর থেকে সমস্ত শীতকাল ধরে এদের ভাল ফুল পাওয়া যেতে পারে। তবে এখানে গ্লাডিওলাস লাগানো হয় প্রধানত সেপ্টেম্বর থেকে। এ গাছটি সুখী প্রকৃতির, তাই ভাল ফুল পেতে এদের ঠিকমত যত্ন নেওয়া দরকার। পুরানো দিনের গ্লাডিওলাস দেখতে তত ভাল নয়, তাই যেসব গাছ অপেক্ষাকৃত নতুন সেগুলি যোগাড় করার চেষ্টা করবেন। গ্লাডিওলাসের বাংলা নাম বৈজয়ন্ত। প্রচলিত ধারণার বিপরীত হলেও, হিমালয়ের জঙ্গলে গ্লাডিওলাস পাওয়া যায় তার কিছু নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

গ্লাডিওলাসের বেলায় নাইট্রোজেন সার যেন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি না হয়, এ সার বেশি হলে গাছ দেখতে ভাল হলেও ফুল তত ভাল হবে না। টবে গ্লাডিওলাস লাগাবার জন্য কুড়ি সেণ্টিমিটার টব ব্যবহার করা যেতে পারে। জমিতে চাষ করার জন্য এমন কেয়ারি বেছে নেবেন যেখানে গত মরসুমে শুধু জৈবসারের সাহায্যে মরসুমী ফুল করেছেন। দুহাত লম্বা ও দেড়হাত চওড়া এই কেয়ারিতে একশো গ্রাম করে হাড়ের গুঁড়ো ও কাঠের ছাই মিশিয়ে নিয়ে তারপরে গ্লাডিওলাস লাগাবেন। গাছ কুড়ি সেণ্টিমিটার বাড়লে এবং ফুলের কুঁড়ি বেরুলে আবার দুই সেণ্টিমিটার পুরু করে চাপান সার বা টপ ড্রেসিং দেওয়া দরকার। এই চাপান সার ষোল ভাগ পাতাপচাসার, দুভাগ স্টেরামীল ও দুভাগ সুপারফসফেট মিশিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। গ্লাডিওলাসের গাছ ভালভাবে বেঁধে দিতে হবে খুব ছোট অবস্থা থেকেই। কারণ গাছ বেঁকে গেলে ফুলের ডাঁটিও বেঁকে যাবে। এদের বাল্ব লাগাবেন মাটির আট সেণ্টিমিটার নিচে এবং এর নিচে এবং ঘিরে বালি দেওয়া থাকবে। বাল্ব প্রথমে হালকা ছায়া জায়গায় বালিভর্তি টবে লাগিয়ে গাছকে কিছুটা বাড়তে দেওয়া যেতে পারে। এ সময়ে বাল্বে সাবধানে জল দিতে হবে যাতে জলের পরিমাণ বেশি না হয়। পোকামাকড়ের জন্য গ্লাডিওলাস গাছে মাঝে মাঝে ম্যালাথিয়ন ও ডি.ডি.টি. স্প্রে করার দরকার পড়তে পারে। গ্লাডিওলাসের ফাঙ্গাস রোগের বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই, এ রোগ যে কেয়ারির গাছে দেখা দেবে সে কেয়ারিতে সামনের বছর

গ্লাডিওলাসের চাষ করবেন না। ফুলের পালা শেষ করে গাছের পাতা হলুদ হতে আরম্ভ করলে আস্তে আস্তে জলের পরিমাণ কমাতে হবে। পাতা অনেকটা শুকিয়ে গেলে বাল্ব খুব সাবধানে তুলে তা ছায়াতে ঝুলিয়ে রেখে ভাল করে শুকিয়ে নেবেন। এর পরে বাল্বে ডি.ডি.টি. ছড়িয়ে দিয়ে এগুলিকে খবরের কাগজে মুড়ে ঘরের ঠাণ্ডা জায়গায় যত্ন করে ঝুলিয়ে রাখবেন। গ্লাডিওলাসের পুরানো বাল্বের উপরে বাল্ব হয়, এবং আগামী বছরের ফুল হবে এই নতুন বাল্ব থেকে। এদের বংশবিস্তার সাধারণত প্রধান বাল্বের পাশের খুব ছোট বাল্বগুলিকে আলাদা করে নিয়ে। ছোট বাল্বগুলিকেও বড় বাল্বের মত সমান যত্নে চাষ করতে হবে। এগুলি ফুল দিতে সময় নেবে বছর তিনচার। কেয়ারিতে গ্লাডিওলাস তিরিশ সেণ্টিমিটার অন্তর লাগানো যেতে পারে। গ্লাডিওলাসের প্রথম ফুলগুলি খুলতে আরম্ভ করলেই ষ্টিকটি কেটে পুষ্পসজ্জায় ব্যবহার করা যেতে পারে, অন্য কুঁড়িগুলি ফুলদানিতেই আস্তে আস্তে ফুটবে। গ্লাডিওলাসের অন্যতম আদি বাসস্থান সাউথ আফ্রিকা।

**গ্লোরিওসা ॥**

এটি এই রচনার একমাত্র লতানো কন্দজ ফুলগাছ। এদের বিদেশী প্রজাতিগুলি সুখী প্রকৃতির গাছ, তাই তাদের টবে চাষ করবেন। কন্দ ভাগ করে গ্লোরিওসার বংশবৃদ্ধি, এবং এদের কন্দ বিষাক্ত বলে জনশ্রুতি। গ্লোরিওসা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য 'বাছাই লতানো ফুলগাছ' অধ্যায়টি দেখুন। এর সুপারবা প্রজাতিটি ভারতের নিজস্ব গাছ।

**দোলন চাঁপা ॥**

দোলন চাঁপা বা হেডিচিয়াম করোনারিয়াম-এর গন্ধের মাধুর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এর ফুলের রঙ ধবধবে সাদা এবং ফুল ফোটে বর্ষাকালে বিকালের দিকে। গাছ জন্মায় ভাল স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় এবং কয়েক দিন বৃষ্টি না হলে গাছে ভাল করে জল দেওয়া দরকার। করোনারিয়াম প্রজাতিটি খুবই কষ্টসহিষ্ণু, এটি ছাড়া করোনারিয়াম ফ্লাভাম, ইলেটাম ও কর্কাসিনিয়াম প্রজাতিগুলিও এখানে করা চলে। দোলন চাঁপা হাত দুয়েক উচ্চতায় এবং এর বংশবৃদ্ধি সর্বজয়ার মত কন্দ ভাগ করে। দোলন চাঁপা ভারতীয় গাছ।

**ভুঁই চাঁপা ॥**

ভুঁই চাঁপা বা কেম্পফেরিয়া রোটানডার ফুলের গন্ধ বেশ মিষ্টি এবং গাছের পাতাও দেখতে সুন্দর। কেম্পফেরিয়ার সব প্রজাতির ফুল গাছের পাতা বেরুবার আগে ফুটতে আরম্ভ করে। এদের ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল। গামলাটবে কন্দ লাগাবেন, নইলে ফুল খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। কন্দ ভাগ করে এদের বংশবিস্তার। ভারত এর অন্যতম আদি বাসস্থান।

**রজনীগন্ধা ॥**

রজনীগন্ধা বা পলিয়ানথাস টিউবরোজা একটি সর্বজনপ্রিয় ফুল। রজনীগন্ধা বেশি ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। এর সিঙ্গেল ও ডাবল প্রজাতি রয়েছে। সিংগেল ফুলটি ফোটে বেশি এবং এর গন্ধও বেশি। সাজাবার ও মালার ফুল হিসাবে সমতল বাংলায় রজনীগন্ধার চাহিদা সবচেয়ে বেশি। গাছ টবেও করা চলে তবে জমিতে আরও ভাল জন্মায়। বর্ষার প্রথমে এদের গোছা ভাগ করে লাগাবেন এবং লাগাবার আগে দিন সাতেক ধরে এদের ছায়ায় বিশ্রাম দেবেন। রজনীগন্ধা গোবরের সার খুব পছন্দ করে, তাই দুভাগ গোবরসার ও তিনভাগ মাটি মিশিয়ে তাতে এর চাষ করা ভাল। রজনীগন্ধার কেয়ারিতে জল দিতে হবে ভাসিয়ে। সর্বজয়ার মত এতেও মাঝে মাঝে কাঁচা গোবর দেওয়া যেতে পারে এবং এর গোড়ার জঙ্গল মাঝে মাঝে বেছে দেওয়া দরকার। রজনীগন্ধার বংশবিস্তার বছর দুই অন্তর গাছের গোছা ভাগ করে। এটির আদি নিবাস মেক্সিকো।

**সর্বজয়া ॥**

সর্বজয়া বা ক্যানা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ। এটি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং এর ফুলও দেখতে সুন্দর। জাতীয় গ্রন্থাগারে বা ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে বিভিন্ন রঙের সর্বজয়া জায়গা দুটি আলো করে রেখেছে। শুধু সর্বজয়ার সম্পূর্ণ একটি কেয়ারি করলে তা মানাবে ভাল, লনের দূরপ্রান্তে এরকম কেয়ারি আরও বেশি মানায়। রজনীগন্ধার মত সর্বজয়াও গোবরসার পছন্দ করে। এর কেয়ারি তৈরী করতে প্রথমে মাটি হাতদেড়েক গভীর করে কুপিয়ে তার উপরে দশ সেণ্টিমিটার পুরু করে গোবরসার বিছিয়ে দিতে হবে। এর পরে মাটি ও গোবর ভাল করে মিশিয়ে দেবার পালা। সর্বজয়া যে কোন সময়ে লাগানো গেলেও বর্ষার প্রথমই এর লাগাবার সবচেয়ে ভাল সময়। সাধারণ সর্বজয়া লাগানো হবে দেড়হাত অন্তর। শীতের প্রথমে এবং আবার শীতের শেষদিকে তিন সেণ্টিমিটার পুরু করে কাঁচা গোবর জমিতে বিছিয়ে দিয়ে তা মাটিতে মিশিয়ে দেবেন, এবং মেশাবার পর জল দেবেন ভাসিয়ে। সর্বজয়ায় তরলসার দিলে নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে কিন্তু গাছের সংখ্যা বেশি হলে তা করা সহজ নয়। উপরের এই বাড়তি গোবর তরলসারের অভাব অনেকটা মেটাবে। সর্বজয়া লাগাবার আগে একে ছায়ায় দিন সাতেক ধরে রেখে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। বর্ষা থেমে গেলে জমি খুঁচে দিয়ে বেশ কয়েক দিন জল দেবেন না যাতে জমি তাড়াতাড়ি শুকুতে পারে। এর গোড়ার জংলীঘাস প্রয়োজনমত বেছে দিতে হবে। সর্বজয়ার বংশবিস্তার গাছের গোছা কন্দসহ ভাগ করে। গোছার জোরালো চারাগুলি বেছে নিয়ে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সর্বজয়া এসেছে সাউথ আমেরিকা থেকে। এদের বেঁটে প্রজাতিগুলিকে টবেও ভাল চাষ করা যাবে।

**সুখদর্শন ॥**

সুখদর্শন বা ক্রাইনাম খুব কষ্টসহিষ্ণু গাছ। একবার লাগিয়ে দেবার পরে এদের আর বিশেষ যত্ন নেবার দরকার পড়ে না। এরা হালকা ছায়া জায়গায় বেশ ভাল জন্মায়। সুখদর্শনের ফুল বেশি ফোটে বর্ষাকালে, ফুলের রঙ প্রধানত পিঙ্ক ও সাদা এবং কিছু প্রজাতির ফুলে গন্ধ আছে। এদের বেশির ভাগ প্রজাতির কন্দের অংশ খুব লম্বা, তাই এর প্রধান অংশই মাটির উপরে থাকবে। শীতের শেষে গোছা আলাদা করে সুখদর্শনের বংশবৃদ্ধি। সাউথ আফ্রিকা এর অন্যতম আদি নিবাস।

**হেমেন্থাস ॥**

হেমেন্থাস বা ফুটবল লিলি দেখতে ফুটবলের মত বড় ও গোল। ফুল ফোটে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং ফুলের রঙ ভারমিলিয়ান। এর সাদা রঙের ফুলও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। হেমেন্থাসের ফুল ফোটে পাতা বেরুবার আগে। বড় বাল্বের ফুলও বড় হবে। এর চাষ অত্যন্ত সহজ, এবং এর বংশবিস্তার পাশের ছোট বাল্ব দিয়ে। টবে ফোটা হেমেন্থাস টবের সমান আয়তনের নধর কচিয়ার পাশাপাশি সাজালে তা চমৎকার মানায়। এটি এসেছে ট্রপিকাল আফ্রিকা থেকে। হেমেন্থাসের বাংলা নাম গোলকর্মাণ।

**হেমারোকেলিস ॥**

হেমারোকেলিস অরাণ্টিয়াকাম ফুলসহ হাতদেড়েক উঁচু এবং এটি খুব কষ্টসহিষ্ণুও। হেমারোকেলিস ফুলসহ একরকম মাটির সাথে লেগে থাকে এবং এর সিঙ্গেল প্রজাতিগুলিই সমতল বাংলায় মোটামুটি ভাল জন্মায়। হেমারোকেলিস ডে লিলি ইংরাজী নামেও পরিচিত। এদের বিভিন্ন রঙের ফুল পাওয়া যায় ; এদের ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে এবং বংশবৃদ্ধি গোছা ভাগ করে। হেমারোকেলিস স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা পছন্দ করে এবং এদের হালকা ছায়া জায়গাতেও লাগানো চলে। জাপান এর অন্যতম আদি বাসস্থান।

**অন্যান্য কন্দজ ফুলগাছ ইত্যাদি ॥**

উপরের গাছগুলি ছাড়া আরও কিছু কন্দজ ফুলগাছ সমতল বাংলায় করা চলে।

জেফিরেন্থাস, প্যানক্রেটিয়াম, হেলিকনিয়া ইত্যাদির ফুল হয়তো তত সুন্দর নয় কিন্তু এদের চাষ এখানে করা চলে খুব সহজেই। নার্শিসাস এখানে প্রথম বছর ফুল দেবার পরে আর ফুল দিতে চায় না, কিন্তু এই একই কন্দ শৈলাবাসে পাঠিয়ে দিলে সেখানে নিয়মিত ফুল দেবে। ওয়াটসনিয়ার চাষ গ্লাডিওলাসের মত করা যেতে পারে। এছাড়া একিমিনিস, ফ্রিজিয়া, লিলিয়াম, গ্লক্সিনিয়া, হায়াসিন্থ, আইরিস, রনানকুলাস, স্ট্রেলিৎজিয়া, নিপোফিয়া, মোরেয়া প্রভৃতির কোন কোন প্রজাতি থেকে সমতল বাংলায় মোটামুটি ফুল পাওয়া যেতে পারে। তবে উল্লিখিত পরিচর্যার চেয়ে এদের পরিচর্যা অনেকটা আলাদা। কোন্ প্রজাতিগুলি এবং কিভাবে তাদের পরিচর্যা করলে সন্তোষজনক ফুল পাওয়া যাবে তা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ রয়েছে। ভাল গ্লাডিওলাসের রঙ কখনও কখনও পালটে তা সাধারণ গ্লাডিওলাসে পরিণত হয়, এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায় ; এ সম্পর্কেও যথেষ্ট অনুসন্ধান হওয়া দরকার। মিরাবিলিস জলাপা বা সন্ধ্যামণি কন্দজ ফুল হলেও এর চাষ বেশি গ্রীষ্ম ও বর্ষার মরসুমী ফুল হিসাবে। এর সুগন্ধি ফুল ফোটে বিকালে, গাছ খুব কষ্টসহিষ্ণু ও বংশবিস্তার প্রধানত বীজ দিয়ে।

শৈলাবাসের মত অনেক ধরনের কন্দজ ফুলগাছ সমতল বাংলায় করা যায় না ঠিকই। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে এখানে বেশ কিছু কন্দজ গাছের উঁচুমানের ফুল ফোটানো সম্ভব। তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কন্দজ ফুলগাছ এখানে খুবই উপেক্ষিত। অথচ এই উপেক্ষার পেছনে কোন যুক্তি নেই। প্রদর্শনীর সাহায্যে উপেক্ষিত কন্দজ ফুলের সৌন্দর্য জনসমক্ষে তুলে ধরা যেতে পারে। এবং এদের প্রাপ্য সমাদর পেতে সাহায্য করার এটাই একমাত্র উপায়। কন্দজ ফুলের স্বার্থে এ ব্যবস্থা আশু হওয়া দরকার।

# অর্কিড

ফুলের সৌন্দর্য বিচারে অর্কিডের তুলনা মেলা ভার। ফুল শুধু সুন্দর নয়, ফুল ফোটা অবস্থায় গাছে বা ফুলদানিতে তাজা থাকে বহুদিন ধরে। এর ফুল ফোটার সময় প্রধানত গ্রীষ্মকাল। অর্কিডের সম্পর্কে আমাদের একটা ভয়ের ভাব রয়েছে। এর চাষ খুব কঠিন ও ব্যয়সাধ্য এ ভুল ধারণার মূলে রয়েছে অর্কিডের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এর চাষ করতে আরম্ভ করলে দেখা যাবে অর্কিডের চাষ তত কঠিন নয়। তবে এ কথা মনে রাখা ভাল যে অর্কিডের প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর এবং প্রজাতি অনুযায়ী এদের পরিচর্যার তারতম্য ঘটবে। কোন প্রজাতির সঠিক পরিচর্যা কি হবে তা নিজেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বের করে নিতে হবে। তবে অর্কিড চাষের কতগুলি সাধারণ নিয়ম রয়েছে যা কম-বেশি সব গাছের বেলায় প্রযোজ্য। সেগুলি জানা থাকলে এ গাছের চাষ আরম্ভ করা সহজ হবে। অর্কিডের দামের সম্বন্ধে একথা সত্যি যে অর্কিডের অনেক অত্যন্ত সুন্দর প্রজাতির মূল্য খুবই বেশি। বাইরের দেশে আজকাল উন্নত পদ্ধতিতে অল্প সময়ে প্রচুর সংখ্যায় অর্কিডের বংশবিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এতে সেখানে পূর্বের দুর্মূল্য গাছও এখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের এখানে মোটামুটি ভাল অর্কিড সাধারণ মূল্যে পাওয়া সম্ভব এবং খুব ভাল অর্কিড এক রকম পাওয়া যায় না। অনেক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর মতে অর্কিডের প্রজাতির সংখ্যা যে কোন জাতির গাছের ভেতরে সবচেয়ে বেশি। আয়তনে দু'পাঁচ ইঞ্চি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে আয়তনে এত বড় যা কষ্ট করে তুলতে হয় এরকম গাছও অর্কিডের ভেতরে পাওয়া যায়। লতানো স্বভাবের অর্কিডও রয়েছে যা গাছ বেয়ে একশো ফুট উঠতে পারে। অর্কিডের ফুলের ভেতরে বিভিন্ন রঙের সাক্ষাৎ মিললেও কালো রঙের ফুলের অর্কিড কোথাও দেখা যায় না।

**অর্কিডের প্রধান চাহিদা ॥**

অর্কিড ভালভাবে চাষ করতে হলে যেসব বনজঙ্গলে যেসব শ্রেণীর অর্কিডের আদি বাসস্থান তাদের জন্য ঠিক সেরকম আবহাওয়া ইত্যাদি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে অর্কিড বাঁচিয়ে রাখা গেলেও তাতে ফুল পাওয়া যাবে না। প্রধানত এই কারণে বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড চাষের এত তারতম্য। গ্লাসহাউসে কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি সহজ হলেও এর ব্যয় বহন করা খুব অল্প ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

সমতল বাংলার জলবায়ুতে বেশ কিছু মোটামুটি ভাল প্রজাতির অর্কিড সাধারণ যত্ন নিলেই করা সম্ভব। তবে গাছ যোগাড় করার বেলায় একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এমন জায়গার গাছ যোগাড় করবেন না যেখানকার জলবায়ুর সঙ্গে সমতল বাংলার জলবায়ুর তফাত অনেক। চেরাপুনজি বা দার্জিলিং থেকে আনা গাছ যদি বা বাঁচে তা বড় একটা ফুল দিতে চায় না। গাছ যোগাড় করার সময়ে এমন প্রজাতি বেছে নেবেন যা এখানে ভাল ফুল দিয়ে আসছে। ক্যাটলিয়া অর্কিডের উৎপত্তি বিদেশে হলেও সমতল বাংলার জলবায়ুতে এটি ভাল জন্মায়। এটির প্রজাতি এখানে সহজে পাওয়া যায় না। ক্যাটলিয়ার মূল্য এখানকার বেশির ভাগ অর্কিডের চেয়ে বেশি এবং এদের ফুলও দেখতে অত্যন্ত সুন্দর।

**অর্কিডের দুটি প্রধান শ্রেণী ॥**

টেরেস্ট্রিয়াল অর্কিড মাটিতে জন্মায় তাই এদের এই নাম। এদের পরিচর্যা তুলনামূলক বিচারে অনেক সহজ। সমান ভাগে পুরানো গোবর, পাতাপচাসার, সাধারণ মাটি, একটু মোটা দানার বালি এবং ছোট ছোট টুকরো কাঠকয়লা মিশিয়ে এর সারমাটি তৈরী করবেন। টবে বেশি করে চারা দেবেন যাতে গোড়ায় কখনও জল না দাঁড়ায়। গোবর আগুনে ভেজে নেবেন। টেরেস্ট্রিয়াল অর্কিডে দিনে একবার জল দেবেন। আলোবাতাস পাবে এপিফাইটিক অর্কিডের মতই। গাছ বসাবেন এমনভাবে যাতে গাছের কোন অংশ (সিউডোবাল্বসহ) সারমাটির নিচে না থাকে। গাছ টব পালটে বসাবার দরকার পড়লে তা ফুল দেবার পরে করবেন। এই অনুচ্ছেদটিতে শুধু টেরেস্ট্রিয়াল অর্কিডের সম্পর্কে বলা হলো। এ ছাড়া আর সবটাই এপিফাইটিক অর্কিড, যাকে সাধারণ ভাবে শুধু অর্কিড বলে, সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

এপিফাইটিক অর্কিড বন্য জীবনে বড় গাছকে আশ্রয় করে থাকলেও এরা আশ্রয়দাতা গাছ থেকে কোন খাবার নেয় না। এরা প্রধানত পাতার সাহায্যে নিজেদের খাবার নিজেরা জলবায়ুর থেকে তৈরী করে নেয়। অনেক অর্কিড (অনেক টেরেস্ট্রিয়াল অর্কিডও) পাতার নিচের অংশে খাবার জমা করে রাখে। এ সব অর্কিডের পাতার নিচের অংশ দেখতে ফোলানো গোলাকৃতি (সিউডোবাল্ব)। বন্য অবস্থায় এরা সাধারণত বেশ কয়েক হাত উঁচুতে গাছের উপরে থাকে, চাষ করার সময়ও এদের হাত চারেক উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা বিধি।

**অর্কিড রাখার জায়গা ॥**

অর্কিড রাখতে হবে এরকম জায়গায় যেখানে এ গাছ সোজাসুজি রোদ পাবে না এবং পশ্চিমের রোদ পাবে না একেবারেই। বড় গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে ঝিরি ঝিরি রোদ আসে সেরকম রোদ অর্কিডের বিশেষ উপযুক্ত। যেখানে বড় গাছের সুবিধা পাচ্ছেন সেখানে গাছের পাতার ফাঁকের রোদের সুযোগ নেবেন। পশ্চিমের রোদ আটকাতেও গাছের বা বাড়ীর দেয়ালের সাহায্য নেওয়া উচিত। বড় গাছের সুবিধা না থাকলে ঝিরি ঝিরি রোদ দেবার ব্যবস্থা অন্য ভাবে করে নিতে হবে। অর্কিড রাখার জায়গার চাল মুলীবাঁশের বোনা ছোট ছোট ফাঁক-ওয়ালা চাটাই দিয়ে ছেয়ে দেবেন। গ্রীষ্মকালে চাটাই-র উপরে নারকেল গাছের পাতা (সরু সরু পাতা না ছাড়িয়ে পুরো পাতা) বিছিয়ে দিতে হবে। পশ্চিমের রোদ যাতে অর্কিডে না লাগে সেভাবে নারকেলের পাতা বা লতাগাছ দিয়ে একটু ঘন করে ছেয়ে নেবেন। শীত বা বর্ষার সময়ে নারকেলের পাতা চাটাই-র উপর থেকে সরিয়ে নেবেন।

এ সময়েও কিন্তু পশ্চিমের রোদ লাগানো চলবে না। অর্কিড ঝুলাবার ব্যবস্থা শক্ত করে করবেন। এছাড়া অর্কিড রাখার জন্য এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে প্রচুর হাওয়া চলাচল করে। এর রাখার জায়গা উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বাভাবে করলে ভাল। এবং অর্কিড ঝোলাবেন এভাবে যাতে ভোরের রোদ যদি বা সরাসরি পড়ে, রোদ চড়লে তা যেন অর্কিডে সরাসরি না পড়ে।

অর্কিড আর্দ্র আবহাওয়া ভালবাসে এবং এই আবহাওয়ায় এদের পক্ষে খাবার তৈরী করা সহজ। কৃত্রিম আর্দ্রতা সৃষ্টি করতে অর্কিড রাখার জায়গায় মাটিতে জলভরা বড় পাত্র রাখতে হবে। অর্কিড রাখার পাশাপাশি জায়গা ও ভূমিতল দিনে কয়েকবার ভিজিয়ে দিয়েও কৃত্রিম আর্দ্রতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বাড়ী তৈরীর কাজে ইট ভেজাবার ট্যাঙ্কের মত পাকাপোক্ত জলাশয় করে নিতে পারলে ভাল। বিকল্পে গরুকে জাব দেবার নাদা ব্যবহার করা যেতে পারে। জল মাঝে মাঝে পালটে দেওয়া দরকার।

**অর্কিড ঝুলানো ॥**

দুটি উপায়ে অর্কিড ঝুলানো যেতে পারে। একটি টবে গাছ লাগিয়ে, অন্যটি একখণ্ড ডালে অর্কিড গাছটি বেঁধে। এ দুটির ভেতরে টবে অর্কিড ঝুলানো বেশি প্রচলিত। ডালে বেঁধে ঝুলাবার জন্য প্রায় হাতখানেক লম্বা ও হাতের মত মোটা আমের ডাল বেছে নিয়ে তার উপরে অর্কিডের শেকড় খুব সাবধানে ছড়িয়ে দিতে হবে। শেকড়ের উপর খুব পাতলা করে মস্ বিছিয়ে দিয়ে কাতার দড়ির সাহায্যে খুব সাবধানে বেঁধে দেবেন। মস্ বেছাবেন খুব পাতলা করে এবং বাঁধার কাজে শুধুমাত্র কাতার দড়ি ব্যবহার করবেন। এর পরে অর্কিড রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় গাছ ঝুলিয়ে দেবেন।

অর্কিডের জন্য বিশেষভাবে তৈরী টব ও ঝুলোবার লোহার চেন কিনতে পাওয়া যায়। গাছের আয়তন অনুযায়ী টব ছোটবড় হবে। টবে প্রথমে একপ্রস্থ ঝামা ইট দেবেন। এই ঝামার উপরে পাতলা করে মস্ বিছিয়ে তার উপরে অর্কিডের শেকড় ছড়িয়ে দিতে হবে। এবং আস্তে আস্তে আরও ঝামার ও কাঠকয়লার টুকরো দিয়ে টব ভরে দিন, এগুলি এভাবে দেবেন যাতে গাছ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্কিডের পাতার কোন অংশ (সিউডো-বাল্ব সহ) ঝামার নিচে যাবে। ঝামা ইট দুইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া ধরনের ও কাঠকয়লা ইঞ্চিখানেক লম্বা ধরনের হবে। কাঠকয়লার পরিমাণ ঝামার পরিমাণের দশ ভাগের একভাগ হওয়া দরকার।

**জল দেওয়া ॥**

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে অর্কিড গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বাড়ে ও শীতকালে বিশ্রাম নেয়। গ্রীষ্মকালে জল দেবেন দিনে দুবার, জল দেবেন সকালে ও বিকালে। বর্ষাকালে জল দেবার দরকার নেই, কিন্তু যেসব দিনে মোটেই বৃষ্টি হবে না এবং দিনটিতে গরম পড়লে দিনে অন্তত একবার জল দিতে হবে। শীতকাল আরম্ভ হলে জল দেবেন সপ্তাহে একবার, জল দেবার উপযুক্ত সময় রোদের তাপ একটু বাড়লে পরে। জল দেবার জন্য পেতলের পিচকারি (এর সূক্ষ্ম ঝারির দিক) ব্যবহার করবেন। জল দেবার বেলায় সব সময়েই গাছের পাতা ও ডাল ভাল করে ভিজিয়ে দেবেন।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

গ্রীষ্মকালে অর্কিডের টবের ঝামার উপরে পাতলা করে মস্ বিছিয়ে দিতে হবে যাতে গাছের শেকড় বেশীক্ষণ ভেজা থাকে। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হলে এই মস্ ভাল করে তুলে নেবেনই, নইলে গাছের ক্ষতি হবে। টব, ঝামা ইত্যাদি ব্যবহার করার আগে বেশ ভাল করে ধুয়ে নেবেন। এগুলি পরিষ্কৃত অবস্থায় ব্যবহার না করলে এদের থেকে রোগের আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা। অর্কিডে রোগের আক্রমণ কম এবং রোগ ছড়ায় প্রধানত কীটপতঙ্গের মাধ্যমে, তাই যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে অর্কিড রাখার জায়গার কীটপতঙ্গ মারতে হবে। একাজে রোগর ব্যবহার করতে পারেন। অর্কিডের রোগাক্রান্ত বা মরা পাতা ও শেকড়

কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

**অর্কিড চাষের নতুন আঙ্গিক ॥**

অর্কিডের বংশবিস্তারের নতুন পদ্ধতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯৫৬-তে জর্জেস মোরেল এই পদ্ধতি, যার নাম মেরিস্টেম পদ্ধতি, আবিষ্কার করেন। অর্কিডের পুরানো গাছের কোন বিশেষ জায়গার খুব ছোট একটু অংশ নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তা দিয়ে একই সঙ্গে অনেক নতুন ছোট অর্কিড গাছের সৃষ্টি করা হয়। এ গাছগুলি সাধারণ নতুন গাছের থেকে বাড়ে অনেক তাড়াতাড়ি। সহজেই অনেক গাছ তৈরী করা যাচ্ছে বলে অনেক দেশে অর্কিড গাছের মূল্য খুবই কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, এপিফাইটিক অর্কিড খাবার খায় প্রধানত পাতার সাহায্যে। এ গাছের গোড়ায় কোন সার দেওয়া উচিত কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আজকাল বাইরের অনেক দেশে অর্কিডে পাতার সার বা ফলিয়ার ফিড ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এতে খুব ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশেও গোলাপে পাতার সারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। অর্কিড চাষের এই নতুন পদ্ধতি দুটি আমাদের দেশে প্রচলন ঘটাতে পারলে অর্কিড চাষ আরও সহজ হয়ে উঠতো। বিশেষ করে বংশবিস্তারের নতুন পদ্ধতির সাহায্যে অর্কিডের নতুন গাছ তৈরী করতে পারলে দুর্লভ গাছও সহজলভ্য হয়ে উঠবে। অর্কিডের সাধারণ প্রজাতির দাম বেশি না হলেও, এখানে খুব ভাল প্রজাতির অর্কিড যোগাড় করা খুব কঠিন এবং দুর্লভ বলে এদের দামও প্রচুর। তাই মেরিস্টেম পদ্ধতির প্রচলন হলে সাধারণ বিত্তশালী ব্যক্তিরাও সত্যিকারের ভাল অর্কিডের চাষ করার সুযোগ পাবেন।

# মরসুমী গাছের বীজ চারানো ও এদের চারাগাছ

মরসুমী ফুল ফুলবাগানের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিভিন্ন মরসুমে বিভিন্ন ফুলের চাষ, এবং এদের ভেতরেও মরসুমী ফুলের সত্যিকারের মেলা বসে শীতকালে। এ সময়ে ফুলে ফুলে বাগান ভরে যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাতেও মরসুমী ফুল ভালই হয়ে থাকে, তবে এই দুই সময়ের মরসুমী ফুলগাছের সংখ্যা শীতের তুলনায় অনেক কম। এছাড়া শীতকালের সুন্দর আবহাওয়া ভাল ফুল ফোটানো অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলে। একথা সত্য যে, একরকম সব মরসুমী ফুলই এসেছে বাইরের দেশ থেকে। কিন্তু একথা আরও সত্য যে এদের অনেক ফুলই এ দেশকে আপন করে নিয়েছে।

**মরসুমী ফুলের বীজ চারানো প্রসঙ্গে ॥**

মরসুমী ফুলের বীজ সত্যিকারের উঁচুদরের না হলে সবরকম যত্ন নিলেও ভাল ফল মিলবে না। ভাল বীজ যদি বেশি দাম দিয়েও কিনতে হয় তবে তাও করবেন। আমাদের দেশের আর্দ্র জলবায়ুতে মরসুমী ফুলের বীজ থেকে চারা জন্মাবার শক্তি খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। বাইরে অনেক দেশে বায়ু নিরোধক প্যাকেটে বীজ পাওয়া যায়, এবং এই প্যাকেটের গুণে মরসুমী ফুলের বীজ বেশ কিছুদিন ধরে ভাল থাকে। এটা বিশেষ আনন্দের কথা যে আজকাল এদেশেও বায়ুনিরোধক ( ময়শ্চার-প্রুফ ফয়েলের প্যাকেট ) প্যাকেটে বীজ বিক্রী হতে আরম্ভ করেছে। বীজের বাজারের এই অগ্রগতি বাগান করা আরও অনেক বেশি আনন্দদায়ক করে তুলবে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত, এই তিনটি মরসুমেরই বীজ বোনা বা চারানোর পদ্ধতি মূলত এক। তবে আবহাওয়ার তফাতের জন্য এই আলাদা তিনটি মরসুমে বীজ চারাবার পদ্ধতির

কিছুটা হেরফের হয়ে থাকে। শীতকালে অনেক বেশি ধরনের মরসুমী ফুল করা চলে এবং এদের অনেকগুলি আবার অন্যান্য ফুলের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। এই ভাল ফুলগুলির অনেকগুলি অন্যান্যদের তুলনায় খুব সুখী প্রকৃতিরও, বীজ চারানোর বেলা থেকেই এদের উপযুক্ত পরিচর্যা নেওয়া দরকার, নইলে আশানুরূপ ফুল পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রীষ্মের মরসুমী বীজ চারাবার উপযুক্ত সময় জানুয়ারীর শেষ থেকে মার্চ পর্যন্ত, বর্ষার এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি এবং শীতের মরসুমী ফুলের অগাষ্টের শেষ থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত। আমরা অনেক সময়েই বীজ চারাতে দেরি করি অথবা বাধ্য হই দেরি করতে। এর ফলে ফুল মরসুমের উপযুক্ত সময়ের অনেক পরে ফোটে এবং এ জন্য এদের থেকে যথেষ্ট ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব হয় না। বীজ চারানো সম্পর্কে অনেক দিন ধরে এই বিশ্বাস চলে আসছে যে পূর্ণিমার কাছাকাছি বীজ চারালে তার চারা ভাল ওঠে, তাই যেখানে সম্ভব সেখানে পূর্ণিমার কাছাকাছি বীজ চারানো ভাল।

এমন কিছু বীজ রয়েছে যা আয়তনে অত্যন্ত ছোট, এদের বীজ চারাবার বিষয়ে আরও বেশি সাবধান হওয়া দরকার। এই বীজগুলি শুধু সুখী প্রকৃতির নয়, এর অনেকগুলিই মূল্যের দিক দিয়ে খুবই দামী। ডাবল পিটুনিয়া, ভাল সিঙ্গেল পিটুনিয়া, সিনেরারিয়া, বিগোনিয়া প্রভৃতি এই ধরনের বীজ। এই সব সুখী বীজ বা যেখানে অল্প চারা দরকার এরকম বীজ গামলাটবে চারানো উচিত এবং যেসব ফুলগাছের চারা বেশি সংখ্যায় দরকার তাদের বীজতলায় চারাতে হবে। কাটিং করেও অনেক মরসুমী ফুলগাছের সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া চলে। দামী ও সাধারণ পিটুনিয়া, কারনেশান, ভারবিনা, গাঁদা, পরচুল্যাকা প্রভৃতি গাছের কাটিংয়ে সহজেই শেকড় আসে। ডালিয়ার কাটিং বসাবার মাটিতে এদের কাটিং বসানো যাবে। কারনেশান দ্বিবর্ষজীবী ; ভাল ফুলের কারনেশান থেকে কাটিং করে সামনের বছরে চাষ করা অনেক দেশে প্রচলিত নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। ডাবল পিটুনিয়াও কাটিং-এর সাহায্যে সামনের বছরের জন্য বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। ডাবল গাঁদার ভাল জাতের বীজ দিয়ে করা গাছেরও সিঙ্গেল ফুল হতে দেখা যায়। ডাবল ফুলের কেয়ারির ভেতরে কিছু সিঙ্গেল ফুল ফুটে থাকা দেখতে নিশ্চয়ই খুব বিসদৃশ। এ অসুবিধা দূর করতে বর্ষার মরসুমে গাঁদার ফুল ফুটিয়ে সেই গাছ থেকে কাটিং করে তা শীতের মরসুমে লাগানো ভাল। যে গাছগুলি থেকে কাটিং নিতে চান তাদের ফুল ভাল কিনা দেখে নেবার জন্য উপরের কয়েকটি ডালে মাত্র ফুল হতে দেবেন। এবং নিচের ডালগুলি যাতে নরম থাকে সেজন্য এ ডালগুলিতে সপ্তাহে একবার দশ লিটার জলে দশ গ্রাম ইউরিয়া গুলে তা পাতার সার হিসাবে ভোরে স্প্রে করবেন।

যে মাটিতে বীজ ফেলা হবে তা শোধন করে নেওয়া একটি অবশ্যকর্তব্য। শোধন করে নিলে নোনা ধরা রোগের হাত থেকে চারাগাছ বাঁচানো সহজ হবে। বীজতলার উপরের পনেরো সেণ্টিমিটার মাটি, গামলাটবের সব মাটি ও বীজের উপরে দেবার মাটি শোধন করে নেওয়া দরকার। কুড়ি সেণ্টিমিটার করে উঁচু ও একমিটার করে চওড়া ও পাশে বীজ ফেলার মাটি কোন বাঁধানো জায়গার উপরে প্রথমে বিছিয়ে দিতে হবে। শতকরা দুভাগ শক্তিবিশিষ্ট ( ফরমালিন দুভাগ ও জল আটানব্বুই ভাগ ) ফরমালিন দ্রবণের চৌদ্দ লিটার দিয়ে এই পরিমাণে মাটি ভাল করে ভিজিয়ে তা ভেজা চটের বস্তা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেওয়া দরকার। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা ঢেকে রাখার পরে চটের বস্তা বা থলিগুলি তুলে নিতে হবে এবং দ্রবণটি যাতে সম্পূর্ণভাবে উপে যায় সেজন্য এই মাটি নেড়েচেড়ে দিতে হবে। মাটি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাবার দিন সাতেক পরে তা বীজ চারানোর কাজে লাগানো চলবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে মাটি ভালভাবে শোধন করা সম্ভব হলেও এটি করা কিছু কঠিন ; বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন শীতের মরসুমী ফুলের বীজ চারাতে হয়, কারণ তখন মাটি শুকনোই দুরূহ ব্যাপার। তাই একটি সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে বীজ ফেলার মাটি বা কাটিং বসাবার মাটি মোটামুটি ভাবে শোধন করে নিতে পারেন। বিল্ডিং তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয় এরকম কড়াই বা অন্য কোন কিছুর উপরে বীজ চারাবার মাটি হালকা ভাবে বিছিয়ে মোটামুটি গরম করে নিতে হবে। তবে মোটামুটি গরম করতে গিয়ে মাটি যেন ভাজাভাজা না হয়ে পড়ে। মাটি গরম করার দিনই বীজ চারানো

উচিত। গোড়া পচে গিয়ে চারাগাছ পড়ে যেতে আরম্ভ করেছে অর্থাৎ নোনা ধরা রোগে চেশান্ট কম্পাউন্ড, পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট, ব্লাইটক্স ইত্যাদি ওষুধ মোটামুটি ভাল কাজ দেবে। চারাগাছ বেরুলে তাতে দেবার জলে অল্প পরিমাণে ব্লাইটক্স দেওয়া ভাল, ব্লাইটক্স সপ্তাহে দুদিন করে দেওয়া যেতে পারে। ঘন হয়ে চারাগাছ উঠলে তাতে নোনা ধরার ভয় খুবই বেশি। এ অবস্থায় কিছু কিছু চারা মাঝখান থেকে তুলে অন্য চারাগাছগুলির ভেতরের দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে হবে। তুলে নেওয়া চারাগুলি অন্য কোথাও লাগিয়ে বড় করে নেওয়া যেতে পারে। বীজ কখনই ঘন করে চারানো হবে না এবং বীজ চারাবার পরে বীজ যতটা পুরু তার দুগুণ ঘন করে বীজের উপরে মাটি দেওয়া দরকার।

চারাগাছকে ঠিকমত রোদ খাওয়ানো একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। সকালের রোদ চারাগাছের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, এবং দরকার পড়লে বিকালের পড়ন্ত রোদও চারাগাছে দেওয়া যেতে পারে। চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অল্প করে রোদের পরিমাণ বাড়াতে হবে, এভাবে আস্তে আস্তে চারাগাছ বাইরে লাগাবার উপযুক্ত হবে। টবের চারাগাছ প্রয়োজনমত রোদে বার করে এবং বীজতলার চারাগাছে হোগলার চাটাইয়ের ছাউনি সরিয়ে এদের রোদ দেবার ব্যবস্থা করবেন।

**বীজতলা তৈরী ও তাতে বীজ ছড়ানো ॥**

বীজতলা তৈরী করতে হবে পরিষ্কার জায়গায় যেখানে সারাদিন রোদ পড়ে, এবং বীজতলাকে প্রয়োজনমত বৃষ্টি ও রোদ থেকে রক্ষা করতে হবে। এটি এমনভাবে তৈরী হবে যাতে পাশাপাশি জায়গা থেকে তা অন্তত পনেরো সেন্টিমিটার উঁচু হয়। একটির উপরে আর একটি ইট বসিয়ে, এভাবে সারা বীজতলা ঘিরে দিলে জমির থেকে উঁচু করা মাটি পড়ে যাবে না। এই দুটি ইটই আলতোভাবে বসানো হবে এবং কখনই এগুলি গেঁথে দেওয়া হবে না ; এছাড়া সব সময়ে ইটের চ্যাপটা দিক মাটির দিকে মুখ করে বসাতে হবে। প্লাষ্টিকের জয়জয়কার আজকাল সর্বত্র, বৃষ্টির হাত থেকে বীজতলার বীজ বা চারাগাছকে রক্ষা করতে মোটা স্বচ্ছ পলিথিন পেপার বা প্রায় সাধারণ কাচের মত মোটা ও স্বচ্ছ পলিথিন শিটের সাহায্য নিতে হবে। কাঠের বা বাঁশের ফ্রেমের উপরে পলিথিন পেপার বা শিট দিয়ে বীজতলার উপরে দোচালা ঘরের মত ছেয়ে দেবেন। এর ছাউনি এমন হবে যে বীজতলায় বৃষ্টি পড়বে না কিন্তু ছাউনির নিচের অনেকটা জায়গা ফাঁকা থাকবে। এই ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার হাওয়া চলাচল করার জন্য এবং যাতে ছাউনি থাকা অবস্থাতেই বীজতলার দুপাশে বসেই বীজতলার জল দেওয়া ইত্যাদি পরিচর্যা করা চলে। পলিথিন পেপার বা শিটের প্রধান কাজ হবে বৃষ্টি আটকানো এবং একই সঙ্গে বৃষ্টির সময়ে চারাগাছে যাতে আলোর অভাব না হয় তা দেখা। শক্ত কাঠের ফ্রেমের উপরে পলিথিনের শিট দিয়ে ছেয়ে দিলে তা অনেক বছর ধরে কাজ দেবে। এই পলিথিনের শিটসহ ফ্রেমটি যে মরসুমে এর দরকার তখনই শুধু কাজে লাগানো হবে, অন্য মরসুমে এটিকে সাবধানে তুলে রাখা হবে। বীজতলার চারদিকে চারটি খুঁটি পুঁতে তাদের সঙ্গে ফ্রেমটিকে বেঁধে দেবেন। বীজ চারানো থেকে চারাগাছ বেরুনো পর্যন্ত বীজতলার রোদ পাবার দরকার নেই, বরঞ্চ রোদ পেলে ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। রোদ থেকে এদের রক্ষা করার জন্য হোগলার চাটাই ব্যবহার করতে হবে। দিনের বেলায় এদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হবে এবং সূর্য অস্ত গেলে এদের সরিয়ে নেওয়া দরকার। চারাগাছ বেরুবার পরে হোগলার চাটাই সরিয়ে নিয়ে বীজতলার চারাগাছের জন্য সকালের রোদের পরিমাণ প্রত্যেক দিন অল্প করে বাড়াতে হবে। তিনটি মরসুমের বীজতলার জন্যই হোগলার চাটাই ব্যবহার করার দরকার পড়বে। এরা বৃষ্টি আটকাতেও সাহায্য করবে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলে এগুলি ভাল কাজ দেবে না। এছাড়া হোগলার আলতো ছাউনিও রোদ না থাকলে ভেতরটা অন্ধকার করে দেবে যা ছোট চারাগাছের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই অঝোর বৃষ্টির সময়ে এদের ব্যবহার বেশি সময়ের জন্য না করাই ভাল। বীজে বা চারাগাছে সম্ভব হলে রাতে হিম খাওয়ানো ভাল কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে এ ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

বীজতলার মাটি প্রথমে একহাত গভীর করে কুপিয়ে নেওয়া দরকার। এর উপরের

ছ'ইঞ্চি বা পনেরো সেণ্টিমিটার মাটি ভাল করে তৈরী করে নিতে হবে। এই উপরের ছ'ইঞ্চি মাটি তৈরী হবে এইভাগে—একভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ লালবালি ও দুভাগ পাতাপচাসার ; টবে বীজ চারাবার মাটিও তৈরী করবেন এই একই ভাগে। সাধারণ মাটি ও পাতাপচাসার মিহি গুঁড়ো করে আটা-ছাঁকার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেওয়া দরকার। বীজ চারানোর মাটি অনেক দিন ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু ব্যবহার করার আগে প্রতিবার এ মাটি শোধন করে নিতে হবে। বীজতলায় বীজ চারিয়ে তার উপরে দেবার উপযুক্ত মাটি সমানভাগে পাতাপচাসার ও লালবালি মিশিয়ে তৈরী করবেন। পাতাপচাসার গুঁড়িয়ে ছেঁকে নিতে হবে এবং বীজের উপরে দেবার মাটিও শোধন করে নিতে হবে।

বীজ চারানোর আগে বীজতলার উপরের মাটি হাত দিয়ে আলতোভাবে চেপে সমান করে দেবেন। বীজ চারাবার কয়েক ঘণ্টা আগে বীজতলার উপরের ছ'ইঞ্চি মাটি সূক্ষ্ম ঝারি দিয়ে মোটামুটি ভাল ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। জল শুষে গিয়ে উপরের মাটি যখন বেশ একটু ভেজাভেজা থাকবে তখন বীজ সাবধানে ছড়িয়ে তার উপরে বীজ ঢাকার মাটি দিয়ে দেবেন।

**গামলাটবে বীজ চারানো ॥**

বীজ চারাবার কাজে গামলাটব ও অল্প উঁচু কাঠের টবের বহুল ব্যবহার। এগুলির সবচেয়ে বড় সুবিধা যে এদের প্রয়োজনমত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়। গামলাটবে বা অন্য কিছুর টবে অন্তত তিনটি ফুটো থাকতে হবে। ফুটোর ঠিক ওপরে বাঁকানো চারা এমন ভাবে দেবেন যাতে তা জল সহজে বের করে দেবার সুবিধা করে দেয়। এর উপরে ইঞ্চিদেড়েক পুরু করে আরও চারা, অর্থাৎ ভাঙা টবের টুকরো ইত্যাদি, দিতে হবে। চারার উপরের আধইঞ্চি মটর দানার মত বড় দানার পাতাপচাসার দিয়ে ভরে দিতে পারলে ভাল। এর পর থেকে টবের কানার আধইঞ্চি নিচু পর্যন্ত বীজ চারাবার মাটি দিয়ে ভরে দেবেন। এই বীজ চারাবার মাটিও বীজতলার মাটির মত করে চেপে দিতে হবে এবং বীজ ফেলার কয়েক ঘণ্টা আগে সূক্ষ্ম ঝারি দিয়ে মোটামুটি ভিজিয়ে দিতে হবে। বীজ খুব সাবধানে চারাবার পরে তা বীজের দুগুণ পুরু করে বীজ ঢাকার মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। টবের বীজ ঢাকার মাটি একভাগ মিহিগুঁড়ো পাতাপচাসার, ও দুভাগ বড়দানার পরিষ্কার সাদাবালি অথবা অভাবে সাধারণ লালবালি মিশিয়ে নিয়ে তৈরী করবেন। বীজ চারানো টবে প্রয়োজনমাফিক জল দিতে হবে কিন্তু চারাগাছ না বেরুনো পর্যন্ত এদের একেবারেই রোদ খাওয়াবেন না। যদিও টবগুলি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে প্রচুর আলোবাতাস পায়। রোদ না পাওয়া ও আলোবাতাস ঠিকমত পায়, এ ব্যবস্থা করতে দরকার পড়লেই টব সরিয়ে রাখতে হবে। রাতে বৃষ্টি হবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হলে টবগুলি উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাখবেন, এ কাজ চারা বড় হলেও করে যাওয়া ভাল।

খুব সূক্ষ্ম বা সুখী প্রকৃতির বীজ এবং দামী বীজের আরও বাড়তি যত্ন নেওয়া দরকার। সূক্ষ্ম বীজের সঙ্গে দশগুণ বীজের উপরে দেবার মাটি মিশিয়ে তা টবে চারাবেন ; এভাবে চারাবার পরে এদের উপরে আর মাটি দেবার দরকার নেই। এই সব বীজের বেলায় টবের নিচ থেকে জল দিতে হবে। টবের উচ্চতা থেকে জল কম রয়েছে এরকম একটি জলপূর্ণ পাত্রের ভেতরে টবটি বসিয়ে দেবেন এবং এর ফলে টবের মাটি নিচ থেকে আস্তে আস্তে ভিজে যাবে। উপরের মাটি ভেজাভেজা হয়ে উঠলেই টব জল থেকে তুলে নিতে হবে। বীজ চারাবার কয়েক ঘণ্টা আগে এভাবে টবের মাটি ভিজিয়ে নেবেন এবং আবার যখনই দরকার পড়বে এই একই ভাবে টবে জল দেবেন। বীজ চারিয়ে বড় একখণ্ড জানালায় লাগাবার কাচ দিয়ে গামলাটবটি ঢেকে দিতে হবে এবং বীজে আলো লাগা বন্ধ করতে কাচের উপরে একখানি ব্রাউন পেপার দিয়ে দেবেন। প্রত্যেকদিন সকালে ও বিকালে কাচখানি তুলে তার ভেতরের দিকে জমা জল পুছে দিতে হবে। বীজ থেকে চারাগাছ বেরুতে আরম্ভ করলে কাচ ও ব্রাউন পেপার সরিয়ে নেবেন এবং এর পর থেকে এদের পরিচর্যা অন্যান্য গামলাটবে চারানো বীজের মত করতে হবে।

**সরাসরি জমিতে বীজ চারানো ॥**

মরসুমী ফুলের কিছু গাছ রয়েছে যেগুলি যেখানে ফুল দেবে সেখানে সরাসরি লাগিয়ে দিলে জন্মায় ভাল, যদিও এদের বীজতলায়ও চারাগাছ করা সম্ভব। সরাসরি চারালে ফল ভাল দিলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। শীতের মরসুমী বীজ চারাবার সময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হয় এবং বর্ষার মরসুমী ফুলের বীজ চারাতে হয় প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে। এর ফলে খুব কষ্টসহিষ্ণু গাছগুলির চারাগাছ ছাড়া অন্যগুলির চারাগাছ বেশি জলের জন্য অথবা প্রয়োজনীয় জল না পাবার জন্য মারা পড়ে সহজেই। এছাড়া কেয়ারিতে বীজ সরাসরি ছড়িয়ে দিয়ে লম্বা কেয়ারিগুলি সব সময় ধরে ভেজাভেজা রাখা খুবই কষ্টকর। তাই সুইট পী, ন্যাশটারসিয়াম, ইপোমিয়া প্রভৃতির বীজ ছাড়া অন্যান্য বীজ বীজতলায় বা গামলাটবে চারিয়ে তার চারাগাছ তুলে নেওয়াও ভাল। যেগুলি সরাসরি চারাবার কথা কিন্তু বীজতলায় চারাগাছ করে পরে তুলে লাগানো হচ্ছে, তাদের বেলায় চারাগাছ খুব সাবধানে তুলবেন। এর থেকেও ভাল উপায় একটি করে বীজ তিনইঞ্চি টবে বা আরও ছোট টবে লাগিয়ে চারাগাছ তৈরী করে তা টবের মাটিসহ সাবধানে খুলে যেখানে লাগানো দরকার লাগিয়ে দেওয়া। এতে যেখানে চারাগাছ লাগানো হবে সেখানে ভাল হয়ে না ওঠার কোন কারণ নেই এবং বীজ থেকে চারাগাছ করতে কোন ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না। ক্লায়ান্থাস ইত্যাদির চারা এভাবে করাই সবচেয়ে ভাল উপায়।

**চারাগাছ পালটে বসানো ॥**

জমিতে বা বড়টবে লাগাবার আগে গামলাটব থেকে পালটে অন্য টবে কিছুদিনের জন্য লাগিয়ে চারাগাছগুলিকে শক্ত করে নিতে পারলে ভাল। পালটে লাগালে চারাগাছগুলি শুধু অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু হবে না, এদের পূর্ণবয়স্ক গাছের আয়তনও অপেক্ষাকৃত ছোট হবে। তবে যেগুলির বীজ সরাসরি চারানো উচিত তাদের বেলায় টব পালটে লাগানো ঠিক হবে না। অনেক সময়ে চারাগাছ তৈরী হয়ে গেলেও এদের লাগাবার জমি তৈরী করে ওঠা সম্ভব হয় না, এ অবস্থায় চারাগাছ টব পালটে লাগানো বিশেষ দরকার ; নাহলে চারাগাছে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ফুল এসে যাবে এবং ফলে ফুলও খারাপ হবে। টব পালটে লাগানোর কাজ বেশ পরিশ্রমের, তাই সুখী ও দামী চারাগাছের বেলায় ছাড়া এটা করাও বেশ কঠিন। সুখী ও দামী চারাগাছের বেলায় আরও একটি কারণে এটি করা দরকার। বীজ থেকে সব চারাগাছ একসময়ে ওঠে না, কোনগুলি ওঠে আগে এবং কোনগুলি অনেক পরে। যে চারাগাছগুলি আগে জন্মেছে তাদের অল্প অল্প করে বেশি রোদ দরকার, কিন্তু যে বীজগুলির চারাগাছ তখনও ওঠেনি বা কিছু ছোট চারাগাছ খুব নতুন উঠেছে, তাদের পক্ষে রোদ বা বেশি রোদ ক্ষতিকারক। এ অবস্থায় বড় চারা-গাছগুলি অন্য টবে লাগিয়ে দিলে মূল গামলাটবে বেশি রোদ খাওয়াবার কখনও দরকার পড়বে না।

চারাগাছ তুলে অন্য টবে পালটে লাগাবার ঘণ্টাখানেক বা আরও আগে দুটি টবের মাটিই ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। চারাগাছ খুব সাবধানে তুলে অন্য টবে ইঞ্চিদুয়েক ফাঁক ফাঁক করে লাগাতে হবে। চারাগাছগুলি সবসময়ে পাতাতে ধরতে হবে, অন্য কোথায়ও ধরলে ক্ষতির সম্ভাবনা। চারাগাছ তুলবার সময়ে পাশের ছোট চারাগাছের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। বীজ চারাবার একটব মাটিতে অল্প কিছুটা গুঁড়ো গোবরসার ও চায়ের চামচের তিনচামচ সুপারফসফেট মিশিয়ে নিলেই তা পালটে লাগাবার টবের উপযুক্ত মাটি হবে। পালটে লাগাবার প্রথম দুদিন চারাগাছগুলিকে হালকা ছায়ায় রাখতে হবে, এর পর থেকে এদের জন্য রোদের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে যাতে জমিতে বা বড় টবে লাগালে তা পুরো দিনের রোদ সহ্য করতে পারে। চারাগাছ তুলে অন্য টবে লাগাবার কাজ খুব তাড়াতাড়ি করবেন, কারণ দেরি হলে গাছের ক্ষতি হতে পারে। চারাগাছ লাগিয়ে এর গোড়ার মাটি সাবধানে চেপে দেওয়া দরকার, এবং যে টব থেকে চারাগাছ তোলা হয়েছে তাতে আরও ছোট চারাগাছ থাকলে বা চারাগাছ হবার সম্ভাবনা থাকলে চারাগাছ তোলার জন্য যেসব ছোট গর্ত হয়েছে তা বীজ চারাবার মাটি দিয়ে

সাবধানে ভরে দিতে হবে। চারাগাছে পাতার সংখ্যা চার থেকে ছয়ে থাকার সময়ে তা জমিতে বা বড় টবে লাগানো উচিত। সব চারাগাছ যতটা সম্ভব তাদের গোড়ার মাটিশুদ্ধ তুলবেন।

**বীজ ও চারাগাছে জল দেওয়া ॥**

বীজে বা চারাগাছে এমন ভাবে জল দিতে হবে যাতে বীজতলার উপরের ছইঞ্চি মাটি ও টবের সব মাটি সবসময়ে ভেজাভেজা থাকে। মাটি শুকিয়ে গেলে বা তাতে জল বেশি হলে বীজ বা চারাগাছের ক্ষতি হবে। চারাগাছ রোদে রয়েছে ঐ সময়ে জল দেবার দরকার পড়লে চারাগাছগুলির টব ছায়ায় এনে টবের মাটি ঠান্ডা করে তারপরে জল দেবেন। মাটি গরম হয়ে রয়েছে এ অবস্থায় জল দিলে চারাগাছের ক্ষতি হবেই। একেবারে সন্ধ্যার দিকে জল দিলে বাড়তি জল বেরিয়ে যেতে অনেক সময় লাগে এবং ফলে নোনা ধরা রোগের আশঙ্কা থাকে, তাই সবসময়ে চেষ্টা করবেন যাতে এ সময়ে জল দেবার দরকার না পড়ে। ক্লিওম, মেসেমব্রিয়ান্থিমাম ইত্যাদির চারাগাছে জলের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলে এদের গোড়া পচে যেতে পারে, তাই এদের বেলায় অতিরিক্ত সাবধান থাকা দরকার। উপর থেকে জল দেবার কাজ সব সময়ে সূক্ষ্ম ঝারির সাহায্যে করবেন।

# শীতের মরসুমী ফুল

সমতল বাংলায় ফুলের সমারোহ শীতকালে। এ সময়ের ফুলের ভেতরে প্রধান গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা ও এ সময়ের মরসুমী ফুল। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে এ সময়ে ফুল ফোটে খুব ভালো এবং শীতের মরসুমী ফুলের সংখ্যাও প্রচুর। এরা সংখ্যাতেই শুধু বিপুল নয়, এদের ভেতরে অনেক ফুল রয়েছে যাদের রূপে গুণে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। শীতের মরসুমী ফুল আমাদের মন অধিকার করে নিয়েছে তাই সব বাগানেই এদের বেশ কিছুর সাক্ষাৎ মিলবে।

শীতকালের মরসুমী ফুলের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এ সময়ের সমাদৃত ফুলগুলির একরকম সবই এসেছে বাইরের দেশ থেকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের বেশ কয়েকটি মরসুমী ফুলের জন্মভূমি ভারত, কিন্তু শীতের মরসুমী ফুলের ভেতরে বোধ হয় একটি গাছও নেই যাকে আমরা দেশী বলে দাবি করতে পারি। তবে বিদেশ থেকে এলেও এরা এখন পুরোপুরি এদেশের অধিবাসী হয়ে গেছে। শীতের মরসুমী ফুলের সংখ্যা অনেক বলে কোন ফুলগুলি চাষ করার জন্য বেছে নেওয়া হবে তা ঠিক করতে সবাইকে মাথা ঘামাতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মরসুমী ফুলের নিত্য নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এগুলি শীতের মরসুমী ফুলের আকর্ষণ দিন দিন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বছরের যে কোন মরসুমে যেসব মরসুমী ফুলের চাষ করা চলে তাদের কিছু গাছও শীতের মরসুমে বিশেষ সমাদৃত। মরসুমী লতানো ফুলগাছের চাষও এই সময়ে সবচেয়ে বেশি। মরসুমী ফুলের নিত্য নতুন প্রজাতি তৈরীর কল্যাণে এখন সম্পূর্ণ সাদা রঙের গাঁদা ও হলদে রঙের পিটুনিয়াও পাওয়া যাচ্ছে।

**কেয়ারি তৈরী ॥**

কেয়ারি বিভিন্ন আয়তনের ও বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। অনেকে জটিল আকৃতির কেয়ারি করতে পছন্দ করেন কিন্তু ফুলগাছ দিয়ে এই সব আকৃতি ফুটিয়ে তোলা খুবই কঠিন, তাই সরল আকৃতির কেয়ারি করাই ভাল। একরকম সব মরসুমী ফুলগাছই রোদ চায়, তাই যে সব জায়গায় যথেষ্ট রোদ পড়ে সেখানে কেয়ারি করতে হবে। কেয়ারি চওড়ায় এমন হবে যাতে এর বাইরের দুদিকে বসে কেয়ারির ভেতরের সব জায়গায় ভাল ভাবে কাজ করা যায়। অনেকটা জায়গা জুড়ে মরসুমী ফুল লাগাতে চাইলে পাশাপাশি সমান্তরাল

অনেকগুলি কেয়ারি তৈরী করা যেতে পারে। যে কোন দুটি কেয়ারির মাঝে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ সেণ্টিমিটার চওড়া জমি ফাঁক রাখা উচিত। এতে কেয়ারির উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবার কখনও দরকার পড়বে না, গাছের পরিচর্যা সহজ হবে এবং শুধু কেয়ারি অবস্থা থেকেই জায়গাটি বেশ সাজানো বলে মনে হবে। যেদিক থেকে কেয়ারির ফুলগাছ সবাই দেখেন সেদিক থেকে কেয়ারির সামনে হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালে কেয়ারিগুলি হাতের সংগে সমান্তরাল হয়ে থাকবে এভাবে এগুলি তৈরী করবেন। এই সব কেয়ারির পেছনের গুলিতে অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের মরসুমী ফুলগাছগুলি লাগাতে হবে এবং সামনের সারিগুলিতে অপেক্ষাকৃত ছোটগুলি।

চারাগাছ লাগাবার অন্তত দিন কুড়ি আগে থেকে কেয়ারি তৈরীর কাজে লাগতে হবে। যে মরসুমে কেয়ারির জমিতে চুন মেশাতে চান সে বারে সার মেশাবার মাসখানেক আগে জমিতে চুন মেশানো ভাল। নতুন জমিতে কেয়ারি করতে চাইলে তা কোপানো দরকার একহাত গভীর করে, কিন্তু যে সব জমিখণ্ডতে প্রতি মরসুমে ওষধি ফুলগাছের চাষ করা হয় তা তিরিশ সেণ্টিমিটার গভীর করে কোপালেই চলবে। তবে সুইটপী ও ক্লায়ান্থাসের জন্য ষাট সেণ্টিমিটার গভীর করে কেয়ারি কোপানো দরকার। জমিখণ্ডটিকে প্রথমে মাপ দিয়ে শুধু কেয়ারি অংশটুকু কোপাবেন কারণ সব জায়গা কুপিয়ে তারপরে কেয়ারির সীমা নির্দেশ করা বেশ একটু অসুবিধের কাজ। বর্ষাকালের মরসুমী ফুলের কেয়ারি সংলগ্ন জমি থেকে একটু উঁচু করে তৈরী হবে, এবং গ্রীষ্মের ও শীতের কেয়ারি তৈরী হবে একটু নিচু করে। কেয়ারির জমি কুপিয়ে মাটি ভাল গুঁড়ো করে দিতে হবে এবং একই সংগে ঘাস বা ঘাসের শেকড় ইত্যাদি ভাল করে বেছে দিতে হবে। চারাগাছ লাগাবার দিন দশেক আগে কেয়ারির মাটি ভাল করে আবার কুপিয়ে তাতে সার মেশাবেন। মাটি ও সার সবই ভাল গুঁড়ো হওয়া বিশেষ দরকার।

**সারমাটি ও বাড়তি সার ॥**

কেয়ারিতে সার মেশাবার ব্যবস্থা দুভাবে করা যেতে পারে। সার সব মাটিতে সমান ভাবে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে অথবা কেয়ারির ঠিক যে যে জায়গায় গাছ লাগানো হবে শুধু সেখানটাতে গর্ত করে তা ভরে দেওয়া যেতে পারে আলাদা তৈরী সারমাটি দিয়ে। যেখানে ফুলগাছের আয়তন ছোট সেখানে কেয়ারিতে সার মিশিয়ে দেওয়াই সুবিধের। ফুলগাছ যেখানে আয়তনে বড় ও পাশে মোটামুটি ছড়ায় সেখানে গাছ লাগাবার নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে পঁয়তাল্লিশ সেণ্টিমিটার গভীর ও তিরিশ সেণ্টিমিটার চওড়া গর্ত করে তা টবের উপযুক্ত সারমাটি দিয়ে ভরে তাতে ফুলগাছ লাগানো হবে। গর্ত করার আগে সব জমিই একবার ভাল করে কুপিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই দ্বিতীয় পদ্ধতির সুবিধা এই যে, সারের বেশিটাই গাছের কাজে লাগে। প্রথম পদ্ধতিতে টবের সারমাটির ভাগে কেয়ারির জমিতে সার মেশানো খুবই ব্যয়সাধ্য। তাই এ পদ্ধতি অনুযায়ী কেয়ারিতে সার কম দিয়ে খরচ কমানো হয়। যেখানে একই জাতের অনেক ফুল একই সংগে করা হয় এবং ফুলগাছ খুব কাছাকাছি লাগানো হয়, এরকম জায়গায় প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী কেয়ারিতে ফুলগাছ ভালই জন্মায়। কিন্তু কিছু ফুলকে বেশ ভাল করে করতে চাইলে তা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে করা ভাল। ক্লায়ান্থাস, হলিহক, ইপোমিয়া, বড় ফুলের গাঁদা, বড় ফুলের জিনিয়া, জারবেরা, ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকার কেয়ারি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তৈরী কেয়ারির জন্য সারমাটি তৈরী করবেন টবের সারমাটির ভাগে, এবং প্রথম পদ্ধতিতে কেয়ারি তৈরী করবেন নিম্নলিখিত উপায়ে। কেয়ারির মাটির উপরে দশ সেণ্টিমিটার উঁচু পরিমাণ গুঁড়ো গোবরসার ও দশ সেণ্টিমিটার উঁচু পরিমাণ ( মোট কুড়ি সেণ্টিমিটার ) গুঁড়ো পাতাপচাসার বিছিয়ে তা ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আরও ভাল ফল পেতে প্রত্যেক দুহাত লম্বা ও দেড়হাত চওড়া জায়গার জন্য আরও মেশানো দরকার এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো, একমুঠো সুপারফসফেট ও ছ'চামচ সালফেট অব পটাশ। যেসব জমিতে প্রতি মরসুমেই সার মিশিয়ে কেয়ারি তৈরী করা হয় সেসব কেয়ারির জন্য উপরের সারগুলি মেশাবেন অর্ধেক থেকে

চার ভাগের তিন ভাগ পরিমাণে। খরচের প্রশ্ন বড় করে দেখা দিলে শেষের তিনটি সার মেশাবার তালিকা থেকে বাদ দেবেন। ন্যাশটারসিয়াম ও পিটুনিয়া মাটিতে বেশি সার চায় না। বর্ষার মরসুমে প্রধানত জৈবসার মিশিয়ে তৈরী করা কেয়ারিতে অন্য কোন সার না মিশিয়ে এদের লাগানো যেতে পারে। এদের জন্য সারমাটি নতুন করে তৈরী করতে হলে অন্যান্য ফুলগাছের জন্য বরাদ্দ সারের অর্ধেক সার মাটিতে মেশাবেন।

জমির মরসুমী ফুলের বাড়তি সার হিসাবে রাসায়নিক সারের, বহুল ব্যবহার। চারাগাছ লাগাবার পরে তা ভাল করে ধরে গেলে চায়ের চামচের অর্ধচামচ এবং আবার দিন কুড়ি পরে একচামচ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট প্রত্যেক গাছের গোঁড়ায় দেবেন। গাছের গোড়ার পনেরো সেণ্টিমিটার দূর থেকে গোল করে পাঁচ সেণ্টিমিটার গভীর করে মাটি তুলে তাতে এই গুঁড়ো সার ছড়িয়ে দিয়ে তা মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া উচিত। গুঁড়ো সার দেবার অসুবিধা থাকলে এর বিকল্প হিসাবে চারাগাছ ভাল করে ধরে যাবার সময় থেকেই পালটা-পালটি করে নাইট্রেট অব সোডা ও এমোনিয়াম সালফেটের তরলসার সপ্তাহে একবার করে দেওয়া যেতে পারে। এই দুটির বেলাতেই দশ গ্রাম সার হারে পাঁচ লিটার জলে গুলে নেওয়া হবে। গাছে কুঁড়ি দেখা দিলে এই সময়ের উপযুক্ত রাসায়নিক তরলসার দেওয়া যেতে পারে সপ্তাহে একবার অথবা দুবার করে। কেয়ারির গাছেও বাড়তি সার হিসাবে জৈবসার দিতে মনস্থ করলে এ কাজে টবের শীতের মরসুমী ফুলের পরিচর্যা অনুসরণ করবেন।

**চারাগাছ লাগানো ॥**

চারাগাছ লাগাবার সবচেয়ে ভাল সময় বিকাল বেলা। খুব দরকার পড়লে এবং শীত মোটামুটি পড়লে চারাগাছ লাগানো চলতে পারে ভোর বেলায়ও। চারাগাছ এরকম দূরত্ব রেখে লাগাতে হবে যাতে বড় হবার পরে পাশাপাশি দুটি গাছ একটি অন্যটিকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলে। কেয়ারিতে একই জাতির দুটি গাছ লাগাবার বেলায় মাঝখানে কতটা দূরত্ব রাখা দরকার তা মরসুমী ফুল সম্পর্কীয় তালিকা দেখে ঠিক করে নেবেন। কেয়ারিতে লাগানো পাশাপাশি যে কোন দুসারির চারাগাছ লাগানো দরকার অলটারনেট প্রথায় যাতে যে কোন সারির যে কোন চারাগাছ পাশের সারির দুটি চারাগাছের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে। কোথায় কোথায় চারাগাছ বসবে তা আগে দাগ দিয়ে নেওয়া উচিত হবে। চারাগাছ লাগাবার আগে কেয়ারির মাটির অবস্থা ভেজা ভেজা থাকা প্রয়োজন, মাটিকে এ অবস্থায় আনতে একদিন বা যেরকম দরকার সময় আগে কেয়ারিতে সাধারণ ভাবে জল দিয়ে নেবেন। চারাগাছ বসাবেন বীজতলা ইত্যাদি থেকে যতটা সম্ভব গোড়ার মাটিসহ তুলে। এগুলি তোলার আগেই কেয়ারিতে লাগাবার জায়গায় ট্রাওয়েল বা ডিবার দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে নেওয়া ভাল। বীজতলায় চারাগাছ যেরকম ছিল চারাগাছগুলি সেরকম বা একটু বেশি মাটিতে ঢুকিয়ে কেয়ারিতে লাগানো যেতে পারে। এগুলি লাগানো সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার যাতে গোড়ায় জল জমার মত গর্ত না থাকে। চারাগাছ লাগাবার পরে এর গোড়ার মাটি হাত দিয়ে আলতোভাবে চেপে শক্ত করে দেবেন।

**উচ্চতা অনুযায়ী গাছ ॥**

মরসুমী ফুলের পাশাপাশি কেয়ারিতে প্রায় সব সময়েই বিভিন্ন ফুলগাছ মিশিয়ে লাগাবার প্রথা বিশেষ প্রচলিত। তাই এদের উচ্চতা অনুযায়ী লাগানো বিশেষ দরকার। উচ্চতা কম এরকম গাছ লাগানো দরকার সামনে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি উচ্চতার গাছগুলি তাদের উচ্চতা অনুযায়ী পেছনে। শীতের মরসুমী ফুলগাছকে উচ্চতার বিচারে তিনভাগে মোটামুটি ভাগ করা যেতে পারে :—স্বল্প উচ্চতায় বা উচ্চতা তিরিশ সেণ্টিমিটারের ভেতরে ; মাঝারি উচ্চতার, অর্থাৎ উচ্চতায় তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেণ্টিমিটারের ভেতরে : এবং লম্বা ফুলগাছ যা পঁয়তাল্লিশ সেণ্টিমিটার থেকে বড়। স্বল্প উচ্চতার ফুলগাছের ভেতরে পড়বে এজেরেটাম, এলিসাম, ব্রাচিকোম, ক্যানডিটাফট, কুফিয়া, ডিমোরফোথেকা, ফেলিসিয়া, গাজানিয়া, লাইনেরিয়া, মেসেমব্রিয়ান্থিমাম, মিগনোনেট, মিমুলাস, মায়োসিটিস,

ন্যাশটারসিয়াম, নেমিসিয়া, নেমোফিলা, প্যানজি, পরচুল্যাকা, ভারবিনা প্রভৃতি ; মাঝারি উচ্চতার ফুলগাছের আওতায় পড়বে এগ্রোষ্টেম্মা, এনচুসা, ব্রায়োলিয়া, ক্যালেনডুলা, সিনেরারিয়া, ডায়ান্থাস, একিয়াম, হেলিওট্রোপ এসকোলজিয়া, লাইনাম, নাইজেলা, পিটুনিয়া, ফ্যাসেলিয়া, ফ্লক্স, ষ্ট্যাটিস, ষ্টক, সুইট উইলিয়াম, স্যাপোনেরিয়া প্রভৃতি ; এবং লম্বা ফুলগাছের ভেতরে পড়বে এক্রোক্লিনিয়াম, এনটিরাইনাম, এষ্টার, কারনেশান, ক্রিসেন্থিমাম, ক্লার্কিয়া, কর্ণফ্লাওয়ার, কসমস, গোডেসিয়া, জিপসোফিলা, হেলিক্রিসাম, হলিহক, লার্কস্পার, লুপিন, গাঁদা, নিকোটিয়ানা, পিমপেনেলা, পপি, স্যালভিয়া, সুইট সুলতান, জিনিয়া, সূর্যমুখী প্রভৃতি।

স্বল্প উচ্চতার ফুলগাছ এলিসাম, ফেলিসিয়া, মেসেমব্রিয়ান্থিমাম, পরচুল্যাকা প্রভৃতি উচ্চতায় পনেরো সেণ্টিমিটারের ভেতরে। এবং লম্বা গাছের ভেতরে কসমস, হলিহক, পিমপেনেলা, সূর্যমুখী প্রভৃতি এক মিটারেরও বেশি উচ্চতায়। পিটুনিয়া, ফ্যাসেলিয়া, ফ্লক্স, লুপিন প্রভৃতি মাঝারি উচ্চতার গাছগুলির স্বল্প উচ্চতার প্রজাতিও রয়েছে। এষ্টার, হেলিক্রিসাম ও স্যালভিয়া প্রভৃতি লম্বা গাছের এরকম প্রজাতি রয়েছে যারা উচ্চতায় মাঝারি। এবং এনটিরাইনাম, গাঁদা ও জিনিয়ার বিভিন্ন প্রজাতির ভেতরে তিনটি উচ্চতার গাছই পাওয়া যাবে।

**কেয়ারিতে ফুলগাছের বিন্যাস ॥**

একই কেয়ারিতে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগাতে হতে পারে এবং পাশাপাশি অনেকগুলি কেয়ারিও থাকতে পারে। তাই বিভিন্ন গাছকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে সব কিছু মিলিয়ে খুবই সুন্দর দেখায়। অনেকগুলি কেয়ারি থাকলে একেবারে পেছনের কেয়ারিতে ফুলগাছ দিয়েই সামনের ফুলগাছগুলির জন্য একটি পশ্চাৎপট তৈরী করা দরকার। পশ্চাৎপট তৈরীর কাজে খুব লম্বাগাছগুলি, যথা সুইটপী ও ডালিয়া, বিশেষ উপযুক্ত। কেয়ারিতে শুধু উচ্চতা ধরে গাছ সাজালে সেটা অনেক সময়ে বড় কৃত্রিম দেখায়। তাই ইচ্ছে করে কোথাও কোথাও একই ধরনের উচ্চতার গাছের মাঝে একটু বড় বা ছোট গাছ লাগিয়ে দিলে বা কোন কোন সারির কিছু কিছু গাছ সামনের সারির কোন কোন জায়গায়ও লাগালে তা এই কৃত্রিম ভাব অনেকটা কাটিয়ে দেবে। একটি কেয়ারিতে শুধু একটি জাতির বা একটি প্রজাতির ফুলগাছ চাষ করলে তা বেশ ভাল দেখায় ; এটি আরও ভাল মানায় যেখানে জমিখণ্ডের পাশে বা পায়ে চলা রাস্তার পাশে কেয়ারির সংখ্যা মাত্র একটি। এ কাজে উজ্জ্বল রঙের ফুলগুলি বেশি মানায়। সবুজ জমিখণ্ডের পাশে হলদে ফ্লক্স ড্রামনডি, হলদে এনটিরাইনাম প্রভৃতি বেশ ভাল দেখায়। অনেকে লনের মাঝে মরসুমী ফুলের কেয়ারি করে থাকেন ; কিন্তু এগুলি ভাল মানায় কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, যদিও লনের পাশের কেয়ারিতে মরসুমী ফুল খুবই মানানসই। অনেক মরসুমী ফুলগাছের বহু বিভিন্ন রঙের প্রজাতি রয়েছে, রঙ মিলিয়ে এদের চাষ করতে পারলে তা খুবই সুন্দর দেখাবে।

**টবের মরসুমী ফুলগাছ প্রসঙ্গে ॥**

টবে মরসুমী ফুলগাছ চাষ করার সবচেয়ে বড় সুবিধে যে ফুলফোটা অবস্থায় এগুলি অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সাজানো চলে। সব মরসুমী ফুলগাছই টবে চাষ করা গেলেও যেগুলি যাঁর বেশি পছন্দ সেগুলিই তিনি টবে চাষ করে থাকেন। মরসুমী ফুলগাছের জন্য ব্যবহার রয়েছে বিভিন্ন আয়তনের টবের। গাছ কতটা বাড়ে সেকথা মনে রেখে এমন টব বেছে নিতে হবে যাতে গাছ ও টবের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য থাকে। গামলাটবে মেসেমব্রিয়ান্থিমাম, পরচুল্যাকা ও প্যানজির চাষ বেশি ; সাধারণত এদের কয়েকটি করে গাছ লাগানো হয় একটি গামলাটবে। ভারবিনা, সিনেরারিয়া, ফ্লক্স, এষ্টার প্রভৃতির জন্য ব্যবহার বেশি কুড়ি সেণ্টিমিটার টবের এবং চব্বিশ সেণ্টিমিটার টব বেছে নেওয়া হয় পিটুনিয়া, এনটিরাইনাম, কারনেশান, গাঁদা, স্যালভিয়া, ক্যালেনডুলা প্রভৃতির জন্য।

টবের মরসুমী ফুলগাছের মাটি এভাবে তৈরী হবে : প্রথমে সমান ভাগে সাধারণ মাটি, মিহিগুঁড়ো করে নেওয়া গোবরসার ও পাতাপচাসার ভাল করে মিশিয়ে নেবেন ;

এরপরে চব্বিশ সেণ্টিমিটার টব ভরে এই পরিমাণ এই তিনটি উপাদান মেশানো মাটিতে আরও মেশাবেন একমুঠো হাড়ের গুঁড়ো, চায়ের চামচের ছ'চামচ সুপারফসফেট ও তিন-চামচ সালফেট অব পটাশ। ডায়ান্থাস, সুইট উইলিয়াম, প্যানজি প্রভৃতির জন্য খুব অল্প পরিমাণে চুন মেশানো দরকার। টবের ফুলগাছে বাড়তি সার হিসাবে এমোনিয়াম সালফেট জাতীয় সার দিলে টবে সহজেই নোনা ধরে, তাই টবের গাছে প্রধানত জৈব সারের ব্যবহার সাধারণ ভাবে প্রচলিত। তাই চারাগাছ ধরে গেলে চায়ের চামচের ছ'চামচ থেকে দশ চামচ সরষের খোল টবের কানার পাশ থেকে দিতে হবে। এবং এর দিন কুড়ি পরে আবার আধমুঠো থেকে ছোট একমুঠো নিম্নলিখিত ভাগে তৈরী এই মিশ্রসার দিতে হবে : এই মিশ্রসার তৈরী হবে সমান পরিমাণে সরষের খোল ও স্টেরামীল মিশিয়ে। সার গাছের আয়তন অনুযায়ী কমবেশি হবে। দ্বিতীয় বারের সারের পর থেকে সপ্তাহে একবার অথবা দুবার জৈব তরলসার দিয়ে যেতে হবে নিয়মিত ভাবে।

টবের অনেক ফুলভরা গাছ একত্রে সাজালে তা বেশ ভাল দেখায়। কিন্তু এর বেলায় সামনের সারির গাছের টবগুলি বেরিয়ে থাকার জন্য সৌন্দর্যহানি ঘটায়। সামনের সারির টবের গাছ হিসাবে ঝুলানো টবের উপযুক্ত মরসুমী ফুলগাছগুলি চাষ করলে এদের ঝুলে পড়া ডালগুলি অনেকটা সাহায্য করবে টব ঢেকে দিতে।

ঝুলানো টবের জন্য পিটুনিয়া কাসকেড, ন্যাশটারসিয়াম ডাবল গ্লীম, ফ্লক্স, ভারবিনা বেশ উপযুক্ত। ঝুলানো টবে চাষ করার বেলায় গাছ বেশ কিছুটা বড় হবার পরে টব ঝুলিয়ে দেওয়া ভালো।

**লতানো মরসুমী ফুলের গাছ ॥**

শীতের মরসুমের ওষধি লতানো ফুলগাছের ভেতরে রয়েছে সুইটপী, ন্যাশটারসিয়াম, মিনালোবাটা ও ইপোমিয়া মর্ণিং গ্লোরী। এগুলির ভেতরেও সুইটপী সবচেয়ে বেশি সমাদৃত। সুইটপী সরাসরি জমিতে চারাতে হবে এবং এর মাথা ভেঙে দেওয়া দরকার গাছ ইঞ্চি নয়েক লম্বা হলে। ভাল ফুল পেতে চাইলে অল্প সংখ্যায় ডাল রাখা দরকার এবং তাতেও ফুল ফুটতে দেওয়া হবে খুব অল্প সংখ্যায়। সুইটপীর জন্য কেয়ারি বেশ কয়েক মাস আগে থেকে আরম্ভ করতে হবে। এর জন্য ট্রেঞ্চ দুহাত গভীর ও দেড়হাত চওড়া করে কাটা দরকার এবং জমির উপরের পনেরো সেণ্টিমিটার মাটি তুলে প্রথমে আলাদা করে রাখা ভাল। অন্য মাটি ট্রেঞ্চের গর্তে ফেলে তার উপরে কাঁচা গোবর পনেরো সেণ্টিমিটার পুরু করে বিছিয়ে তা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে ভাল করে। এবং আলাদা করে রাখা উপরের পনেরো সেণ্টিমিটার মাটিতে সার মেশাতে হবে সাধারণ কেয়ারির মত করে। সুইটপী গাছ ভাল করে লেগে যাবার পর থেকেই তরলসার দিয়ে যেতে হবে নিয়মিত ভাবে এবং মাসে একবার মিটারে ত্রিশ গ্রাম হারে গুঁড়ো চুন জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তার পরেই জল দিতে হবে ভাল করে। সুইটপীর কেয়ারি উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত হলে ভাল। টবে চাষ করার পক্ষে ডোয়ার্ফ সুইটপী বিশেষ উপযোগী। সুইটপীর ফুল আরও ভাল করতে গাছে মোট একটি বা দুটি ডাল রেখে তাতে খুব স্বল্পসংখ্যক ফুল হতে দিতে হবে এবং গাছের সব আঁকসিও কেটে ফেলা হবে। ন্যাশটারসিয়ামের লতানো প্রজাতিটিকে উপরে বাইয়ে দিলে ফুলফোটা অবস্থায় তা খুবই সুন্দর দেখায়। ইপোমিয়া মর্ণিং গ্লোরীর 'ফ্লাইয়িং সসার', 'কর্ণেল' প্রভৃতি প্রজাতিগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। সব লতানো মরসুমী ফুলেরই বেয়ে ওঠার ভাল ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সুইটপীর পাঠকাঠির অবলম্বন কাজের পক্ষে বেশ ভাল এবং দেখতেও বেশ।

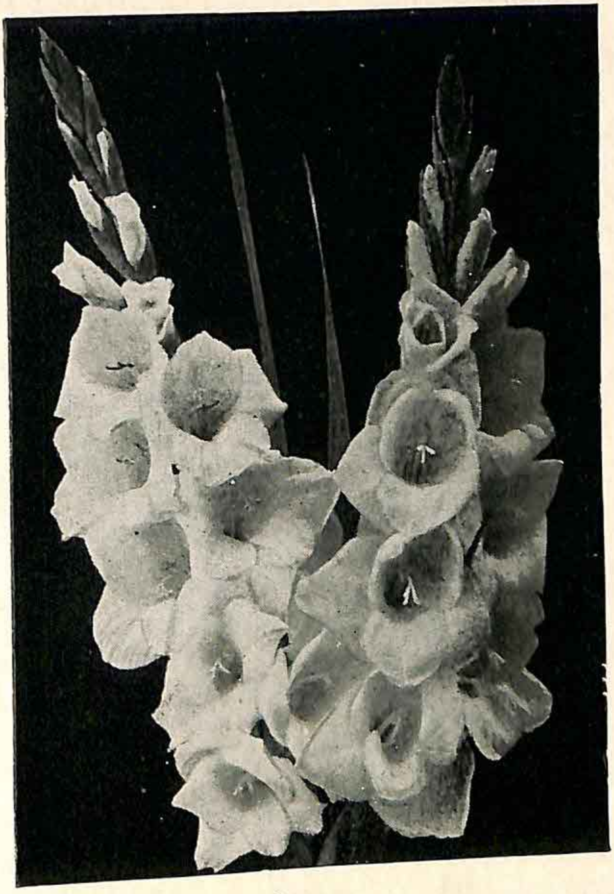
**ক্লায়ান্থাস, জিরেনিয়াম প্রভৃতি গাছ ॥**

বেশ কয়েকটি গাছ রয়েছে যেগুলি আসলে বহুবর্ষজীবী কিন্তু তাদের সমাদর মরসুমী ফুল হিসাবে। শীতের মরসুমে এরা অনুপস্থিত থাকলে ফুলবাগান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ দেখাবে। ক্লায়ান্থাস, জিরেনিয়াম, এনজেলোনিয়া, জারবেরা প্রভৃতি এই ধরনের ফুল। ক্লায়ান্থাসের চাষ বেশ একটু ভিন্নধর্মী, এদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 'বাছাই

লতানো ফুলগাছ' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। জিরেনিয়াম, এনজেলোনিয়া ও জারবেরার চাষ বেশ সহজ এবং প্রথম দুটির টবে চাষই সর্বাধিক প্রচলিত। জারবেরার চাষ টবে ও জমিতে দুয়েই করা চলে, তবে এর জমিতে যাতে কখনও জল না দাঁড়ায় তার ভাল ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। এনজেলোনিয়া ও জারবেরা ফুল দেয় একরকম সারা বছর ধরে এবং জিরেনিয়াম শীতের শেষ দিকে। জারবেরার বংশবিস্তার গাছের গোছা ভাগ করে, এবং জিরেনিয়াম ও এনজেলোনিয়ার ডালিয়ার মত কাটিং করে। জিরেনিয়ামের কাটিং বসাবার ভাল সময় অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর, কাটিং-এ জল দিতে হবে সাবধানে কারণ জল বেশি হলে কাটিং পচে যাবে।

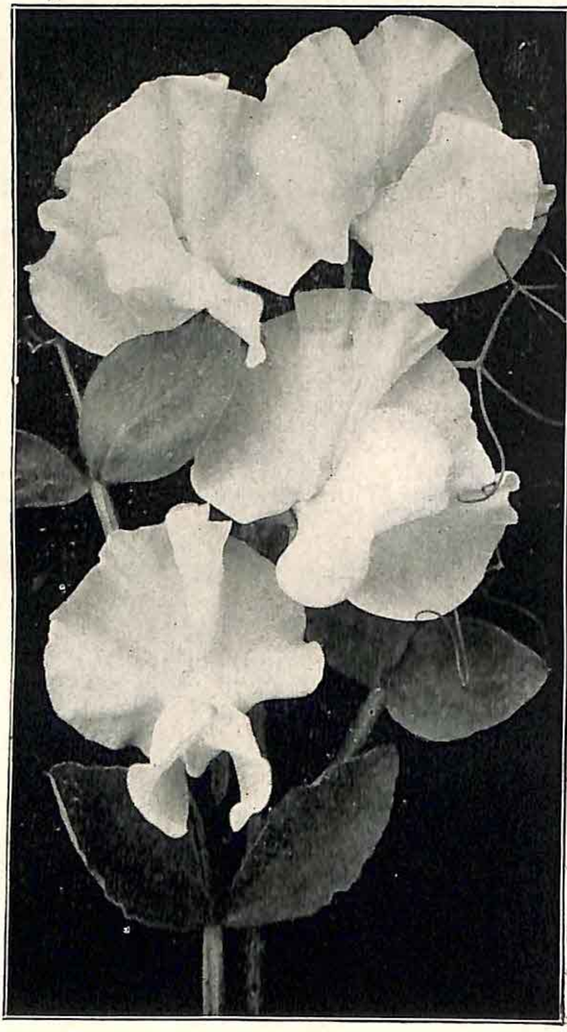
**বিশিষ্ট ফুলের পরিচয় ও বিশেষ পরিচর্যা ॥**

শীতের মরসুমী ফুলের ভেতরে যেগুলি বেশি ভাল দেখতে তাদের সংখ্যাও প্রচুর। সিনেরারিয়া, পিটুনিয়া, ফ্লক্স, এনটিরাইনাম, এষ্টার, কারনেশান, গাঁদা, প্যানজি প্রভৃতি বিশিষ্ট ফুলেদের মাঝেও অতিবিশিষ্ট ফুল। এবং অতিবিশিষ্ট ফুলের তালিকায় আরও আসবে সুইটপী, ক্লায়ান্থাস, ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকা, যাদের সম্পর্কে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট ফুলের তালিকায় রয়েছে ক্যানডিটাফট হায়াসিন্থ-ফ্লাওয়ারড, ডিমোর-ফোথেকা, মেসেমব্রিয়ান্থিমাম, ন্যাশটারসিয়াম ডাবল, পরচুল্যাকা, ভারবিনা, ক্যালেনডুলা, এসকোলজিয়া, ডায়ান্থাস সিঙ্গেল, সুইট উইলিয়াম, লার্কস্পার, পপি, সুইট সুলতান, জিনিয়া প্রভৃতি। সিনেরারিয়া হালকা ছায়া পড়ে এরকম জায়গায় রাখতে হবে এবং এটি টবেতেই বেশি ভাল জন্মায়। এটি রোদ কখনই খুব সহ্য করতে পারে না তাই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সিনেরারিয়ার সারমাটির প্রধান উপাদানের ভাগ হবে পাতাপচাসার একভাগ, মাটি একভাগ ও গোবরসার দুভাগ ; এদের সাথে টবের মরসুমী ফুলের অন্যান্য সারও একই ভাগে মেশাতে হবে। পিটুনিয়ার প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর, এটি ফোটে অনেক দিন ধরে, এবং কেয়ারি, টব, ঝুলানো টব প্রভৃতির পক্ষে চমৎকার মানানসই গাছ। পিটুনিয়ার এফ-ওয়ান হাইব্রিড গ্রানডিফ্লোরা, কাসকেড, এফ-ওয়ান হাইব্রিড ডাবল গ্রানডিফ্লোরা, এফ-ওয়ান হাইব্রিড ডাবল মালটিফ্লোরা, এফ-ওয়ান হাইব্রিড মালটি-ফ্লোরা প্রভৃতি খুবই সমাদৃত ফুল। এদের বীজ খুব ছোট তাই খুব সাবধানে চারাতে হবে। এবং দুর্বল বলে সুখীজাতের পিটুনিয়ার কোন চারাকে বাতিল করবেন না কারণ এগুলিই অনেক সময়ে সবচেয়ে ভাল ফুল দেয়। শুধু একরঙের ফ্লক্স ড্রামনডি পুরো কেয়ারিতে লাগালে তা খুব ভাল দেখায়। এবং ফ্লক্স ডোয়ার্ফ ষ্টার প্রজাতি গামলাটবের পক্ষে খুব উপযুক্ত। এষ্টারের বোকে পাউডার-পাফ অন্যান্য এষ্টার থেকে দেখতে বেশ একটু আলাদা এবং দেখতেও বেশ ভাল। কারনেশানের চারা অবস্থায় গাছে জল বেশি হলে পচে যাবার ভয় রয়েছে। অনেকে ছোট টবে লাগিয়ে কারনেশানের চারাগাছ কিছুটা বড় করে পরে বড় টবে পালটে দেন। চারাগাছে চার বা ছ'পাতা হলে তা প্রথমে দশ সেণ্টিমিটার টবে লাগানো হয় এবং এর সারমাটি তৈরী হয় সমান পরিমাণের পাতাপচাসার ও মাটি মিশিয়ে। এবং গাছ দশ থেকে পনেরো সেণ্টিমিটার বড় হলে তা পালটে লাগানো হবে বড় টবে। কারনেশানের বেলায় টবের মরসুমী ফুলগাছের জন্য তৈরী সারমাটিতে আরও মেশানো উচিত প্রত্যেক বড় টবের জন্য একমুঠো দালান ভাঙ্গা রাবিশ। এর দুর্বল পাশের ডালগুলি ছেঁটে ফেলে শুধু পাঁচছয়টি ভাল ডালে ফুল হতে দেবেন। গাছে কুঁড়ি এলে পরে বড় কুঁড়িটি ও উপর থেকে তৃতীয় কুঁড়িটি রেখে অন্য সব কুঁড়ি কাঁচ অবস্থাতে ভেঙে ফেলা যেতে পারে। আরও বড় ফুল চাইলে ডালের শুধুমাত্র বড় কুঁড়িটি রাখা হবে এবং গাছে ডাল রাখা হবে মাত্র গোটাতিনেক। কারনেশানের বড় কুঁড়িটি না খোলা পর্যন্ত অনেকে এটির পাশে একটি ছোট কুঁড়ি রেখে দেন ; কারনেশানের বৃতি অনেক সময়ে ফেটে যায়, ছোট কুঁড়িটি থাকাতে বৃতি ফাটবে না এই আশায় এটা করা হয়। প্যানজির বড় ফুল চাইলে গাছে অল্প ডাল রাখতে হবে এবং প্রতি ডালে ফুল নেওয়া হবে একটি করে। প্যানজির গাছের বয়স হলে ফুল ছোট হয়ে আসবে, এ অবস্থায় গোড়া থেকে ছেঁটে দিলে নতুন বেরুনো ডালে আবার ভাল ফুল দেবে। গাঁদা শীতের মরসুমেই বেশি ভাল



গ্লাডিওলাস

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal



সুইটপী



ক্লায়ান্থাস



এনথ্যুরিয়াম ক্রিষ্টালিনাম

STATE INSTITUTE OF
Govt. of West



ছোট ফুলের চন্দ্রমল্লিকা



ক্যাকটাস



পাতাবাহার

জন্মায় ; এদের প্রচুর প্রজাতি রয়েছে এবং এদের ভেতর থেকে নিজের পছন্দমত প্রজাতি সহজেই বেছে নেওয়া যাবে। এনটিরাইনামের ভাল ফুল পেতে শুধু মাঝের ডালটি রেখে অন্য সব ডাল কচি অবস্থায় ভেঙে দিতে হবে। বেশি ও ভাল ফুল পেতে চাইলে এনটি-রাইনামের মাঝের ডাল এবং অন্য বাড়তি ডাল ভেঙে ফেলে শুধুমাত্র তিনচারটি ভাল ডালে ফুল হতে দেওয়া হবে। মরসুমী ফুলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও জগদীশ সেনগুপ্তের বই 'মরসুমী ফুল'-এ করা হয়েছে। এ বইটির সাহায্যে প্রদর্শনীর মানের ফুল করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

**জল দেওয়া ইত্যাদি ॥**

চারাগাছ লাগাবার পরে বেশ ভাল করে জল দিতে হবে এবং চারাগাছ ভালভাবে লেগে যাওয়া পর্যন্ত এদের গোড়ার মাটি শুকিয়ে গেলেই জল দিতে হবে গোড়ার মাটি ভিজিয়ে। গাছ লেগে যাবার পর কেয়ারি ভাসিয়ে জল দেবেন যাতে দিন কয়েক অন্তর জল দিলেই চলে যায়। গাছেতে সবসময়ে সকালে জল দেওয়া ভাল। পিটুনিয়া প্রভৃতি যেসব টবের গাছ পাশে বেশি ছড়ায় তাদের জল দিতে গিয়ে ফুল ও পাতায় জল পড়লে ফুলে দাগ ধরে যায়। এদের বেলায় ঝারির মুখ অর্থাৎ রোজ্ খুলে রেখে মাটির কাছে ঝারির খোলা মুখ নিয়ে জল দেওয়া দরকার ; জল দেবার সময়ে ঝারির খোলা মুখ আঙ্গুল দিয়ে কিছুটা চেপে ধরতে হবে যাতে জল জোরে বেরুতে না পারে। গুঁড়ো সার গাছের গোড়ায় দেবার দিন ধরে পর পর তিনদিন গাছে ভাল করে জল দিতেই হবে। তরলসার দেবার ঘণ্টা দুয়েক আগে গোড়ায় স্বাভাবিক পরিমাণে জল দিয়ে নেওয়া দরকার। টবের গাছেও সার ও তরল-সারের বেলায় একই নিয়মে জল দিতে হবে, এবং এ ছাড়া টবের গাছে জলের দরকার দেখা দিলেই জল দেওয়া উচিত। ডাবল পিটুনিয়া, কারনেশান, সিনেরারিয়া ও ক্লায়ান্থাস ফুল দিতে মাস পাঁচেক সময় নেবে তাই এদের উপযুক্ত সময়ে চারাবেন। গরম পড়তে আরম্ভ করলেও ভাল ফুল দিয়ে যাবে লার্কস্পার, জিরেনিয়াম, পিটুনিয়া, ক্লায়ান্থাস, ক্যালেনডুলা, ডায়ান্থাস, ফ্লক্স, স্যালভিয়া, ভারবিনা, জিনিয়া, পরচুল্যাকা প্রভৃতি ফুলগাছ। সিনেরারিয়া, মায়োসিটিস প্রভৃতিকে লাগানো যেতে পারে যেসব জায়গায় সব সময়ে হালকা ছায়া পড়ে ; আরও কিছু ফুলগাছও হালকা ছায়াতে হতে পারে কিন্তু তাদের ফুলের সংখ্যা ও ফুলের ঔজ্জ্বল্য কমে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। অনেক সময়ে তাড়াতাড়ি ফুল পাবার দরকার পড়ে। সিলোশিয়া প্লুমোসা ও চিল্ডসী, গাঁদার ছোট ফুলের বেশ কয়েকটি প্রজাতি, কসমস, এলিসাম, এজেরেটাম, ক্যাকেলিয়া, সূর্যমুখী, জিনিয়া লিনিয়ারিস ও ছোট ফুলের জিনিয়া প্রভৃতির ফুল ফোটে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি। সুগন্ধি মরসুমী ফুলের তালিকায় রয়েছে কারনেশান, নিকোটিয়ানা, পিটুনিয়া, সুইটপী, সুইট উইলিয়াম, সুইট সুলতান, এলিসাম, হেলিওট্রোপ, ষ্টক, ওয়াল ফ্লাওয়ার, ন্যাশটারসিয়াম ডাবল গ্লীম, মিগনোনেট, ফ্লক্স, ভারবিনা প্রভৃতি। কেয়ারিতে লাগানো চারাগাছ কোথাও মরে গেলে একই বয়সের চারাগাছ সেখানে লাগানো দরকার। একাজের জন্য কিছু গাছ টবেতে লাগানো যেতে পারে, এবং প্রয়োজনমত এ গাছ মাটিশুদ্ধ খুলে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। গাছের গোড়া দিন দশেকে একবার করে খুঁচে দেওয়া দরকার। চারাগাছ লাগাবার পরের তিনচারদিন গাছে রোদ যাতে না লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজ কলাগাছের খোল বা শালপাতা গোছের বড় পাতার সাহায্যে সহজেই করা সম্ভব। যে সব গাছ অনেকদিন ধরে ফুল দেবে সেগুলিকে ঝোপালো করতে চাইলে গাছ কিছুটা বড় হলে মাথা খুঁটে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। অনেক মরসুমী ফুলগাছ গোড়া থেকে ছেঁটে দিলে তাতে আর এক দফা ফুল পাওয়া যেতে পারে। এই ছাঁটার কাজ করতে হবে শেষের ফুলগুলি ফুটে যাবার আগেই, এবং ছাঁটার পরে গাছ বাড়তে সাহায্য করে এরকম তরলসার নিয়মিত ভাবে দিয়ে যেতে হবে। মরসুমী ফুলগাছে কখনও কখনও ফুল দেবার স্বাভাবিক সময়ের আগেই গাছে কুঁড়ি এসে যায়। এ রকম কুঁড়ি এলেই তা ভেঙে দিতে হবে, নইলে গাছে কখনই ভাল ফুল পাওয়া যাবে না। গাছের অবলম্বন গাছের খুব ছোট অবস্থা থেকেই ব্যবস্থা করা দরকার। শীতের মরসুমী ফুলে বিভিন্ন পোকামাকড় ও বিভিন্ন রোগের আক্রমণ রয়েছে। ছত্রাক রোগের বেশি উপদ্রব

রয়েছে লার্কস্পার, ডায়ান্থাস, কারনেশান, সুইটপী প্রভৃতিতে। পোকামাকড়ের জন্য ফলিডল ও ফাঙ্গাস রোগের জন্য মোরেষ্টান প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। উপযুক্ত যত্ন নিয়ে চাষ করলে রোগাদির আক্রমণ কখনই বিব্রত করার মত বেশি হবে না। মরসুমী ফুল গাছেও পাতার সার বেশ ভাল কাজ দেবে।

# গ্রীষ্ম ও বর্ষার মরসুমী ফুল

একটি নির্দিষ্ট ঋতু ছাড়া হয় না এরকম ফুলগাছের সংখ্যা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এই দুই মরসুমেরই নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু এরকম মরসুমী ফুলের সংখ্যা খুব কম নয় যাদের একটি অংশকে গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই দুই মরসুমেই করা যায়, এবং অন্য অংশটিকে বর্ষা ও শীত এই দুই সময়েই করা সম্ভব। এছাড়া অনেক মরসুমী ফুল রয়েছে যেগুলি বছরের তিনটি মরসুমেই চাষ করা চলে। শীতের মরসুমী ফুলের সংখ্যা প্রচুর, এদের থেকে বেশি সুন্দর ফুলের গাছগুলি বেছে নেওয়াই একটি সমস্যা বিশেষ। তাই যেসব ফুল শীতের মরসুমে চাষের সুযোগ হয়ে ওঠে না অথচ তিনটি মরসুমেই চাষ করা চলে, তাদের বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে চাষ করা খুবই প্রচলিত। সব মিলিয়ে এই দুই মরসুমে করার মত মরসুমী ফুলের যে সংখ্যা দাঁড়ায় তা মোটেই নগণ্য নয়। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শীতের তুলনায় এই দুটি ঋতুর মরসুমী ফুলের বাগান সত্যিই হীনপ্রভ। তা সত্ত্বেও এই দুই সময়ে চাষ করা চলে এরকম কিছু বিশিষ্ট মরসুমী ফুল রয়েছে যাদের দিয়ে বাগান সুন্দর করে তোলা মোটেই কঠিন নয়।

**এই দুই মরসুমের ফুল ॥**

শুধু গ্রীষ্মকালেই চাষ করার নিয়ম এরকম মরসুমী ফুল খুঁজে পাওয়া ভার; এবং শুধু বর্ষার মরসুমেই করা চলে এরকম গাছও বোধ হয় মাত্র একটি, এটির নাম কচিয়া। অন্যান্য সবগুলি দুটি মরসুমে বা তিনটি মরসুমেই চাষ করা সম্ভব। গ্রীষ্মে করা প্রচলিত কিন্তু বর্ষায়ও করা চলে এরকম মরসুমী ফুল কক্সকোম্ব, ভারবিনা এরিনয়ডিস ও সিলোশিয়া ; গ্রীষ্মে করা হয় কিন্তু শীতেও চাষ করা চলে এরকম মরসুমী ফুল আর্কটোটিস, ক্যাকেলিয়া ও একিয়াম। বর্ষাকালে চাষ করা প্রচলিত কিন্তু শীতেও করা চলে সহজেই এরকম ফুল টিথোনিয়া, টোরেনিয়া, দোপাটি বা বলসাম, লাভ-লাইজ-ব্লিডিং, বাহারি পাতার এমারান্থাস ও লতানো মরসুমী ফুলের গাছ মিনালোবাটা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাতেই এদের চাষের চল বেশি কিন্তু শীতের মরসুমে করাও সহজ সম্ভব এরকম ফুল কারিয়পসিস, কসমস, ক্লিওম, গাঁদা বা মেরীগোল্ড, গিলার্ডিয়া, গ্লোব আমারান্থ, জিনিয়া, ট্যাগেটিস, নিকোটিয়ানা, পরচুল্যাকা, পিটুনিয়া বেডিং ষ্ট্রেইন, সূর্যমুখী বা সানফ্লাওয়ার, স্যালভিয়ার দুটি প্রজাতি, হাইমেনাথেরাম ; বাহারি পাতার কোলিয়াস এবং লতানো ফুলগাছ ইপোমিয়ার ওষধি প্রজাতিগুলি। শীতের মরসুমে চাষ করা টিলোনিয়া ও এমারান্থাসের গাছ লম্বায় বর্ষার সময়ে করা গাছের চেয়ে বেশ কিছুটা ছোট হবে।

গ্রীষ্মকালে যেসব মরসুমী ফুলের চাষ হয় তাদের ভেতরে একিয়াম, ক্যাকেলিয়া, পরচুল্যাকা ও ভারবিনা এরিনয়ডিস ; আর্কটোটিস, গিলার্ডিয়া, গ্লোব আমারান্থ ও পিটুনিয়া ; কক্সকোম্ব, কারিয়পসিস, কসমস, গাঁদা, জিনিয়া, নিকোটিয়ানা, সিলোশিয়া, সূর্যমুখী ও স্যালভিয়া ককসিনিয়া বেশি জনপ্রিয়। এই তালিকার প্রথম পাঁচটি উচ্চতায় ছোট, একই কেয়ারিতে বিভিন্ন উচ্চতার মরসুমী ফুলগাছ লাগালে এগুলি সব সময়ে সামনের জায়গা অধিকার করবে। তালিকার ষষ্ঠ থেকে নবমটি উচ্চতায় মাঝারি অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ সেণ্টিমিটারের মত উঁচু এবং পরের সবগুলি উচ্চতায় আরও বড়। কারিয়পসিস, কসমস, গাঁদা ও জিনিয়ার স্বল্প উচ্চতার ও মাঝারি উচ্চতারও প্রজাতি রয়েছে ; এবং কক্সকোম্ব,

পিটুনিয়া ও সিলোশিয়ার স্বল্প উচ্চতারও প্রজাতি রয়েছে।

বর্ষাকালের মরসুমী ফুলের ভেতরে এগুলি বিশেষ উল্লেখ্য—টোরেনিয়া ও পরচুল্যাকা ; পিটুনিয়া ; কসমস, গাঁদা, জিনিয়া ও নিকোটিয়ানা ; ক্লিওম, টিথোনিয়া, দোপাটি, লাভ-লাইজ-ব্লিডিং ও স্যালভিয়া ফেরিনেসিয়া। এদের ভেতরের টোরেনিয়া স্বল্প উচ্চতার এবং শেষের পাঁচটি উচ্চতায় পঁয়তাল্লিশ সেণ্টিমিটারের বেশি। তালিকার অন্যান্য ফুলগাছগুলি সম্পর্কে আগের অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই তালিকার নতুন গাছগুলির ভেতরে একমাত্র দোপাটির মাঝারি উচ্চতারও প্রজাতি রয়েছে। বাহারি পাতার গাছের ভেতরে কচিয়া ও এমারান্থাসের বর্ষাকালে ব্যাপক চাষ এবং কোলিয়াস গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই দুটি মরসুমেই সমাদৃত। এ তিনটি গাছই দেড় ফুটের বেশি উঁচু। লতাগাছের ভেতরে মিনালোবাটার চাষ বেশি বর্ষাকালে ও ইপোমিয়ার ওর্ষধি প্রজাতিগুলির তিনটি মরসুমেই সমান সমাদর। এছাড়া অতসী ও দুপুরেচণ্ডী সমাদর লাভের উপযুক্ত হয়েও ফুলবাগানে অনাদৃত হয়ে রয়েছে। প্রথমটির ফুল হলদে এবং দ্বিতীয়টির লাল এবং দুটিই উচ্চতায় হাত চারেক।

**সারমাটি ও বাড়তি সার ॥**

টবে চাষ করা হবে এরকম গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের মরসুমী ফুলের জন্য সারমাটি এই ভাগে তৈরী করবেন— চারভাগ সাধারণ মাটি, চারভাগ গোবরসার, দুভাগ পাতাপচাসার ; এবং প্রতি টবের জন্য একমুঠো থেকে এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো। সারমাটির প্রথম তিনটি উপাদানই ভাল করে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এই একই ভাগে কেয়ারির সারমাটিও তৈরী করে নিতে পারলে ভাল কিন্তু তা সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে কোপাবার পরে মাটি গুঁড়ো করা হয়েছে এরকম কেয়ারিতে ইঞ্চি তিনচারেক গুঁড়ো গোবরসার প্রথমে বিছিয়ে দিয়ে তা একফুট গভীর মাটির সঙ্গে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বর্ষাকালের মরসুমী ফুলের কেয়ারিতে এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো প্রত্যেক দেড়হাত চওড়া ও দেড়হাত লম্বা কেয়ারির জমিতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। এটা বর্ষার মরসুমী ফুলকে ভাল ফুটতে সাহায্য করবে এবং তার চেয়েও বেশি কাজ দেবে একই কেয়ারিতে করা শীতের মরসুমী ফুলের বেলায়। কেয়ারিতে ফুলগাছ লাগাবার আগে কেয়ারির মাটি আবার ভাল করে কুপিয়ে মিশিয়ে নেবেন।

গ্রীষ্মের মরসুমে গাছ লাগাবেন বিকাল বেলায় এবং বর্ষাকালের ঠাণ্ডার দিনে সকালে বা বিকালে। বর্ষাকালের ঠাণ্ডার দিনে লাগানো চারাগাছ ঢেকে দেবার দরকার নাও পড়তে পারে, কিন্তু গ্রীষ্মের মরসুমে বা বর্ষাকালের গরমের দিনে লাগানো চারাগাছ প্রথম তিনদিন চড়া রোদের সময়ে নিশ্চয়ই ঢেকে দেবেন। চারাগাছ ভাল করে বাড়তে আরম্ভ করলে আধচামচ থেকে একচামচ করে ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট প্রতিটি গাছের গোড়াতে অন্তত দশ সেণ্টিমিটার দূর থেকে গোল করে মাটি তুলে তাতে ছড়িয়ে দিতে হবে। জৈবসার ব্যবহার করতে চাইলে ডাই-এমোনিয়াম ফসফেটের পরিবর্তে দুতিন চামচ সরষের খোল দিতে হবে। এরপর থেকে সপ্তাহে একবার বা দুবার করে জৈব বা রাসায়নিক তরলসার দিয়ে যাবেন। এমারান্থাসের বেলায় গোবরের পরিমাণ সারমাটির নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক করতে হবে, এবং এই গোবরের পরিবর্তে সাধারণ মাটি মিশিয়ে দেওয়া হবে। কচিয়া ও কোলিয়াসে অন্য কোন বাড়তি সার না দিয়ে আধচামচ করে ইউরিয়া অথবা একচামচ করে এমোনিয়াম সালফেট দেওয়া ভাল এবং পরে শুধু এই সারের তরলসার দেবেন।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

এই দুই ঋতুতে হরেক রকম রঙের ফুল পাওয়া যায়, তাই কেয়ারিতে ফুলের রঙ মিলিয়ে ফুলগাছ লাগাবার পক্ষে কোন অসুবিধা নেই। জমিতে কেয়ারি এমন জায়গায় করবেন যেখানে প্রচুর রোদ পড়ে, টবের গাছও রোদ পায় এরকম জায়গায় রাখবেন। গ্রীষ্মকালে জল দেওয়ার উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, বর্ষাকালেও বৃষ্টি নিয়মিত না হলে গাছে জল দেবার দরকার পড়বে। সার দেবার দিন ধরে পর পর তিনদিন জল দেওয়া ও তরলসার দেবার আগে ও পরে জল অবশ্যই দিতে হবে। গরমের দিনে ভেজা

মাটির জল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, জল বেশি সময় ধরে রাখতে পাতাপচাসার বা অন্য কিছু দিয়ে গাছের গোড়ায় মালসিং-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। এই দুই ঋতুর মরসুমী ফুলের পোকামাকড়ের জন্য রোগর, পাউডারি মিল্ডিউতে মোরেস্টান এবং অন্যান্য রোগে প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। ফুলগাছে ভাইরাস রোগের আক্রমণ ঘটলে গাছকে সুস্থ করে তোলা খুবই কঠিন। জিনিয়াতে এক ধরনের অসুখ দেখা দিচ্ছে যা গাছকে হাতখানেক বড় হতে না হতেই মেরে ফেলে। এ অবস্থায় ভাইরাস রোগ বলে মোটামুটি নিশ্চিত হলেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা একান্ত আবশ্যক। এই দুই ঋতুর মরসুমী ফুলগাছের বীজ বোনা ও চারার পরিচর্যা 'মরসুমী ফুলের বীজ চারানো ও এদের চারাগাছ' অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে করবেন। ক্লিওমের বীজ চারাবার আগে ঘণ্টা তিনেক ধরে জলে ভিজিয়ে রাখবেন, এতে চারা অপেক্ষাকৃত ভাল উঠবে। টবে চাষ করার কাজে একরকম সব মরসুমী ফুলগাছই ব্যবহার করা যেতে পারে, এই সব গাছের জন্য ন'দশ ইঞ্চি টব বেছে নেবেন। গৃহসজ্জার কথা মনে রেখে পাঁচইঞ্চি টবেও কিছু কিছু ফুলগাছ চাষ করা যেতে পারে। ফুল ফোটা অবস্থায় টবশুদ্ধ এদের সাজানোর কাজে লাগানো চলে। পাঁচইঞ্চি টবে লাগালে গ্লোব আমারান্থ, জিনিয়ার পম্পন ও এই ধরনের অন্যান্য প্রজাতি, টোরেনিয়া, পরচুল্যাকা ও সিলোশিয়া প্লুমোসা লিলিপুট বেশ ভাল কাজ দেবে। কয়েকটি করে পরচুল্যাকা একটি গামলাটবে লাগালে তাও খুব ভাল মানাবে। মিনালোবাটা বা ইপোমিয়া টবে লাগালে বাঁশের বাখারি দিয়ে টবের উপরে বেলুন করে দিতে হবে যাতে এটা বেয়ে লতাগাছ সুন্দরভাবে ছড়াতে পারে। এদের জমিতে লাগানো গাছেরও বেয়ে ওঠার ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন। বড় ফুলের সব জিনিয়ারই প্রথম দফার কুঁড়ি খুঁটে ফেলে দেওয়া ভাল, তা না হলে গাছ বড় না হতেই ফুল দিতে আরম্ভ করে বলে সে ফুল আশানুরূপ ভাল হয় না। যে গাছগুলি অনেক ফুল দিয়ে থাকে তাদের প্রথম দফার কুঁড়িও ভেঙে দেওয়া ভাল, এতে গাছ বেশ ঝোপালো হয়ে উঠবে এবং ফুলও ভাল হবে। তবে কক্সকোম্ব ও সিলোশিয়া প্লুমোসার কুঁড়ি কখনও ভাঙবেন না।

**বিশিষ্ট ফুলের পরিচয় ॥**

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে চাষ প্রচলিত এরকম মরসুমী ফুলের ভেতরে অনেকগুলি দেখতে আরও বেশি সুন্দর। জিনিয়ার প্রচুর প্রজাতি রয়েছে এবং এদের সব প্রজাতিগুলিই এই দুই মরসুমে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। এর ক্রিসেন্থিমাম-ফ্লাওয়ারড প্রজাতির ফুল অবিকল চন্দ্রমল্লিকার মত; এগুলিকে এই ধরনের চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তা চট করে জিনিয়া বলে ধরা কঠিন। জিনিয়ার অপেক্ষাকৃত নতুন প্রজাতিটির নাম এন্‌ভি ; এটির রঙ এক ধরনের সবুজ এবং ফুলটি আয়তনে মাঝারি আয়তনের ডালিয়া-ফ্লাওয়ারড প্রজাতির মত। জিনিয়ার কাট-এ্যাণ্ড-কাম-এগেন, লিলিপুট, টম থাম্ব, থাম্বেলিনা প্রজাতিগুলিও উল্লেখের দাবি রাখে। খুব অল্প খাটুনিতে ভাল বর্ডার করতে জিনিয়া লিনিয়ারিসের তুলনা নেই। গাঁদার প্রসঙ্গে এটা বলে রাখা ভাল যে, একরকম সব প্রজাতির আফ্রিকান মেরী গোল্ডই এই দুই মরসুমে করা চলে কিন্তু তারা শীতকালের মত ভাল ফুল এ সময়ে দেবে না। তবুও এই দুই মরসুমেও এদের কয়েকটি প্রজাতি, যথা হানিকোম্ব, কিউপিড, গোল্ডেন এজ্, প্রভৃতি, বেশ ভালই করা যায়। ভাল ফুল ছাড়াও গাঁদার এই তিনটি প্রজাতির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এগুলির পাতায় অন্য সাধারণ গাঁদার পাতার মত গন্ধ নেই। কসমস ক্লণ্ডাইক ফুলগাছটি সত্যিই অনেকটা জংলী প্রকৃতির, কিন্তু এদের নতুন প্রজাতিগুলি কসমস ক্লণ্ডাইক সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমূল পাল্টে দেবে। এই প্রজাতিগুলির সেমি-ডাবল ফুলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর এবং এরা খুব কষ্টসহিষ্ণুও। দোপাটি বুশ-ফ্লাওয়ারডের ফুলগুলি হঠাৎ দেখলে গোলাপ বলে মনে হবে, এগুলি ডালের মাথা ভরে ফোটে এবং এই প্রজাতিটি একটু সুখী প্রকৃতিরও। সিলোশিয়া প্লুমোসা লিলিপুট উচ্চতায় তিরিশ সেন্টিমিটারের মত এবং এদের ফুলগুলি আরও বেশি সুন্দর। সূর্যমুখীর ক্রিসেন্থিমাম ফ্লাওয়ারড ও অটাম বিউটি প্রজাতি দুটির ফুল সাধারণ সূর্যমুখীর চেয়ে অনেকটা আলাদা। ক্লিওমের দুটি প্রজাতিই চমৎকার দেখতে

এবং এদের ফুলের গড়নেও একটা নতুনত্ব রয়েছে। লতানো ফুলগাছের ভেতরে ইপোমিয়ার কর্নেল প্রজাতিটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এর ফুলের প্রধান রঙ ঘন পিঙ্ক কিন্তু ফুলের প্রান্তসীমার রঙ পরিষ্কার সাদা, ফলে ফুলটি খুবই সুন্দর দেখায়। বাহারি পাতার এমারান্থাস, কচিয়া ও কোলিয়াস সব বাগানেই স্থান পাবার দাবি রাখে। কোলিয়াসের ফুলের কুঁড়ি দেখা দিলেই তা কেটে ফেলতে হবে। প্রায় স্বচ্ছ পাতার কোলিয়াস-গুলি দেখতে আরও বেশি ভাল, কাটিংয়ের সাহায্যে নতুন গাছ করে সব কোলিয়াসই বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

# বাছাই ছোট ফুলগাছ

এই রচনার গাছগুলি ছোট গুল্ম বা যাদের ইংলিশে স্মল শ্রাব বলি সেই পর্যায়ের। গাছগুলি উচ্চতায় সাধারণত দেড় থেকে ছ'হাত এবং এগুলি করা চলে খুব অল্প জায়গায়। গাছ দেখতে সুন্দর ও আয়তনে ছোট বলে ছোট বড় সব ফুলবাগানেই এদের সমাদর। পায়ে-চলা পথের দুপাশে, লনের ধারে, শুধু ছোট গুল্মের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে অথবা দুটি নাতি-উচ্চ ফুলগাছের মাঝের গাছ হিসাবে এগুলি বেশ মানানসই। লনের মাঝে লাগাবার পক্ষেও এর কয়েকটি গাছ খুবই ভাল। তাছাড়া এর একরকম সবগুলিই টবে করার উপযোগী। ছোট ফুলগাছের বেশ কয়েকটি গাছ ফুল দেয় সারাবছর ধরে। রচনার কতগুলি গাছ আমাদের সবার খুবই পরিচিত, পুজোর ফুল পেতে এদের চাষ অনেক বাগানেই হয়ে থাকে।

**গাছ লাগানো ॥**

প্রচুর রোদ পায় এরকম জায়গায় গাছ লাগাবেন বর্ষাকালের যে কোন সময়ে অথবা মাঘ মাসে। গাছ দক্ষিণ অথবা পূর্বদিকে লাগানো ভাল। ছায়া ভালবাসে এরকম গাছ লাগাতে হবে হালকা ছায়া পড়ে এরকম জয়গায়। গাছ লাগাবার জমি তৈরী করবেন গাছ লাগাবার মাস খানেক আগে। গর্ত হবে সওয়া হাত ব্যাস ও দেড়হাত গভীর। এবং সারমাটির ভাগ হবে দুভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ গোবরসার ও এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো। সারমাটি ভাল করে মিশিয়ে গর্তে এমনভাবে ভরবেন যাতে গর্তের মাটি পাশের জমি থেকে বিশ সেন্টি-মিটারের মত উঁচু থাকে। গাছ লাগাবেন বিকালে অথবা মেঘলা দিনের যে কোন সময়ে।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

দামী গাছের বেলায় ছোট টবে ছমাস থেকে একবছর রয়েছে এরকম গাছ কিনবেন। গাছে জল দেবার দরকার পড়লেই জল দেবেন গোড়া বেশ ভাল করে ভিজিয়ে। গরমের সময়ে জল দেওয়া দরকার পড়বে মাসে বার পাঁচেক এবং শীতকালে মাসে বার তিনেক। গাছের গোড়া খুঁচে দেওয়া দরকার অন্তত মাসে দুবার, এ কাজ করবেন জল দেবার দিন চারেক পরে। তবে বর্ষাকালে গাছ খুঁচে দেবার বিশেষ দরকার নেই কিন্তু এ সময়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখতে হবে খুব ভালভাবে। বাড়তি সার প্রতি বছর বর্ষার প্রথমে গাছের চারিদিক কুপিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন। বাড়তি সারের পরিমাণ হবে ছোট গাছে আধ-বালতি গোবরসার ও এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো, এবং অপেক্ষাকৃত বড় গাছে একবালতি গোবরসার ও দুই আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো। গাছে মরাডাল দেখলেই ছেঁটে ফেলতে হবে এবং যে গাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে তাদের ছাঁটা হবে সাধারণত ফুল দেবার পরে। গাছ ছাঁটা দরকার যাতে তা আরও ভাল ফুল দেয় ও সুন্দর দেখায়। তবে জবা, ক্যালিয়ানড্রা, রন-ডেলেটিয়া, ম্যাগনোলিয়া, পোর্টল্যানডিয়া প্রভৃতি সুখী বা খুব আস্তে আস্তে বাড়ে এরকম গাছ ছাঁটার দরকার নেই।

**টবের গাছ ॥**

টবের গাছের সারমাটির ভাগ হবে তিনভাগ সাধারণ মাটি, দুভাগ গোবরসার এবং পাতাপচাসার একভাগ। এছাড়া ছাব্বিশ সেণ্টিমিটার টব ভরে এরকম পরিমাণ সারমাটিতে আরও মেশাবেন দুমুঠো হাড়ের গুঁড়ো। টবের গাছের বিভিন্ন পরিচর্যা 'ছাদের ফুল-বাগান'-এর মত করবেন তবে এদের বেলায় রোদ ও তাপের হাত থেকে বাঁচাবার পরিচর্যা না করলেও চলবে। টবে লাগাবার কাজে যে ছোট্ট ফুলগাছগুলি বেশি উপযুক্ত তাদের নাম এখানে দিচ্ছিঃ ক্যালিয়ানড্রার সব কয়টি প্রজাতি; ক্রসেনড্রার সব কয়টি প্রজাতি; গলফিমিয়া; গন্ধরাজের দুটি প্রজাতি ; রঙ্গন ডাফি হাইব্রিড, সিঙ্গাপোরেন্সিস, লিউটিয়া ও রোজিয়া ; জ্যাট্রোফা পানডুরাফোলিয়া রোজিয়া; ল্যানটানা ডিপ্রেসা; পেণ্টাসের সব কয়টি প্রজাতি, প্লামবাগো ক্যাপেন্সিস ও ক্যাপেন্সিস এলবা ; কোয়াশিয়া এমারা ; এডেনিয়াম ; পোর্টল্যান্ডিয়া; রণডেলেটিয়া, জুঁই রাই জাপানীজ, ডালিম গ্রানাটাম নানা এবং জবার বিভিন্ন প্রজাতি।

এবারে বিভিন্ন গুল্মের বিশদ পরিচয়ে আসছিঃ

**অলিয়া ॥**

অলিয়া ফ্রাগরানসের ফুল দেখতে আহামরি না হলেও ফুলে বেশ সুগন্ধ রয়েছে এবং এই গন্ধের জনাই এর সমাদর। খুব ছোট ঘিয়ে-সাদা ফুলগুলি ফোটে ছোট ছোট স্তবকে। বছরে ফুল পাওয়া যায় অনেক বার।

গাছ একটু সুখী প্রকৃতির, বাড়ে আস্তে আস্তে এবং এটি উচ্চতায় হাত কয়েক। অলিয়া লাগাবেন হালকা ছায়া পড়ে এরকম জায়গায় এবং গাছের গোড়ায় জল না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে এবং এটিকে ছাঁটার দরকার নেই। ভারত অলিয়ার অন্যতম আদি বাসস্থান।

**এডেনিয়াম ॥**

এডেনিয়াম ওবেসাম গাছ ও ফুল মিলিয়ে দেখতে বেশ সুন্দর এবং গাছটি দেখতে একটু নতুন ধরনেরও। ফুলের গড়ন অনেকটা কলকের মত, ফুলের রঙ হলদে ও হালকা লাল মেশানো এবং ফুল ফোটার সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। এডেনিয়ামের গোড়ার গড়ন ঘটের মত এবং এটি প্রকৃত পক্ষে সাকুলেণ্ট যদিও এর বেশি ব্যবহার গুল্ম হিসাবে। এটি টবে ও পাহাড়-উদ্যানে বেশ ভাল জন্মায়। এডেনিয়ামের সারমাটি এমন ভাবে তৈরী হবে যা বেশি জল ধরে রাখে না; এ কাজে চন্দ্রমল্লিকা বা সাকুলেণ্টের উপযুক্ত সারমাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি হাত চারেক উঁচু এবং এর বংশবৃদ্ধি বীজ অথবা গুটিকলমের সাহায্যে। এডেনিয়াম এসেছে ট্রপিকাল আফ্রিকা থেকে। এটির বাংলা নাম কিন্নরী।

**এলাম্যানডা ॥**

হলদে ফুলের এলাম্যানডা প্রকৃতপক্ষে লতানো ফুলগাছের আওতায় পড়বে। তবে ছেঁটে রেখে এদের গুল্ম হিসাবে ব্যবহার খুব বেশি প্রচলিত। সমতল বাংলার বীরভূম ও বাঁকুড়ার জলবায়ুতে এটি বেশ ভাল জন্মায়। এলাম্যানডার ফুল ফোটে একসঙ্গে অনেক এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফুল পাওয়া যায় বেশি। এর ফুলের গড়ন অনেকটা কলকের মত তবে আয়তন কলকের চেয়ে অনেক বড়। হলদে ফুলের ভেতরে এলাম্যানডা ক্যাথারটিকা স্কটী বেশি জনপ্রিয়। হলদে ফুলের সব এলাম্যানডাই খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং এদের বংশ-বিস্তার কাটিং দিয়ে।

এলাম্যানডা ভাওলেসিয়া-র ফুল হালকা ভায়োলেট রঙের এবং এটি সত্যিই গুল্ম। ফুলের আয়তন ছোট এবং হলদে ফুলের চেয়ে ফোটেও কম, তবুও এটি দেখতে খুব সুন্দর। গাছটি সুখী প্রকৃতির এবং এটি হাত তিনেক উচ্চতায়। ভাওলেসিয়ার বংশবিস্তার দাবা বা হলদে ফুলের এলাম্যানডার সঙ্গে জোড়কলম করে। ভাওলেসিয়া এবং একরকম সব হলদে ফুলের এলাম্যানডা এসেছে ব্রাজিল থেকে। এলাম্যানডার দেশী নাম অলকনন্দা।

**কৃষ্ণচূড়া গিলেসী ॥**

কৃষ্ণচূড়া গিলেসী-র ফুলের থোকা অন্য দুটি ছোট কৃষ্ণচূড়া অর্থাৎ সিজালপাইনিয়ার চেয়ে বেশ কিছুটা ছোট। ফুলের রঙ হলদে, ফুল দেয় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে। এ গাছটি সুখী প্রকৃতির। গিলেসী হাত চারেক উচ্চতায় এবং বীজ দিয়ে এর বংশবৃদ্ধি।

**কোয়াশিয়া ॥**

কোয়াশিয়া এমারা-র ফুল দেখতে অনেকটা লাল স্যালভিয়ার মত। গাছের পাতা ও কান্ড দুইই একটু অদ্ভুত ধরনের। গাছ এখানে হাত ছয়েক উঁচু হতে পারে তবে সচরাচর এরকম বড় গাছ দেখা যায় না। কোয়াশিয়া খুবই সুখী প্রকৃতির। এটি কড়া রোদ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। গাছ লাগাতে হবে এরকম একটু উঁচু জমিতে যেখানে শুধু সকালে রোদ পড়ে। কোয়াশিয়া এসেছে গায়না থেকে এবং সেখানে গাছ বেশ বড় হয় বলে প্রকাশ। দাবা ও গুটিকলম করে এর বংশবিস্তার। কোয়াশিয়ার বাংলা নাম কস্তুরী।

**ক্যালিয়ানড্রা ॥**

সব কয়টি ক্যালিয়ানড্রার প্রজাতি দেখতে বেশ চমৎকার। উচ্চতার বিচারে ক্যালিয়ানড্রা স্পেসিওসা ও ব্রিভাইপস এই রচনার আওতায় পড়বে। শিরীষ ফুলের সঙ্গে ক্যালিয়ানড্রার ফুলের গড়নের খুব মিল রয়েছে। ব্রিভাইপসের ফুলের রঙ পিঙ্ক, ফুল দেয় সারা বছর এবং ফুল ফোটে বেশি শীতকালে। স্পেসিওসা সমতল বাংলায় এসেছে ইদানীং, গাছ ছোট এবং টবের পক্ষে খুব উপযোগী। এটির ফুলের রঙ লাল, ফোটে একরকম সারা বছর ধরে এবং কিছুদিন অন্তর ফুল ফোটে গাছ ভরে। এ দুটি গাছ উচ্চতায় হাত চারেকের মত। স্পেসিওসা প্রজাতিটি ইনেকুলেটোরা নামেও পরিচিত, তবে কোন নামটিই বোধ হয় এর সঠিক নাম নয়।

হালকা ছায়া পড়ে এবং জল দাঁড়ায় না এরকম জায়গায় ব্রিভাইপস লাগাতে হবে, অন্যটি রোদের জায়গায় লাগানো দরকার। এদের বংশবিস্তার বীজ ও দাবাকলমের সাহায্যে। ব্রিভাইপস এসেছে ব্রাজিল থেকে। এবং ক্যালিয়ানড্রার বাংলা নাম মণিকুন্তলা।

**ক্রসেনড্রা ॥**

পুজার ফুল হিসাবে দক্ষিণ ভারতে ক্রসেনড্রার চাহিদা খুব বেশি। সমতল বাংলায়ও এর সমাদর দিন দিন বাড়ছে। ক্রসেনড্রার বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। এদের ভেতরে নিলোটিকার ইটের রঙ, আনডুলেফোলিয়ার কমলা, ফ্লাভার হলদে এবং সৌন্দরিয়ার কমলা রঙের ফুল। ক্রসেনড্রা ফুল দেয় একরকম সারা বছর এবং সৌন্দরিয়া ফুল দেয় বেশি শীতকালে। এদের হালকা ছায়া জায়গায়ও লাগানো চলে। ক্রসেনড্রা উচ্চতায় হাত দুতিন এবং এদের বংশবৃদ্ধি প্রধানত দাবাকলমের মাধ্যমে। ক্রসেনড্রা আফ্রিকা ইত্যাদি দেশ থেকে এসেছে তবে এর একটি বন্য প্রজাতি আমাদের দেশেও পাওয়া যায় বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। এ প্রজাতিটির ফুলের রঙ হালকা সবুজ, বাঁকুড়ার ঝোপেঝাড়ে একে হতে দেখেছি। ক্রসেনড্রার দেশী নাম কঙ্কণা।

**ক্লিরোডেনড্রন ॥**

ক্লিরোডেনড্রনের প্রজাতির সংখ্যা অনেক হলেও দেখতে খুব সুন্দর এরকম প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম। দেখতে মোটামুটি ভাল হিসাবে কেম্পফেরি, প্যানিকুলেটাম ও ম্যাক্রোসাইফনের নাম করা যেতে পারে। ম্যাক্রোসাইফনের ফুলের রঙ সাদা ও পিঙ্ক, ফুল ফোটে একরকম সারা বছর ধরে; অন্য দুটির ফুল স্কারলেট রঙের এবং ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। কেম্পফেরি লাগাতে হবে হালকা ছায়া জায়গায়। ক্লিরোডেনড্রন ছেঁটে দেবেন ফুল শেষ হয়ে গেলে। এদের বংশবৃদ্ধি প্রধানত দাবাকলমের সাহায্যে। ম্যাক্রোসাইফন ও প্যানিকুলেটাম এসেছে ট্রপিকাল আফ্রিকা থেকে।

ক্লিরোডেনড্রন গুল্মের ভেতরে খুব সুন্দর প্রজাতি পাওয়া না গেলেও এদের দুটি

অত্যন্ত সুন্দর লতানো প্রজাতি টমসনি ও স্প্লেনডেন্সকে ছেঁটে রেখে সহজেই গুল্ম হিসাবে চাষ করা যায়। টমসনির ফুল লাল ও সাদা এবং ফোটে একরকম সারাবছর ; স্প্লেনডেন্সের ফুল ঘন লাল, ফুল ফোটে শীতকালে গাছ ভরে। ক্লিরোডেনড্রনের বাংলা নাম কিরণময়ী।

**গন্ধরাজ ॥**

গন্ধরাজ ও গ্যার্ডেনিয়ার আদি বাসস্থান জাপান বা চায়না হলেও এটি আমাদের একান্তভাবে নিজস্ব গাছ হয়ে গেছে। গন্ধরাজের চাষ অত্যন্ত সহজ এবং হালকা ছায়া জায়গাতেও এদের লাগানো যেতে পারে। গন্ধরাজের ভেতরে ফরচুনিয়ানার ফুল সবচেয়ে বড় এবং এটি দেখতেও খুব সুন্দর। ভিতচীর ফুল ছোট এবং ফুলের গড়ন অনেকটা গোলাপের মত। দুটিরই ফুল পরিষ্কার সাদা এবং সুগন্ধযুক্ত। এদের ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। ভিতচী উচ্চতায় হাত আড়াই এবং ফরচুনিয়ানা হাত পাঁচেক। বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে।

**গলফিমিয়া ॥**

গলফিমিয়া গ্রাসিলিস গাছে ফুল নেই এরকম কখনই দেখা যায় না। ফুল খুব ছোট, ফোটে ছোট ছোট থোকায় এবং গাছ ভরে। ফুলের রঙ হলদে। গাছ হাত তিনেক উঁচু, বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে এবং এর আদি বাসস্থান মেক্সিকো। এর বাংলা নাম শর্বাণী।

**জবা ॥**

জবা আমাদের সবার পরিচিত, পূজার ফুল হিসাবে এর খুব সমাদর। আজকাল জবার অনেক উন্নত সংকর প্রজাতি পাওয়া যায়, সৌন্দর্যের বিচারে এদের সাথে সাধারণ জবার কোন তুলনাই হয় না। জবার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 'জবা' অধ্যায়ে করা হয়েছে।

**জাষ্টিসিয়া ॥**

জাষ্টিসিয়া ম্যাগনিফিকা কারণিয়া-তে ফুল ফোটে একরকম সারাবছর ধরে এবং ফুল ফোটে বেশি শীতকালে। ফুল ফোটে থোকায় এবং ফুলের রঙ পিঙ্ক। গাছ লাগাবেন হালকা ছায়া জায়গায় যেখানে কোন সময়েই জল দাঁড়ায় না। বেশি ফুল ফোটার পরে গাছ ছেঁটে দেবেন। বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে এবং এটি এসেছে ব্রাজিল থেকে।

**জুঁই ॥**

জুঁই বা জেসমিনাম-এর খুব ভাল করে শ্রেণীবিভাগ হয়নি তাই অনেক সময়ে একই গাছকে বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে দেখা যায়। প্রায় সব জুঁইয়ের চমৎকার গন্ধ রয়েছে এবং এই সুগন্ধের জন্যেই এদের এত সমাদর। জুঁই একরকম সবগুলিই ভাল, তবুও এদের ভেতরে বাছাই করতে গেলে এই প্রজাতিগুলির কথা প্রথমেই মনে পড়ে—শীতকালে ফোটে পিঙ্ক কুন্দ, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফোটে ডাবল জুঁই, ও জুঁই সম্বাক-এর বিভিন্ন প্রজাতি যথা সুলতানী জুঁই, রাই, রাই জাপানীজ ইত্যাদি ; এবং গ্রীষ্মের প্রথমে ফোটে নবমল্লিকা। নবমল্লিকা অর্থাৎ গ্রাসিলে ম্যাগনিফিকাম প্রজাতিটি লাগাবেন দক্ষিণদিকে যাতে বাতাস ফুলের গন্ধ ঘরে পেঁছে দেয়। সব জুঁই ফুলের পরে ছেঁটে দিতে হবে। এদের বংশবিস্তার দাবাকলম ও কাটিং-এর সাহায্যে। জুঁইয়ের কিছু কিছু প্রজাতির জন্মভূমি ভারত। জুঁই হিউমিল স্বর্ণ চামেলি নামেও পরিচিত, এটি দেশী গাছ এবং এর খুব মৃদু সুগন্ধ রয়েছে। হিউমিলের সোনালী-হলদে রঙের ফুল ফোটে বর্ষাকালে।

**জ্যাট্রোফা ॥**

জ্যাট্রোফা পানডুরাফোলিয়া রোজিয়া-র ফুল ফোটে সারাবছর। স্নিগ্ধ পিঙ্ক রঙের ছোট ছোট ফুলে সারা গাছ ভরে থাকে। গাছ একটু সুখী প্রকৃতির এবং এটি উচ্চতায়

হাত চারেক। এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। জ্যাট্রোফা পোডাগ্রিকা দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের। গাছের কান্ডটি ঘটের মত, এবং এর ফুল লাল ও কমলা রঙের। জ্যাট্রোফা এসেছে ওয়েস্ট ইনডিজ থেকে। রোজিয়া প্রজাতিটি না ছাঁটাই ভাল। জ্যাট্রোফার বাংলা নাম জয়তী।

**ঝাঁটি ॥**

ঝাঁটি বা বার্লেরিয়া খুব একটা আহামরি দেখতে না হলেও এটি যখন ফোটে তখন অন্যান্য গাছে ফুল বিশেষ থাকে না। এদের ফুল ফোটার সময় শীতের প্রথম। ঝাঁটির বিভিন্ন প্রজাতির ভেতরে নীল ও পারপেল রঙের ফুলগুলি দেখতে বেশি ভাল। এ গাছ করা অত্যন্ত সহজ এবং হেজ্ করার কাজে ঝাঁটির বহুল ব্যবহার। ফুল ফোটার পরে গাছ ভাল করে ছেঁটে দেবেন। এদের বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে এবং কিছু কিছু প্রজাতির ঝাঁটি এ দেশের গাছ।

**টগর ॥**

টগর বা ট্যাবারনামনটানা করোনারিয়া ফ্লোর প্লেনো-র ফুল ডাবল। এই গাছের সঙ্গে কোন তফাত নেই এরকম একটি টগরের ফুল পুরোপুরি সিঙ্গেল। সিঙ্গেল ফুলের এই টগরটি দেখতে আরও বেশি সুন্দর এবং ভোরে এদের ফুলের মৃদু সুগন্ধও পাওয়া যায়। টগর ডাবলের একটি ভেরীগেটা পাতার গাছও রয়েছে। এই তিনটি টগরই উচ্চতায় হাত চারেক তবে গাছ খুব ঝোপালো। টগর ফুল দেয় সারাবছর এবং ফুল দেয় বেশি বর্ষাকালে। তবে বেশি বর্ষার দিনে অনেক সময়ে এদের পাতা পচে যায়, এবং এ সময়ে এ গাছে পোকামাকড়ের উপদ্রবও রয়েছে। টগর ভারতের ফুলগাছ এবং পূজাতে এ ফুলের খুব সমাদর। সব টগরের ফুলের রঙ সাদা। টগরকে হালকা ছায়া জায়গায়ও লাগানো চলবে এবং এদের বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে।

**ডালিম-ফুল ॥**

শুধু ফুলের জন্যও ডালিমগাছ বা পিউনিকা-র কয়েকটি প্রজাতির বেশ সমাদর। সমতল বাংলায় এরা খুব বেশি ফুল দেয় না, তাহলেও ডালিমের গ্রানাটাম নানা লাগাবার মত। লাল রঙের ডাবল ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। গাছটি উচ্চতায় বেশ ছোট এবং এর বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। ভারত ডালিমের আদি বাসস্থান।

**ডেডালাকান্থাস ॥**

ডেডালাকান্থাস নারভোসাস-এর ফুলের রঙ নীল, ফুল ফোটে অনেকটা ক্রসেনড্রার ধরনে এবং ফোটে শীতকালে। এটি হালকা ছায়া জায়গায় জন্মায় ভাল এবং এটি খুবই কষ্টসহিষ্ণু গাছ। বর্ষার সময়ে ভাল করে ছেঁটে দেবেন এবং গাছ কয়েক বছরের পুরানো হলে তার জায়গায় নতুন গাছ লাগাবেন। ডেডালাকান্থাস ভারতের গাছ, এটি উচ্চতায় হাত তিনেক এবং এর বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে।

**ডোডোনিয়া ॥**

ডোডোনিয়া ভিসকোসা-র ফুল কিছু আহামরি না হলেও এর সমাদর হালকা সবুজ রঙের ফুল বলে। পুষ্পসজ্জার কাজে এই ফুলের বিশেষ সমাদর। ডোডোনিয়া খুবই কষ্টসহিষ্ণু গাছ এবং এর সঙ্গে আমাদের বেশি পরিচয় হেজ্ করার গাছ হিসাবে। এটি উচ্চতায় হাত ছয়েক এবং বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে।

**থানবার্জিয়া ॥**

থানবার্জিয়া ফুলের গড়ন অনেকটা কলকের মত। এর প্রজাতি ইরেক্টার ফুল ঘন নীল রঙের এবং হাইব্রিডার হালকা নীল। দুটি গাছই করা সহজ এবং এদের হালকা

ছায়া জায়গাতেও লাগাতে পারেন। ফুলের পরে গাছ ভাল করে ছেঁটে দেবেন। এটির বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে। ইরেক্টা এসেছে ওয়েস্ট ইনডিজ থেকে। থানবার্জিয়ার বাংলা নাম ছন্দতিলক।

**পেট্রিয়া ॥**

পেট্রিয়া আরবোরিসা-র সঙ্গে এর লতানো পেট্রিয়া ভলুবিলিসের ফুলের বেশ মিল রয়েছে। এটি ফুল দেয় গ্রীষ্মকালে, ফুল দেয় কয়েকবার এবং এর ফুলের রঙও পারপেল-ব্লু। আরবোরিয়া সুখী প্রকৃতির গাছ। এটি হাত পাঁচেক উঁচু, ট্রপিকাল আমেরিকা এর আদি বাসস্থান এবং এর বংশবৃদ্ধি ভলুবিলিসের সঙ্গে জোড়কলম করে বা দাবাকলম করে। পেট্রিয়ার দেশী নাম নীলমণি।

**পেণ্টাস ॥**

পেণ্টাসের ফুলের গড়ন ও ফুল ফোটার ধরন অনেকটা রঙ্গনের মত। পেণ্টাসের ভেতরে কারমেসিয়ানা প্রজাতিটি দেখতে সবচেয়ে সুন্দর এবং এটি একটু সুখী প্রকৃতির গাছ। এর ফুল উজ্জ্বল লাল রঙের এবং এটি শুধু সকালের রোদ পেতে চায়। পেণ্টাসের অন্য প্রজাতিগুলি বেশ কষ্টসহিষ্ণু। সব কয়টিরই ফুল ফোটে একরকম সারা বছর ধরে। গাছ ছাঁটতে চাইলে তা বর্ষার মাঝামাঝি করবেন। পেণ্টাস উচ্চতায় হাত দুতিন, বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে এবং এগুলি এসেছে আফ্রিকা থেকে। এটির বাংলা নাম রতনচূড়।

**পোর্টল্যানডিয়া ॥**

পোর্টল্যানডিয়া গ্রানডিফ্লোরার চাষ প্রত্যেক বাগানে হওয়া উচিত। এর ফুল ও গাছ দুইই সুন্দর। ফুল অনেকটা ধুতরো ফুলের মত, রঙ সাদা এবং ফুলে মিষ্টি গন্ধ। ফুল শীতকাল বাদে একরকম সব সময়েই ফোটে। গাছ হাত ছয়েক বড় হতে পারে তবে এরকম বড় গাছ সমতল বাংলায় কোথাও চোখে পড়েনি। গাছ সুখী প্রকৃতির তাই পরিচর্যায় অবহেলা করা চলবে না। গোড়ায় জল দাঁড়াবে না এবং শুধু সকালের রোদ পায় এরকম জায়গায় পোর্টল্যানডিয়া লাগাবেন। সমতল বাংলায় এ গাছের বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে এবং এটি এসেছে ওয়েস্ট ইনডিজ থেকে। পোর্টল্যানডিয়ার বাংলা নাম তুষারমোতি।

**প্লামবাগো ॥**

প্লামবাগোর চাষও আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত, এদেরও গাছ ও ফুল দুইই দেখতে সুন্দর। প্লামবাগো ক্যাপেনসিসের ফুল হালকা নীল রঙের এবং ক্যাপেনসিস এলবার একেবারে সাদা। ফোটার ধরন ও ফুল অনেকটা ফ্লক্সের মত। ফুল ফোটে সারাবছর, বর্ষা ও শীতে গাছ ভরে। গাছ লাগাবেন এমন জায়গায় যেখানে জল জমার ভয় নেই, এবং প্লামবাগো ছাঁটতে চাইলে বর্ষাকালে হালকাভাবে ছাঁটবেন। গাছ উচ্চতায় হাত তিনেক এবং এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। প্লামবাগোর এই দুটি প্রজাতি এসেছে সাউথ আফ্রিকা থেকে। এ গাছটির বাংলা নাম নয়নবিলাস।

**ফ্রানসিশিয়া ॥**

ফ্রানসিশিয়া হোপিয়ানা-র ইংলিশ নাম 'ইয়েস্টারডে, টুডে এন্যাড টুমরো' বলেই বেশি পরিচিত। একই সময়ে গাছে ল্যাভেণ্ডার ( এবং এর মাঝখানটা হলদে ), হালকা ল্যাভেণ্ডার এবং প্রায় সাদা রঙের ফুল দেখা যায় বলেই এর এই নামকরণ। ফুল ফোটে ল্যাভেণ্ডার হয়ে এবং তা আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হয়ে প্রায় সাদা রঙে দাঁড়ায়। ফুল গাছ ভরে ফোটে এবং একই সঙ্গে তিন রঙের ফুল থাকায় গাছটি এই সময়ে ভারি সুন্দর দেখায়। তাছাড়া ফুলে মৃদু সুগন্ধও রয়েছে। আকৃতিতে ছোট সিঙ্গেল পিটুনিয়ার সঙ্গে ফ্রানসিশিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। এর ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, এটি হালকা ছায়া পড়ে এরকম জায়গাতেও লাগাতে পারেন। গাছ

উচ্চতায় হাত চারেক, আকৃতিতে বেশ ঝোপালো এবং এর বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। ফ্রানসিশিয়া আলাদা বলে পরিচিত হলেও এটি আসলে ব্রানফেলসিয়া গণের অন্তর্ভুক্ত। এটির আদি বাসস্থান ব্রাজিল এবং এর বাংলা নাম বিচিত্রা।

**ব্রানফেলসিয়া ॥**

ব্রানফেলসিয়া আমেরিকানার ফুলের রঙ ঘিয়ে সাদা ও গ্রানডিফ্লোরার সাদা। ফুলের গড়ন অনেকটা কলকের মত। দুটি প্রজাতির ফুলেই গন্ধ রয়েছে এবং এরা ফোটে একরকম সারাবছর ধরে। গাছ উচ্চতায় হাত পাঁচেক, মোটামুটি কষ্টসহিষ্ণু এবং এদের বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে। ব্রানফেলসিয়ার এই দুটি প্রজাতি এসেছে সাউথ আমেরিকা থেকে।

**মালপিগিয়া ॥**

মালপিগিয়া ককসিজেরা-র ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট সাদা ফুলে গাছ একরকম ছেয়ে থাকে। মালপিগিয়া কষ্টসহিষ্ণু গাছ, এটি বাড়ে খুব আস্তে এবং উচ্চতায় হাত দেড়েক। বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে এবং এর আদি বাসস্থান ওয়েস্ট ইনডিজ।

**মুসায়েনডা ॥**

মুসায়েনডা-র প্রজাতি সংখ্যা বেশ কয়েকটি। এদের ভেতরে লালরঙের এরিথ্রোফাইলা, সাদা রঙের ফ্রণডোসা ও নাতি-উচ্চ ফুলগাছের ফিলিপিকা প্রজাতিগুলি দেখতে খুব সুন্দর। বুগেনভিলিয়ার মত মুসায়েনডারও ফুলের চেয়ে ফুলের আবরণীর ( পাপড়িসদৃশ বৃত্যংশ ) জন্য সমাদর। অনেকগুলির আবরণী দেখতে অবিকল সেই গাছের পাতার মত, তফাত শুধু রঙের। ফ্রনডোসা যে কোন জায়গায় লাগানো চললেও এরিথ্রোফাইলা প্রজাতিটি সারাদিন হালকা ছায়া পড়ে শুধু এরকম জয়গায় লাগাবেন। প্রত্যেক বাগানেই সারাদিন হালকা ছায়া পড়ে এরকম কিছু জমি থাকেই, এসব জায়গার পক্ষে মুসায়েনডা এরিথ্রোফাইলাই সবচেয়ে উপযুক্ত। দুটি প্রজাতিরই ফুল দেবার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল এবং বর্ষার দিনে ফুলভরা গাছগুলি দেখায় চমৎকার। গাছ দুটি উচ্চতায় হাত দুয়েক এবং ডালপালা উপরের থেকে পাশে ছড়ায় বেশি। তাছাড়া এরিথ্রোফাইলার একটু লতিয়ে চলারও অভ্যাস। এটিকে ছাঁটার দরকার নেই এবং এর আদি বাসস্থান কঙ্গোর বনভূমি। কোন কোন মুসায়েনডার জন্মভূমি ভারত। এ দুটির বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের মাধ্যমে। মুসায়েনডার বাংলা নাম পত্রলেখা।

**ম্যাগনোলিয়া ॥**

ম্যাগনোলিয়া পুমিলা উচ্চতায় হাত চারেক এবং ফসকাটাও প্রায় এরকম উঁচু। পুমিলা প্রজাতিটি জহুরী চাঁপা নামেও কিছুটা পরিচিত। পুমিলা ফুল দেয় প্রায় সারাবছর, এর ফুল সাদা রঙের এবং ফুলের গন্ধ রাতে বেশ ভালভাবেই পাওয়া যায়। ফসকাটা ফুল দেয় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, এর ফুল প্রধানত ঘিয়ে সাদা এবং মৃদু গন্ধযুক্ত। ফসকাটা অত্যন্ত সুখী গাছ, পুমিলা অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু। সারাদিন হালকা ছায়া পড়ে এবং গোড়ায় জল জমবে না এরকম জায়গায় এদের লাগাবেন। পুমিলার গুটিকলমে এবং ফসকাটার দাবাকলমের সাহায্যে বংশবিস্তার, এবং এ দুটিই সম্ভবত চায়না থেকে এসেছে। ফসকাটার বাংলা নাম সুখচাঁপা।

**রঙ্গন ॥**

রঙ্গনের সংস্কৃত নাম রুক্মিণী এবং উদ্ভিদবিদ্যায় নাম ইকজোরা। রঙ্গনের প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর এবং একরকম সবগুলির চাষই সহজ। খুব বড় থোকার সাদা ফুলের সুপারবা অত্যন্ত সুখী প্রকৃতির গাছ এবং দুষ্প্রাপ্যও। রঙ্গনের ভেতরে সিঙ্গাপোরেনসিস প্রজাতিটিই বোধ হয় সবচেয়ে সুন্দর, এবং বেশির ভাগ সাদা ফুলের রঙ্গনেরই মৃদু সুগন্ধ রয়েছে।

রঙ্গনের ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল, এদের ফুল ফোটে থোকায় গাছ ভরে। ফুল ফোটা শেষ হয়ে গেলে গাছ হালকা ভাবে ছেঁটে দেবেন। রঙ্গনের খুব চমৎকার হেজ্ করা চলে এবং বর্ষাকালে হেজ্ না ছাঁটলে গাছে ফুলও পাবেন ; হেজের কাজে ডাফি হাইব্রিড বিশেষ উপযুক্ত। সিঙ্গাপোরেনসিসের দাবাকলমের সাহায্যে এবং অন্য প্রায় সবগুলির কাটিং-এর সাহায্যে বংশবৃদ্ধি। রঙ্গনের কোন কোন প্রজাতি আমাদের দেশী গাছ।

**রণডেলেটিয়া ॥**

রণডেলেটিয়া স্পেসিওসা-র ফুল দেখে রঙ্গন বলে মনে হতে পারে। ফুল ফোটার ধরন ও গড়ন দুইই অনেকটা রঙ্গনের মত। ফুলের রঙ হলদে মেশানো উজ্জ্বল লাল এবং ফুল ফোটে একরকম সারাবছর ধরে। গাছ রোদ ভালবাসে তবে হালকা ছায়া জায়গাতেও লাগানো যেতে পারে। রণডেলেটিয়া মোটামুটি কষ্টসহিষ্ণু এবং উচ্চতায় এটি হাত তিনেক। বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে এবং এটি এসেছে কিউবা থেকে। রণডেলেটিয়ার দেশী নাম রঞ্জনী।

**রামধন চাঁপা ॥**

রামধন চাঁপা বা ওকনা ওয়াইটিয়ানা-র সোনালী হলদে ফুল ফোটে একরকম সারা বছর ধরে এবং ফুল ফোটে বেশি গ্রীষ্মকালে। অনেক ফুল ফোটা অবস্থায় গাছটি দেখতে খুবই সুন্দর, কিছু ফুল সকালে ফুটে দুপুরের আগেই ঝরে যায়। তবে গাছের বীজগুলিও দেখতে বেশ ভাল এবং সেই সঙ্গে পাতাও। গাছটি হাত পাঁচেক উঁচু, ফুল দিতে সময় নেয় বছর তিনেক এবং বীজ দিয়ে এর বংশবৃদ্ধি। এটি এসেছে সম্ভবত নাটাল থেকে।

**রাসেলিয়া ॥**

রাসেলিয়া জানসিয়া একটি বিচিত্র-দর্শন গাছ। গাছে সত্যিকারের পাতা একরকম নেই তাছাড়া বেশির ভাগ ডালই নুয়ে থাকে। রাসেলিয়ার ফুল ছোট তবে ফোটে প্রচুর, ফুলের রঙ টকটকে লাল, এবং ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে। গাছ বাড়ে তাড়াতাড়ি, উচ্চতায় এটি হাত তিনেক এবং এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে। রাসেলিয়ার আদি নিবাস মেক্সিকো।

**লঙ্কাজবা ॥**

লঙ্কাজবা বা মালভাভিসকাস কনজাটী আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ। শীতকালের প্রথম দিকে যখন ফুল একরকম পাওয়াই যায় না তখন পূজার ফুলের জন্য লঙ্কাজবাই প্রধান ভরসা। এর ফুল টকটকে লাল এবং এর অন্য একটি প্রজাতি এলবা-র ফুলের রঙ পিঙ্ক। লঙ্কাজবা ফুল দেয় একরকম সারাবছর তবে শীতের দিনে ফুল দেয় অনেক বেশি। গাছ প্রথম বর্ষায় ছেঁটে দিতে পারেন, এদের বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে এবং লঙ্কাজবা এসেছে ট্রপিকাল আমেরিকা থেকে।

**লেমোনিয়া ॥**

লেমোনিয়া স্পেক্টাবিলিস ফুল দেয় সারাবছর। ক্রিমজন রঙের ফুল ও পাতা দুইই দেখতে ভাল। হালকা ছায়া জায়গাতেও এদের লাগানো যেতে পারে। গাছ উচ্চতায় হাত চারেক, মোটামুটি কষ্টসহিষ্ণু এবং এর বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। লেমোনিয়া এসেছে কিউবা থেকে এবং এর বাংলা নাম লাবনি।

**ল্যানটানা ॥**

ল্যানটানা দেশী গাছ না হয়েও ভারতের অনেক জায়গাতে জংলীগাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুলগাছ না হয়ে জঙ্গল হবে এই ভয়ে অনেকেই এ গাছ করতে চান না। কিন্তু ল্যানটানা ডিপ্রেসা এবং আরও দুয়েকটি প্রজাতির বেলায় জঙ্গল হবার ভয় নেই। সারা গাছ ভরে ছোট ছোট থোকায় ফুল ফোটা অবস্থায় ল্যানটানা খুবই সুন্দর দেখাত। ডিপ্রেসার ফুল

হলদে, এটি ফোটে একরকম সারা বছর ধরে এবং এটি এসেছে সেণ্ট্রাল আমেরিকা থেকে। বর্ষার শেষ দিকে ল্যানটানা ভাল করে ছেঁটে দেবেন। এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে।

**ষ্ট্যাকিটারফিটা ॥**

ষ্ট্যাকিটারফিটা জ্যামাইকেন্সিস-এর খুব ছোট ছোট ফুলগুলি ফোটে ছড়ায়। ফলের রঙ নীল ও ফুল ফোটে বছরের বিভিন্ন সময়ে। গাছটির সমাদর বিশেষ করে এর ফুলের রঙের জন্য। এটি বেশ কষ্টসহিষ্ণু ও এটি উচ্চতায় হাত তিনেক। ষ্ট্যাকিটারফিটা এসেছে ওয়েষ্ট ইনডিজ থেকে এবং এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে। এর মিউটাবিলিস প্রজাতিটিও বেশ সুন্দর দেখতে।

**সারবেরা ॥**

সারবেরা ফ্রুটিকোসা-কে পিঙ্ক টগর বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। ফুলের গড়নে সিঙ্গেল টগরের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে যদিও জাতিগতভাবে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। সারবেরা ফুল দেয় একরকম সারা বছর এবং প্রায় সব জায়গাতেই এটি লাগাতে পারেন। এর বীজ বিষাক্ত বলে জনশ্রুতি। গাছ হাত পাঁচেক উঁচু এবং এর বংশবৃদ্ধি গুটকলমের সাহায্যে। সারবেরা ট্রপিকাল আফ্রিকার গাছ।

**হাস্নাহানা ॥**

হাস্নাহানা বা সিষ্ট্রাম নকটারনাম আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। গন্ধ একটু তীব্র, তাহলেও এই গন্ধের জন্যই এদের এত সমাদর। গন্ধ পাওয়া যায় দিনের চেয়ে রাতে বেশি। গাছ করা অত্যন্ত সহজ এবং বুঝি যে কোন জায়গায় লাগানো চলে। হাস্নাহানা উচ্চতায় হাত পাঁচেক এবং কখনও কখনও আরও বড় হয়। বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে এবং এটি এসেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে।

# বাছাই নাতি-উচ্চ ফুলগাছ

এ রচনার গাছগুলি ছোট বাগানে, বড় রাস্তার পাশের দুটি বড় গাছের মাঝখানে একটি নাতি-উচ্চ গাছ, খুব অল্প জমির উপরে বাড়ীতে এর দু'চারটি গাছ হিসেবে লাগাতে বিশেষ উপযোগী। বড় বাগানের ভেতরের রাস্তার দু'পাশের গাছ হিসেবে এবং যে সব রাস্তায় বিদ্যুতের তারের জন্য বড় গাছ লাগাবার অসুবিধে, সে সব জায়গায় এদের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। উদ্ভিদবিদ্যার বিভাগ অনুযায়ী এদের অনেকে ট্রি (গাছ) বা টল শ্রাব ( বড় গুল্ম ) বলে ; কিন্তু গুল্ম বা গাছে ভেদ না করে যেগুলি সাধারণত হাত সাত-আট থেকে হাত পনেরোর ভেতরে, তাদের এই রচনার আওতায় আনছি। রাস্তায় ছায়া দেবার কাজে এ গাছগুলির উপকারিতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বাগানে বা বিশেষ কোন জায়গার শোভা বাড়ানো এবং পুজো ও সাজাবার ফুল যোগানোর কাজেই এদের বিশেষ ব্যবহার। রচনার অনেক গাছই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ হলেও উপযুক্ততার বিচারে এরা সহজেই ফুলবাগানে নিজেদের জায়গা করে নেয়।

**গাছ লাগানো ॥**

অপেক্ষাকৃত ছোট গাছের জন্য সওয়া হাত চওড়া ও দেড় হাত গভীর এবং একটু বড় গাছের জন্য দেড় হাত চওড়া ও দুহাত গভীর করে গর্ত গাছ লাগাবার মাসখানেক আগে তৈরী করবেন। দুভাগ সাধারণ মাটি ও একভাগ গোবরসার অথবা কম্পোষ্ট সার ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। সারমাটি ভরার সময়ে লক্ষ্য রাখবেন যে, সংলগ্ন জমি থেকে

গাছ লাগাবার জমিটুকু আট আঙ্গুল পরিমাণ উঁচু হবে। দামী গাছের বেলায় ছোট টবে প্রায় বছর খানেক রয়েছে এরকম গাছ যোগাড় করবেন। গাছ লাগাবেন বিকেলে অথবা মেঘলা দিনে। একরকম সব গাছের জন্য সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গা বেছে নেবেন। গাছ পূবদিকে অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করে লাগানো ভাল।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

গাছে যখনই জল দেবেন, গাছের গোড়া বেশ ভাল করে ভিজিয়ে দেবেন—অন্তত বালতি দুয়েক জল পড়বেই। সুখী গাছগুলিকে জল দেবেন গরমের দিনে মাসে বার পাঁচেক এবং শীতকালে মাসে বার তিনেক। কষ্টসহিষ্ণু গাছগুলিকে প্রথম দুবছর একই ভাবে জল দেবেন, তারপর থেকে জল নিয়মিত না দিলেও চলতে পারে। গাছের গোড়াতে কখনও ঘাস বা জঙ্গল হতে দেওয়া হবে না এবং গাছের গোড়া মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দেবেন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ার চারদিক কুপিয়ে ছোটগাছে এক বালতি এবং অপেক্ষাকৃত বড় গাছে দুবালতি গোবরসার মাটিতে মিশিয়ে দেবেন। সঙ্গে পাঁচশো থেকে এক কিলো হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে পারলে ভাল। গাছ ছাঁটার খুব প্রয়োজন নেই যদি না গাছ ছোট করে রাখতে চান। যেগুলি ছাঁটতে চান সেগুলি ফুল শেষ হলে ছাঁটবেন।

**এমহার্ষ্টিয়া ॥**

অনেকের মতে এমহার্ষ্টিয়া নোবিলিস ফুলগাছের জগতে সবচেয়ে সুন্দর গাছ। গাছ প্রথম দেখলে অশোক বলে ভুল হবার সম্ভাবনা। গাছের পাতা অশোকের চেয়ে আরও লম্বা ও আরও সুন্দর। তামাটে রঙের কচিপাতা ঝুলে থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাতা সবুজ হয় এবং উপরের দিকে উঠে আসে। গাছ উচ্চতায় হাত পনেরো ও প্রস্থে হাত দশেক। নিজের দেশ বর্মায় গাছের আয়তন অনেক বড় হয় বলে শোনা যায়। ফুল ছাড়াও গাছটি দেখতে সুন্দর। এ গাছটির বাংলা নাম সীমন্তক।

ফুলফোটা অবস্থায় গাছটি অত্যন্ত রকমের সুন্দর, ফুল ফোটার সময় পৌষ থেকে চৈত্র। ফুলের রঙ সিঁদুরে লাল, তার উপরে হলদে ফোঁটা। ফুল ফোটে স্তবকে এবং ফুল ফোটেও প্রচুর। ফুলের স্তবকগুলি নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। স্তবকটির ডাঁটি ও কুঁড়িগুলির রঙও সিঁদুরে লাল। স্তবকে ফুলের সংখ্যা দশ-পনেরো অথবা আরও বেশি। ফুল উপর থেকে ফুটতে আরম্ভ করে এবং একটি স্তবকে একসঙ্গে চার পাঁচটির বেশি ফুল ফোটা অবস্থায় দেখা যায় না। একক ফুলের আয়তন পাঁচ সাত সেন্টিমিটার এবং একক ফুল দু'তিন দিনের বেশি সুপ্রভ থাকে না। একক ফুলের অর্কিডের সঙ্গে আকৃতির সাদৃশ্য রয়েছে এবং সৌন্দর্যে অর্কিডের সঙ্গে এর তুলনা চলে। গাছে মাঝে মাঝে বীজ হয়, বীজ দেখতে চ্যাপ্টা সীমের মতো; সীমের চারদিকে ঘন লাল আভা খুবই স্পষ্ট। সীম ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে।

এমহার্ষ্টিয়া অত্যন্ত সুখী গাছ। ছোট অবস্থায় যথেষ্ট যত্ন না করলে গাছ বাঁচে না এবং এটিই বোধ হয় প্রধান কারণ, যে জন্য এমহার্ষ্টিয়া যে কোন বাগানে দেখা যায় না। সব-সময়ে হালকা ছায়া পড়ে গাছ এরকম জায়গা ভালবাসে, ছোট অবস্থায় কড়া রোদ পেলে গাছ মরে যাবার সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি বাড়ে এরকম কোন গাছ, যথা ডুমুর, প্রথমে লাগিয়ে তার ছায়ায় অথবা যেখানে সোজাসুজি রোদ একরকম পড়ে না এরকম পরিষ্কার জায়গায় এমহার্ষ্টিয়া লাগাবেন। বছর চার পাঁচ বয়স হলে গাছ মোটামুটি রোদ সহ্য করতে পারবে, এই সময়ে ছায়া দেবার জন্য যে গাছটি লাগিয়েছিলেন সেটি কেটে ফেলবেন। গাছ ছাঁটবেন না। দাবাকলমে গাছের বংশবৃদ্ধি, কেউ কেউ বিশেষ হরমোন প্রয়োগে গুলকলমও করে থাকেন। পুষ্পসজ্জায় এর ফুল কাজে লাগানো যায় না। এমহার্ষ্টিয়া সব বাগানের উপযোগী গাছ। এ গাছ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক।

**কর্ডিয়া ॥**

গাছে ফুল না থাকলে কর্ডিয়া সেবাষ্টিনাকে ফুলের গাছ বলেই মনে হয় না। পাতা

দেখতে বুনো এবং ডুমুরের পাতার মত কর্কশ, গড়নেও ডুমুরের পাতার সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে। গাছ দশ বারো হাত উচ্চতায়, প্রস্থে হাত সাতেক, নিজের দেশ কিউবায় কর্ডিয়া হাত পঁচিশেক বড় হয় বলে জানা যায়।

ফুল ছাড়া কর্ডিয়া দেখতে ভাল না লাগলেও গ্রীষ্মে ও বর্ষায় ফুলভরা অবস্থায় গাছটি দেখতে খুবই সুন্দর। ফুলের রঙ অরেঞ্জ-স্কারলেট, ফুলের রঙের জন্য গাছটি স্কারলেট কর্ডিয়া নামেও পরিচিত। ফুল থোকা হয়ে ফোটে, এক এক থোকায় পনেরো কুড়িটি ফুল। একক ফুল আয়তনে ইঞ্চিখানেক। বছরে প্রায় সব সময়ই কিছু না কিছু ফুল দেয়, তবে ফুলের থোকা বা ফুলের সংখ্যা গ্রীষ্ম বর্ষাতেই বেশি। ফুল তুললে খুব সহজেই নেতিয়ে পড়ে, তাই সাজাবার বা পুজোর কাজে এদের খুব কিছু ব্যবহার নেই।

কর্ডিয়া করা খুব সহজ। গাছ একবার লেগে গেলে তারপর খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন নেই। গাছের বংশবৃদ্ধি বীজের সাহায্যে, নতুন বীজ খোসা ছাড়িয়ে বর্ষার দিনে চারাবেন। বছর দুয়েকের মাথায় গাছ ফুল দেবে। কর্ডিয়ার বাংলা নাম রক্তরাগ।

**করবী ॥**

করবী বা নিরিয়াম অলিয়েন্ডার আমাদের অতি পরিচিত গাছ। পুজোতে করবীর ব্যবহার খুব বেশি। এদের সাদা, লাল, পিংক, গোলাপী রঙের প্রজাতি এবং সিঙ্গেল ও ডাবল ধরনের ফুলও রয়েছে। ফুলে গন্ধ আছে, গ্রীষ্মকালে ডালের মাথায় ফুল গুচ্ছাকারে ফোটে। সাদা ডাবল ফুলের পাপড়ির সংখ্যা কম, একটি সিঙ্গেল ফুলকে আর একটি সিঙ্গেল ফুলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে যে রকম দেখায়, এটি সে রকম দেখতে। কাটিং বা গুলকলমের সহায়তায় এর বংশবৃদ্ধি। করবী ছাঁটবেন না।

**কলকে ॥**

কলকে বা থিবেটিয়া নেরীফোলিয়া আমাদের পরিচিত গাছ। এ গাছ এত সহজে জন্মায় যে একথা কখনই মনে হয় না যে এটিও একসময়ে বাইরের থেকে এসেছিল। পুজোর ফুল হিসেবে কলকের খুব আদর। ফুল ফোটে একরকম সারা বছর, ফুলের রঙ সাদা, গেরুয়া অথবা হলদে, ফুলের গন্ধ মিষ্টি। গাছের সরু সরু পাতাও দেখতে সুন্দর। ফল বা ডাল বিষাক্ত। গরু বা ছাগলে গাছ খায় না। কলকে যেসব জায়গায় অন্য গাছ সহজে হতে চায় না এরকম জায়গায় লাগাবেন। বংশবৃদ্ধি বীজের সাহায্যে। কলকে এসেছে ওয়েষ্ট ইনডিজ থেকে।

**কাঁঠালি চাঁপা ॥**

কাঁঠালি চাঁপা বা আর্টাবোত্রিস ওডোরাটিসিমোস সর্বজন পরিচিত গাছ। ফুল ঘিয়ে রঙের, নোনা বা আতাগাছের ফুলের মত দেখতে অনেকটা। ফুলে চমৎকার গন্ধ। ফুলের গন্ধে ফুল খুঁজে পাওয়া সম্ভব, নইলে পাতার ভেতরে ফুলের দেখা পাওয়া কঠিন। গাছ লতানো ধরনের, কোন জায়গা আড়াল করার পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ এবং দেখতেও সুন্দর। গাছ করা খুব সহজ, যে কোন জায়গায় এটি লাগাতে পারেন। ফুল ফোটে একরকম সারা বছর। বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। কাঁঠালি চাঁপা ভারতীয় গাছ।

**কাঞ্চন ॥**

কাঞ্চন বা বোহিনিয়ার সুন্দর প্রজাতি রয়েছে বেশ কয়েকটি। এদের কতকগুলি হাত আটেক এবং অন্যগুলি হাত পনেরো উঁচু। সবগুলিই করার মত, তবুও এদের ভেতরে কাঞ্চন গলিপনি ও কাঞ্চন ব্লেকিয়ানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোট জাতের ভেতরে সালফুরিয়ার ঘিয়ে রঙের, টমেনটোসার ঘিয়ে রঙের ভেতরে বড় ঘন লাল ফোঁটা, একুমিনেটার ধপধপে সাদা এবং গলিপনির ভারমিলিয়ান রঙের ফুল। বড় গাছের ভেতরে পারপুরিয়ার মোভ বা লালচে সাদা, ভেরিয়াবিলিসের পারপেল, ক্যানডিডার পরিষ্কার সাদা, পিটার-

সিয়ানার কাঁচা হলদে রঙের ভেতরে ঘন মেরুন ফোঁটা এবং ব্লেকিয়ানার পারপেল রঙের ফুল। একুমিনেটা, সালফুরিয়া ও টমেনটোসার ফুল ফোটার সময় বর্ষাকাল; পারপুরিয়া, পিটারসিয়ানা ও গল্পিনির বর্ষার সময়ে ও শীতের প্রথম এবং ক্যানডিডা, ভেরিয়াবিলিস ও ব্লেকিয়ানার শীতকালে ঠান্ডা একটু বেশি পড়লে। ক্যানডিডা ও ভেরিয়াবিলিসের গাছ ফুলে একরকম ভর্তি হয়ে যায় এবং এ সময়ে গাছে পাতা একরকম থাকেই না। কাঞ্চনের বেশির ভাগ প্রজাতির চাষ সহজ। একটু শুষ্ক জলবায়ুতে ফুল ফোটে বেশি ; বাঁকুড়া বা দুর্গাপুরে তাই সহজেই ভাল ফুল পাওয়া যায়। হালকা ছায়াতেও গাছ লাগাতে পারেন; কিন্তু সেক্ষেত্রে ফুল পাবেন কম। গাছের পাতা অদ্ভুত ধরনের, অনেকটা উটের খুরের আকৃতির মত। পিটারসিয়ানা ও গল্পিনির পাতা আয়তনে ছোট। গল্পিনি ও পিটারসিয়ানা লাগাবার বছর তিনেক পরে ফুল দেয়, অন্যগুলিতে বছর দুয়েকের ভেতরে। সমতল বাংলায় গল্পিনি ও ব্লেকিয়ানার দাবাকলমের মাধ্যমে এবং অন্যগুলির বীজের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি। গল্পিনি এসেছে কেপ অব গুড হোপ থেকে, ব্লেকিয়ানা হংকং থেকে এবং এর বেশ কয়েকটি প্রজাতি ভারতীয়।

কাঞ্চন গল্পিনি ও ব্লেকিয়ানা রোদ ভালবাসে। গল্পিনির পাশে ছড়িয়ে পড়ার স্বভাব। গল্পিনি সুখী গাছ, বাড়ে খুব আস্তে আস্তে। গাছের প্রথম দুবছর যত্নের ব্যাপারে কোন অবহেলা করবেন না। ফুল ফোটা অবস্থায় গাছ দেখতে খুব সুন্দর, দূর থেকে মনে হবে যেন অনেক লাল প্রজাপতি বসে রয়েছে। অনেক সময়ে গল্পিনি আরও দু-এক দফায় ফুল দেয়। ব্লেকিয়ানাও সব বাগানে থাকার মত গাছ।

**কামিনী ॥**

কামিনী বা মারেয়া আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ। গাছ করা অত্যন্ত সহজ, রোদ বা ছায়ায়ও করা চলে। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় থোকায় ছোট ছোট সাদা ফুল কয়েকবার ফোটে। ফুলে সুমধুর গন্ধ, গাছের পাতাও দেখতে সুন্দর। গাছ ছেঁটে বিভিন্ন আকৃতির (টোপিয়ারি) ও হেজ্ করা যায়। কামিনী ইলঙ্গেটার ফুল আয়তনে বড়। বংশবৃদ্ধি বীজ ও গুটিকলমের সাহায্যে। ভারত কামিনীর অন্যতম আদি বাসস্থান।

**কুরচি ॥**

কবিরাজী ওষুধ তৈরীর কাজে কুরচি বা হোলাড়েনার প্রচুর ব্যবহার। কিন্তু শুধু ফুলের জন্যও এ গাছ করার মত। সুগন্ধি ফুল ফোটে গাছ ঢেকে গ্রীষ্মকালে এবং অনেক সময়ে আবার শীতকালে। ফুল সাদা, দেখতে অনেকটা সিঙ্গেল টগরের মত। গাছ উচ্চতায় হাত পনেরো, বংশবৃদ্ধি শেকড় থেকে বেরুনো চারার মাধ্যমে। কুরচির চাষ অত্যন্ত সহজ, একরকম যে কোন জায়গায় লাগাতে পারেন। গাছটি ভারতীয়।

**কৃষ্ণচূড়া-ছোট ॥**

কৃষ্ণচূড়া নামের জন্য বড় গাছ কৃষ্ণচূড়া বা পয়েলসিয়ানা রেজিয়ার সঙ্গে ভুল হওয়া সম্ভব। আসলে এটি সিজালপাইনিয়া পুলকেরিমা বা বারবাডোজ প্রাইড। আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ এবং করাও খুব সহজ। ফুল ফোটে বড় ছড়ানো থোকায়, এর প্রজাতি বাই-কলারের ফুলের রঙ লাল-হলদে এবং ফ্লাজার শুধু হলদে। ফুল ফোটে বারোমাস। গাছ বেশ ছোট করে ছেঁটে দেওয়া দরকার বছরে একবার। এগুলি উচ্চতায় হাত নয়েক, বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। এ গাছ এসেছে ওয়েস্ট ইনডিজ থেকে।

**ক্যালিয়ানড্রা ॥**

ক্যালিয়ানড্রার সব ক'টি প্রজাতি দেখতে খুব সুন্দর। ফুল দেখলে নতুন রঙের শিরীষ ফুল বলে মনে হতে পারে। গাছের পাতা দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের। ক্যালিয়ানড্রার হেমাটোসেফালা এবং হুস্টনী হাত আটেক, টুইডী আরও একটু বেশি উঁচু। হেমা-টোসেফালার ফুল ক্রিমজন, ফোটে শীতকালে ; হুস্টনীর সাদা ও হালকা লাল এবং টুইডীর

সাদা ও ঘন লাল, এ দুটিই ফোটে সারা বছর। সব ক'টি গাছই বাড়ে আস্তে আস্তে। হুন্টনী হালকা ছায়া জায়গায় লাগাবেন। হুন্টনীর দাবাকলমের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি, অন্য দুটির গুটিকলমে। টুইডী এসেছে ব্রিটিশ গায়না থেকে এবং হেমাটোসেফালা ব্রাজিল থেকে।

**ক্যালিষ্টিমন ॥**

ক্যালিষ্টিমন ইংলিশে সাধারণত 'বটল-ব্রাশ' নামে পরিচিত। এদের ফুলের সঙ্গে বটল-ব্রাশ ছাড়া অন্য কিছুর উপমাও দেওয়া সম্ভব নয়। গাছের আদি বাসস্থান অষ্ট্রেলিয়া। ক্যালিষ্টিমনের চাষ খুবই সহজ। গাছের ডাল ঝুলে পড়ে ; ফুল একরকম ডালের সঙ্গে লেগে থাকে এবং ফুলের সামনে পেছনে দুদিকেই পাতা। ফুলের রঙ লাল, গাছ ফুল ছাড়াও দেখতে সুন্দর। ক্যালিষ্টিমন ল্যানসিওলেটাস হাত পনেরো উঁচু, স্পেসিওসা এর চেয়ে ছোট। ল্যানসিওলেটাস ফুল দেয় প্রায় সারা বছর, বর্ষাকালে ফুলের সংখ্যা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি। এদের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। ক্যালিষ্টিমনের গাছ কখনও কখনও বেশ বড় হতে দেখা যায়।

**গন্ধরাজ ॥**

গন্ধরাজ বা গার্ডেনিয়া সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত। এ গাছটি আমাদের এত আপনার যে একথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না যে এ গাছটি এক সময়ে চায়না থেকে এসেছিল। গন্ধরাজ ফ্লোরিডা উচ্চতায় হাত দশেক। অন্য দুটি প্রজাতি ছোট গাছের আওতায় পড়বে। গন্ধরাজ ফ্লোরিডা করা খুব সহজ, অল্প ছায়াতেও গাছ ভাল জন্মায়। ফুল সাদা, ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। অনেকে গন্ধরাজ দিয়ে হেজ্ করেন, তবে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে, তাই হেজ্ এ সময়ে মোটেই সুন্দর দেখায় না।

**গুলঞ্চ ॥**

গুলঞ্চ বা প্লুমেরিয়া গুলচি, কাঠগোলাপ, ফিরিঙ্গিপানি ইত্যাদি নামেও পরিচিত। গুলঞ্চের বিভিন্ন রঙের কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায় এবং একরকম সব ক'টিরই চমৎকার গন্ধ। পূজোর ফুল হিসেবে এদের বিশেষ সমাদর। ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, তাই যে কোন জায়গায় গুলঞ্চ লাগাতে পারেন। বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। কাটিং লাগাবার আগে কাটা ডাল কয়েকদিন ছায়ায় শুকিয়ে নেবেন। ট্রপিকাল আমেরিকা গুলঞ্চের আদি বাসস্থান।

**জ্যাট্রোফা ॥**

জ্যাট্রোফা পানডুরাফোলিয়া-র ফুল ছোট, কিন্তু গাছ ফুলে ভরে থাকে সারাবছর। ফুলের রঙ লাল। গাছ উচ্চতায় হাত নয়েক, সহজেই ছেঁটে ছোট করেও রাখা চলে। টবেও ফুল দেয় সারাবছর। গাছ কষ্টসহিষ্ণু, বংশবৃদ্ধি গুলকলমের সাহায্যে। এটি এসেছে ওয়েষ্ট ইনডিজ থেকে।

**টগর ॥**

টগর বা ট্যাবারনামনটানা করোনারিয়া আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ। এদের ফুল পূজোর কাজে বুঝি অপরিহার্য। ফুলভরা টগর গাছ দেখতেও বেশ সুন্দর। সিঙ্গেল টগর বা কাঠটগর হাত নয়েক উঁচু। আসামের জঙ্গলে কাঠটগরের সাধারণ সিঙ্গেল ফুলের অন্তত দুগুণ বড় ফুলের একটি প্রজাতিও দেখেছি। সিঙ্গেল টগর দিয়ে অনেকে হেজ্ করেন। গাছ হালকা ছায়া জায়গায়ও লাগানো চলে। এদের বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। টগর ভারতের নিজস্ব গাছ।

**টেকোমা ॥**

টেকোমার সব ক'টি প্রজাতি দেখতে ভাল, তবুও এদের ভেতরে গাউডিচাউডি সৌন্দর্যের বিচারে যে কোন বাগানে স্থান পাবার উপযুক্ত। ক্রিসেন্থা ও ষ্ট্যানের ফুলের রঙ হলদে, ক্যাপেনসিস ও স্মিথির হলদে ও কমলা রঙের, এবং সব ক'টির ফুল ফোটে থোকাতে। গাউডিচাউডির ফুল উজ্জ্বল হলদে এবং এর থোকা খুবই বড়, বছরে বার দুয়েক ফুল ফোটে গাছ ভয়ে। সব টেকোমাই ফুল দেয় একরকম সারাবছর। টেকোমা বছরে একবার ভাল করে ছাঁটবেন, এ কাজ বেশি ফুল দেবার পরে করবেন। গোড়ায় জল জমে না এরকম জায়গায় টেকোমা লাগাবেন। গাছের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। গাউডিচাউডির বংশবৃদ্ধি দাবা-কলমে করা ভাল। টেকোমার অনেকগুলি প্রজাতি এসেছে সাউথ আমেরিকা থেকে। গাছটির দেশী নাম ছন্দপ্রভা।

**ট্যাবিবুইয়া ॥**

বসন্তের দূত হিসেবে গণ্য হবার দাবি ট্যাবিবুইয়া স্পেক্টাবিলিস জানাতে পারে সহজেই। শীতের শেষে বসন্ত সমাগমে তাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানায় সোনালী হলদে ফুলভরা এই গাছটি। ক্ষণিক বসন্তের মতো ট্যাবিবুইয়ারও ফুলের সময়ও মাত্র কয়েকদিনের, তাহলেও এ গাছটি সমাদর পাবার খুবই উপযুক্ত। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের প্রথমেও আর এক দফা ফুল দেয়। ফুল ফোটার সময়ে গাছে পাতা থাকে না। গাছভরা ফুল অবস্থায় ট্যাবিবুইয়া দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। গাছ উচ্চতায় হাত বারো, বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। ট্যাবিবুইয়া এসেছে ট্রপিকাল আমেরিকা থেকে। এটির বাংলা নাম বসন্তদূত।

**ডম্বিয়া ॥**

ডম্বিয়া গ্যাগিয়ানার ফুল অন্যান্য ডম্বিয়ার মত উপরের দিকে মুখ করে না ফুটে নিচের দিকে ঝুলে থাকে। গ্যাগিয়ানার ফুলের রঙ পিঙ্ক এবং ডম্বিয়ার ভেতরে বোধহয় এটিই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। ফুল ফোটে থোকায়, ফোটার সময় শীতকাল এবং ফুল ফোটেও মোটামুটি বেশ। ফুল ঝুলে থাকে বলে সহজেই গ্যাগিয়ানা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের গাছের পাতা দেখতে বুনো বুনো। গ্যাগিয়ানা হালকা ছায়া জায়গায় অথবা যেখানে শুধু সকালের রোদ পড়ে এরকম জায়গায় লাগাবেন। ফুল শেষ হয়ে যাবার পর গাছ ছেঁটে দেবেন। গাছ আটদশ হাত উচ্চতায়, বংশবিস্তার গুটি কলমের সাহায্যে। ডম্বিয়ার দেশী নাম ডমরুপাণি।

**পয়েনসেটিয়া ॥**

ক্রিসমাসের সময়ে পয়েনসেটিয়া পুলকেরিমার ফুলে গাছ আলো করে থাকে তাই এ গাছ 'ক্রিসমাস লীফ' নামেও পরিচিত। বুগেনভিলিয়ার মত ফুলের রঙীন আবরণীর জন্যই এই গাছের এত সমাদর। পয়েনসেটিয়ার সব কয়টি প্রজাতি দেখতে সুন্দর, এদের ভেতরেও ফ্লেমিং স্ফিয়ার ও ডাবল পয়েনসেটিয়া ( এটি পয়েনসেটিয়া প্লেনিসিমা নামেও পরিচিত ) সত্যিই দেখতে চমৎকার। গাছ সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গায় লাগাবেন এবং যথেষ্ট জায়গা থাকলে অনেকগুলি পয়েনসেটিয়া কাছাকাছি লাগাবেন। এক সারি পয়েনসেটিয়া ফুটে থাকলে এদের থেকে চোখ ফেরানো কঠিন। এদের নতুন ডালে ফুল ভাল ফোটে, তাই গাছ প্রত্যেক বছরই ফুল ফোটার পরে ছেঁটে দেবেন। গাছ আট দশ হাত উঁচু এবং বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। মেক্সিকো পয়েনসেটিয়ার আদি বাসস্থান। এর বাংলা নাম পত্রমঞ্জরী।

**পালতেমাদার ॥**

পালতেমাদার বা এরিথ্রিনার বেড়া অনেক জায়গাতেই চোখে পড়ে, কিন্তু এর দুটি খুব সুন্দর প্রজাতি কৃষ্টাগেলি ও ব্লাকী সচরাচর দেখা যায় না। কৃষ্টাগেলী দেখতে শুধু সুন্দর নয়, অন্যান্য পালতেমাদারের থেকে দেখতেও অনেকটা আলাদা এবং এর ফুল

ফোটে অনেকদিন ধরে। এদের ফুল ফোটার প্রধান সময় গ্রীষ্মকাল এবং দুটিরই এক এক থোকায় অনেক ফুল ফোটে। গাছ দুটি হাত বারো চৌদ্দ উচ্চতায়, এদের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। ক্লণ্টাগোলি এসেছে ট্রপিকাল আমেরিকা থেকে। এর কোন কোন প্রজাতির অন্যতম আদি বাসস্থান ভারত।

**পোসোকুরিয়া ॥**

পোসোকুরিয়া ল্যাটিফোলিয়া-র ফুল ফোটে থোকায়, একক ফুল ইঞ্চি চারেক লম্বা এবং অনেকটা নিকোটিয়ানার ফুলের মত। ফুল সাদা, সুগন্ধিযুক্ত ফুল ফোটে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং ফোটে একসঙ্গে অনেক। গাছ সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গায় অথবা হালকা ছায়ায় লাগাতে পারেন। গাছ বাড়ে ধীরে ধীরে এবং মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু। হাত বারোর উপরে উচ্চতায় এরকম পোসোকুরিয়া গাছ দেখেছি, তবে সাধারণত গাছ এত বড় হয় না। বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে তবে পোসোকুরিয়ার শেকড় সহজে হতে চায় না। এটি এসেছে ব্রাজিল থেকে এবং এর বাংলা নাম সিতকণ্ঠ।

**ফুরুস ॥**

ফুরুস বা ল্যাগারস্ট্রোমিয়া ইন্ডিকার সব কয়টি প্রজাতি দেখতে খুব সুন্দর। ল্যাঙ্কাস্টেরীর রঙ পারপেল, দি ব্রাইডের গোলাপী। এছাড়া সাদা বা মোভ রঙের প্রজাতিও পাওয়া যায়। ফুরুসের ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষাকাল। বর্ষার মেঘের ঘনঘটার দিনে ফুরুস এলবা-র সাদা থোকা থোকা ফুল অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এ গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং একরকম যে কোন জায়গায় লাগানো চলে। অনেকের মতে শীতের শেষে ফুরুস গাছ বেশ করে ছেঁটে দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। অন্যান্য ফুরুস যদি বা ছাঁটেন, এলবা কিন্তু বেশি করে ছাঁটবেন না। এলবা বেশি করে ছাঁটলে মেঘের পশ্চাৎপটে এর রূপ খুব একটা বোঝা যাবে না। ফুরুস উচ্চতায় হাত বারো, বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে। এগুলি ভারতীয়।

**বকফুল ॥**

বকফুল বা সেসবানিয়া গ্রানডিফ্লোরার ডাবল প্রজাতি দুটি দেখতে খুবই ভাল। সাদা ডাবল ফুলটি পিঙ্ক ডাবল ফুলের চেয়ে আকারে বড়। বকফুল শীতকালে বেশি ফোটে এবং ডাবল বকফুলে বীজ হতে দেখা যায় না। গাছ হাত বারো উচ্চতায়, ডাবল বকফুলের বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। বকফুল এসেছে মালয় থেকে।

**ব্রায়া ॥**

ব্রায়া ইবেনাস একরকম সারা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল ভরে ফুল দেয় এবং মাঝে মাঝে ফুল দেয় গাছ ভরে। ছোট ছোট কমলা রঙের ফুলে ছেয়ে থাকা অবস্থায় ঝুলে পড়া ডালের গাছটি দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। ফুলে মৃদু গন্ধ রয়েছে। গাছ হাত বারো উচ্চতায়, কষ্টসহিষ্ণু এবং এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। এটি এসেছে ওয়েষ্ট ইনডিজ থেকে এবং এর দেশী নাম স্বর্ণচূড়।

**মিলেটিয়া ॥**

মিলেটিয়া ওভালিফোলিয়ার ফুল মোভ রঙের, এবং ছোট ছোট ফুলে ভরা গাছ দেখতে খুব সুন্দর। ফুল ফোটে ছড়ায় এবং ফুলের সময়ে গাছে একরকম পাতা থাকে না। ফুল ফোটে গরমের প্রথমে। গাছের পাতাও দেখতে সুন্দর এবং গাছের ডাল কিছুটা ঝুলে পড়ে। মিলেটিয়া উচ্চতায় হাত বারো এবং এটি মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু। বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। মিলেটিয়া এসেছে বার্মা থেকে।

**মুসায়েনডা ॥**

মুসায়েনডা ফিলিপিকা প্রজাতিগুলির বিশেষত্ব এই যে এতে ফুলের আবরণীর সংখ্যা অন্যান্য মুসায়েনডার থেকে বেশি। অরোরা প্রজাতিটির ফুলের আবরণীর রঙ সাদা এবং ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে। ফিলিপিকার পাতাও সুন্দর, তাই ফুল ফোটা অবস্থায় গাছ দেখতে খুবই ভাল। গাছগুলি অত্যন্ত সুখী প্রকৃতির, তাই কখনও অবহেলা করা যাবে না। সারাদিন হালকা ছায়া পায় এবং গাছের গোড়ায় জল জমবে না এরকম জায়গায় ফিলিপিকা লাগাবেন। গাছ হাত আটেক উচ্চতায়, বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে। এগুলি এসেছে ফিলিপাইনস থেকে। মুসায়েনডার বাংলা নাম পত্রলেখা। লাল রঙের ডোনা লাজ, পিঙ্ক রঙের সিরিষ্টি ও এলিসিয়া প্রজাতিগুলিও অরোরার মত সমান সুন্দর। এই সবগুলির নরম ডালের ডালিয়ার মত কাটিং করা যায়।

**ম্যাগনোলিয়া ॥**

ম্যাগনোলিয়ার গুটি দুতিন প্রজাতির ফুলের খুব সমাদর। এদের ভেতরে ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা বা হিমচাঁপা আমাদের মোটামুটি পরিচিত। ফুল সমতল বাংলায় খুব বেশি ফোটে না, তাহলেও গাছটি জনপ্রিয়। গাছ দেখতে সব দিক দিয়ে একই রকমের ; কিন্তু একটির ফুল অন্যটির চেয়ে অনেক বড়, ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরার ভেতরে এ ধরনের গাছ দেখা যায়। শ্বেতপদ্মের মত বড় ফুলের গাছটি গ্রানডিফ্লোরা এক্সমাউথ নামে কোন কোন জায়গায় পরিচিত। ছোট ফুলটি এক্সমাউথের তুলনায় অনেক সাধারণ যদিও ফোটে সংখ্যায় বেশি। এদের ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। ফুল সাদা ও সুগন্ধযুক্ত। গ্রানডিফ্লোরার গাছ ফুল ছাড়াও দেখতে সুন্দর। গাছ বড় হলে রোদ ভালভাবে সহ্য করতে পারে, তাই ছোটবেলায় এমহার্ষ্টিয়া নোবিলিসের মত পরিচর্যা পেলে ভাল। গাছ বাড়ে খুব আস্তে আস্তে, বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে। এটি উচ্চতায় হাত বারো বা আরও বড়। ম্যাগনোলিয়া টেরোকার্পা বা আনন্দ চাঁপা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য গাছ এবং এটি সহজে এখানে বাঁচানো যায় না। ফুল সাদা, ফুলে গন্ধ রয়েছে এবং ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে। কিন্তু এখানে ফুল ফোটে খুব কম এবং ফুটলেও ভাল ফোটে না। গ্রানডিফ্লোরা এসেছে উত্তর আমেরিকা থেকে এবং আসাম টেরোকার্পার অন্যতম আদি নিবাস।

ম্যাগনোলিয়া মিউটাবিলিসের বাংলা নাম সহজ চাঁপা। এর ফুল দেখতে অদ্ভুত ধরনের। ফুলের আকৃতি ঠিক ডিমের মত এবং ফুল গাঢ় ঘিয়ে রঙের। ফুলে মিষ্টি গন্ধ। ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল। মিউটাবিলিস সারাদিন হালকা ছায়া পায় এবং গোড়ায় জল জমবে না এরকম জায়গায় লাগাবেন। গাছ উচ্চতায় হাত দশেক এবং বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে।

**রঙ্গন ॥**

রঙ্গনের সংস্কৃত নাম রুক্মিণী এবং উদ্ভিদবিদ্যায় নাম ইকজোরা। উচ্চতার বিচারে এর বেশি ভাগ গাছ ছোট গাছের আওতায় পড়বে। শুধু মাত্র রঙ্গনের পর্ভিফ্লোরা, ওয়েষ্টী, ম্যাক্রোথাইরসা ইত্যাদি কয়েকটি প্রজাতি উচ্চতায় হাত আটেকের উপরে। প্রথমটির ফুল সাদা এবং অন্য দুটির লাল, এদের ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে। পার্ভিফ্লোরার ফুল দেখতে তত ভাল না হলেও ফুলে মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। রঙ্গন অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং এদের একরকম যে কোন জায়গায় লাগানো চলে। বংশবিস্তার গুটি কলমের সাহায্যে। পার্ভিফ্লোরা ছায়া জায়গায় বেশি মানায়, এটি পুরোপুরি ভারতীয়।

**শিউলি ॥**

শিউলি বা নিকটেন্থাস আরবর ট্রিষ্টিস আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ। এটি শেফালিকা ও পারিজাত নামেও পরিচিত। পুজোর ফুল হিসেবে শিউলির খুব সমাদর। ফুল সাদা ও কমলা রঙের, ফুল ফোটে রাতে। ফুলের সুগন্ধ গাছের কাছাকাছি জায়গা মাতিয়ে রাখে। ফুলের গড়ন আলাদা এ রকম দুতিন রকমের গাছ দেখা যায়। এর ভেতরে একটির

ফুল অন্যগুলির চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড়। সাধারণ ভাবে শিউলির ফুল ফোটার সময় বর্ষার শেষ ও শীতের প্রথম। কিন্তু কোন কোন গাছ অসময়েও ফুল দেয়। এ ধরনের গাছ ও বড় ফুলের শিউলি কাটিং দিয়ে বা গুটিকলম দিয়ে নতুন গাছ তৈরী করে তা বেশি করে লাগানো উচিত। শীতের শেষে কাটিং করলে তার কিছু কিছু বাঁচার সম্ভাবনা। ফুল হয়ে গেলে গাছ মুড়িয়ে ছেঁটে দেবেন। অনেকে বছর পাঁচেক পরে গাছটিকে বাতিল করে নতুন গাছ লাগিয়ে থাকেন। শিউলি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু গোড়ায় কিছুমাত্র জল জমলে গাছ বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এদের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। ওষুধ হিসেবে এবং অন্যান্য কাজেও শিউলি সমাদৃত। শিউলি আমাদের দেশী গাছ।

**স্টেমাডেনিয়া ॥**

স্টেমাডেনিয়া বেলার ফুল সাদা এবং এর গড়ন কিছুটা সিঙ্গেল টগরের মত। ফুলে সুগন্ধ রয়েছে এবং এটি ফোটে গ্রীষ্মকালে। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু এবং উচ্চতায় হাত দশেক। বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে। স্টেমাডেনিয়ার বাংলা নাম মণিমালতী।

**স্থলপদ্ম ॥**

স্থলপদ্ম বা হিবিসকাস মিউটাবিলিস আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ এবং পুজোতে এর ফুলের বহুল ব্যবহার। ফুল ফোটার সময় শীতকাল এবং ফুলের রঙ প্রধানত গোলাপী। এর সিঙ্গেল ও ডাবল দুটি প্রজাতিই দেখতে সুন্দর। কোন কোন সিঙ্গেল ও ডাবল গাছের ফুল ফোটে সাদা রঙের, কিন্তু দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা ধীরে ধীরে গোলাপী হয়ে যায়। ফুলের পরে গাছ মুড়িয়ে ছেঁটে দেবেন। গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে। স্থলপদ্মের আদিনিবাস চায়না।

**হ্যামিলটোনিয়া ॥**

হ্যামিলটোনিয়া সুয়াভেওলেনসের ছোট ছোট ফুল ফোটে লম্বা ছড়ায়। ফুলের রঙ সাদা এবং ফুলে মৃদু সুগন্ধ রয়েছে। ফুল ফোটে শীতকালের শেষ দিকে। গাছ করা খুব সহজ, এটিকে হালকা ছায়া জায়গাতেও লাগাতে পারেন। ফুল হয়ে যাবার পরে গাছ মুড়িয়ে ছেঁটে দেওয়া ভাল। হ্যামিলটোনিয়া উচ্চতায় হাত নয়েক এবং এর বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। ভারত এর অন্যতম আদি বাসস্থান। হ্যামিলটোনিয়া বাঁই চাঁপা নামেও কিছুটা পরিচিত।

# বাছাই বড় ফুলগাছ

বড় ফুলগাছের পরিচর্যার সঙ্গে ছোট বা নাতি-উচ্চ ফুলগাছের পরিচর্যার মূলত কোন ভেদ নেই। বড় ফুলগাছ আকৃতিতে বড় তাই তার চাহিদা, বিশেষ করে প্রাথমিক চাহিদা, পরিমাণে বেশি। তবে সুবিধের দিকও রয়েছে। প্রাথমিক চাহিদা ভালভাবে মিটলে পরে বড় গাছের আর পরিচর্যার বিশেষ দরকার পড়ে না।

**বড় ফুলগাছের উপযুক্ত জায়গা ॥**

বড় ফুলগাছকেও আবার আকৃতি অনুযায়ী ছোট, মাঝারি ও বড় করে ভাগ করা চলে। ছোটগুলি বড় বাগানের ভেতরের বড় রাস্তার দুপাশে লাগাবার বিশেষ উপযুক্ত। তাছাড়া জমি অল্প এরকম বাগানে এদের থেকে বেছে একটি বা দুটিকে লাগাতে পারেন। মাঝারি আকৃতির গাছগুলি বড় আকৃতির গাছের মাঝে মাঝে অথবা ছোট আকৃতির গাছের

মাঝে মাঝে লাগানো চলে। মাঝারি ও বড় আকৃতির গাছগুলি বিশেষ করে বড় বাগান বা বড় রাস্তার পাশে ছায়া দেবার কাজের উপযোগী। তবে যেসব গাছের ডালপালা নরম এবং সহজেই গাছ বা ডাল ভেঙে পড়ে তাদের বড় রাস্তার পাশে লাগানো চলে না। বড় বা মাঝারি আকৃতির গাছ যেগুলির ফুল খুব উজ্জ্বল সেগুলির একই প্রজাতির তিনচারটি গাছ বাগানের দূরের কোন জায়গায় পর পর লাগালে তা দেখতে খুব সুন্দর দেখাবে। বড় আকৃতির গাছ লাগাবেন একরকম সব সময়ে বাগানের শেষ সীমায়। কাটিং বা গুটি-কলমের নতুন গাছ লাগালে তা বীজের গাছের চেয়ে আকৃতিতে অনেক ছোট হবে। কিন্তু এ ধরনের নতুন গাছ শুধুমাত্র ছোট আকৃতির গাছের বেলায় লাগানো ভাল। কেননা এই সব গাছের মূল শেকড় থাকে না বলে বড় বা মাঝারি আকৃতির গাছ হলে তা সহজেই ঝড়ে উপড়ে পড়ার সম্ভাবনা।

এ রচনার সব গাছ সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গায় লাগাবেন। বাগানে বড় ও মাঝারি আকৃতির গাছ লাগাবেন দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তে। উত্তর প্রান্তেও লাগাতে পারেন কিন্তু পূর্ব প্রান্তে বড় বা মাঝারি আকৃতির গাছ লাগাবেন না। পূবের সীমানায় বড় বা মাঝারি আকৃতির গাছ লাগালে তা কিছুদিনের ভেতরেই বাগানের অন্যান্য ছোট গাছকে সকালের রোদ থেকে বঞ্চিত করবে। গাছের ছোট অবস্থায় এ অসুবিধার কথা বোঝা যাবে না কিন্তু গাছ মহীরুহ হয়ে দাঁড়াবার পরে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করারও থাকবে না। যে গাছ লাগাবেন তা কত বড় হওয়া স্বাভাবিক সেই সব প্রজাতির প্রাপ্তবয়স্ক গাছ দেখে ধারণা পাকা করে নেওয়া ভাল। শুধু যদি বড় ফুলগাছ সারি করে লাগান তাহলে ছোট আকৃতির যে কোন দুটি গাছের ভেতরে ব্যবধান রাখবেন হাত বারো, মাঝারি আকৃতির হাত আঠারো এবং বড় আকৃতির গাছের বেলায় হাত পঁচিশেক।

**গাছ লাগানো ॥**

তিন হাত গভীর ও দুহাত চওড়া (ব্যাস) করে গর্ত করবেন। দুভাগ সাধারণ মাটি ও একভাগ গোবরসার ভাল করে মিশিয়ে তা দিয়ে গর্ত ভরে দিন। সারমাটি যাতে ভাল করে বসে যায় সেজন্য মাঝে কয়েকদিন বাদ দিয়ে অন্তত দুবার গাছ লাগাবার সারমাটি ভরা গর্তে খুব করে জল ঢেলে দিন। সারমাটির পরিমাণ এরকম হবে যাতে গর্তের সারমাটি পাশের জমি থেকে কিছুটা উঁচু থাকে। সম্ভব হলে প্রত্যেক গর্তের সারমাটিতে বালতি খানেক হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দেবেন।

বড় ফুলগাছ, বিশেষ করে মাঝারি ও বড় আকৃতির গাছের বেলায়, লাগাবার কাজে এক বছরের বা তার কিছু কম বয়সে চারাগাছ ব্যবহার করবেন। নার্শারী-টবে লাগানো রয়েছে এরকম চারাগাছই একাজে বাঞ্ছনীয়। দুতিন বছরের গাছের মূল শেকড় তত সরল বা সতেজ না থাকার সম্ভাবনা, তাই বছর খানেকের চারাগাছ লাগানোই ভাল। গাছ লাগাবেন মাঘ মাসে অথবা বর্ষার প্রথমে। এবং লাগাবেন বিকেল বেলা বা মেঘলা দিনে। টব থেকে খুলে গাছ এভাবে লাগাবেন যাতে টবের গাছের কাণ্ড যতটা মাটির উপরে ছিল ঠিক যেন ততটাই জমির উপরে থাকে।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

গাছ লাগিয়ে জল দেবেন এবং যখনই জল দেবেন বেশ বেশি করেই দেবেন। জল প্রতিবারেই অন্তত বালতি দুই পড়বে। গাছের গোড়ায় থালার মত করে বেঁধে দেবেন যাতে ভালভাবে জল পায়। এই থালা কিন্তু বর্ষাকালে ভেঙে দিতে হবে। বর্ষাকালে থালা ভেঙে দিয়ে গাছের গোড়ার জমি একটু উঁচু করে দেবেন যাতে গোড়ায় জল দাঁড়াতে না পারে। গ্রীষ্মকালে মাসে বার পাঁচেক ও শীতকালে বার তিনেক জল দেবেন। গোড়ার থালার উপরে দশ সেণ্টিমিটার ঘন করে গাছের শুকনো পাতা বা কাটা খড় বিছিয়ে দিতে পারেন। এতে জল দেবার সংখ্যা কমিয়ে গ্রীষ্মকালে মাসে তিন দিন এবং শীতকালে দুদিনে দাঁড় করানো চলে। তবে বর্ষাকালে পাতা সরিয়ে গাছের গোড়া উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে, নাহলে গাছের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার জমি খুঁচে দেবেন।

একাজ করবেন জল দেবার দিন পাঁচেক পরে। এবং গাছের গোড়ায় কখনও জঙ্গল হতে দেবেন না।

বড় ফুলগাছকে এভাবে বাড়তে সাহায্য করবেন যাতে গুঁড়ি ঋজু হয়ে ওঠে এবং প্রায় দেড় মানুষ উঁচু গুঁড়ি থেকে কোন ডাল না ছাড়ে। গাছ বেঁকে উঠলে বা গোড়া থেকে ডালপালা ছাড়লে তার নিচে চলাফেরা করার অসুবিধে। তছাড়া বেঁকে উঠলে গাছের সৌন্দর্যও তত খুলবে না। গাছকে সরল ভাবে বাড়তে সাহায্য করতে গাছ লাগাবার সময় থেকেই বড় কাঠি বা সরু বাঁশের সঙ্গে গাছ বেঁধে দেবেন। গাছ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে বাঁধতে হবে। বাঁধার কাজ কলাগাছের তন্তু বা নরম দড়ি দিয়ে করবেন। এবং গাছটি বাঁধার অংশটি পুরানো কাপড় ভাঁজ করে মুড়ে তার উপর দিয়ে বাঁধবেন যাতে গাছের ছালের কোন ক্ষতি না হয়। এ ছাড়া গোড়া থেকে নতুন ডাল বেরুলে তা কচি অবস্থায় ভেঙে দেবেন।

মানুষের ইচ্ছাকৃত ক্ষতির হাত থেকে গাছ বাঁচাবার কোন উপায় নেই। গরুছাগলের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গাছ ঘিরে বিভিন্ন ধরনের বেড়া দিতে পারেন। চারকোনা লোহার জালের বেড়া দেখতে ও কাজে সবচেয়ে ভাল। এ ধরনের বেড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চৌহদ্দিতে নতুন গাছ বাঁচাবার কাজে লাগানো হচ্ছে দেখতে পাবেন। এছাড়া ইট ও সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা গোল করে ঘেরা বেড়াও করা যেতে পারে। এবং প্রয়োজনমাফিক অন্যান্য ধরনের বেড়াও দিতে পারেন। গাছ যথেষ্ট আলোবাতাস পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বেড়া দেবেন।

বড় ফুলগাছ ছাঁটার একরকম দরকার পড়ে না। শুধুমাত্র মরাডাল কেটে বাদ দেবেন। গাছ ছোট করে রাখার জন্য বড় ডালও কেটে দিতে পারেন কিন্তু এতে গাছের সৌন্দর্যহানি ঘটবে। বড় ফুলগাছে রোগের উপদ্রব একরকম নেই। এ ছাড়া, গাছে কোন অবস্থাতেই পেরেক ঠুকবেন না, গাছের ছাল তুলবেন না অথবা তার দিয়ে গাছ বাঁধবেন না।

এবারে বাছাই গাছের পরিচয় জানাচ্ছি :

**আকাশ নিম ॥**

আকাশ নিম বা মিলিংটোনিয়া হরটেনসিসের ফুল দেখতে অনেকটা সন্ধ্যামণির মত। ফুলের রঙ সাদা। ফুলে সুন্দর গন্ধ। ফুল ফোটে একসঙ্গে অনেক এবং তখন কাছাকাছি জায়গা গন্ধে ভরে যায়। ফুল ফোটার সময় শীতকাল। আকাশ নিমের আকৃতি মাঝারি। অনেক জায়গায় গাছ খুব লম্বা হয় কিন্তু লম্বা গাছ সমতল বাংলায় সচরাচর চোখে পড়ে না। গাছের ডাল নরম তাই এ গাছ রাস্তার ধরে লাগাবেন না। গাছের শেকড় দিয়ে প্রচুর তেড় বেরোয়। এবং অনেক সময়ে এটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এই তেড় দিয়েই সাধারণত আকাশ নিমের বংশবিস্তার। আকাশ নিমের আদি বাসস্থান বারমা এবং এটি বেশ কষ্টসহিষ্ণু গাছ।

**কদম্ব ॥**

কদম্ব বা এনথোসেফালাস ইনডিকাস আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ। ফুল গোল, ফোটে বর্ষাকালে এবং ফোটেও প্রচুর। ফুল সুগন্ধযুক্ত, ও ফুল প্রধানত হলদে। গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং সোজা উপরে বেড়ে যায়। কদম্ব বড় আকৃতির গাছ ; এটি বিশেষ করে উচ্চতার দিক দিয়ে খুবই বড়। গাছ খুবই কষ্টসহিষ্ণু কিন্তু গাছের ডাল খুব শক্ত নয়। বছরে একবার গাছের পাতা ঝরে যায়, এর চারাগাছের পাতা বড় গাছের পাতার চেয়ে অনেক বড়। গাছটি ভারতের। কদম্বের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে।

**করিজিয়া ॥**

ফুল ফোটা অবস্থায় করিজিয়া স্পেসিওসা দেখতে চমৎকার। ফুল ফোটে শীতের প্রথমে এবং ফুলের রঙ প্রধানত ঘন-পিঙ্ক। ফুল ফোটে গাছ ভরে এবং এ সময়ে গাছে পাতা থাকে না। ফুল আসে বরুণ গাছের মত যেন সবার অলক্ষ্যে। সমতল বাংলায় করিজিয়ার ছোট আয়তনের গাছই দেখা যায় যদিও স্বদেশে গাছ মাঝারি আকৃতির হয় বলে প্রকাশ। করিজিয়া বছর পাঁচেকের মাথায় ফুল দেয়। গাছের ডালপালা শক্ত নয় তাই এটি রাস্তার



9744

পাশে না লাগানোই ভাল। করিজিয়ার গাছ দেখতে অনেকটা শ্বেত শিমুলের মত। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, এটি একটু উঁচু জায়গায় করবেন যাতে গোড়ায় জল না জমে। মেনিনজার তাঁর 'ফ্লাওয়ারিং ট্রিজ অব দি ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে করিজিয়ার একটি আশ্চর্য দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে কোন দুটি করিজিয়া স্পেসিওসার ফুল ঠিক এক রঙের নয়। এবং মাঝে মাঝে রঙের এত বেশি তারতম্য দেখা যায় যে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে দুটি গাছ একই প্রজাতির কি না। করিজিয়ার আদি বাসস্থান ব্রাজিল। এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে কিন্তু সমতল বাংলায় বীজ হতে দেখা যায় না। আমাদের কাছে করজিয়া এখনও একরকম অপরিচিত, তবে এর প্রসার অনেক ব্যাপক হওয়া উচিত। এ গাছটির দেশী নাম হিমাঞ্জন।

**কর্লভিলিয়া ॥**

কর্লভিলিয়া রেসিমোসার কমলা-লাল রঙের ফুল দেখতে খুবই সুন্দর। এটি ফোটে বর্ষার শেষকালে যখন অন্য কোন বড় ফুলগাছে ফুল একরকম থাকে না। গাছ দেখতে কৃষ্ণচূড়ার মত, ফুল ফোটে বড় বড় থোকায় এবং ফুলের পরে গাছের সব পাতা ঝরে যায়। ফুলের থোকাগুলি ধরে ডালের আগায় এবং এগুলি ঝুলে পড়ে নিচের দিকে। ফুল ফোটা অবস্থায় বা এমনিতেও কর্লভিলিয়া দেখতে সুন্দর এবং এটি যে কোন বাগানেই স্থান পাবার উপযুক্ত। পাতাঝরা অবস্থায় গাছ দেখলে মনে হতে পারে যে গাছ মরে গেছে। কর্লভিলিয়া মোটামুটি সুখী প্রকৃতির, এটি এমন জায়গায় লাগাবেন যেখানে জল দাঁড়ায় না। এ গাছটি উচ্চতায় মাঝারি কিন্তু ডালপালা পাশে খুব ছড়ায় না। কর্লভিলিয়ার আদি বাসস্থান ইস্ট আফ্রিকা এবং বংশবৃদ্ধি সাধারণত বীজ দিয়ে। এর বাংলা নাম হিমরঞ্জন।

**কৃষ্ণচূড়া ॥**

কৃষ্ণচূড়া বা পয়েনসিয়ানা রেজিয়ার সঙ্গে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত। এ গাছটি রাস্তার পাশে, পার্কে বা বাগানে দেখা যাবে বহুল পরিমাণে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কৃষ্ণচূড়ার বিভিন্ন গাছের ফুলে অন্তত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রঙ রয়েছে। কোন কোন গাছের ফুল বেশি লাল, কোনটি লাল-হলদে আবার অন্যগুলি হালকা হলদে রঙের যাতে লাল রঙের ভাগ খুব কম। একটির চেয়ে অন্যটির রঙের তফাত হয়তো অল্প কিন্তু তফাতটা লক্ষ্য পড়ে সহজেই। তাছাড়া কৃষ্ণচূড়ার বিভিন্ন গাছের আকৃতিও যেন আলাদা। প্রাপ্তবয়স্ক গাছগুলির ভেতরে অনেকগুলি বেশ বড় আবার অন্যগুলি ছোট ধরনের, যদিও সবগুলি একই পরিচর্যা পেয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার তিনটি আলাদা রঙ দেখা গেলেও কোন চারাগাছটি কি রঙের ফুল দেবে তা ফুল দেবার আগে জোর করে বলা সম্ভব নয়। এ অসুবিধা দূর হবে যদি গুটিকলমে নতুন গাছ তৈরী করেন। কৃষ্ণচূড়া ফোটে গাছ ভরে এবং ফুলভরা গাছ দেখতে অপূর্ব সুন্দর। ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। অনেক গাছে ফুল ফোটার সময়ে গাছে কোন পাতা থাকে না। গাছ কষ্টসহিষ্ণু, আকৃতিতে বড় বা মাঝারি। ঝড়ে কৃষ্ণচূড়ার প্রায়ই ডাল ভাঙে। তাই এটি বড় রাস্তায় ছায়া দেবার কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। ফুলের রঙ ফুটিয়ে তুলতে অনেকে কৃষ্ণচূড়াকে হলদে ফুলের কেশিয়া ফিশচুলা বা পেল্টোফোরামের পাশাপাশি লাগিয়ে থাকেন। কৃষ্ণচূড়ার বংশবৃদ্ধি সাধারণত বীজ দিয়ে, এটি এসেছে ট্রপিকাল আফ্রিকা থেকে।

**কেশিয়া ॥**

কেশিয়ার প্রজাতির সংখ্যা অনেকগুলি এবং এদের বেশ কয়েকটি সৌন্দর্যের বিচারে যে কোন ভাল বাগানে স্থান পাবার উপযুক্ত। কেশিয়ার ফুল ফোটে গাছ ভরে এবং এ সময়ে গাছগুলির শোভা এক কথায় অপূর্ব। ফুলের সময় অনেকগুলি প্রজাতিতে পাতা একরকম থাকেই না, এবং এগুলি দেখতে আরও ভাল দেখায়। অনেক কেশিয়ার হালকা মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। গাছ ফুল ছাড়াও দেখতে সুন্দর এবং চারদিকে ডালপালা ছাড়ে বলে রাস্তার ধারে ছায়া দেবার কাজেও কেশিয়া বেশ ভাল। প্রকৃতির বিধানে কেশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতিরও

আবার সংকর-প্রজাতি রয়েছে। এগুলি দেখতে অনেক সময়ে মূল প্রজাতি থেকে ভাল। তবে এদের সম্পর্কে অসুবিধে এই যে, কোনটি কিসের সংকর-প্রজাতি তা ধরা বেশ কঠিন। কেশিয়ার বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে কিন্তু বীজের গাছ সব সময় মূল গাছের মত হয় না। তাই কলমের সাহায্যে নতুন গাছ করতে পারলে ভাল কিন্তু তা করা খুব কঠিন। কেশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতির ভেতরে ফিশ্চুলা, নভোসা, জাভানিকা, রেনিজারা, ল্যাংকাস্টেরী, ক্যালিয়ানথা প্রভৃতি অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে বেশি সুন্দর। কেশিয়ার বাংলা নাম লোকেশ্বর।

কেশিয়া ফিশ্চুলা :—এটি পুরোপুরি দেশী গাছ এবং আয়ুর্বেদীয় ওষুধে এর প্রচুর ব্যবহার। ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে, গাছ ফুলে ভরে যায় এবং অনেক গাছে এ সময়ে পাতা একরকম থাকে না। শুধুই ফুলে ভর্তি এরকম গাছ দেখে চোখ ফেরানো সত্যিই কঠিন। ফিশ্চুলার ফুলের রঙ সোনালী এবং ফুল ফোটে ঝুলে পড়া লম্বা লম্বা থোকায়। ফুলের পরে অনেক গাছে লম্বা লম্বা বীজ ঝুলে থাকে, এ অবস্থায় গাছ মোটেই ভাল দেখায় না। গরু-ছাগলে ফিশ্চুলার পাতা খায় না, গাছের ডাল শক্ত এবং গাছ ভাল ছায়া দেয় তাই রাস্তার পাশে লাগাবার কাজে ফিশ্চুলা বিশেষ উপযুক্ত। কেশিয়া ফিশ্চুলার বিভিন্ন গাছের ভেতরে বেশ কিছুটা তফাত চোখে পড়ে। কোন কোনগুলি আকৃতিতে অনেক ছোট, ফুল ফোটার সময়ে গাছ পত্রহীন, ফুলের থোকা অনেক বড় এবং গাছে বীজ একরকম ধরে না, এবং অনেকগুলি এর বিপরীত। কোন কোনটিতে এই সব ক'টি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং কোন কোনটিতে বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা এক বা দুইয়ে সীমিত। ফিশ্চুলা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু গাছ। বাংলা ভাষায় এটি সোঁদল নামে পরিচিত।

কেশিয়া নভোসা ও জাভানিকা :—নভোসার পিংক ও সাদা রঙের ফুল ফোটে যখন গাছে পাতা একরকম থাকে না এবং ফুল ফোটে গাছ ভরে। কোন কোন গাছে ফুল ফোটে অন্যান্য নভোসা গাছের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে। নরেন্দ্রপুরে এ রকম একটি গাছ ছিল যার ফুলের সংখ্যা, ফুলের সাদা রঙের আধিক্য বা ফুল ফুটে থাকার সুদীর্ঘ সময় এটিকে আলোচনার বস্তু করে তুলেছিল ( কেশিয়া নভোসার একটি সংকর প্রজাতি এখানে এখনও ভাল ফুল দিচ্ছে )। তবে এ গাছটি ছিল সম্ভবত একটি সংকর প্রজাতি। এর বীজের কোন গাছই মূল গাছের মত ভাল হয়নি। এই ধরনের একটি ভাল গাছ টালিগঞ্জ হোমসের কাছে দেখেছি। নভোসা ও জাভানিকা মাঝারি আয়তনের গাছ এবং দুটিই বেশ কষ্টসহিষ্ণু। এ দুটি রাস্তার পাশের গাছ হিসেবে বেশ ভাল। কেশিয়া জাভানিকা ফুলের সঙ্গে নভোসার ফুলের বিশেষ কোনো তফাত নেই। গাছও অনেকটা একরকম তাই একটিকে অন্যটি বলে ভুল হবার সম্ভাবনা। তবে নভোসা ও জাভানিকার পাতার গড়নে তফাত রয়েছে ; প্রথমটির পাতার আগের ভাগ সূঁচলো এবং জাভানিকার গোল। এছাড়া নভোসা ফুল দেয় অনেক বেশি দিন ধরে, ফোটার সময়ে এর পাতা একরকম থাকে না কিন্তু জাভানিকার ফুল ফোটে বেশির ভাগ ডালের আগায় এবং গাছের পাতা একরকম ঝরে না। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে এদের দুটির অনেক প্রজাতি-সংকর রয়েছে এবং এদের বেলায় এই দুটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি খাটে না। প্রজাতি-সংকর থাকায় নভোসা, জাভানিকা বা এদের প্রজাতি-সংকরকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। নভোসা ও জাভানিকার ভেতরে তুলনামূলক বিচারে নভোসাই বেশি ভাল। আসাম নভোসার আদি বাসস্থানের অন্যতম, জাভানিকা এসেছে জাভা থেকে।

কেশিয়া রেণিজারা ও ল্যাংকাষ্টেরীঃ—রেণিজারা ও ল্যাংকাষ্টেরী দুটিই আকৃতিতে ছোট। এদের লনের মাঝেও লাগানো চলতে পারে। দুটিরই ফুলের রঙ পিংক ; রেণিজারার ফুল ফোটে নিষ্পত্র অবস্থায় এবং এ সময়ে এটি দেখতে খুবই সুন্দর। এদের ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। রেণিজারার আদি বাসস্থান বারমা। ল্যাংকাষ্টেরী সংকর প্রজাতি, এর কলমের চারাগাছ যোগাড় করবেন।

কেশিয়া ক্যালিয়ানথাঃ—ক্যালিয়ানথার ফুলের রঙ হলদে, ফুল ফোটে থোকায় উপরের দিকে মুখ করে। কেশিয়া সায়ামিয়ার সঙ্গে ফুলের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু ক্যালিয়ানথা ফুল দেখতে অনেক সুন্দর। ফুল ফোটার সময় শীতকালের প্রথমভাগ। ক্যালিয়ানথা সুখী প্রকৃতির এবং এটি আকৃতিতে ছোট ধরনের মাঝারি। এর ডাল নরম তাই রাস্তার পাশে না

লাগানোই ভাল। সৌন্দর্যের বিচারে এটি যে কোন ভাল বাগানে স্থান পাবার উপযুক্ত। এটি এসেছে ট্রপিকাল আমেরিকা থেকে।

**গোয়াকাম ॥**

গোয়াকাম অফিসিনালি এখানে খুব একটা চোখে পড়ে না কিন্তু এ গাছটিও করার মত গাছ। এর ফুলের রঙ নীল, ছোট ছোট ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটে অনেক। ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। গাছ সুখী প্রকৃতির এবং আকৃতিতে ছোট। সমতল বাংলায় এর বীজ হতে চায় না। গোয়াকাম এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে।

**চাঁপা ॥**

চাঁপা সংস্কৃত ভাষায় চম্পক এবং এর উদ্ভিদবিদ্যায় নাম মাইকেলিয়া চম্পক। চাঁপা আমাদের সবার পরিচিত। পুজোর ফুল হিসেবে চাঁপার অত্যন্ত সমাদর। চাঁপা ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, এবং এর ফুলের সুগন্ধে গাছের পাশাপাশি জায়গা আমোদিত করে রাখে। স্বর্ণ চাঁপার উজ্জ্বল ঘিয়ে-হলদে থেকে ফ্যাকাসে ঘিয়ে-হলদে ফুল দেখা যায়। এটির বীজ থেকে (চারাবার আগে বীজগুলির খোসা পাতলা করে নেবার জন্য অমসৃণ মেঝেতে ঘসে নেবেন) নতুন গাছ করাই সাধারণ নিয়ম কিন্তু পছন্দসই রঙের গাছ পেতে হলে জোড়-কলমের নতুন গাছ করে নেওয়া উচিত। চাঁপার প্রজাতি এলবা-র ফুল সাদা, এবং ফুলের আকৃতি গাছের আয়তন স্বর্ণচাঁপার চেয়ে ছোট। এর বংশবৃদ্ধি স্বর্ণচাঁপার চারার সঙ্গে জোড়কলমের সাহায্যে। চাঁপার অন্য দুটি সুন্দর প্রজাতি সিংহাচলম ও বার্মাসিয়ানা মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায়। এ দুটি বেশ সুখী প্রকৃতির, কিন্তু চেষ্টা করলে এদের জোড়কলমের নতুন গাছ বাঁচানো খুব কঠিন নয়। এ দুটির ফুল আরও ভাল এবং এদের গন্ধও খুব ভাল। স্বর্ণচাঁপা ও শ্বেতচাঁপা (এলবা) কষ্টসহিষ্ণু গাছ হলেও গোড়ায় জল বসলে গাছ মরে যাবে তাই এদের একটু উঁচু জায়গায় লাগাবেন। ভারত চাঁপার আদি বাসস্থানের ভেতরে অন্যতম।

**জারুল ॥**

জারুল বা ল্যাগারস্ট্রোমিয়া-র ফুল ফোটে গাছ ভরে। জারুল ফ্লস রেজিনার বিভিন্ন প্রজাতির ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল এবং জারুল থরেলীর বর্ষাকাল। ফ্লস-রেজিনা রোজিয়ার ফুল লাল এবং ফুল ফোটা অবস্থায় এটি দেখতে খুবই সুন্দর। এ গাছটি আকৃতিতে বেশ ছোট। রোজিয়ার বেলায় সবসময়ে কলমের গাছ যোগাড় করবেন। পারপেল ফুলের ম্যাগনিফিকার ফুলের থোকা বড়, গাছও বড়, ফুল ফোটে বর্ষাকালে এবং গাছটি দেখতে বেশ সুন্দর। ফ্লস-রেজিনা ও থরেলীর ফুলের রঙ লাইলাক ও সাদা। জারুলের একই প্রজাতির বিভিন্ন গাছের ফুলের রঙের তারতম্য দেখা যায় তাই পছন্দসই রঙের ফুল পেতে সেই রঙের গাছের নতুন গাছ গুটিকলমের সাহায্যে করতে পারেন। জারুলের গাছ খুব কষ্টসহিষ্ণু, এর ডালপালা খুবই শক্ত এবং ডালপালা পাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাই রাস্তার পাশে লাগাবার কাজে জারুল খুবই উপযুক্ত, এবং একাজে জারুল ম্যাগনিফিকা এদের ভেতরে সবচেয়ে ভাল। রোজিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির জারুল মাঝারি আকৃতির। শুষ্ক জলবায়ুতে জারুল আয়তনে ছোট হয়। এদের বংশবিস্তার প্রধানত বীজ দিয়ে। ভারত কোন কোন জারুলের অন্যতম আদি বাসস্থান। থরেলী এসেছে কোচিন-চায়না থেকে।

**জ্যাকারানডা ॥**

জ্যাকারানডা মিমোসাফোলিয়া-র ফুলের রঙ নীলরঙ মেশানো মোভ। ছোট ছোট ফুল ফোটে থোকায় এবং ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। জ্যাকারানডার পাতা দেখতে কৃষ্ণচূড়ার মত, এবং গাছের আকৃতি ছোট ধরনের মাঝারি। সমতল বাংলায় জ্যাকারনডা খুব বেশি ফুল না দিলেও এ গাছ সব বাগানে স্থান পাবার উপযুক্ত। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, এটি গোড়ায় জল জমবে না এরকম জায়গায় লাগাবেন। এখানে এর বীজ হতে দেখা যায়

না জ্যাকারনডা এসেছে ব্রাজিল থেকে এবং এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। এটির বাংলা নাম নীলকণ্ঠ।

**ট্যাবিবুইয়া ॥**

গ্রীষ্মের প্রথমে ট্যাবিবুইয়া রোজিয়া-র গাছ-ছেয়ে থাকা ফুল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সহজেই। ফুল ফোটে এক মাসের চেয়েও কম সময়ের জন্য তবুও সৌন্দর্যের বিচারে এটি একটি বিশিষ্ট গাছ। ট্যাবিবুইয়া গাছ হিসেবে খুব লম্বা কিন্তু ডালপালা বা পাশে খুব ছড়ায় না, তাই ছায়া দেবার কাজে বিশেষ উপযুক্ত নয়। ট্যাবিবুইয়া অন্যান্য জায়গায় সমতল বাংলার মত বড় হয় না। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, এটি এসেছে মেক্সিকো থেকে। ট্যাবিবুইয়ার বীজ সমতল বাংলায় হতে দেখা যায় না। খুব যত্ন করে করলে গুটিকলমে নতুন গাছ তৈরী করা যায়। ট্যাবিবুইয়ার দেশী নাম বসন্তদূত। হলদে ফুলের প্রজাতি ডনেলস্মিথী ও আর্জেণ্টিয়া আকৃতিতে ছোট, এবং গ্রীষ্মের প্রথমে ফুলভরা অবস্থায় এরা অপূর্ব সুন্দর দেখতে। এ দুটি গাছের সমাদর আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত। দুটিরই ঝকমকে ফুল ফোটে গাছের নিস্পত্র অবস্থায় এবং ফুলে ফুলে গাছ ভরে থাকে।

**নাগলিঙ্গম ॥**

নাগলিঙ্গম বা কুরুপিটা গায়নেনসিস গাছটি দেখতে সুন্দর আবার একটু অদ্ভুত ধরনেরও। ফুল বিচিত্র গড়নের, ফুলের রঙ পিঙ্ক ও সাদা এবং ফুলের বাইরের দিকের রঙ হালকা হলদে। কোন কোন গাছের ফুলের রঙ বেশি পিঙ্ক আবার কোনগুলির বেশি সাদা, বেশি পিঙ্ক ফুলগুলি দেখতে অপেক্ষাকৃত ভাল। ফুলে গন্ধ রয়েছে ; কারো কারো কাছে ফুলের এ গন্ধ বেশ ভালই লাগে আবার কেউ কেউ এ গন্ধ পছন্দ করেন না। ফুল ফোটে বড় বড় ছড়ায়, ছড়া বেরোয় গাছের গুড়ি বা মোটা ডাল থেকে। বয়স্ক গাছে ফুল ফোটে গাছ ভরে। নাগলিঙ্গমের পাতা অনেকটা ছাতিমের মত এবং এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে বছরে দু তিনবার গাছের সব পাতা ঝরে যায়। পাতা ঝরার খুব অল্প দিনের ভেতরেই গাছ নতুন পাতায় ভরে ওঠে। এ গাছটি খুব বড় এবং ঝোপালো, এটি ছায়া দেবার কাজে বেশ ভাল তবে কয়েকবার গাছের সব পাতা ঝরে যায় বলে রাস্তার পাশে নাগলিঙ্গম লাগানো উচিত নয়। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু এবং এর ডালপালাও মোটামুটি শক্ত। নাগলিঙ্গমের ফল আকৃতিতে বড় বেলের মত, ফল পেকে ফেটে গেলে তার থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরোয়। এর চারাগাছ লাগাবার পরে বছর দশ পনেরো সময় নেবে ফুল দিতে। কোন কোন গাছ এর আগেই ফুল দেয়, আবার কোন কোন গাছ পনেরো বছরের পরেও ফুল দিতে চায় না। ফুল দিতে চায় না এরকম বয়স্ক গাছের গুঁড়িতে দা দিয়ে সেণ্টিমিটার তিনেক গভীর করে গুঁড়িভরে কোপ দিয়ে দেখেছি এতে ফুল তাড়াতাড়ি আসে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে নাগলিঙ্গম খুবই ভাল গাছ। সমতল বাংলায় এ গাছের প্রসার আরও অনেক বেশি হওয়া দরকার। নাগলিঙ্গম এসেছে গায়না থেকে এবং এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে।

**নাগেশ্বর ॥**

নাগেশ্বর চাঁপা বা মিসুয়া ফেরিয়া ফুলের পূজোর কাজে বিশেষ সমাদর। ফুল সাদা, দেখতে অনকোবার ফুলের মত এবং ফুলে সুন্দর গন্ধ। ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে। নাগেশ্বর গাছ ফুল ছাড়াও দেখতে সুন্দর, এটি আকৃতিতে ছোট এবং এর ডালপালা অত্যন্ত শক্ত। সমতল বাংলায় নাগেশ্বর খুব চোখে পড়ে না, এর কারণ ছোট অবস্থায় এ গাছ খুব সহজেই মারা যায়। নাগেশ্বর লাগাবার জমি পাশের জমি থেকে হাত দেড়েক উঁচু করা দরকার এবং ছোটবেলায় বেশি রোদের দিনে গাছে ছায়া দিতে পারলে ভাল। তাছাড়া এ গাছ পালটে লাগানো পছন্দ করে না তাই টব থেকে পালটে জমিতে লাগাবার কাজ খুব সাবধানে করতে হবে। নাগেশ্বরের বংশবিস্তার বীজ দিয়ে।

**পলাশ ॥**

'...আগুন লেগেছে বনে বনে', শুনলে গাছ ছেয়ে থাকা আগুনে রঙের পলাশ বা বুটিয়া ফ্রনডোসা-র কথাই প্রথমে মনে আসবে। পলাশের ফুল ফোটে নিষ্পত্র অবস্থায় গ্রীষ্মকালে। রুক্ষ মাটিতে বিনা যত্নে পলাশ জন্মায় ভাল তবুও বাগানেও এদের সমাদর রয়েছে। এ গাছ লাগাবেন বাগানের দূরের এক কোণে যাতে ফুল ফোটা অবস্থায় শুধুমাত্র গাছের দিকে দৃষ্টি পড়ে। পলাশ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু গাছ এবং আয়তনে ছোট। গাছটি ভারতীয়, এর বংশবৃদ্ধি নতুন পাকা বীজ দিয়ে।

**পেল্টোফোরাম ॥**

পেল্টোফোরাম ফেরুজিনিয়াম রাধাচূড়া নামেও পরিচিত। কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে এক সময়ে ফোটে বলে পেল্টোফোরাম কৃষ্ণচূড়ার পাশাপাশি লাগালে দুটি ফুলের সমাবেশ বেশ ভাল দেখাবে। এটির ফুল হলদে এবং ফুল ফোটে গাছ ভরে। ফুলের পরে গাছ বীজে ছেয়ে যায় এবং এ সময়ে এটিকে দেখতে মোটেই ভাল দেখায় না। পেল্টোফোরাম খুবই কষ্টসহিষ্ণু, মোটামুটি বেশ লম্বা গাছ, ডালপালাও মোটামুটি শক্ত এবং রাস্তার পাশে ছায়া দেবার কাজে উপযুক্ত। এটি এসেছে সিংহল থেকে, এর বংশবিস্তার বীজ দিয়ে।

**বকুল ॥**

বকুল বা মিমুসপস ইলেনগি-র ফুল মালা গাথার ফুল হিসেবে বিশেষ পরিচিত। ফুল অত্যন্ত ছোট সেজন্য গাছে ফুল ফুটে থাকলেও সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু ফুলের সুগন্ধ গাছের কাছাকাছি গেলেই পাওয়া যায়। ফুল ঘিয়ে রঙের এবং ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। বকুল গাছ বেশ লম্বা এবং ডালপালা খুব ছড়ানো না হলেও রাস্তার পাশে ছায়া দেবার কাজে এটি খুবই উপযুক্ত। বকুলের পাকা ফল খেতে বেশ। বকুলের একটি ভেরীগেটেড পাতার প্রজাতি রয়েছে যার পাতা দেখতে বেশ সুন্দর কিন্তু এ গাছে কোন ফুল হয় না ; এটির বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে। বকুল দেশী গাছ, এর বংশবিস্তার সাধারণত বীজ দিয়ে।

**বরুণ ॥**

বরুণ বা ক্রাটেভা রক্সবুর্গী ফুল ফোটা অবস্থায় দেখতে অপূর্ব সুন্দর। ফুল ফোটে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং ফোটে এত বেশি যে ফুলের ভারে গাছের ডাল যেন নুয়ে পড়ে। ফুলের রঙ সাদা, ফুল পুরানো হলে ঘিয়ে রঙের হয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না রাতে ফুলভরা গাছটি চমৎকার দেখায়। বরুণ আমাদের দেশী গাছ এবং এর চাহিদাও অত্যন্ত সামান্য। তবে ফুলগাছের ভেতরে এটি অত্যন্ত উপেক্ষিত। গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, ডালপালা বেশ শক্ত ও ছড়ানো ; এবং গাছ আকৃতিতে মাঝারি। সব মিলিয়ে রাস্তার পাশে লাগাবার পক্ষে মোটামুটি উপযুক্ত। শীতকালে বরুণের সব পাতা ঝরে যায়, গ্রীষ্মের প্রথমে নতুন পাতার সঙ্গে সঙ্গে ফুলও গাছ ছেয়ে ফেলে। ফুল ফোটে এত তাড়াতাড়ি যে মনে হবে গাছ যেন হঠাৎ ফুলে ছেয়ে গেছে। শীতকালে রোদ এবং গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়া পেতে চাই এরকম জায়গায় লাগাবার পক্ষে বরুণ বিশেষ উপযোগী। এ গাছটি আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তৈরীর কাজে লাগে। বরুণ গাছ ফুল দিতে আরম্ভ করে তিন চার বছরের মাথায়, বীজ দিয়ে এর বংশবৃদ্ধি।

**বিগ্নোনিয়া ॥**

বিগ্নোনিয়া মেগাপোটামিকার ফুল দেখতে ট্যাবিবুইয়া রোজিয়ার মত, তবে এর ফুল হালকা পিঙ্ক রঙের এবং ফুলের ভেতরের দিক হলদেটে। ফুল ফোটে কিছুদিন অন্তর এবং একরকম সারাবছর ধরে তবে ফুল একসঙ্গে সংখ্যায় খুব বেশি ফোটে না। গাছ ছোট এবং গাছের পাতা দেখতে বেশ সুন্দর। বিগ্নোনিয়া কিছুটা সুখী প্রকৃতির। সমতল বাংলায় এর বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে এবং এখানে বীজ হতে দেখা যায়

না। বিগ্নোনিয়া মেগাপোটেমিকা এসেছে ব্রাজিল থেকে।

**সোনাঝুরি ॥**

সোনাঝুরি বা একেসিয়া মনিলিফর্মিস-এর ফুলের রঙ হলদে, খুব ছোট ফুলগুলি ফোটে ছোট ছোট ঝুরিতে। ফুলের সময় গ্রীষ্মকাল এবং মাঝে মাঝে ফুল ফোটে একসঙ্গে অনেক। গাছের পাতা অদ্ভুত ধরনের, আসলে পাতা বলে যেগুলি পরিচিত তা কাণ্ডের রূপান্তর মাত্র। সোনাঝুরির বিভিন্ন গাছের ভেতরে দুটি পরিষ্কার আলাদা ধরনের গাছ দেখা যায়। একটির গাছ দেখতে বেশ ছোট এবং এর ডালগুলি ঝুলে পড়ে। অন্যটির গাছ বেশ বড় এবং ডালপালাও উপরের দিকে ছড়ায়। সোনাঝুরির ডালপালা খুব সহজে ভেঙে পড়ে তাই এদের রাস্তার পাশে লাগানো উচিত নয়। এটি এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে এবং এর বংশবিস্তার বীজ দিয়ে।

**সোনালী শিমুল ॥**

সোনালী শিমুল বা ককলোস্পারমাম গসিপিয়ামের শিমুলের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা না থাকলেও ফুলের গড়ন, ফোটার ধরন ও ফুলের বীজ শিমুলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ফুল ফোটা অবস্থায় এর সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এরকম বড় ফুলগাছ খুঁজে পাওয়া কঠিন। শীতের শেষ দিক থেকে গ্রীষ্মের প্রথম পর্যন্ত সোনালী বড় বড় ফুলে গাছ ছেয়ে থাকে এর নিস্পত্র অবস্থায়। সোনালী শিমুল অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং এর চাষও খুব সহজ ; চারাগাছ ফুল দিতে আরম্ভ করে দুতিন বছর বয়স থেকে। ডালপালা নরম বলে রাস্তার পাশে লাগানো উচিত নয়, তাছাড়া গাছের উপরের দিক যাতে খুব ঝোপালো না হয় সেজন্য বর্ষাকালে গাছ মাঝামাঝি জায়গা থেকে কেটে দেওয়া ভাল। সোনালী শিমুল দেশী গাছ, এর বংশবৃদ্ধি প্রধানত বীজ দিয়ে।

**স্প্যাথোডিয়া ॥**

স্প্যাথোডিয়া ক্যামপানুলেটার লাল-কমলা রঙের বড় বড় ফুল যখন গাছের মাথায় একসঙ্গে অনেক ফুটে থাকে, সে দৃশ্য দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। সমতল বাংলায় স্প্যাথোডিয়া তত বেশি ফুল দেয় না, তাহলেও এ গাছটি সব বাগানেই লাগাবার উপযুক্ত। এখানে এর ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালের প্রথমে এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে। মেনিনজারও স্প্যাথোডিয়ার খুসীমত ফুল দেবার কথা তাঁর বই 'ফ্লাওয়ারিং ট্রিজ অব দি ওয়ার্ল্ড'-তে উল্লেখ করেছেন। স্প্যাথোডিয়া লম্বায় বেশ উঁচু। এর ডালপালা শক্ত নয় বলে রাস্তার ধারে লাগানো উচিত নয়। ক্যামপানুলেটা ছাড়া নিলোটিকা নামে এর আর একটি প্রজাতি বিভিন্ন গাছ-ব্যবসায়ী বিক্রী করে থাকেন। তবে এটি সত্যিই আলাদা প্রজাতি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। নিলোটিকা বলে কিনে গাছ করে দেখেছি যে এর সাথে ক্যামপানুলেটার কোন প্রভেদ নেই। তাছাড়া স্প্যাথোডিয়ার অনেক গাছ ফুলফোটা অবস্থায় দেখেছি কিন্তু কোন গাছের বেলায় কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখিনি। মেনিনজারও ক্যামপানুলেটার আর এক নাম নিলোটিকা বলে উল্লেখ করেছেন। স্প্যাথোডিয়া এসেছে উগান্ডা থেকে। শুধু হলদে রঙের ফুলের স্প্যাথোডিয়া ক্যামপানুলেটা বাইরের কোন কোন দেশে পাওয়া যায়। এর বংশবিস্তার বীজ অথবা গাছের শেকড় থেকে বেরুনো ছোট গাছ দিয়ে। স্প্যাথোডিয়ার বাংলা নাম রক্তোপল।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

# বাছাই লতানো ফুলগাছ

সমতল বাংলায় লতানো ফুলগাছের চাষ খুবই কম যদিও এই জলবায়ুতে বহু জাতির লতানো ফুলগাছ করা সহজে সম্ভব। করা সহজ এরকম লতানো ফুলগাছের অনেকগুলি আবার দেখতে খুবই সুন্দর। লতানো ফুলগাছের প্রচলন কম হবার পেছনের কারণ বোধ হয় দুটি। পরিচয় না থাকার জন্য কয়েকটি ছাড়া বেশির ভাগ লতানো ফুলগাছের প্রকৃতি আমাদের অজানা। তাই এগুলির চাষও যে কঠিন নয় তা আমরা জানি না। দ্বিতীয়ত, লতানো ফুলগাছকে কোন কিছুর উপরে ভালভাবে তুলে দেওয়া অনেক সময়েই যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে লতানো গাছ তার অবলম্বন-সহ ভেঙে পড়ে, এবং এটা ঘটলে গাছটির মারা পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কারণ হিসাবে এটিই প্রধান যেজন্য এখানে লতানো ফুল গাছের এখনো বিশেষ প্রসার হয়নি। এই অবস্থায় রাতারাতি কোন পরিবর্তন ঘটবে এটা আশা করা যায় না। তবে আমরা যদি প্রত্যেক বাগানে দুয়েকটি বাছাই লতানো ফুলগাছের চাষ করি তাহলে লতানো ফুলগাছের আলাদা সৌন্দর্য থেকে ফুলের বাগান একেবারে বঞ্চিত হবে না।

যদিও আসলে লতানো ফুলগাছ তবুও বুগেনভিলিয়া, এলাম্যানডা, হোমস্কিয়োলডিয়া প্রভৃতির গুল্ম হিসাবে চাষের খুবই প্রচলন। এছাড়াও অনেকগুলি গাছ সম্পর্কে সেগুলি লতাগাছ অথবা গুল্ম তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কাঞ্চন গল্পিনি এখানে গুল্ম হিসাবে পরিগণিত হলেও অন্যত্র এটি একটি অন্যতম সুন্দর লতানো ফুলগাছ। এমন কি পোর্টল্যানডিয়া গ্রানডিফ্লোরা কোথাও কোথাও লতাগাছ হিসাবে চাষ হয় বলে প্রকাশ। অপর দিকে মুসায়েনডা এরিথ্রোফাইলা গুল্ম হিসাবে স্বীকৃত হলেও একে একটু চেষ্টা করলেই চমৎকার লতানো ফুলগাছ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ গাছটিকে নিজে নিজেই দশ বারো হাত গাছ বেয়ে উঠতে দেখেছি।

**গাছ লাগানো ও অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

লতানো ফুলগাছের লাগানো ও এর বাৎসরিক পরিচর্যার সঙ্গে ছোট ফুলগাছ বা নাতি-উচ্চ ফুলগাছের পরিচর্যার মূলত কোন ভেদ নেই। এদের মতই লতানো গাছের লাগাবার উপযুক্ত সময় বর্ষাকালের যে কোন সময়ে অথবা শীতের শেষ দিকে। গাছ লাগাবার গর্তের সারমাটি তৈরী হবে একই ভাবে—দুভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ গোবরসার ও এক আঁজলা থেকে তিন আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো। লতানো গাছের জন্য গর্ত হবে গাছটির আকৃতি অনুযায়ী। স্বল্পপ্রসারী লতানো গাছের জন্য একহাত চওড়া ও একহাত গভীর গর্ত, মধ্যপ্রসারীর জন্য দেড়হাত চওড়া ও দেড়হাত গভীর এবং দীর্ঘপ্রসারী লতানো গাছের জন্য দেড়হাত চওড়া ও দুহাত গভীর করে গর্ত করা দরকার। গাছ লাগাবার সময়ে যতটা চওড়া করে গর্ত করেছিলেন অন্তত সেটুকু পরিমাণ গোড়ার জায়গা মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দিতে হবে। গাছ লাগাবার পদ্ধতি, জল দেওয়া, বাড়তি সার প্রয়োগ ইত্যাদির বেলায় ছোট বা নাতি-উচ্চ ফুলগাছের পরিচর্যার মত করবেন। বাড়তি সারের বেলায় গাছের আয়তন অনুযায়ী সারের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে।

লতানো ফুলগাছ বিশেষ ছাঁটবার প্রয়োজন পড়ে না। তবে দীর্ঘ ও মধ্যপ্রসারী লতা-গাছগুলিকে মাঝে মাঝে ছেঁটে অপেক্ষাকৃত ছোট করে রাখার দরকার হতে পারে। এ ছাড়া যে লতানো গাছগুলি নতুন ডালে ফুল ভাল দেয় সেগুলিও ছেঁটে দিতে হবে যাতে সহজেই নতুন ডাল ছাড়ে। এগুলি ছাঁটবেন হালকা ভাবে এবং ছাঁটার কাজ করবেন ফুল দেবার পরে। তবে খুব গরমের দিনে গাছ ছাঁটবেন না। মরা ডালগুলি সব লতানো গাছের বেলাতেই ছেঁটে দিতে হবে।

**অবলম্বন ॥**

অবলম্বন এ রকম হওয়া দরকার যা টিকবে অনেক বছর। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরী অবলম্বন সাময়িক ভাল কাজ দিলেও এগুলিও পুরানো হয়ে পচে গিয়ে সমস্ত লতানো গাছটি নিয়ে পড়ে যায়। এ অবস্থায় লতানো গাছটিকে আবার ভালভাবে তুলে দেওয়া খুবই কঠিন। স্থায়ী অবলম্বন তৈরী করা সম্ভব লোহার উপকরণ অথবা কংক্রিট দিয়ে। কিন্তু এগুলি করা খরচসাধ্য। এবং এগুলি গ্রীষ্মকালে সহজেই তেতে ওঠে বলে এদের উপরে তুলে দেওয়া গাছের এসময়ে খুবই কষ্ট পেতে হয়। ওষধি লতানো ফুলগাছের বেলায় অবশ্য বাঁশের চাটাই বা অন্য কোন সাময়িক অবলম্বন ব্যবহার করা চলে। বাইরের দেশে আজকাল এলুমিনিয়ামের তৈরী তারের জাল লতাগাছের অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। এগুলি এমনভাবে তৈরী যাতে রোদে সহজে তেতে না যায়, এছাড়া এলুমিনিয়ামের হওয়াতে মরচে ধরে এদের নষ্ট হবার ভয়ও নেই।

স্বল্পপ্রসারী লতানো ফুলগাছের অবলম্বন হিসাবে বড় ফুটোওয়ালা শক্ত তারের জালের প্রয়োজনমাফিক টুকরো, লোহার রড বা ব্যবহৃত জলের পাইপের সঙ্গে এঁটে তাতে লতা গাছটিকে তুলে দেওয়া যেতে পারে। যতটা উপরে লতাগাছটিকে বিস্তার ইচ্ছা করেন সেখানে তারের জালটি লোহার উপকরণের সঙ্গে শক্ত করে তার দিয়ে এঁটে দেবেন। তিনটি লোহার রড ত্রিভুজ আকৃতিতে পুতে রডগুলির মাথা মসৃণ ধাতুর পাত দিয়ে ঘিরে দিতে পারেন। এবং গোলাকৃতি মাঝের ফাঁকা স্থানটি তারের জাল দিয়ে ঘিরে তার উপরে লতাগাছটি তুলতে পারেন। এ ধরনের অবলম্বনের উপরে মুসায়েনডা এরিথ্রোফাইলা, ছোট আকৃতির বুগেনভিলিয়া বা যে সব গাছের ডালপালা একটু শক্ত ধরনের সেগুলি তুলে দিয়ে লতানো গাছগুলিকে ছাতার মত আকৃতি দিলে তা খুব সুন্দর দেখাবে।

মধ্য ও দীর্ঘপ্রসারী লতানো ফুলগাছ তুলে দেওয়া যেতে পারে লোহার বা সিমেন্টের তোরণ, সীমানার সিমেন্টের দেয়াল, নিচু বাড়ীর ছাদ প্রভৃতি জায়গায়। বাড়ীর ক্যানটিলিভার পোর্টিকো দীর্ঘপ্রসারী লতানো ফুলগাছগুলি তুলে দেবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এছাড়া ডাবল-পারগোলার উপরে লতাগাছ তুলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ডাবল-পারগোলার বেলায় একটি বড় অসুবিধা রয়েছে। পায়ে চলা পথের আচ্ছাদন হিসাবে মাথার বেশ কিছু উপরে লতানো ফুলগাছগুলির ব্যবহার বলে ডাবল-পারগোলার উপরে ফুল ফুটলেও তা সহজে চোখে পড়ে না। ক্যানটিলিভার পোর্টিকোর উপরে মাঝে মাঝে কয়েকটি ইট দিয়ে তার উপরে বড় ফুটোওয়ালা চাটাই বিছিয়ে দেওয়া ভাল। এতে গরমের দিনে সিমেন্টের তাপ বেশি না লাগায় সব জায়গায় ডালপালা ভালভাবে ছড়িয়ে পড়বে। ধাতুর তোরণে আলকাতরা বা সবুজ রঙের প্রলেপ দিলে তা মরচে পড়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে এবং তোরণগুলি গরমে অপেক্ষাকৃত কম তেতে উঠবে। বড় গাছে দীর্ঘপ্রসারী লতাগাছ তুলে দেবার চল রয়েছে। কিন্তু এসব লতানো গাছ অনেক সময়েই খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে অবলম্বন গাছটিকে মেরে ফেলে। তাই শুধুমাত্র জংলী ধরনের এবং অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু গাছগুলিকে অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও অবলম্বন হিসাবে অনেক কিছুই ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচ থেকে লতানো ফুলগাছ তিন চারতলা বাড়ী উপরে তুলতে তারের বহুল ব্যবহার। অনেকে তারের উপরে তুলে লতাগাছটিকে পাশাপাশি অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করেন।

**অবলম্বনে তুলে দেওয়া ॥**

লতানো ফুলগাছ যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়লে ভাল সে জায়গা পর্যন্ত লতাগাছটির শুধু একটি সতেজ ডাল বাড়তে দেবেন। এর পরে ডালটির মাথা খুঁটে দেবেন যাতে এর মাথার কাছ থেকে অনেকগুলি ডাল ছাড়ে। এই নতুন ডালগুলি বড় হলে এদের মাথাও ভেঙে দিতে হবে এবং এভাবে লতানো গাছটি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে। মাথা ভেঙে দিয়ে এবং নতুন ডালগুলিকে একপাশে ছড়াতে সাহায্য করে লতাগাছটির শাখা-প্রশাখা দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটি ভরে দেবেন। লতাগাছটি ছড়াবার নির্দিষ্ট জায়গার নিচে যত বেশি ডাল ছাড়বে সেগুলি কাঁচ অবস্থায় ভেঙে দিতে হবে। কোন জায়গা আড়াল করবার জন্য

তারের জালে লতাগাছ ছড়িয়ে দিতে হলে ছোট অবস্থায় লতাগাছটির মাথা খ‍ুঁটে দিয়ে সেটিকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করা দরকার। সীমানার কংক্রিটের প্রাচীরের বেলায় লতা গাছের ওজন যতটা সম্ভব যেন প্রাচীরের উপরের দিকে পড়ে। ভারী লতাগাছ প্রাচীরের একদিকে ঝুলে থাকলে তা দেয়ালের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই এর ডালপালা ছেঁটে লতাগাছটির বিস্তার যতটা সম্ভব প্রাচীরের উপরে রাখার চেষ্টা করা উচিত। লতাগাছ বাড়ীর তিন চার তলা পর্যন্ত তুলতে হলে একে পাশে একরকম বাড়তে দেবেন না। যেসব জায়গায় ফুল ফুটলে ভাল দেখাবে শুধু সেখানে কিছু কিছু ডালপালা হতে দেওয়া হবে। এছাড়া এসব গাছ শক্ত করে বাঁধবার জন্য দেয়ালে মাঝে মাঝে হুক বসানো দরকার। সব লতানো ফুলগাছের বেলায় গাছ ভাল করে বেঁধে দিতে হবে যাতে ঝড়ে গাছ নিচে না পড়ে যায়।

এবারে বিভিন্ন লতানো ফুলগাছের পরিচয় প্রসঙ্গে আসছি।

**অপরাজিতা ॥**

অপরাজিতা বা ক্লিটোরিয়া টারনেটিয়া পুজার ফুল হিসাবে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। সিঙ্গেল ও ডাবল গড়নের, এবং সাদা, নীলচে সাদা, মোভ, ঘন নীল ও পারপেল বর্ণের অপরাজিতা পাওয়া যায়। এ গাছ স্বল্পপ্রসারী। অপরাজিতার ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল। লতা গাছটি কষ্টসহিষ্ণু এবং একরকম যে কোন জায়গায় চাষ করা চলে। এটি বহুবর্ষজীবী হলেও বর্ষার প্রথমে বীজ চারিয়ে নতুন গাছ করে নেওয়া একরকম রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। অপরাজিতা ভারতের নিজস্ব লতানো গাছ।

**ইপোমিয়া ॥**

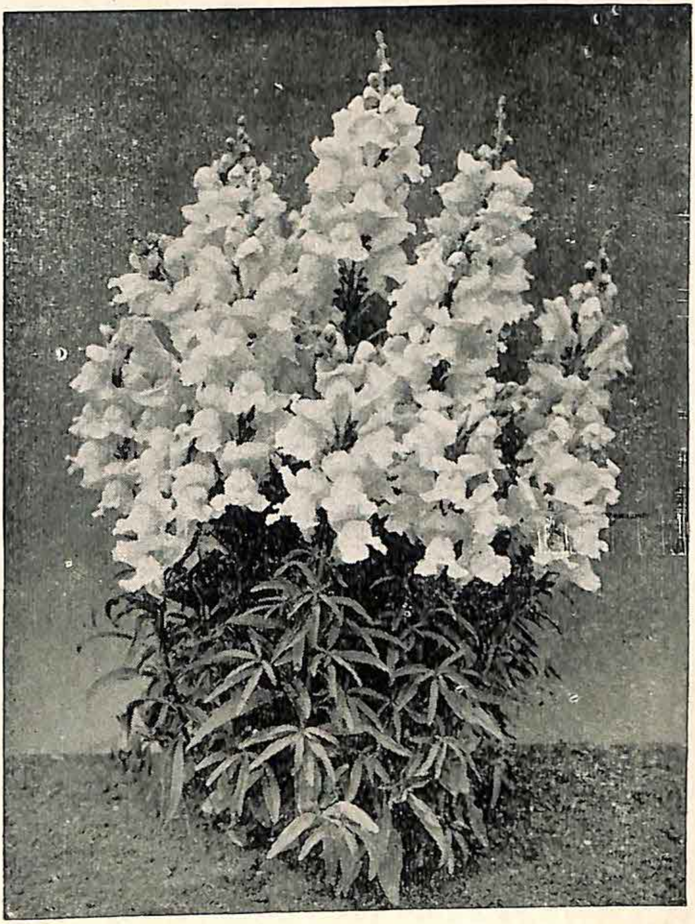
ইপোমিয়া ইংলিশে মর্ণিং গ্লোরী ও এদেশে কোথাও কোথাও পার্বতী নামে পরিচিত। ইপোমিয়ার বেশ কিছু গাছ প্রকৃতিতে ওষধি এবং অন্যগুলি দীর্ঘজীবী। ওষধি গাছগুলি বীজ চারিয়ে বছরের যে কোন সময়ে গাছ তোলা চলে। এর সব প্রজাতি দেখতে বেশ সুন্দর, এবং এদের ভেতরেও সাদা বর্ডার দেওয়া গাঢ় পিঙ্ক ফুলের কর্ণেল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বহুবর্ষজীবী ইপোমিয়ার ভেতরে পারপেল-নীল রঙের লিয়ারী ও গাঢ় পিঙ্ক রঙের হর্ষফেলিয়া খুবই সুন্দর দেখতে। এ দুটিই মধ্যপ্রসারী এবং ধাতুর তোরণে তুলে দেবার কাজে বিশেষ উপযুক্ত। লিয়ারীর ফুল ফোটে একরকম সারাবছর ধরে এবং হর্ষফেলিয়া ফুল দেয় শীতকালে। লিয়ারী খুবই কষ্টসহিষ্ণু গাছ কিন্তু হর্ষফেলিয়া সুখী প্রকৃতির, প্রথমটির বংশবৃদ্ধি দাবাকলমে ও দ্বিতীয়টির জোড়কলমের সাহায্যে। লিয়ারীকে ভাল করে ছেঁটে দেওয়া অথবা প্রতি বছর নতুন গাছ লাগানো উচিত।

**এডেনোক্যালিমনা ॥**

এডেনোক্যালিমনা-র অন্যতম প্রজাতি এলিসিয়া ক্যানটিলিভার পোর্টিকোতে তুলে দেবার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এলিসিয়ার ফুলের রং গাঢ় মোভ ও ক্যালিসিনার হলদে, এ দুটিরই ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে। ক্যালিসিনা সমতল বাংলায় বড় একটা দেখা যায় না। এলিসিয়া খুব কষ্টসহিষ্ণু ও দীর্ঘপ্রসারী লতানো গাছ। এর ফুল ফোটে থোকায়, গাছ ভরে এবং এ অবস্থায় লতাগাছটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। এলিসিয়া এসেছে ব্রাজিল থেকে, এর বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে। এডেনোক্যালিমনার বাংলা নাম পুলকলতা।

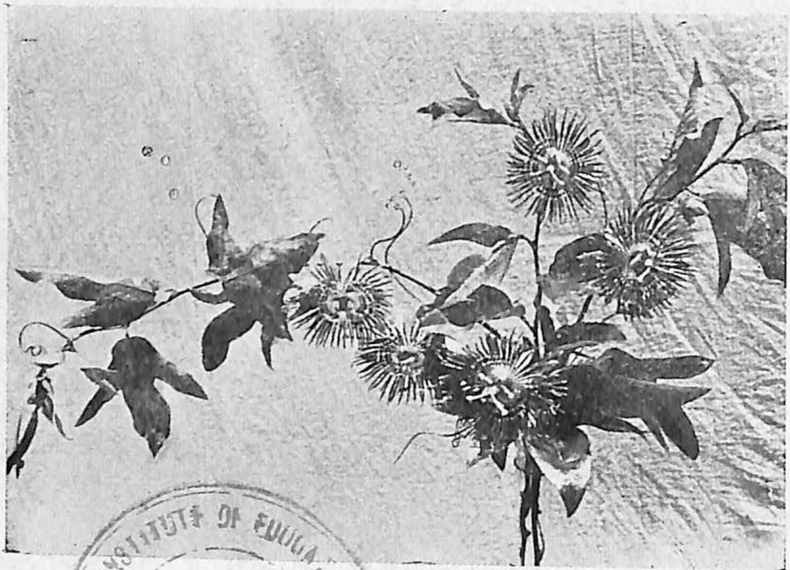
**এনটিগোনন ॥**

এনটিগোননের বিভিন্ন রঙের কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। এদের ভেতরে ঘন লাল রঙের প্রজাতি আপকারি ও ডাবল গোলাপী ফুলের প্রজাতি ইনসিগনি দেখতে বেশি সুন্দর। ইনসিগনির ফুল ফোটে শীতকালে এবং অন্যগুলির এক রকম সারা বছর ধরে—ফুল মাঝে মাঝে ফোটে গাছ ভরে। ফুল ফোটে ঝুরিতে, একক ফুলের আকৃতি খুবই ছোট। এনটিগোনন দীর্ঘপ্রসারী হলেও গাছ হালকা, এদের ইটের দেয়ালে তুলে অপর দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া

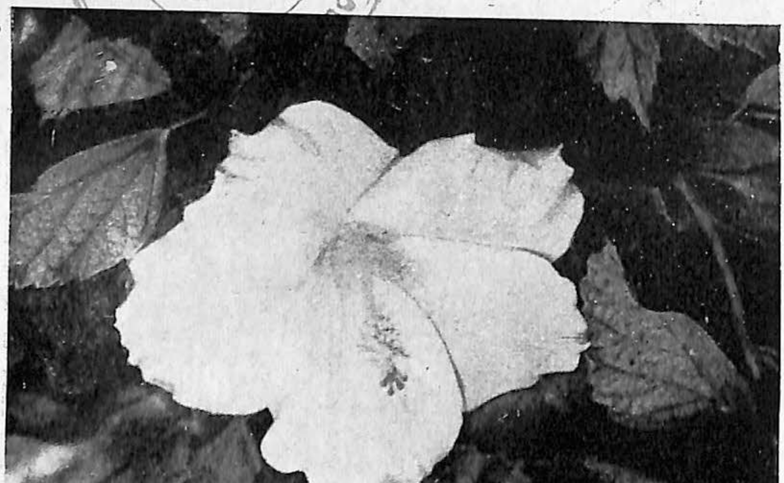


এনটিরাইনাম

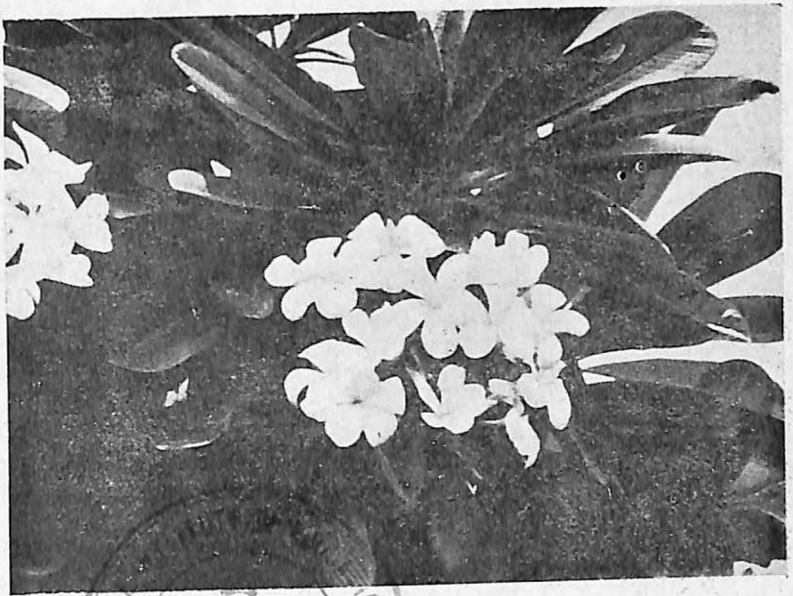
STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal



ঝুমকোলতা



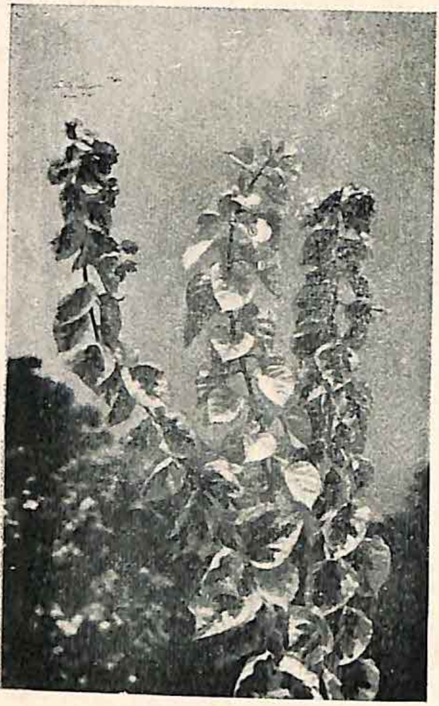
জবা মাই বিউটি



গুলঞ্চ

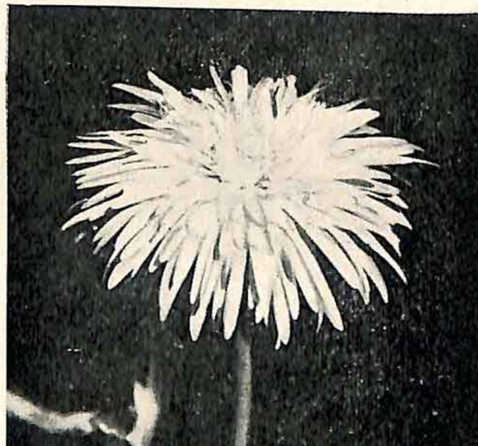


মুসায়েনডা এরিথ্রোফাইলা



বুগেনভিলিয়া স্কারলেট কুইন ভেরীগেটা

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

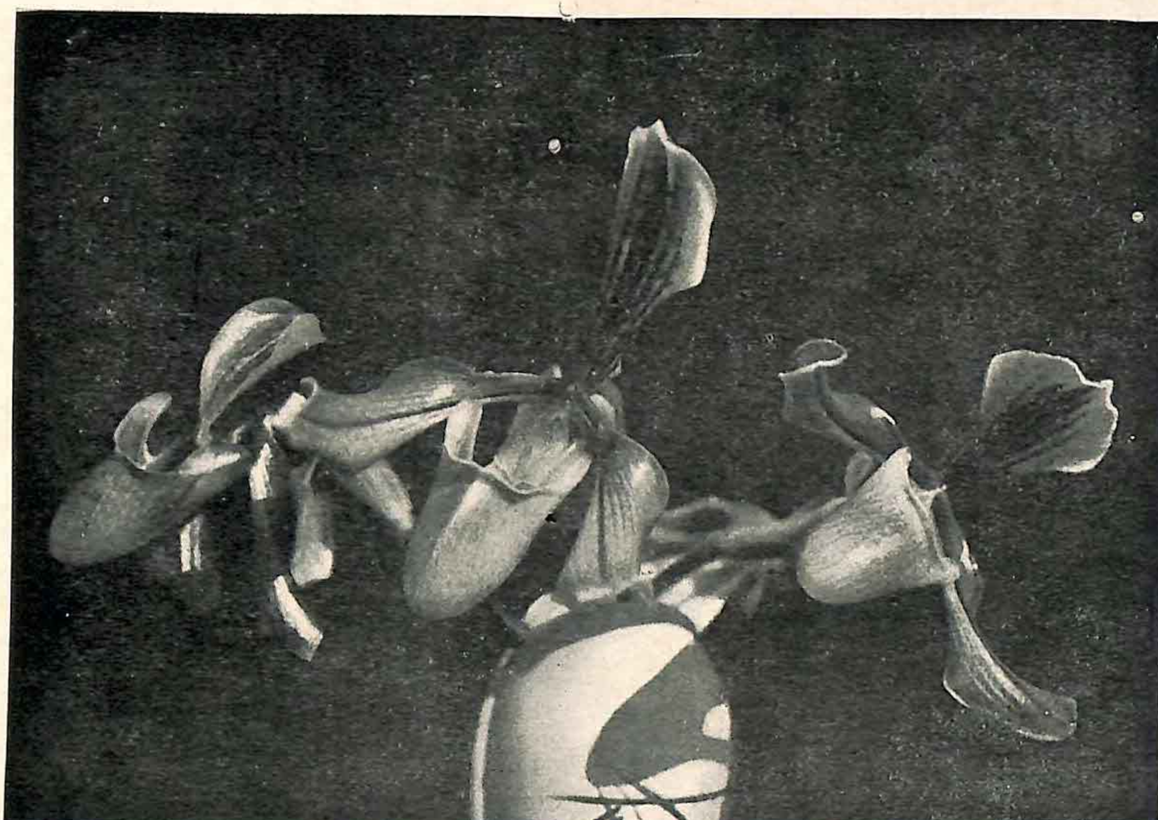


জারবেরা



গোলাপ ফুলদানিতে

STATE INSTITUTE OF EDUCA



অর্কিড ফুলদানিতে

Govt. of West Bengal



ক্যালিয়ানড্রা ইনকুলেটারা

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Gov ... Bengal.



কাঞ্চন গল্পিনি

যেতে পারে। এ লতাগাছটি খুবই কষ্টসহিষ্ণু, বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। এনটিগোননের আদিনিবাস সাউথ আমেরিকা। এটি বছরে দুবার ছাঁটার দরকার হতে পারে, একবার মার্চে ও দ্বিতীয়বার অকটোবরে। এটির বাংলা নাম মধুলতা।

**এলাম্যানডা ॥**

এলাম্যানডা একরকম সব কয়টি হলদে ফুলের প্রজাতিকে লতানো গুচ্ছ অথবা গুল্ম হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এবং গুল্ম হিসাবেই এলাম্যানডার ব্যবহার বেশি। এর বাংলা নাম অলকনন্দা।

**ওডোনটেডোনিয়া ॥**

ওডোনটেডোনিয়া স্পেসিওসার ফুল হালকা হলদে রঙের এবং ফুলের আকৃতি কিছুটা কলকের মত। ফুল ফোটে ছোট ছোট থোকায় এবং ফোটে একরকম সারাবছর ধরে। এটি সুখী প্রকৃতির গাছ. শুধু সকালে রোদ পায় অথবা হালকা ছায়া জায়গায় এটি লাগানো উচিত। ওডোনটেডোনিয়া মধ্যপ্রসারী লতাগাছ, নতুন ডালে ফুল ভাল হয় বলে এটি প্রত্যেক বছর হালকা করে ছেঁটে দেওয়া দরকার। এটি এসেছে সাউথ আমেরিকা থেকে এবং এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। ওডোনটেডোনিয়ার দেশী নাম অলকলতা।

**কর্মব্রিটাম ॥**

কর্মব্রিটাম-এর খুব ছোট ছোট ফুলগুলি খুব সুন্দর সাজানো ঝুরিতে ফোটে। ফুল বা ফুলের ঝুরি দূর থেকে সহজে চোখে না পড়লেও কাছ থেকে এদের দেখতে খুবই ভাল লাগে। কর্মব্রিটামের প্রজাতির ভেতরে ডেনসিফ্লোরাম ফোটে একরকম সারা বছর ও গ্লোরিওসাম প্রধানত গ্রীষ্মকালে। এ লতাগাছগুলি কষ্টসহিষ্ণু, মধ্যপ্রসারী কিন্তু ঝোপালো এবং এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। ডেনসিফ্লোরামের প্রকৃতি অনেকটা গুল্মের মত। এদের ফুলের রঙ লাল।

**ক্যামোয়েনসিয়া ॥**

ক্যামোয়েনসিয়া ম্যাক্সিমার ফুল দেখতে চমৎকার—ফুলের রঙ ধপধপে সাদা এবং এর বর্ডার সোনালী রঙের। ফুল আয়তনে মোটামুটি বড়, ফোটে থোকায়, ফোটে গ্রীষ্মকালে এবং ফুলে মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। গাছ সুখী প্রকৃতির, ভাল করে লেগে না যাওয়া পর্যন্ত এর যত্নের কোন রকম কমতি চলবে না। এটি মধ্যপ্রসারী কিন্তু ঝোপালো এবং বংশবিস্তার দাবাকলমের মাধ্যমে। ক্যামোয়েনসিয়া এসেছে ওয়েস্ট আফ্রিকা থেকে।

**ক্যাম্পসিস্ ॥**

ক্যাম্পসিস্ গ্রানডিফ্লোরা লতাগাছটি এখনও এর বর্জিত নাম টেকোমা গ্রানডিফ্লোরা বলে বেশি পরিচিত। এর ফুল ঘন কমলা রঙের, ফুলের গড়ন টেকোমা ষ্ট্যান্সের মত। ফুল ফোটে থোকায় এবং থোকাসহ গাছের ডালটি প্রায়ই নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ক্যাম্পসিস্ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, মধ্যপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। এ লতাগাছটি দেয়াল বেয়েও উঠতে পারে। ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এবং শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়। ক্যাম্পসিসের শেকড় থেকে কাছাকাছি জায়গায় অনেক তেড় বের হয়. এদের সংখ্যা বেশ বেশি হয় বলে এটি একটা অসুবিধার দিকও। এদের বংশবিস্তার এই তেড় দিয়ে। ক্যাম্পসিস্ এসেছে চায়না থেকে। এটি শীতকালে ছাঁটতে হবে। ক্যাম্পসিসের দেশী নাম কমললতা।

**ক্লায়ান্থাস ॥**

ক্লায়ান্থাস ডেমাপিয়ারি একটি অপূর্বদর্শন ফুল। এর সংগে তুলনা দেওয়া যেতে পারে এরকম কোন কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও ঝাড় লণ্ঠন বা ছবির রাবণের দশমুণ্ডের সাজানোর পদ্ধতির সংগে কিছুটা মিল আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

টকটকে লাল ও মাঝখানটা কালো রঙের ফুল ফোটে মূল ডাঁটির সব দিক ঘিরে। ফুল কখনো এক থাক আবার কখনো দু থাকে ফোটে। একই থোকায় দশটির বেশি ফুল ফুটতে দেখিনি; নিচের থাকে ফুলের সংখ্যা ছয় এবং উপরের থাকে বেশি হলে চারটি ফুল দেখা যায়।

ক্লায়ান্থাস দীর্ঘজীবী গাছ হলেও এর চাষ শীতের মরসুমী ফুলের মতই করা ভাল। এ গাছ বৃষ্টি মোটেই সহ্য করতে পারে না, তাই এখানে বহুবর্ষজীবী গাছ হিসাবে চাষের চেষ্টা করে বিশেষ লাভ নেই। ক্লায়ান্থাস লতানো গাছের আওতায় পড়লেও এর প্রকৃতি নরম ডালের গুল্মের মত। শীতের মরসুমী বীজের সঙ্গে একে চারাতে হবে। ব্লেড বা ছুরি দিয়ে বীজের শক্ত আবরণ খুব সূক্ষ্ম ভাবে কেটে অথবা ফাটিয়ে দিতে হবে যাতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম সহজে হয়। এক একটি বীজ চারাতে হবে এক একটি তিন ইঞ্চি টবে এবং গাছ বড় হলে টবের মাটিশুদ্ধ সাবধানে খুলে টবে বা জমিতে লাগানো উচিত, কারণ ক্লায়ান্থাস তুলে লাগানো একেবারেই পছন্দ করে না। গোড়ায় আঘাত লাগলে এ গাছ সহজেই মরে যায় তাই গছের গোড়া না খোঁচানোই ভাল এবং এছাড়া গাছের গোড়ায় যেন কিছুতেই জল না বসে। অন্যান্য পরিচর্যা মরসুমী ফুলের মত করবেন। ক্লায়ান্থাস ফুল দেয় প্রচুর, একই সময়ে একই গাছে পঞ্চাশটি ফুলের থোকাও পেয়েছি। বীজ দিয়ে এর বংশবিস্তার, এবং সমতল বাংলায় এর ভাল বীজ হয়। ক্লায়ান্থাস এসেছে অস্ট্রেলিয়া অথবা নিউজিল্যান্ড থেকে। এর চাষ আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত। ক্লায়ান্থাসের বাংলা নাম নয়নমণি। এর গোড়ার জমি খুঁচিয়ে দেবার খুব প্রয়োজন দেখা দিলে আঁচড় কাটার মত করে জমি খোঁচানো হবে।

**ক্লিমেটিস ॥**

ক্লিমেটিসের সমাদর এর ফুলের সুন্দর গন্ধের জন্য। তাছাড়া এর ফুল এবং গাছও দেখতে বেশ সুন্দর। ক্লিমেটিসের ফ্লামুলা ও প্যানিকুলেটা ছাড়া সমতল বাংলায় অন্যান্যগুলি ভাল করা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। ফ্লামুলার ফুলের গন্ধ প্যানিকুলেটার চেয়ে আরও ভাল। এ দুটি গাছেরই ফুল সাদা, ফুল দেখতে কিছুটা সিঙ্গেল জুঁইয়ের মত এবং ফুল ফোটে থোকায়। ক্লিমেটিস ফ্লামুলা খুব সুখী প্রকৃতির এবং এটি স্বল্পপ্রসারী। এর চাষ টবেও করা চলে। ক্লিমেটিসের গোড়ায় যাতে জল না জমে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। এদের ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ; ফুল হয়ে যাবার পর ডাল খুব হালকাভাবে ছেঁটে দেবেন। ক্লিমেটিসের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। এই লতাগাছটির বাংলা নাম তারামঞ্জরী।

**ক্লিরোডেনড্রন ॥**

ক্লিরোডেনড্রন স্প্লেনডেনস প্রজাতিটির ফুল টকটকে লাল এবং টমসনি প্রজাতিটির ফুল সাদা ও লাল মেশানো। দুটিরই ফুল ফোটে থোকায়। প্রথমটির ফোটে গাছ ভরে শীতকালে এবং দ্বিতীয়টির গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে। এদের হালকা ছায়া জায়গায় অথবা শুধুমাত্র সকালে রোদ পায় এরকম জায়গায় লাগাবেন। গাছ বাড়ার মরসুমে এদের যথেষ্ট জল পাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দুটি গাছই মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, মাঝারি ঝোপালো ও মধ্যপ্রসারী। এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। স্প্লেনডেনসকে বর্ষাকালে ভাল করে ছেঁটে দিতে হবে। এ দুটিই এসেছে ওয়েস্ট আফ্রিকা থেকে। ক্লিরোডেনড্রনের বাংলা নাম কিরণময়ী।

**গোলাপ ॥**

সমতল বাংলার লতানো গোলাপ তত ভাল না হলেও এদের চাষ এখানে আরও বেশি হওয়া উচিত। লতানো গোলাপের প্রজাতি অগুন্তি। অনেক গুল্ম-গোলাপের ডাল থেকে প্রকৃতির খেয়ালে লতানো গোলাপের উদ্ভব হয়েছে; এরকম যে সব প্রজাতির গুল্ম এখানে ভাল ফুল দেয় সেই সব লতানো গোলাপের সমতল বাংলায় ভাল ফুল দেবার বেশি

সম্ভাবনা। এদের পরিচর্যা অন্যান্য গোলাপের মত, ছাঁটার বেলায় শুধু মরা ও আধমরা ডালগুলি ছাঁটা হবে।

**গ্লোরিওসা ॥**

গ্লোরিওসার ভারতীয় প্রজাতি সুপারবা লতাগাছটিকে বর্ষাকালে ঝোপেঝাড়ে খুঁজে পাওয়া যায়। সুপারবা বেশ কষ্টসহিষ্ণু হলেও এর ইষ্ট আফ্রিকার প্রজাতি রথশিল্ডিয়ানা অথবা প্লানটী ইত্যাদি খুবই সুখী প্রকৃতির। গ্লোরিওসা কন্দজ জাতির গাছ এবং এর চাষও কন্দজ ফুলগাছের মত। সুপারবা ফুল দেবার পরে গাছ মরে যায় কিন্তু রথশিল্ডিয়ানা বছরে ফুল দেয় বার তিনেক। এটি হালকা জাতীয় লতাগাছ এবং টবে চাষ করার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে প্রথম থেকে সাবধান হতে হবে। সংস্কৃতে ও বাংলায় এর নাম অগ্নিশিখা।

**জ্যাকুমণ্টিয়া ॥**

জ্যাকুমণ্টিয়া ভাওলেসিয়ার ফুল দেখতে অবিকল ইপোমিয়ার মত। নীল ফুলগুলি দেখতে খুবই সুন্দর এবং ফোটে একরকম সারাবছর ধরে। গাছ কষ্টসহিষ্ণু এবং মধ্যপ্রসারী কিন্তু হালকা ধরনের। এটি এসেছে ট্রপিকাল আমেরিকা থেকে, এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। জ্যাকুমণ্টিয়ার চাষ বড় টবেও করা যেতে পারে। বছর তিনচারেক পরে ওর নতুন গাছ লাগানো ভাল। জ্যাকুমণ্টিয়া হালকা ছায়া জায়গায়ও ভাল জন্মায়। এই লতাগাছটির দেশী নাম নীলাঞ্জনলতা।

**চামেলি ॥**

চামেলি বা জেসমিনাম গ্রানডিফ্লোরামের ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষায়। গাছ মোটামুটি কষ্টসহিষ্ণু, মধ্যপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। চামেলি শীতের প্রথমে ছেঁটে দেবেন। এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে।

**ঝুমকো ॥**

ঝুমকো বা প্যাসিফ্লোরার প্রজাতি সিরুলিয়া আমাদের খুব পরিচিত। ঝুমকোর অনেক প্রজাতি রয়েছে, এদের ভেতরে নীল রঙের সিরুলিয়া এবং লাল রঙের রেসিমোসা ও কারমেসিয়ানা দেখতে খুব সুন্দর। এর সব কয়টির ফুল গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এবং অনেক প্রজাতির ফুলে সুন্দর গন্ধ রয়েছে। সিরুলিয়া কষ্টসহিষ্ণু ও দীর্ঘপ্রসারী এবং অন্য দুটি মধ্যপ্রসারী ও সুখী প্রকৃতির। এদের আদি বাসস্থান ব্রাজিল, বংশবিস্তার সাধারণত দাবা-কলমের সাহায্যে।

**ট্রাকেলোস্পারমাম ॥**

ট্রাকেলোস্পারমাম জেসমিনোইডিসের সঙ্গে জুঁইফুলের কোন সম্পর্ক না থাকলেও এটি ইংলিশে ষ্টার জেসমিন নামেও পরিচিত। এর পেছনের কারণ এই যে, ফুলগুলি দেখতে অনেকটা জুঁইয়ের মত এবং এতে মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে এবং ফোটে সংখ্যায় অনেক। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, মধ্যপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। ট্রাকে-লোস্পারমাম রোদ পছন্দ করলেও একে হালকা ছায়া পড়ে এরকম জায়গায়ও লাগানো চলে। দাবাকলম এর বংশবৃদ্ধির সাধারণ উপায় এবং এটি ভারতীয় গাছ। এটির বাংলা নাম শ্যামালতা।

**থানবার্জিয়া ॥**

থানবার্জিয়া ফুলের গড়ন অনেকটা এলাম্যানডার মত এবং এদের বেশ কয়েকটি প্রজাতির ফুল দেখতে বেশ ভাল। মাইসোরেনসিস প্রজাতির ফুলের রঙ হলদে ও খয়েরী, গ্রানডিফ্লোরার হালকা নীল ও কক্‌সিনিয়ার লাল এবং সবগুলিই ফোটে থোকায়। প্রথম

দুটি ফোটে গ্রীষ্মকালে এবং ককসিনিয়া শীতকালে। তিনটি প্রজাতিই দূরপ্রসারী, বেশ ঝোপালো এবং পুরোপুরি ভারতীয়। এদের বংশবিস্তার দাবাকলমের মাধ্যমে। গ্রানডিফ্লোরাকে বর্ষার আগে ভাল করে ছেঁটে দিতে হবে।

**পাইরোস্টেজিয়া ॥**

পাইরোস্টেজিয়া ভেনাস্টা লতাগাছটি এর বর্জিত নাম বিগ্নোনিয়া ভেনাস্টা নামে অনেক বেশি পরিচিত। এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর ফুলের লতাগাছ। শীতকালে গাছ ভরে ফুল ফোটে। ফুলের রঙ কমলা-হলদে, ফুল আকৃতিতে সরু সরু টিউবের মত এবং ফুল ফোটে থোকায়। ফুলের কিছুদিন আগে থেকে এবং ফুল ফোটার সময়ে পাইরোস্টেজিয়ায় জল দেবেন নিয়মিতভাবে। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, দূরপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। পাইরোস্টেজিয়ার আদি বাসস্থান ব্রাজিল, দাবাকলমে এর বংশবৃদ্ধি। এটির বাংলা নাম কনকলতা।

**পেট্রিয়া ॥**

পেট্রিয়া ভলুবিলিস বা নীলমণিলতার ফুল দেখতে খুবই সুন্দর। ফুলের রঙ পারপেল ও মোভ মেশানো, ছোট ছোট ফুল ফোটে ঝুলে পড়া বড় বড় থোকায়। ফুল ফোটে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং অনেক সময়ে বছরে আরও একদফা ফুল পাওয়া যায়। গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু, দূরপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। এটিকে ছেঁটে রেখে গুল্ম হিসাবেও চাষ করা চলে। উইস্টেরিয়া সমতল বাংলায় ভাল ফুল দেয় না, কিন্তু এর অভাব পেট্রিয়া অনেকাংশে পূরণ করেছে। পেট্রিয়ার আদি বাসস্থান ট্রপিকাল আমেরিকা এবং এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে।

**প্যানডোরিয়া ॥**

প্যানডোরিয়া জেসমিনোইডিস লতাগাছটিও তার বর্জিত নাম টেকোমা জেসমিনোইডিস নামে বেশি পরিচিত। ফুলের গড়ন টেকোমা গাউডিচাউডির মত এবং এই ফুলের মত প্যানডোরিয়ারও একটা আলাদা পেলবতা রয়েছে। ফুলের রঙ লাল ও সাদা, ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটে অল্পবিস্তর সারাবছর ধরে। এটি সুখী প্রকৃতির, স্বল্পপ্রসারী ও আয়তনে হালকা ধরনের। প্যানডোরিয়ার আদি বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া এবং এর বংশবিস্তার দাবাকলমের মাধ্যমে।

**বুগেনভিলিয়া ॥**

কোঠাবাড়ীর ক্যানটিলিভার পোর্টিকোতে বুগেনভিলিয়ার সমান উপযোগী লতাগাছ বুঝি পাওয়া সম্ভব নয়। বুগেনভিলিয়া বড় গাছেও তুলে দেওয়া যেতে পারে তবে এর বৃদ্ধির আধিক্যে বড় গাছটির মৃত্যু ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বুগেনভিলিয়া আসলে লতাগাছ হলেও এর বেশীর ভাগ প্রজাতি গুল্ম হিসাবে ভাল জন্মায়। তবে রেফালজেন্স, পার্থ, মেরী পামার প্রভৃতি প্রজাতিকে লতাগাছ হিসাবে খুব ভালভাবে ব্যবহার করা চলে। লতাগাছ হিসাবে ব্যবহৃত বুগেনভিলিয়াকে বেশি ছাঁটা উচিত নয়। এর চাষের বিশদ সংবাদের জন্য 'বুগেনভিলিয়া' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

**ব্যমণ্টিয়া ॥**

ব্যমণ্টিয়া গ্রানডিফ্লোরা ভারতের নিজস্ব গাছ কিন্তু যতদূর জানি এর কোন দেশী নাম নেই। ব্যমণ্টিয়ার ফুলের রঙ সাদা, দেখতে লিলির মত, ফুল ফোটে থোকায় এবং ফুলে মৃদু গন্ধ রয়েছে। এ গাছটি খুব ঝোপালো, দূরপ্রসারী ও বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। ইচ্ছে করলে এটিকে ছেঁটে গুল্ম হিসাবেও রাখা যায়। বর্ষাকালে ব্যমণ্টিয়া ছেঁটে দেওয়া দরকার। এর বংশবিস্তার সাধারণত দাবাকলমের মাধ্যমে।

**মধুমালতী ॥**

মধুমালতী বা কুইসকোয়ালিস ইনডিকা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত গাছ। এদের ফুল ফোটে থোকায় এবং থোকাতে একই সঙ্গে সাদা ও লাল ফুল ফুটে থাকে। শুধু সাদা ফুলের মধুমালতীও পাওয়া যায় তবে এগুলি দেখতে তত সুন্দর নয়। মধুমালতীর ফুলের গড়ন অনেকটা সন্ধ্যামণির মত, এদের ফুল ফোটে এক রকম সারা বছর ধরে এবং ফুলে মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। মধুমালতী অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, দূরপ্রসারী ও ঝোপালো লতা গাছ। এদের বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে। ভারতও বোধ হয় এর একটি অন্যতম আদি নিবাস।

**মাধবীলতা ॥**

মাধবীলতা বা হিপটেজ মাধবলতা ফুলের সুগন্ধ চারিদিক আমোদিত করে রাখে। ফুল ঘিয়ে রঙের, ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটে শীতের শেষ দিকে। গাছটি কষ্টসহিষ্ণু ও বেশ ঝোপালো। মাধবীলতা লতাগাছ হলেও গুল্মের মত এর বেড়ে ওঠা স্বভাব, তাই অনেকে একে ছেঁটে গুল্ম করে রাখেন। এ গাছটির বীজ অদ্ভুত ধরনের, বাতাসে উড়ে গিয়ে যাতে দূরে পড়তে পারে তার উপযুক্ত এর গড়ন। মাধবীলতা ভারতীয় গাছ এবং এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। এটিকে বছর তিনেক অন্তর ভাল করে ছেঁটে দেওয়া দরকার।

**মালতী ॥**

মালতী বা একাইটিস কোরিওফাইলাটা আমাদের খুবই পরিচিত। ফুল সাদা, ফুলে মিষ্টি গন্ধ, ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটার সময় বর্ষাকাল। গাছ বেশ কষ্টসহিষ্ণু, মধ্যপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। মালতীর বংশবিস্তার দাবাকলমের মাধ্যমে।

**লনিসেরা ॥**

লনিসেরা সেমপারভিরেন্স প্রজাতিটির আদি বাসস্থান ট্রপিকাল আমেরিকা ও হিল-ডেব্রানডিয়ানার বার্মা। প্রথমটির ফুল লাল, এবং দ্বিতীয়টির ফুল হলদে ও বেশ বড় ফুল। লনিসেরার সরু টিউবের মত ফুল ফোটে থোকায় গ্রীষ্মের প্রথমে। গাছ দুটি মধ্য-প্রসারী, মাঝারি ঝোপালো এবং মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু। এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে।

**ষ্টিক্টোকার্ডিয়া ॥**

ষ্টিক্টোকার্ডিয়া বেরাভিয়েন্সিসের ফুল দেখতে অবিকল ইপোমিয়ার মত। এটি সাধারণভাবে ইপোমিয়া ক্যানডী-কিং নামে পরিচিত। ফুলের বাইরের দিক ও ভেতরের বর্ডারের রঙ স্নিগ্ধ গোলাপী এবং ভেতরের রঙ হালকা হলুদ। এর ফুলগুলি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, ফুল ফোটে থোকায় অথবা আলাদাভাবে। ষ্টিক্টোকার্ডিয়া সুখী প্রকৃতির ও মধ্যপ্রসারী। এর আদি নিবাস ট্রপিকাল আফ্রিকা এবং বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের মাধ্যমে। ষ্টিক্টোকার্ডিয়া সমতল বাংলায় এখনও একরকম দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু এর বহুল চাষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এটির দেশী নাম বৈদূর্যমণি।

**ষ্টিফানোটিস ॥**

ষ্টিফানোটিস ফ্লোরিবানডার ফুলের সঙ্গে রজনীগন্ধার মিল অনেক—এদের ফুলও সাদা এবং তাতে মিষ্টি গন্ধ, তা ছাড়া আয়তন এবং গড়নও বেশ কিছুটা রজনীগন্ধারই মত। তাই এটি লতানো রজনীগন্ধা নামেও পরিচিত। ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটে সাধারণত গ্রীষ্মকালে। গাছ অত্যন্ত সুখী প্রকৃতির ও বাড়ে ধীরে ধীরে। ষ্টিফানোটিসকে সহজেই টবে চাষ করা চলে। এর আদি বাসস্থান ম্যাডাগাস্কার এবং বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। ষ্টিফানোটিসের দেশী নাম রজনীগন্ধালতা। সুযোগ পেলে লতাগাছটি বেশ কিছুটা বেড়ে চলে।

**স্যারিটা ॥**

স্যারিটা ম্যাগনিফিকা এর বর্জিত নাম বিগ্নোনিয়া ম্যাগনিফিকা বলে বেশি পরিচিত। এর ফুল ফোটার সময়ে মোভ রঙের কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের রঙ পাল্টে ক্রিমজন হয়ে দাঁড়ায়। স্যারিটার ফুল ফোটে ছোট ছোট থোকায়, ফুল দেখতে অনেকটা এডেনোক্যালিমনা এলিসিয়ার মত এবং এর ফোটার সময় শীতকাল। স্যারিটার বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে। এটি মোটামুটি কষ্টসহিষ্ণু ও দূরপ্রসারী লতা গাছ। সমতল বাংলায় এটি তত ভাল ফুল দিতে চায় না।

**হোমস্কিয়োলডিয়া ॥**

হোমস্কিয়োলডিয়া লতাগাছ হলেও একে গুল্ম হিসাবে চাষ করাই রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। লতা হিসাবে এর চাষ করতে চাইলে এর লতানো ডালগুলিকে বাড়বার সুযোগ করে দিতে হবে। হোমস্কিয়োলডিয়া দেশীগাছ এবং এর দুটি প্রজাতিই দেখতে সুন্দর। এটি মাঝারি কষ্টসহিষ্ণু ও মাঝারি ঝোপালো এবং এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। এটি ফুল দেয় শীতকালে। দূর থেকে দেখে একে বুগেনভিলিয়া বলে মনে করা স্বাভাবিক। ফুল ফোটা অবস্থায় হোমস্কিয়োলডিয়া খুবই সুন্দর দেখতে। এটি দ্রোণ নামেও কিছুটা পরিচিত।

# পথের দুধারে গাছ

পথের দু'ধারে গাছ লাগানোর প্রয়োজন পড়ে দুটি প্রধান কারণে। প্রথমটি সৌন্দর্যবৃদ্ধি —পথে যেতে যেতে ফুল ও গাছের সৌন্দর্য উপভোগ করা। এবং দ্বিতীয়টি, রাস্তার পাশে কিছু ছায়াশীতল জায়গার ব্যবস্থা করা যা গ্রীষ্মের দিনে ক্লান্ত পথিককে আশ্রয় দেবে। অথবা গাছ এমনভাবে লাগানো হয় যাতে সমস্ত রাস্তা জুড়েই গাছের ছায়া পড়ে, এবং এটা বেশি করা হয় শহরের বাইরের সুদীর্ঘ রাস্তার বেলায়। এই পথকে গাছ লাগাবার ভিত্তিতে আবার তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (১) পায়ে-চলার পথ ; (২) মাঝারি-চওড়া পথ যাতে জনাচারেক পাশাপাশি চলতে পারে ; এবং (৩) যানবাহন চলাচল লেগেই আছে এ রকম বড় রাস্তা। এ তিনটির ভেতরে প্রথম দুটির বেলায় সৌন্দর্য প্রধান ভাবনা এবং এদের বেলায় ছায়ার স্থান গৌণ ; এবং তৃতীয়টির বেলায় ছায়ার ভাবনা প্রধান ও সৌন্দর্যের স্থান গৌণ। যদিও, সব কয়টির বেলাতেই যেসব গাছ থেকে একই সঙ্গে ছায়া ও সৌন্দর্য লাভ করা যায় এ কাজে তাদের সমাদর বেশি। পথের পাশে লাগাবার উপযুক্ত যে গাছগুলির কথা বলা হয়েছে তাদের একরকম সবারই পরিচর্যার কথা বইয়ে যথাস্থানে বলা হয়েছে।

**পায়ে-চলা পথের ধারের গাছ ॥**

সব ফুলবাগানেই এ ধরনের পথ রয়েছে। এই পায়ে-চলা পথের পাশে লাগানোর কাজে বেশি উপযুক্ত সব গুল্ম ও ছোট আয়তনের নাতি-উচ্চ গাছগুলি। স্বল্প-প্রসারী লতানো গাছগুলিও এই পথের পাশে লাগাবার পক্ষে বেশ মানানসই। পায়ে-চলা পথের পাশে লাগাবার উপযুক্ত গাছের সংখ্যা অনেক বলে এদের ভেতর থেকে কিছু গাছ বেছে নেওয়া যেতে পারে যারা এ কাজের পক্ষে আরও বেশি উপযুক্ত। এরকম গাছের ভেতরে রয়েছে বাহারি পাতার গাছ একালিফা, এরালিয়া, লেবু ভেরীগেটা, জবা স্নো ফ্লেক ; ফুলগাছের ভেতরে রঙ্গন সিঙ্গাপোরেনসিস, কাঞ্চন গল্পিনি, কৃষ্ণচূড়া গিলেসী, ক্যালিয়ানড্রা ব্রিভাইপস ও স্পেসিওসা সারবেরা, ক্রসেনড্রা, ফ্রানসিশিয়া, গন্ধরাজ ভিতচী ও ফরচুনিয়ানা, পিঙ্ক কুন্দ, জ্যাট্রোফা পানডুরাফোলিয়া রোজিয়া, লেমোনিয়া, ম্যাগনোলিয়া ফসকাটা, মুসায়েনডা

ফিলিপিকা প্রজাতিগুলি ও এরিথ্রোফাইলা, পেণ্টাস কারমেসিয়ানা, প্লামবাগো ক্যাপেনসিস, পেটিল্যানডিয়া, কোয়াশিয়া, রণডেলেটিয়া, জবার ছোট আয়তনের প্রজাতিগুলি, ফুল-ষ্ট্যান্ডার্ড গোলাপ, এবং লতানো ফুলগাছের ভেতরে জ্যাকুমণ্টিয়া, এলাম্যানডা, ক্লিমেটিস ফ্লামুলা, হোমস্কিয়োলডিয়া ও ষ্টিফানোটিস। পায়ে-চলা পথের দু'ধারের গাছগুলি লাগাতে হবে পথ থেকে দু'তিন হাত দূরের জমিতে।

**মাঝারি-চওড়া পথের ধারের গাছ ॥**

মাঝারি-চওড়া অর্থাৎ জনা চারেক পাশাপাশি হাঁটতে পারে এ রকম পথ পাওয়া যাবে বড় বাগানের ভেতরে বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বড় ক্যামপাসে। এ পথ পায়ে চলার কাজেই বেশি ব্যবহার হয় যদিও ছোট গাড়ীর পথ হিসাবে ব্যবহার হতেও এর কোন বাধা নেই। এই পথের পাশে অনেক সময়ে এমন গাছ লাগানো দরকার, পরে যা বেশ কিছুটা ছায়াও দেবে। মাঝারি-চওড়া পথের বেলায় ছায়া দেবার গাছ লাগাতে হবে শুধুমাত্র এর পশ্চিম অথবা দক্ষিণ দিকে। এ পথের ধারের গাছ হিসাবে বেশি ব্যবহার নাতি-উচ্চ গাছগুলির, যেগুলি বেশ ঝোপালো হয়ে বেড়ে ওঠে এবং যে গাছগুলি গাছ ভরে ফুল দেয়। পথের দু'ধারেই একই আয়তনের গাছ লাগানো যেতে পারে, অথবা অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের গাছগুলি লাগানো যেতে পারে সেদিকে যেদিকে ছায়া দেবার কোন প্রশ্ন নেই। পথের ধারের এই গাছগুলি হবে পথ থেকে হাত চারেক দূরে এবং এদের দুটি গাছের ভেতরের দূরত্ব হবে হাত বারো। মাঝারি-চওড়া পথের দুটি গাছের মাঝে একটি করে পায়ে-চলা পথের উপযুক্ত গাছও লাগানো চলবে, তবে এগুলি লাগাতে হবে পথ থেকে হাত দু'তিন দূরে। মাঝারি-চওড়া পথের জন্য ভাল ফুল দিচ্ছে এরকম মূলগাছ থেকে কলমের সাহায্যে তৈরী চারাগাছ যোগাড় করা ভাল, কারণ অনেক মূলগাছের বীজের চারাগাছ সবসময়ে মূলগাছের মত ভাল ফুল দেয় না। এছাড়াও, কৃষ্ণচূড়া, সোনালী শিমুল ও জ্যাকারণডার কলমের গাছও মাঝারি-চওড়া পথের ধারে লাগাবার পক্ষে খুব ভাল, যদিও ডাল সহজেই ভেঙে পড়ে বলে এ তিনটির বীজের গাছ পথের ধারে লাগাবার মোটেই উপযুক্ত নয়। কিন্তু এদের কলমের গাছগুলি আয়তনে বড় হবে না বলে এদের থেকে ক্ষতির আশংকা একরকম নেই, অথচ এদের সুন্দর ফুল পথ আলোকিত করে তুলবে।

নাতি-উচ্চ গাছগুলি এই পথের দুধারে লাগাবার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। এদের ভেতরেও যেগুলি আরও বেশি উপযুক্ত তাদের নাম এখানে দিচ্ছি : বাহারি পাতার গাছের ভেতরে ফিলিসিয়াম, কর্ডিয়া সেবাষ্টিনা ভেরীগেটা, মাথা ভেঙে দিয়ে ছোট করে রাখা দেবদারু পেনডুলা, বট কৃষ্ণ ও বকুল ভেরীগেটা ; এবং ফুলের গাছের ভেতরে কলমের জারুল ফ্লস রেজিনা রোজিয়া, ট্যাবিবুইয়া স্পেক্টাবিলিস, ফুরুস, ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা, শিউলী, পয়েনসেটিয়া প্লেনিসিমা, কামিনী, কর্ডিয়া, কুরচি, শ্বেত চাঁপা, কলমের টেকোমা গাউডি-চাউডি, কাঞ্চন ভেরীগেটা, ব্লেকিয়ানা ও ক্যানডিডা, ব্রাউনিয়া গ্রানডিসেপস, মিলেটিয়া, গুলঞ্চ ও পালতে মাদার কৃষ্টাগেলী। মাঝারি-চওড়া পথের উপযুক্ত কলমের কৃষ্ণচূড়া তৈরী করতে প্রাপ্তবয়স্ক কিছু ছোট আয়তনের মূলগাছ বেছে নিতে হবে।

**বড় রাস্তার পাশের গাছ ॥**

প্রচুর যানবাহন চলাচল করে এ রকম বড় রাস্তার পাশে গাছ লাগানো হয় প্রধানত ছায়া পাবার জন্য। বড় রাস্তার পাশে শুধু সৌন্দর্যের কারণেও গাছ লাগানো হয়ে থাকে তবে সেগুলি লাগানো হয় রাস্তা থেকে বেশ একটু দূরে যাতে এসব গাছের ডাল ভেঙে পড়লে বা গাছ উপড়ে পড়লেও কারো কোন ক্ষতির আশংকা থাকে না। ছায়া দেবার গাছগুলি ফুলগাছও হতে পারে তবে বড় রাস্তার ঠিক পাশের গাছগুলির এই গুণগুলি থাকতেই হবে : ( ১ ) গাছের ডালপালা ঝড়ঝাপটায়ও সহজে ভাঙে না ; ( ২ ) গাছ হবে দৃঢ়মূল যাতে সহজে উপড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না ; ( ৩ ) গাছের পাতা খুব বেশি ঝরবে না ; ( ৪ ) গাছের মাথা হবে ঝোপালো যাতে গাছ অনেকটা ছায়া দিতে পারে ; ( ৫ ) গাছ যেন ঋজুভাবে বেড়ে ওঠে ; এবং ( ৬ ) গাছ হবে কষ্টসহিষ্ণু

যাতে সাধারণ পরিচর্যাতেই তা ভালভাবে বেড়ে ওঠে।

বড় রাস্তার বেলায় দুপাশেই ছায়া দেবার গাছ লাগানোর প্রচলন রয়েছে। তবে ইচ্ছা করলে এরও পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে ছায়া দেবার গাছগুলি লাগিয়ে রাস্তার বিপরীত দিকে এমন গাছগুলি লাগানো যেতে পারে যা সমস্ত জায়গার শোভা বাড়িয়ে তুলবে। শোভা বাড়াবার অনেকগুলি গাছই বিভিন্ন কারণে রাস্তার ঠিক পাশে লাগাবার উপযুক্ত নয় তাই এদের রাস্তা থেকে এমন দূরত্বে লাগাতে হবে যাতে তাদের ডালপালা ভেঙে পড়লেও রাস্তায় কারো কোন ক্ষতি না হয়। সহজেই ডাল ভেঙে পড়ে এ ধরনের গাছের ভেতরে রয়েছে কৃষ্ণচূড়া, সোনাঝুরি, আকাশ নিম, কেশিয়া সায়ামিয়া, চাঁপা, ট্যাবিবুইয়া রোজিয়া ও ডনের্লাস্মিথী ; শিমুল, পলাশ, সোনালী শিমুল, কলভিলিয়া, স্প্যাথোডিয়া, গ্লিরিসিডিয়া ও জ্যাকারাণডা। এই তালিকার গাছগুলি মোটেই রাস্তার পাশে লাগাবার উপযুক্ত না হলেও এদের ভেতরের কৃষ্ণচূড়া ও কেশিয়া সায়ামিয়াকে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে রাস্তার ধারের ছায়া দেবার গাছ হিসাবে। সহজেই ডাল ভেঙে পড়ে এ রকম গাছগুলিকে ছায়া দেবার কাজে লাগালে এদের দিয়ে লাভের বদলে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি।

বড় রাস্তায় ছায়া দেবার গাছের বেলায় কোন কলমের গাছ কখনই ব্যবহার করা হবে না। শুধু তাই নয়, এ কাজের জন্য এরকম চারাগাছ বেছে নিতে হবে যার মূল শেকড় ঋজু রয়েছে। এই সব চারাগাছ তৈরী করতে একটি করে বীজ লম্বা নার্শারী-টবে চারালে, এবং মূল শেকড় টবের শেষ অংশে পৌঁছয়নি এ অবস্থায় চারাগাছ রাস্তার পাশে লাগালে মূল শেকড় সহজেই ঋজু রাখা যাবে। জমিতে বীজ বুনে চারাগাছ তৈরী করে লাগালেও গাছের মূল শেকড় কমজোরি হয়েই থাকবে। যেখানে সম্ভব সেখানে গাছের বীজ সরাসরি বড় রাস্তার পাশের ছায়া দেবার গাছের নির্দিষ্ট জায়গায় একটি করে বীজ চারিয়ে দেওয়া ভাল। এটা আম, তেঁতুলের বেলায় সহজেই করা সম্ভব। বড় রাস্তার পাশের ছায়া দেবার গাছগুলি লাগানো হবে রাস্তা থেকে হাত দশেক দূরে। এবং এই বড় দুটি গাছের ভেতরের দূরত্ব হবে হাত পঁচিশেক। শুধু ছায়া দেবার কাজে আম, তেঁতুল, বট, জির, ষ্টারকুলিয়া, অশ্বত্থ, দেবদারু, নিম, বকুল, পুত্রঞ্জীব, মেহগনি ও অর্জুন ; এবং একই সঙ্গে ছায়া ও ফুল দেবে এরকম গাছের ভেতরে কেশিয়া ফিশ্চুলা, নড়োসা ও জাভানিকা ; রাধাচূড়া, জারুলের সব বড় আয়তনের প্রজাতিগুলি, অশোক, থেসপেশিয়া, করঞ্জ ও পুন্নাগ চাঁপা রাস্তার পাশে লাগাবার কাজের বিশেষ উপযুক্ত। থেসপেশিয়ার ডাল তত শক্ত নয়, তবে এর গাছ আয়তনে ছোট বলে এর থেকে ক্ষতির আশঙ্কা খুব নেই।

শহরের রাস্তার দুপাশে লাগাবার গাছ আয়তনে খুব বড় হওয়া উচিত নয়। গাছ বড় হলে তার ডালপালা বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতির অসুবিধা ঘটাবে। তাছাড়া শহরের প্রধান রাস্তাগলি খুবই চওড়া—গাছের ছায়া সম্পূর্ণ রাস্তাকে ঢেকে দেবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। তাই এর রাস্তার পাশের গাছ এমন হতে হবে যার ছায়ায় ইচ্ছা করলে এসে আশ্রয় নেওয়া যায়। শহরের রাস্তার পাশের গাছগুলি হওয়া উচিত মাঝারি আয়তনের এবং হওয়া দরকার অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু কারণ বাঁধানো রাস্তার পাশে বা ফুটপাথে বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিশ্চয়ই খুবই কঠিন। শহরের রাস্তার পাশে যতটা বেশি সম্ভব ফুলের গাছ লাগানো দরকার, এরা সমস্ত জায়গাটিতে সুন্দর করে তুলবে এবং একই সঙ্গে ছায়াও দেবে। এ কাজে খুব ভাল কাজ দেবে কেশিয়া ফিশ্চুলা ও জারুল ম্যাগনিফিকা। এছাড়া, শহরের রাস্তার পাশে লাগাবার গাছ হিসাবে পুত্রঞ্জীব, বকুল, দেবদারু, অশোক, পুন্নাগ চাঁপা, থেসপেশিয়া ও রাধাচূড়া বেশ উপযুক্ত।

বড় রাস্তার পাশে যেখানে অনেক গাছ লাগাবার সুযোগ রয়েছে সেখানে গাছ মিলিয়ে লাগাবার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। গাছ মিলিয়ে লাগানো হয় বিশেষ করে ফুলগাছের বেলায়। যে গাছের পাশে যে গাছ লাগালে তা আরও ভাল দেখায় নিচে তার চারটি ভিন্ন ভিন্ন তালিকা দেওয়া হলো :

( ১ ) কেশিয়া নডোসা—কেশিয়া রেনিজারা—কেশিয়া জাভানিকা—কেশিয়া মারজিনেটা।

( ২ ) জারুল ম্যাগনিফিকা—কেশিয়া নডোসা—রাধাচূড়া।
( ৩ ) কৃষ্ণচূড়া—কেশিয়া ফিশ্চুলা।
( ৪ ) কৃষ্ণচূড়া—রাধাচূড়া—জ্যাকারাণডা।

এই তালিকাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি আলাদা সমাবেশের গাছগুলি ফুল দেয় একই সময়ে। সমাবেশগুলির গাছের ক্রম বজায় রেখে যত বেশি ইচ্ছা গাছ লাগানো যেতে পারে। উপরের প্রথম দুটি সমাবেশের গাছগুলি রাস্তার পাশে ছায়া দেবারও খুব উপযুক্ত, এবং শেষের দুটি রাস্তার থেকে দূরে লাগাতে হবে কারণ এদের ভেতরের কৃষ্ণচূড়া ও জ্যাকারাণডা রাস্তার ঠিক পাশে লাগানো উচিত নয়। প্রথম সমাবেশের সব কয়টি গাছের পাতা বা গাছ দেখতে অনেকটা এক রকম। চার নম্বর সমাবেশের গাছ-গুলির পাতারও মিল রয়েছে। ফুল ফুটলে এদের আলাদা বৈশিষ্ট্য অবশ্য সহজেই ধরা পড়ে। রাধাচূড়া পেল্টোফোরামের বাংলা নাম।

# ক্যাকটাস ও সাকুলেণ্ট

ক্যাকটাস করা কঠিন এবং সব গাছেরই দাম প্রচুর এই রকম ধারণা অনেককে ক্যাকটাস-বিমুখ করেছে বছর দশেক আগে পর্যন্ত। এর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় না থাকায় এ ধরনের ভুল ধারণার উৎপত্তি। কেননা কয়েকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখলে ক্যাকটাস সবার পক্ষেই করা সম্ভব। শহুরে জীবনে যেখানে বাগান করার জন্য একফালি জমি বা গুটিদশেক বড় টব রাখার জায়গাও সহজে মেলে না, সেখানে ক্যাকটাসের চেয়ে উপযুক্ত কোন গাছ পাওয়া যাবে না। দরকার বোধ করলে ক্যাকটাস সারা বছরই ঘরে রাখা যায়। তাছাড়া এর জায়গার চাহিদাও অত্যন্ত কম।

ক্যাকটাস অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। অনেক সময়েই দেখা যায় খুব অযত্নে থেকেও গাছ বেঁচে রয়েছে। মাটিতে কখনই জল জমবে না এবং প্রয়োজনমাফিক জল পাবে, এ দুটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারলে ক্যাকটাস করা সহজসম্ভব হয়ে উঠবে।

**টবে গাছ লাগানো ॥**

গাছের আয়তন অনুযায়ী গাছ ভালভাবে এঁটে যায় এরকম টব বেছে নেবেন। ছোট আয়তনের গাছের জন্য ছোট এবং টব পালটে লাগাবার বেলায় বা বড় গাছের জন্য আয়তন অনুযায়ী বড় টব ব্যবহার করবেন। বড় জাতির চারাগাছের জন্যও ছোট টব ব্যবহার করবেন গাছের আয়তন অনুযায়ী। বড় জাতির ছোট চারাগাছের জন্য একসঙ্গে বড় টব ব্যবহার করলে গাছের গোড়ায় সহজে জল জমে গাছ পচে যাবার সম্ভাবনা। নিচের ফুটো ছাড়াও পাশে কয়েকটি ফুটো আছে এরকম টবে বাড়তি জল তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে যাবে। টবের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে চারা বা ঝামা দেবেন, এবং টব ও চারা দুইই ধুয়ে নেবেন ভাল করে। টবে সারমাটি ব্যবহার করবেন ভেজাভেজা অবস্থায়। গাছ টব পালটে লাগাতে হবে মাঝে মাঝে ; যেগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে সেগুলি একটু ঘন ঘন এবং যেগুলি আস্তে আস্তে বাড়ে সেগুলি অপেক্ষাকৃত দেরিতে। গাছ টবে লাগাবার পরে দিন সাতেক জল না দেওয়া ভাল, সারমাটি ভেজাভেজা থাকায় জল না পাওয়ায় গাছের কোন ক্ষতি হবে না। সাধারণত বছর দেড়েকে একবার টব পালটানো ভাল। টব ভেঙে টবের গাছ লাগাবেন নতুন টবে, কারণ টব থেকে গাছ খুলতে গেলে গাছ জখম হবার সম্ভাবনা। টব পালটাবার সময় টবের গাছটির গোড়ার মাটি শুকনো থাকবে। গাছ পালটানো চলে যে কোন সময়ে তবে গ্রীষ্মের প্রথম ভাগ এর বেশ উপযুক্ত সময়। গাছ লাগাবার পরে টব আস্তে আস্তে মাটিতে ঠুকে সারমাটি ঠিকমত বসিয়ে দেবেন, চন্দ্রমল্লিকার টবের মত উপর থেকে টিপে শক্ত করবেন না।

**সারমাটি ॥**

ক্যাকটাসের সারমাটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যা জল ধরে রাখে না এবং পর্যাপ্ত খাবার যোগায়। সারমাটি এমন হবে যে হাতের মুঠোর ভেতরে চেপে কোথাও রেখে দিলে সারমাটি দলা হয়ে থাকে, কিন্তু একটু চাপ দিলেই দলা গুঁড়ো হয়ে যায়। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে সব গাছের জন্য সারমাটি এভাবে তৈরী করতে পারেন—বারো টব সারমাটির জন্য তিন টব করে সাধারণ মাটি, পরিষ্কার বালি ও অন্তত বছর দুয়েকের পুরানো পাতাপচাসার ( মাটি ও পাতাপচাসার ভাল করে গুঁড়ো করে নেবেন ) এবং এর সঙ্গে এক টব গুঁড়ো কাঠকয়লা, আধ টব করে পুরানো বাড়ী ভাঙ্গা রাবিশ, গুঁড়ো ডিমের খোলা, গুঁড়ো ইট ও হাড়ের গুঁড়ো। গাছ লাগাবার মাস দুয়েক আগে সারমাটি তৈরী করে তাতে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে দেবেন। টবের সারমাটিতে শ্যাওলা জমলে বা উপরের মাটি সহজেই জমাট বেঁধে গেলে বুঝতে হবে সারমাটি ঠিকমত তৈরী হয়নি। এক্ষেত্রে সারমাটি পালটে গাছ নতুন করে লাগানো উচিত। ক্যাকটাসে রাসায়নিক সার দেবেন না।

**জল দেওয়া ॥**

সঠিকভাবে জল পাওয়া ক্যাকটাসের দরকার। বেশির ভাগ জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পাওয়া ক্যাকটাসের মৃত্যুর কারণ। অথচ পর্যাপ্ত জল পাওয়া গাছের পক্ষে দরকার, নইলে গাছ ভালভাবে বাড়তে পারবে না। এই সমস্যার ক্ষেত্রে একটা কথা সবসময়ে মনে রাখা ভাল যে জল দেব কি দেব না প্রশ্ন মনে দেখা দিলে ক্যাকটাসে জল দেবেন না। গাছের ছোট অবস্থায় জলের পরিমাণ কম হবে, গাছ বাড়তে থাকলে জলের পরিমাণও বাড়বে। তাছাড়া কমজোরি গাছে জল দেবেন পরিমাণে কম।

গাছে জল দেবার দরকার দেখা দিলে পরিমিত জল দেবেন। টবে জোরে টোকা মেরে অথবা সরু লোহার কোন কিছু খুব সাবধানে ঢুকিয়ে জল দেওয়া দরকার কিনা বোঝা যেতে পারে। জলের দরকার রয়েছে এরকম টবে টোকা দিলে টং টং শব্দ হবে এবং লোহার কাঠিটিতে অল্প অল্প মাটি লেগে থাকলে জল দেবার দরকার নেই বুঝবেন ; কিন্তু যদি মাটি না লাগে তাহলে জল দেবার প্রয়োজন বুঝবেন। জল দেবার সময়ে টবের সব মাটি ভিজে যায় এরকম পরিমাণে জল দেবেন, শুধুমাত্র উপরের মাটি ভেজে এরকম জল দিলে গাছের ক্ষতি হবে। শীতকাল ক্যাকটাসের বিশ্রামের সময়, এ সময়ে এবং বর্ষাকালে জল ঘন ঘন দেবেন না। গ্রীষ্মকাল গাছ বাড়ার সময়, এ সময়ে জল দেবার প্রয়োজন দেখা দিলেই জল দেবেন। গাছ রোদে থাকলে বা ছোট গাছের টবে জলের প্রয়োজন পড়বে একটু ঘন ঘন। জলের পরিমাণ কিছুটা বাড়াবেন গাছে কুঁড়ি আসা থেকে ফুল ফুটে যাওয়া পর্যন্ত।

গাছের গোড়াতে জল দাঁড়ালে গোড়া পচে যাবার বা নিদেনপক্ষে গোড়ায় দাগ হবার সম্ভাবনা। এ অসুবিধে দূর করতে কোন জলভরা পাত্রে টবের চার ভাগের তিন ভাগ বসিয়ে দিয়ে টবের উপরের মাটি ভেজাভেজা হয়ে এলে টব তুলে নেবেন। এ ছাড়া গাছের গোড়ায় কিছু পরিষ্কার বালি ছড়িয়ে দিতে পারেন যাতে গাছের গোড়া সহজে না পচে। গাছে মাঝে মাঝে সকালের দিকে জল স্প্রে করলে ভাল। কিন্তু স্প্রে করা জল বা অন্য কোন জল যেন গাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে না যায়। এতে গাছে দাগ হবার সম্ভাবনা। ফুঁ দিয়ে এই জল ফেলে দিতে পারেন।

**অন্যান্য কথা ॥**

এপিফাইলাম হালকা ছায়া জায়গায় রাখবেন, এবং এর সারমাটিতে মাটি না দিয়ে তার জায়গায় আরও তিন টব পাতাপচাসার মেশাবেন। এছাড়া এক রকম সব গাছই রোদ ভালবাসে। গাছের যেদিকে ছায়া পড়ে, সেদিক মাঝে মাঝে ফিরিয়ে দেবেন রোদের দিকে। মাটি সাবধানে মাঝে মাঝে খুঁচে দেবেন। জল দেওয়া ও সারমাটি ভালভাবে তৈরী হলে ক্যাকটাসের রোগের আশংকা কম। রোগাক্রান্ত হবার প্রথম অবস্থায় নিকোটিনের কোন

ওষুধ ( নিকোটিন প্রিপারেশন ) বা অন্য কোন ওষুধ তুলো দিয়ে সাবধানে লাগাবেন। গাছ রাখবেন এমন জায়গায় যেখানে অন্তত সকালের রোদ এবং প্রচুর আলোবাতাস পায়।

জমিতে ক্যাকটাস করা চলে। জমি হবে উঁচু, রোদ পায় যথেষ্ট এবং জল দাঁড়াবে না কোন অবস্থাতেই। জমিতে লাগাবার কাজে গাছ বেছে নেবেন যেগুলি আরও বেশি কষ্টসহিষ্ণু। এপিফাইলামের চাষ প্রধানত এর সুন্দর ফুলের জন্য। এর গাছে কুঁড়ি এলে কাঁচা গোবরের তরলসার দেবেন দিন দশেক অন্তর। ক্যাকটাসের বংশবৃদ্ধি কাটিং, গাছেতে হয়েছে এরকম চারাগাছ ( অফসেট ), বীজ ও জোড়কলমের সাহায্যে। এর ভেতরে শেষের দুটি সবার পক্ষে করা কঠিন। কাটিং ও চারা ক্যাকটাস হালকা ছায়ায় শুকনো লালবালিতে লাগাবেন এবং এতে জল দেবেন না। কাটিং বসাবার আগে তা ছায়ায় শুকিয়ে নেবেন দিনদশেক।

ক্যাকটাসের প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর, তাই রুচি অনুযায়ী বেছে নেবার সুযোগও প্রচুর। বিভিন্ন প্রদর্শনী বা গ্রাফের বই 'এক্সোটিকা থ্রি' গাছ বাছাই করার কাজে খুব সাহায্য করবে। প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর হওয়াতে স্বাভাবিক কারণে এদের প্রকৃতি ও পরিচর্যাও ভিন্ন। এ অবস্থায় ক্যাকটাস সম্পর্কে সাধারণভাবে ছাড়া কিছু বলা কঠিন। সবদিকে চোখ রেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপরে সার্থক ক্যাকটাস করা নির্ভর করবে। তবে একবার করতে আরম্ভ করলে দেখা যাবে ক্যাকটাসের চাষ খুব কিছু কঠিন নয়।

**সাকুলেণ্ট ॥**

সাকুলেণ্টের পরিচর্যার সঙ্গে ক্যাকটাসের পরিচর্যার খুব মিল রয়েছে এবং ক্যাকটাসের মত এদের সংখ্যাও বিরাট। সংখ্যায় অনেক এবং প্রকৃতি আলাদা বলে এদের বিভিন্ন গাছের পরিচর্যার বেলায় স্বাভাবিক কারণেই তফাত রয়েছে। তবুও খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে একভাগ করে পাতাপচাসার, গোবরসার, সাধারণ মাটি ও দুভাগ বালি মিশিয়ে তৈরী করা সারমাটি বিভিন্ন সাকুলেণ্টের বেলায় বেশ ভাল কাজ দেবে। ক্যাকটাসের মত এদের বেলায়ও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গাছে প্রয়োজনের চেয়ে জল বেশি না হয়। কষ্টসহিষ্ণু গাছগুলির বেলায় এতে খুব ক্ষতি না হলেও জল পরিমিত না হলে সুখী গাছগুলি খুব বেশি রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে গাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে তাদের প্রয়োজনমত একটু বড় টবে পালটে দিতে হবে। এদের অন্যান্য পরিচর্যা হবে মূলত ক্যাকটাসের পরিচর্যার মত।

## লন

সুন্দর সবুজ লন দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। ফুলবাগানের সৌন্দর্য বাড়াতে লনের একরকম তুলনা নেই। বাড়ীর সামনে একটু ছোট লন থাকলে তা সমস্ত বাড়ীর চেহারা পালটে দেবে। যে ধরনের সৌন্দর্য লন সৃষ্টি করবে তা অন্য কোন কিছু দিয়েই সম্ভব নয়। সমতল বাংলায় লন করা অপেক্ষাকৃত সহজ যদিও জংলী ঘাসের উৎপাত রয়েছে খুবই। লন যাতে সহজে ভাল রাখা যায় সেজন্য প্রথম থেকেই যত্ন করে এটিকে তৈরী করতে হবে। লন তৈরীর কাজ ভাল করে না হলে পরে চেষ্টা করেও লন ভাল করা যাবে না।

**জমি তৈয়ার ॥**

সারাদিন রোদ পড়ে এবং জল দাঁড়ায় না এ রকম জমিখণ্ড লনের জন্য বেছে নেবেন। লনের জন্য জমি কোপাতে হবে এক হাঁটু গভীর করে। কাশ বা উলুখড় হয়ে রয়েছে এ রকম জমি কোপাতে হবে আরও গভীর করে। প্রথমে যে কোন এক দিকের সীমানার

হাত দেড়েক চওড়া জমির মাটি একহাত গভীর করে তুলে লনের বিপরীত সীমানার ঠিক বাইরে নিয়ে রাখুন। এরপরে সংলগ্ন জমির মাটি কেটে যে খাদ তৈরী হয়েছে তাতে ফেলুন এবং এইভাবে অপর সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান। খাদে মাটি ফেলা হবে এভাবে যাতে উপরের ঘাসের চাবড়া-সহ-মাটি প্রথমে এবং খাদের দিকে মুখ করে পড়ে এবং এর উপরে পড়ে নিচের মাটি। এ ব্যাপারে অন্যরকম কিছু যাতে না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকবেন। সীমানার পাশে রাখা মাটিও একই ভাবে সীমানা সংলগ্ন খাদে ফেলবেন। এরপরে উপরের বিশ সেণ্টিমিটার মাটি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুঁড়ো করবেন। এ মাটিতে ঘাস বা শেকড় না থাকায় মাটি বাছার দরকার নেই।

উপরের নিয়মে না করে সাধারণ ভাবে কোদাল দিয়ে মাটি গভীর করে কুপিয়ে ও গুঁড়ো করে তা ঘাস জন্মাবার জন্য তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু এতে একটা মস্ত বড় অসুবিধা থেকে যাচ্ছে। জংলী ঘাসের বীজ বাছা সম্ভব নয় বলে তা উপযুক্ত সময়ে প্রচুর জংলী ঘাসের জন্ম দেবে। জংলী ঘাসের উপদ্রব তো এমনিতেই রয়েছে কিন্তু এতে তা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। তাই এ ভাবে করার চেয়ে আগের নিয়মে জমি তৈয়ার করা বেশি ভাল। যে কোন নিয়মে করুন না কেন, জমি তৈরীর কাজ গ্রীষ্মের প্রথম থেকে বৈশাখের ভেতরে করবেন।

**জমি সমান করা ॥**

লনের জমি এ রকম ভাবে সমান করবেন যাতে লনে কখনই জল না দাঁড়ায়। ছোট লন চারপাশের জমি থেকে একটু উঁচু হওয়া ভাল। বড় লন এভাবে করবেন যাতে মাঝখানটা উঁচু হয় এবং এর সংলগ্ন জমি আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে জল নিকেশের ড্রেনেতে মেশে। ছোট লনের বেলায় লনের পাশে ড্রেন না করলেও চলবে, কিন্তু বড় লনের বেলায় এটি করা অবশ্যই দরকার। তাছাড়া বর্ষাকালে ড্রেন থেকে জল যেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় এ দিকেও লক্ষ্য রাখবেন। যে সব জায়গায় জলের অভাব, সেখানে লন বরঞ্চ পাশাপাশি জমির থেকে একটু নিচু করে করবেন।

লনের জমি মোটামুটি সমান করার পরে এর পাশগুলি ইঞ্চি আটেক উঁচু করে বেঁধে দিয়ে তাতে বেশ করে জল দেবেন। জল দেবার ঘণ্টাখানেক পরে কোন্ কোন্ জায়গায় জল দাঁড়িয়ে আছে দেখবেন ও সে জায়গাগুলিতে চিহ্ন দিয়ে দেবেন। এবং পরে তা গুঁড়ো মাটি দিয়ে অন্যান্য জায়গার সমান করে দেবেন। এরকম ভাবে অন্তত দুবার দিন কয়েক বাদে জলের সাহায্যে জমি সমান করা দরকার। এতে মাটি যা বসার বসে যাবে এবং জমিও মোটামুটি সমান হবে। যাঁরা খুব ভালভাবে জমি সমান করতে চান, তাঁরা শ্রীমতী এগনিস হারলার ( দি গার্ডেন ইন দি প্লেনস ) বর্ণিত নিয়মে জমি সমান করবেন। জমি সমান করার বিষয়ে একথা সব সময়ে মনে রাখবেন যে জমিতে জল জমলে দূর্বাঘাস ভাল জন্মায় না এবং এর বিভিন্ন অসুখও দেখা দেয়। তাই জমি সমান করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জল যাতে সহজেই বেরিয়ে যায় তার উপযুক্ত ড্রেনের ব্যবস্থাও করতে হবে। দূর্বাঘাস জন্মাবার পরেও কোন কোন জায়গা নিচু থেকে গেলে তা গুঁড়ো মাটি দিয়ে কয়েক বারে সমান করে দেবেন। নিচু জায়গায় কয়েক দিন অন্তর তিন সেণ্টিমিটার করে পুরু গুঁড়োমাটি ছড়িয়ে দেবেন, এতে ঘাসেরও কোন ক্ষতি হবে না অথচ জমিও সমান হবে। ঘাস লাগাবার আগে লনের জমিতে কয়েক দিন অন্তর হালকা রোলার দেবেন।

**ঘাস জন্মানো ॥**

সমতল বাংলায় দূর্বাঘাসের লন দেখতে সবচেয়ে ভাল এবং করাও চলে সবচেয়ে সহজে। দূর্বা লাগানো চলে কয়েক ভাবে। এদের ভেতরে দূর্বা কেটে লাগানো ও দূর্বা বীজ বোনা বিশেষ প্রচলিত। আবার এ দুটির ভেতরে প্রথমটি বেশি সুবিধের। কেটে লাগাবার জন্য কাছাকাছি গাঁট রয়েছে এবং একটু পুরানো এ রকম দূর্বাঘাস বেছে নেবেন। অনেকে ময়দানের পাশের ট্রামলাইনের থেকে দূর্বাঘাস যোগাড় করেন। তিনচারটি ইঞ্চি

তিনেক লম্বা দূর্বার কাটিং-এর গোছা লনে ইঞ্চি তিনেক দূরে দূরে বসাবেন। কাটিং-এর গোছা বসাবেন একটু গভীর করে। দূর্বার কাটিং লাগাবেন মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হলে। কোন কারণে পর পর কয়েকদিন বৃষ্টি না হলে নতুন লাগানো ঘাস মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দিতে হবে। দূর্বা ভালভাবে লেগে গেলে কিছুদিন অন্তর হালকা রোলার ব্যবহার করবেন। ঘাস ছাঁটার মত বড় হলে প্রথম বার দুই ঘাস ছাঁটবেন ঘাস ছাঁটার কাঁচি দিয়ে। এর পর থেকে লনমোয়ার ব্যবহার করতে পারেন।

দূর্বার বীজ বুনে লন করার জন্যও প্রথমে একই ভাবে জমি তৈয়ার করবেন। এছাড়া জমির উপরে ইঞ্চিখানেক পরিমাণ সারমাটি ছড়িয়ে দেবেন। এই সারমাটি তৈরী করবেন অর্ধেক পাতাপচাসার ও অর্ধেক মিহি গুঁড়ো মাটি মিশিয়ে। দূর্বাঘাসের বীজ যাতে সমান ভাবে পড়ে সেজন্য জমিতে প্রয়োজন মত মাপ দিয়ে নেবেন। এক কিলো দূর্বা বীজে চারশো স্কোয়ার মিটার লনের জন্য দরকার পড়বে। দূর্বাবীজ সমান পরিমাণ সাদা বালি বা গুঁড়ো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বিশেষ হাওয়া নেই এরকম দিনে লনের জমিতে ছড়িয়ে দেবেন। ছড়াবার পরে জমিতে জল দেবেন যেভাবে ঝারি দিয়ে বীজতলায় জল দেন সেভাবে। জমি শুকিয়ে এলে হালকা রোলার ব্যবহার করে জমির উপরটা একটু আঁট-সাঁট করে দেওয়া দরকার। এরপর থেকে ঝারি দিয়ে নিয়মিত জল দেবেন যাতে লনের জমি সবসময়ে ভেজা ভেজা থাকে। বীজ বেরুবে তিন থেকে পাঁচ সপ্তাহের ভেতরে। কোন কোন জায়গায় বীজ ঠিকমত না বেরুলে সেখানকার উপরের মাটি রেক দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে আবার বীজ ফেলবেন। ঘাস একটু বড় হলে মাঝে মাঝে হালকা রোলার দেবেন এবং ঘাস ছাঁটার মত হলে প্রথম বার দুই ঘাস-ছাঁটা কাঁচি দিয়ে ঘাস ছেঁটে দেবেন। বীজ বোনার কাজ গ্রীষ্মকালের প্রথম থেকে বৈশাখের ভেতরে করবেন। বীজ দিয়ে ঘাস জন্মাবার প্রধান অসুবিধে দুটি, ঘাসের বীজের সঙ্গে জংলী ঘাসের বীজ এসে যায় সহজেই এবং বীজ থেকে সহজে সমান ভাবে ঘাস জন্মাতে চায় না।

**ঘাস ছাঁটা ও রোলিং ॥**

গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকালে লনমোয়ারের ( ঘাস ছাঁটার যন্ত্র ) ছুরি জমি থেকে তিন সেণ্টিমিটার উপরে রেখে ঘাস ছাঁটবেন। এবং শীতকালে ছুরি জমির যত কাছাকাছি নাবানো সম্ভব নাবাবেন। সাধারণ ভাবে সপ্তাহে একবার এবং সম্ভব হলে শীতকালে সপ্তাহে দুবার ঘাস ছাঁটবেন। রোলার ব্যবহার করবেন মাঝে মাঝে। তবে লনের ভেজা অবস্থায় রোলার ব্যবহার করা চলবে না। অনেকে সপ্তাহে একবার বা দুবার রোলার ব্যবহারের পক্ষপাতী কিন্তু মাসে দু'তিনবার রোলার ব্যবহার করাই অপেক্ষাকৃত ভাল।

**সার দেওয়া ॥**

বর্ষার শেষে লন রেক করে আধ ইঞ্চিটাক পুরু সারমাটি লনে বিছিয়ে দেবেন ; সম্ভব হলে ঠিক বর্ষার আগেও একইভাবে সারমাটি দেবেন। এই সারমাটি তৈরী করবেন সমান পরিমাণের পাতাপচাসার, হাড়ের গুঁড়ো ও মিহি গুঁড়ো সাধারণ মাটি মিশিয়ে। প্রথম বছরের লনে একই সারমাটি দিতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে লনে রেক করবেন না। রেক দিয়ে পুরানো লন ভাল করে ছড়ে দিতে হবে, এই ছড়ে দেওয়াতে লনের ঘাস আরও ভাল হয়ে উঠবে। আবার অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত দু গ্যালন জলে এক থেকে দেড় আউন্স এমোনিয়াম সালফেট গুলে মাসে একবার করে লনে দেবেন। সার ছিটিয়ে তারপরে জল দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সার জলে গুলে দেওয়া বেশি ভাল। যদিও একঝারি জল কতটা জমিতে দেওয়া যাবে তা আন্দাজ করে নিতে হবে। এই তরলসার দেবার সময় লন ভেজাভেজা থাকবে এবং তরলসার দেবার পরে লনে আবার জল দেবেন। এমোনিয়াম সালফেটের পরিবর্তে ইউরিয়া দিয়েও তরলসার করতে পারেন। এতে লনের সবুজ রং অনেকটা কচি কলাপাতার রঙের মত হবে। বাজারে লনের ব্যবহারের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী সারও পাওয়া যায়, এ সার নির্দেশানুযায়ী ব্যবহার করবেন।

**জল দেওয়া ॥**

লনে জল এমন ভাবে দেবেন যাতে দিন সাতেক অন্তর জল দিতে হয়। তাই শীতকালে জলের পরিমাণ গ্রীষ্মকালের চেয়ে কম হবে। অল্প করে জল দেওয়া এবং বেশ ভিজিয়ে জল দেওয়া এ দুটি মতই প্রচলিত। কিন্তু অল্প করে জল দিলে তা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে এবং ঘাসের বিশেষ উপকারে আসবে না। আবার বেশি করে জল দিলে বেশি জংলী ঘাস জন্মাবার সম্ভাবনা। তাই এর মাঝামাঝি একটা রফা করে নিতে হবে। লনের ঘাসের জন্য সব সময়ে স্বাদু জল ব্যবহার করবেন। জল দেবার কাজে স্প্রিঙ্কলার ব্যবহার করলে জল দেবার পরিশ্রম বাঁচবে।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

শীতকালের সকালে লনের ঘাসের উপরে হিমের জল জমে রয়েছে দেখতে পাবেন। বাঁশের বাখারির সাহায্যে হিমের জল ঘাসের উপর থেকে ঘাসের গোড়ায় ফেলার ব্যবস্থা করবেন। এ জল গোড়ায় পড়লে ঘাসের উপকারে লাগবে। এ কাজ করতে হবে ভোরবেলায়। বর্ষাকালে কেঁচো ছোট ছোট ঢিবি করে মাটি তোলে। এগুলিও ভোরবেলায় বাখারির সাহায্যে গুঁড়ো করে দেবেন। দিন বাড়লে এ ঢিবি শক্ত হয়ে যাবে, তখন এগুলি ভাঙা সহজ হবে না। কেঁচো মেরে ফেললে ঢিবি হবে না ঠিকই, কিন্তু লনের স্বার্থেই কেঁচো থাকা ভাল।

দুর্বা ছাড়া অন্য যে কোন ঘাসই দুর্বাঘাসের লনে জংলী ঘাস। জংলীঘাস মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে শেকড়শুদ্ধ তুলে ফেলবেন। যতই জংলী ঘাস তুলে ফেলা হোক না কেন, এদের নির্মূল করা সম্ভব নয়, তাহলেও জংলীঘাস বেশি হলেই বেছে দিতে হবে। নিয়মিত ভাবে সার দিলে জংলীঘাস দুর্বার নিচে চাপা পড়ে যাবে, তাই সার দেবার বিষয়ে যত্নবান হবেন। এছাড়া জল নিকেশের ভাল বন্দোবস্ত না থাকলে লনের বিভিন্ন অসুখ হতে পারে। তাই জল যাতে লনে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে খুবই সাবধান হতে হবে। পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জল লনের মস জন্মানো অসুখ সারাতে ও কেঁচোকে মাটির উপরে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে। প্রথমটির জন্য এক আউন্স ও কেঁচো মারতে চাইলে দ্বিতীয়টির জন্য আধ আউন্স জলে মিশিয়ে ব্যবহার করবেন। কেঁচো উপরে এলে তাকে তুলে ফেলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে লনে রিং-এর মত গোল হয়ে ঘাস শুকিয়ে যায়। এ ধরনের রোগ বা ফেয়ারি-রিং হলে তাতে এক আউন্স কপার সালফেট এক গ্যালন জলে মিশিয়ে ব্যবহার করবেন। এছাড়া বাজারে লনের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ওষুধ পাওয়া যায়। সেগুলিও ব্যবহার করে দেখতে পারেন। কিন্তু যেসব উইডিসাইড বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায় বলে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়নি। লনে খুব বেশি জংলীঘাস জন্মালে নতুন করে লন করা ছাড়া উপায় নেই।

**লনে ফুলগাছ ॥**

বড় লনে কোন ফুলগাছ না থাকলে লন দেখতে তত সুন্দর দেখাবে না। ছোট লনেও দুয়েকটি ছোট ফুলগাছ থাকলে তা দেখতে আরও ভাল দেখাবে। লনের সবুজ রঙের সঙ্গে হলদে রঙ বেশ ভাল মানায়, যদিও অন্য অনেক গাছও লনে বেশ মানানসই। অনেকে লনে মরসুমী ফুলের কেয়ারি করেন, কিন্তু এগুলি লনে মানায় কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বড় লনের জন্য এরকম ফুলগাছ বেছে নেবেন যা ফুল দেয় গাছ ভরে, ডালপালা বেশ ছড়ানো কিন্তু সুসংবদ্ধ এবং গাছের পাতা খুব বেশি ঝরে না। তাছাড়া গাছ উচ্চতায় যেন খুব বড় না হয়। একাজে টেকোমা গার্ডীচাউডি, ট্যাবিবুইয়া স্পেক্টাবিলিস, কারিজিয়া স্পেসিওসা, গুটিকলমের জারুল রোজিয়া, ফুরুস এলবা এবং গুটিকলমের কেশিয়া ল্যাঙ্কাটেরী বেশ উপযুক্ত। ছোট লনের জন্য রঙ্গন সিঙ্গাপোরেনসিস ও সিঙ্গেল জবার ভেতরে লক্ষ্মী, সানসেট ও মাই বিউটি বেশ ভাল। বড় লনে তিন-চারটি এবং ছোট লনে দুয়েকটির বেশি গাছ লাগাবেন না।

# পাতাবাহার

পাতাবাহারের বিভিন্ন রঙ মেশানো সুন্দর পাতাগুলি সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ রোদ পায় না এরকম বারান্দা বা প্রয়োজনমত ঘরের ভেতর সাজাবার কাজে পাতাবাহারের বহুল ব্যবহার। বর্ষাকালে পাতাবাহারের সৌন্দর্য সবচেয়ে খোলে, এবং এ সময়ে সাজাবার কাজে এরা অপরিহার্য। বাগানেও দিনের বেশি ভাগ সময় ছায়া পড়ে এরকম কিছু জায়গা থাকবেই। এ সব জায়গা সুন্দর করে সাজাতেও পাতাবাহারের কোন জুড়ি নেই। পাতাবাহারের বিভিন্ন রঙবেরঙের প্রচুর প্রজাতি থাকায় সবারই তাঁর নিজের পছন্দমাফিক প্রজাতি বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে। যে কোন বাহারি পাতার গাছকেই বোধ হয় পাতাবাহার বলা চলে, কিন্তু পাতাবাহার বলতে আমরা একমাত্র ইংলিশ নামধেয় ক্রেটেন-কেই বুঝি।

সাজাবার কাজে সমাদর টবে তৈরী করা সৌন্দর্যে ঝলমল করছে এরকম পাতাবাহার। পাতাবাহার যদি বেশ ঝোপালো হয়, এদের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত একরকম সব পাতাই যদি অটুট থাকে এবং গাছের পাতা যদি প্রিয়দর্শন হয় তাহলেই তাদের সমাদর। নইলে গোড়ায় যথেষ্ট পাতা নেই শুধু মাথাটি পাতায় ভর্তি, এরকম খ্যাংরা কাঠি আলুর দম পাতাবাহারের সৌন্দর্যের বিচারে মূল্য খুবই কম। যদিও এই নিচু মানের পাতাবাহারই খুব বেশি দেখা যায়। সঠিক সারমাটি ও সঠিক পরিচর্যার উপরে পাতাবাহারের সৌন্দর্য কিরকম খুলবে তা নির্ভর করে। বয়স হলে গাছের পাতা ঝরবেই, এ সম্পর্কে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু গাছের গোড়ায় জল বসতে দিলে বা ঠিকমত সময় জল দেওয়া না হলে গাছের মূল্যবান পাতাগুলির অকালে ঝরে পড়া ছাড়া গতি নেই। পাতাবাহারের চাষ অত্যন্ত সহজ হলেও এদের পরিচর্যার বেলায় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টবে পাতাবাহার খুব মানানসই হলেও এর ডাল বা পাতা ফুলদানিতে খুব মানায় না। এবং ছোট ধরনের পাতা, বাড়ে তাড়াতাড়ি ও প্রচুর রোদ সহ্য করতে পারে এরকম পাতাবাহার দিয়ে খুব সুন্দর হেজ্ তৈরী করতে পারেন।

**সারমাটি ও বাড়তি সার ॥**

পাতাবাহারের সারমাটি দুটি প্রধান উপায়ে তৈরী করা যেতে পারে। প্রথম উপায়ে প্রথমে মেশাতে হবে সমান পরিমাণে গত বছরের ব্যবহার করা চন্দ্রমল্লিকার সারমাটি ও কম্পোষ্ট সার। এবং বিকল্প উপায়ে প্রথম মেশাতে হবে তিনভাগ সাধারণ মাটি, দুভাগ গোবরসার, দুভাগ পাতাপচাসার ও একভাগ সাদা বালি। এই দুটি উপায়ে তৈরী করা চব্বিশ সেণ্টিমিটার বা ন'ইঞ্চি টব পরিমাণ মাটিতে আরও মেশাবেন দশ সেণ্টিমিটার বা চারইঞ্চি টবের একটব দালানভাঙ্গা রাবিশ ও একটব হাড়ের গুঁড়ো। রাবিশ না পেলে তার বিকল্প হিসাবে দুচামচ কলিচুন।

বর্ষার প্রথম দিকে টবের গাছের গোড়ার মাটি সাত সেণ্টিমিটার বা ইঞ্চি তিনেক গভীর করে সাবধানে তুলে সে জায়গা নতুন তৈরী সারমাটি দিয়ে ভরে দেবেন। জল দেবার জন্য মাটি বেশি ধুয়ে গেলে বাড়তি সারমাটি বছরের যে কোন সময় দিতে হতে পারে। বর্ষার প্রথম দিকে একবার এবং মাস দুয়েক পরে আর একবার একচামচ কলিচুন টবের মাটি সাধারণভাবে খুঁচে তাতে ছড়িয়ে দেবেন। পাতাবাহারের সৌন্দর্য যথাসম্ভব বাড়াতে চাইলে গাছ লাগাবার মাসদেড়েক পর থেকে কাঁচাগোবরের তরলসার সপ্তাহে একবার করে দেবেন। তবে শীতকালে এ সার দেবেন না। পাতাবাহারে কোন রাসায়নিক সার দেবার দরকার দেখি না, এবং গাছের পাতার সারও এর বেলায় ভাল কাজ করবে বলে মনে হয় না।

**অন্যান্য পরিচর্যা ॥**

পাতাবাহার হালকা ছায়া ভালবাসলেও গাছ কিছুটা রোদ না পেলে পাতার রঙ খুলবে না। তাই টবের গাছকে সকাল ন'টা পর্যন্ত রোদ খাওয়ানো দরকার। ঘরের ভেতরে সাজাবার কাজে লাগাচ্ছেন এরকম পাতাবাহারও রাতে খোলা জায়গায় বার করে দিয়ে সকাল ন'টা পর্যন্ত রোদ খাওয়াবেন। কোন গাছই কিন্তু বেশিদিন ধরে ঘরের ভেতরে রাখা উচিত নয়। টবের পাতাবাহার লাগাবেন ন'ইঞ্চি টবে বা আরও বড় টবে। গাছে জল এমনভাবে দেবেন যাতে টবের মাটি সবসময়েই ভেজাভেজা থাকে কিন্তু গোড়ায় যেন কিছুতেই জল না দাঁড়িয়ে যায়। পাতাবাহার যথাসাধ্য ভাল করতে চাইলে জল দিয়ে গাছের পাতা স্প্রেয়ার বা পিচকারির সাহায্যে ভাল করে সপ্তাহে তিনচার দিন ধুয়ে দেবেন। পাতার উপর নিচ দুদিকই ধুয়ে দেবেন এবং এই ধুয়ে দেবার কাজ সন্ধ্যার দিকে করবেন। পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে প্রয়োজনমত রোগর বা বিকল্প কোন ওষুধ স্প্রে করা দরকার। টবের মাটি মাঝে মাঝে খুঁচে দেবেন। টবের পাতাবাহার ঝোপালো করতে গাছট কুড়ি সেণ্টিমিটার বড় হলে তার মাথা খুঁটে ভেঙে দেওয়া যেতে পারে।

জমির পাতাবাহারের জন্য এমন জায়গা বেছে নেবেন যেখানে একরকম সারাদিনই হালকা ছায়া থাকে এবং যেখানে জল দাঁড়ায় না। তবে বড়গাছের একেবারে নিচে পাতাবাহার লাগানো উচিত নয়। জমির গাছ কখনই টবের গাছের মত ভাল দেখাবে না, তবু এদেরও একটা আলাদা শোভা রয়েছে। সরু পাতার বা খুব ছোট পাতার পাতাবাহারের অনেক প্রজাতি রোদ মোটামুটি ভালই সহ্য করতে পারে। এদেরকে রোদ বেশি পায় এরকম জায়গায়ও লাগানো চলবে। জমির গাছে প্রত্যেক বর্ষায় কলম করা ভাল। এতে টবে লাগাবার উপযুক্ত গাছ পাওয়া যাবে এবং মূলগাছও খুব ঢেঙা হবে না। এছাড়া কলম করলে পাতাবাহারের বীজ পাবার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। জমির পাতাবাহারের অন্যান্য পরিচর্যা প্রধানত 'বাছাই ছোট ফুলগাছ'-এর মত হবে। পাতাবাহারের গুটিকলম করতে হবে একেবারে বর্ষার প্রথমে। কলমে ভাল শেকড় আসার পরে তা কেটে পাঁচইঞ্চি টবে লাগিয়ে দিতে হবে। এই অবস্থায় দিন পনেরো থাকার পরে তা বড়টবে পালটে লাগানো চলবে। কলম কেটে সরাসরি বড় টবে বা জমিতে লাগাবেন না, লাগালে নিচের পাতা সহজেই ঝরে পড়বে।

**গাছ পাল্টানো ইত্যাদি ॥**

পাতাবাহার বড় টবে লাগাবার সময় ধরে বছর দুই বেশ সুন্দর থাকে। এর পরে স্বাভাবিক কারণে গাছের গোড়ার বেশ একটা বড় অংশ নিস্পত্র হয়ে পড়ে। দুটি ভিন্ন উপায়ে এই সময়ে পাতাবাহারের পরিচর্যা করা চলে। প্রথমটি প্রচলিত পদ্ধতি ও দ্বিতীয়টি আমাদের বহুল পরীক্ষিত পদ্ধতি। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে, গাছ যাতে নতুন করে ডালপালা ছাড়ে সেজন্য গাছের ছ'ইঞ্চি গোড়া রেখে গাছের সব ডাল কেটে ফেলতে হবে। কেটে ফেলার দিন সাতেক পরে গাছের গোড়ার বেশ কিছুটা মাটি সাবধানে তুলে ফেলে সেখানে নতুন তৈরী সারমাটি দেবেন। গাছ ছাঁটার ও নতুন সারমাটি দেবার ফলে নতুন ডালপালা ছাড়বে এবং এই টবের পাতাবাহারটি সাজাবার কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠবে মাস ছয়েকের ভেতরে।

কিন্তু এই প্রচলিত পদ্ধতির কতগুলি বিশেষ অসুবিধার দিক রয়েছে। গাছ গোড়া থেকে ছেঁটে ফেলার পরে আবার সুন্দর হয়ে উঠতে গাছ মাস ছয়েক সময় নেবে, এ ছ'মাস এ গাছ একরকম কোন কাজেই আসবে না। দ্বিতীয়ত, টবেতে শুধু উপর থেকে কিছু নতুন তৈরী সারমাটি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু টবের নিচের দিকের পুরানো সারমাটি পালটানো মোটেই সহজ নয়। অথচ এই পুরানো মাটিতে গাছের শেকড় চাপ বেঁধে থাকছে। তাই এই অবস্থায় আর তত ভাল পাতাবাহার জন্মানো বেশ কঠিন। তৃতীয়ত, কাটা ডালগুলি কাটিং করে নতুন গাছ করা সহজ নয় কারণ সুখী পাতাবাহার

গাছের কাটিং-এ ভাল শেকড় আসতে চায় না। কাটিং লাগিয়ে নতুন গাছ করলেও সেটি বেশ কিছুদিনের ভেতরে টবে লাগানো সম্ভব নয়, কারণ এই নতুন গাছের নিচের দিকে পাতা একরকম থাকছেই না।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসরণ করলে প্রচলিত পদ্ধতির অনেকগুলি অসুবিধা এড়ানো যেতে পারে সহজেই। টবের পাতাবাহারের নিচের বেশ কিছু পাতা ঝরে গিয়ে থাকলে বর্ষার প্রথমে গাছের পাতার ঠিক নিচে পলিথিন পেপার দিয়ে গুটিকলম বাঁধবেন। গুটিকলমটি বাঁধবেন এমন ভাবে যাতে এটি সহজে চোখে না পড়ে। সব কয়টি বড় ডালেই কলম বাঁধবেন। সব পাতাবাহারের আগার পাতার আয়তন বড় ও রঙ উজ্জ্বলতর। টবের পাতাবাহারও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই আগার ডাল কলম করে তা আবার টবে লাগালে ভাল পাতাবাহার তৈরীর কাজ সহজ হবে। সব কলম একসঙ্গেই কেটে নেওয়া সম্ভব হবে, এবং কেটে নেবার পরে টবের নেড়া গাছটিকে নির্বাসন দেবেন জমিতে। সেখানে এটি যথাসময়ে নতুন ডালপালা ছাড়বে। শেকড় আসা কলমটিকে প্রথমে পাঁচইঞ্চি টবে দিন পনেরো রেখে সেটিকে সহজেই লাগিয়ে দিতে পারেন পুরানো বড় টবটিতে। এবং এই টবে নতুন তৈরী সারমাটি ব্যবহার করবেন অবশ্যই। এভাবে অনেকগুলি ভাল নতুন গাছ পাওয়া সম্ভব হবে এবং পাতাবাহারটি তার সমগ্র টব-জীবন ধরে সুন্দর থাকছে।

**পাতাবাহারের সংকর প্রজাতি ॥**

বাঙ্গালোরে পাতাবাহারের নতুন নতুন এবং আরও উন্নত প্রজাতির সৃষ্টি হচ্ছে। সমতল বাংলায়ও পাতাবাহারের নতুন উন্নত প্রজাতি সৃষ্টি করা খুবই সম্ভব। বর্ষার প্রথমে জমির গাছে গুটিকলম বাঁধার পরে কলমের ডালগুলিতে সহজেই ফুল আসতে দেখা যায়। পুরুষ-ফুল ও স্ত্রী-ফুল সাধারণত আলাদা ছড়াতে ফোটে। পুরুষ-ফুলগুলি দেখতে ক্ষুদ্রাকৃতি কদম্ব ফুলের মত। এগুলির পরাগ ছড়াবার মত হলে তুলির সাহায্যে বা ছড়াটির সাহায্যে পরাগ সংমিশ্রণের কাজ করবেন। বীজ পেকে গেলে তা ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যাতে এটা না হয় সেজন্য বীজ পাকার আগে লম্বা পলিথিনের ঠোঙার ভেতরে বীজের ছড়াটি খুব সাবধানে ঢুকিয়ে ঠোঙাটির মুখ বেঁধে দিতে হবে। ব্যবহারের আগে ঠোঙাটিতে পিন দিয়ে বহু ফুটো করে দিতে হবে যাতে এর ভেতরে হাওয়া চলাচল করে। বীজ তোলার আগে কলমটি গাছ থেকে কাটবেন না। বীজ তুলে দিন দুয়েক শুকিয়েই বীজতলায় চারাবেন। যেগুলি ভাল হতে পারে বলে মনে হবে সে চারাগাছগুলি ইঞ্চি ছয়েক বড় হলে প্রথমে তুলে পাঁচইঞ্চি টবে লাগাবেন। এতে মাস কয়েক থাকার পরে সেগুলি বড়টবে লাগাতে হবে। বাকি চারাগাছগুলি ছ'ইঞ্চি অবস্থাতেই তুলে ফেলে দিতে পারেন। পাঁচইঞ্চি টব ও বড় টবে ব্যবহার করতে হবে পাতাবাহারের জন্য নির্দিষ্ট সারমাটি। শেষ পর্যন্ত যে গাছগুলি উৎকর্ষের বিচারে সত্যই ভাল, গুটিকলমের সাহায্যে তাদের বংশবিস্তার ঘটানো হবে। একটি চারাগাছ কিরকম ভাল হবে তা বুঝতে বছর তিনেক সময় লাগবে।

# বাছাই বাহারি পাতার গাছ

ফুলবাগানে ফুলগাছ ছাড়াও বাহারি পাতার গাছেরও খুব সমাদর। ফুলগাছের শোভা আমাদের মুগ্ধ করে তার ফুল ফুটে থাকা অবস্থায় কিন্তু বাহারি পাতার গাছের শোভা উপভোগ করা চলে সারা বছর ধরেই, যদিও একথা ঠিকই যে বাহারি পাতার শোভাও বছরের কোন কোন সময়ে আরও বাড়ে। বাহারি পাতার গাছ প্রধানত তাদের

আয়তনের বিচারে লাগাতে হবে, বিভিন্ন ফুলগাছের মাঝে মাঝে এদের দুয়েকটি লাগালে সে জায়গার সৌন্দর্য এরা আরও বাড়িয়ে তুলবে। বাহারি পাতার গাছের ভেতরে পাতাবাহার বা ক্রোটন খুবই সমাদৃত। এদের সম্পর্কে 'পাতাবাহার' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য বাহারি পাতার গাছের ভেতরে একটি বড় সংখ্যার গাছ রয়েছে প্রকৃতির খেয়ালে যাদের পাতা মূলগাছ থেকে অন্য রকমের হয়ে গেছে। এই সব গাছ বোঝাতে ভেরীগেটা কথাটি সাধারণত মূলগাছের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। ভেরীগেটা গাছগুলির পরিচর্যা প্রধানত এদের মূলগাছের মতই হবে। এই সব ভেরীগেটা গাছের অনেকগুলিরই মূল-গাছের মত ভাল ফুল ফোটে এবং এতে সমস্ত গাছটি খুবই সুন্দর দেখায়। ভেরীগেটা গাছগুলি অনেক সময়ে মূলগাছের প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চেষ্টা করে, এ কথা মনে রেখে এই গাছে মূলগাছের মত সাধারণ পাতার ডাল হতে দেখলেই তা সাবধানে ছেঁটে ফেলতে হবে। এই রচনার ফিকাস রিপেনস ছাড়া অন সবগুলিকে টবে চাষ করে বারান্দা সাজাবার গাছ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। বড় গাছগুলির বেলায় তাদের যতদিন সম্ভব টবে চাষ করে বারান্দা সাজাবার কাজে লাগিয়ে তারপরে জমিতে লাগিয়ে দেওয়া হবে। এদের অনেকগুলির পরিচর্যার কথা 'বারান্দা সাজাবার গাছ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে বলে এখানে আবার আলোচনা করা হয়নি। এছাড়া যেগুলি যে আয়তনের গাছ তাদের পরিচর্যা মূলত সেই সব আয়তনের গাছের মত হবে। তাই কোন গাছের পরিচর্যার বিশেষ কোন দিক থাকলে শুধু তাই গাছের পরিচয়ের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

**ইরান্থিমাম ॥**

ইরান্থিমামের অনেকগুলি প্রজাতির পাতা বেশ দেখতে সুন্দর। এদের ফুলও ফোটে। এবং কতগুলি ইরান্থিমাম প্রজাতির চাষ হয় বিশেষ করে তাদের ফুলের জন্য। এদের ছায়া বা হালকা ছায়াতে করতে হবে। ইরান্থিমামের বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে।

**একালিফা ॥**

একালিফার রঙবেরঙের বড় বড় পাতার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। গাছ খুবই কষ্টসহিষ্ণু, এটি রোদ বা হালকা ছায়া পছন্দ করে। একালিফার বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে।

**এক্সকোকারিয়া ॥**

এক্সাকোকারিয়ার পাতার নিচের দিকের রঙ লাল, তাই সবুজ ও লাল পাতা সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গাছ হালকা ছায়া জায়গায় জন্মায় ভাল এবং গুটিকলমের সাহায্যে এর বংশবৃদ্ধি।

**এরালিয়া ও প্যানাক্স ॥**

এরালিয়া ও প্যানাক্স গাছ দুটি সাধারণজনের কাছে একই গাছ হয়ে পড়েছে। এ দুটি গাছ দেখতে প্রায় একরকমের এবং এদের পাতা প্রধানত সাদা ও সবুজ। কোন কোন প্রজাতিতে পাতার বিচিত্র আকৃতিও দেখা যায়। এ গাছগুলি হালকা ছায়া পছন্দ করে এবং এদের বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। এরালিয়া তার বাংলা নাম সুহাসিনী বলেও পরিচিত।

**ড্রেসিনা ও কর্ডিলাইন ॥**

ড্রেসিনা ও কর্ডিলাইনও আলাদা গাছ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণজনের কাছে এদুটি একই গাছ বলে পরিচিত। এ দুটিরই অনেক প্রজাতি রয়েছে এবং বেশির ভাগ প্রজাতিরই চাষ সহজ। এ দুটি সকালের রোদ পেতে চায় কিন্তু অন্য সময়ের জন্য হালকা ছায়া পছন্দ করে। এদের গাছের পক্ষে ছোট টবে লাগাতে হবে। টবে এদের গাছ ঢেঙা হয়ে গেলে আর ভাল দেখায় না। এই অবস্থায় গাছের মাথার অংশটিকে গুটিকলমের সাহায্যে

নতুন গাছে পরিণত করে তা আবার টবে লাগাবেন এবং টবের পুরানো গাছটিকে জমিতে লাগিয়ে দেবেন। এদের খুব সুখী প্রজাতিগুলির চাষ ছায়াঘরে করা দরকার। গুটিকলম ছাড়া ড্রেসিনা ও কর্ডিলাইনের বংশবৃদ্ধি ডিফেনবাকিয়ার মতও করা যায়। পত্রবিলাস ড্রেসিনার বাংলা নাম।

**জবা ভেরীগেটা ॥**
জবার প্রজাতি স্নো-ফ্লেকের পাতা সাদা ও সবুজ। এর ফুল সিঙ্গেল ও লাল রঙের। গাছ রোদ পছন্দ করে। সবুজ পাতার ডাল বেরুলেই ছেঁটে দেবেন। কুপারী জবার একটি নতুন ভেরীগেটা প্রজাতি, এর চাষও একই রকমের হবে।

**টগর ভেরীগেটা ॥**
ডাবল ফুলের টগরের একটি ভেরীগেটা গাছ রয়েছে। এর পাতা হলদে সাদা ও সবুজ। এটি এমন জায়গায় লাগানো দরকার যেখানে রোদ কম লাগে অথবা হালকা ছায়া পায়।

**ডুরাণ্টা ভেরীগেটা ॥**
ডুরাণ্টা প্লুমিরি ভেরীগেটার পাতা হলদে সাদা ও সবুজ। এর ফুল সাধারণ ডুরাণ্টার মত নীল রঙের। এটিকে রোদে লাগাবেন এবং এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে।

**লংকাজবা ভেরীগেটা ॥**
লংকাজবা বা মালভাভিসকাস কনজাটী ভেরীগেটার পাতার রঙ হলুদ ও সবুজ। এবং এর ফুলের রঙ লাল। এটিকে রোদে বা হালকা ছায়া জায়গায় লাগাবেন।

**লেবু ভেরীগেটা ॥**
লেবু বা সিট্রাস লিমোনিয়া ভেরীগেটার পাতা হলদে সাদা ও সবুজ। গাছে ফুল হয় না। এটি লাগাবেন হালকা ছায়া জায়গায় এবং এর বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে।

**অরোকেরিয়া ॥**
অরোকেরিয়া কুকী টবের গাছ হিসাবে অপূর্ব সুন্দর গাছ। সুখদর্শন ছোট ডালগুলি বেরায় থাকে থাকে। ছোট অবস্থায় এ গাছে কড়া রোদ না লাগানো ভাল। এর অনেকগুলি একই উচ্চতার গাছ একসঙ্গে টবে লাগালে সাজাবার কাজে সুবিধা হবে। অরোকেরিয়া বড় লনেও ভাল দেখায়। গাছ হাত তিরিশেক উচ্চতায়, তবে ঋজুভাবে উঠে গেছে এরকম অরোকেরিয়া দেখা যায় না। লম্বা হবার মুখে গাছ কোন না কোন জায়গায় বেঁকে যায়। অরোকেরিয়ার আদি বাসস্থান নিউ ক্যালেডনিয়া। বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে কিন্তু সমতল বাংলায় বীজ হয় না। কাটিং দিয়ে এর নতুন গাছ তৈরী করা সম্ভব হলেও তা সোজা হয়ে বাড়ে না। অরোকেরিয়ার বাংলা নাম অর্কচূড়।

**কর্ডিয়া ভেরীগেটা ॥**
কর্ডিয়া সেবাষ্টিনা ভেরীগেটার বড় বড় পাতার রঙ হলদেটে সাদা ও সবুজ। এটি রোদে বা হালকা ছায়ায় লাগাবেন এবং এর বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে।

**গ্রেভিলিয়া ॥**
গ্রেভিলিয়া রোবাষ্টা-র পাতার উপরের দিক সবুজ কিন্তু নিচের দিক রূপালী সাদা। গাছ বড় হলে মাঝারি আয়তনের বড় গাছ হবে। গ্রেভিলিয়ার ফুলও দেখতে সুন্দর

কিন্তু সমতল বাংলায় ফুল বিশেষ ফোটে না। বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে, এবং এর আদি বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া।

**ঝাউ ॥**

ঝাউ বা থুজা বাড়ে খুব ধীরে ধীরে। এগুলি শুধু টবে চাষ করাই ভাল কেননা জমির গাছ অনেক সময়েই অসুন্দর ভাবে বেড়ে ওঠে। ময়ূরপঙ্খী বা ওরিয়াণ্টালিস ঝাউ অন্যান্যদের চেয়ে বেশি সমাদৃত। এদের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে কিন্তু এখানকার বীজে চারা হতে চায় না।

**দেবদারু ॥**

দেবদারু বা পলিয়ালথিয়া লনগিফোলিয়া-র প্রজাতি পেনডুলা সোজা লম্বা হয়ে উঠে যায় এবং পাতাভর্তি ছোট ছোট ডালগুলি ঝুলে ঝুলে পড়ে। একটি বাঁশকে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সাধারণ দেবদারু পাতা দিয়ে সাজালে যেরকম দেখায় পেনডুলা প্রজাতিটি অনেকটা সেই রকম। একই আয়তনের কয়েকটি দেবদারু পেনডুলা এক সারিতে একটু ঘন করে লাগালে বেশ চমৎকার দেখায়। সাধারণ দেবদারু বড় রাস্তার পাশে ছায়া দেবার কাজে খুবই ভাল। দেবদারু এসেছে সিংহল থেকে এবং এদের বংশবিস্তার বীজ দিয়ে।

**পাইন ॥**

পাইন বা পাইনাস লনগিফোলিয়া পাহাড়ের গাছ হলেও সমতল বাংলায় এটি মোটামুটি ভাল জন্মায়। এদের পাতা খুব সরু সরু এবং দেখতে বেশ একটু অদ্ভুত ধরনের। পাইন হালকা ছায়া জায়গায় লাগানো ভাল। সমতল বাংলায় গাছ বড় হয় না ; এখানে এর উচ্চতা অনুসারে এটি নাতি-উচ্চ গাছের ভেতরে পড়বে। এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে।

**পান্থপাদপ ॥**

পান্থপাদপ বা র‍্যাভেনালা ম্যাডাগাসকারেনসিস-এর পাতা দেখতে কলাপাতার মত এবং গুঁড়ি নারকেল গাছের মত। এর পাতার ডাঁটা কাটলে কিছুটা জল বেরোয় যা খাওয়া চলে বলে জনশ্রুতি। খুব বড় হলে গাছ তত ভাল দেখায় না। এটি বেশ কষ্টসহিষ্ণু গাছ। পান্থপাদপ এসেছে ম্যাডাগাসকার থেকে এবং এর বংশবৃদ্ধি তেড়ের সাহায্যে।

**পালতে মাদার ভেরীগেটা ॥**

পালতে মাদার বা এরিথ্রিনা ইনডিকা পার্সেলি-র পাতা হলুদ ও সবুজ, এবং এর ফুল কমলা রঙের। গাছ রোদে লাগাবেন এবং এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে। গাছটি ভারতীয়।

**ফিলিসিয়াম ॥**

ফিলিসিয়াম ডেসিপিয়েন্স-এর চাষের আরও প্রসার হওয়া উচিত। এর পাতা অদ্ভুত ধরনের কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর। গাছ বাড়ে আস্তে আস্তে এবং ছোট অবস্থায় গাছ খুবই মানানসই। সমতল বাংলায় ফিলিসিয়াম নাতি-উচ্চ গাছের আওতায় পড়বে। এর বংশবিস্তার বীজ দিয়ে কিন্তু সমতল বাংলায় এর বীজ হয় না। ভারত ফিলিসিয়ামের অন্যতম আদি বাসস্থান। এর বাংলা নাম পত্রনিধি।

**বকুল ভেরীগেটা ॥**

বকুল ভেরীগেটার পাতার রঙ হলুদ ও সবুজ। এটি খুবই কষ্টসহিষ্ণু এবং এর চাষও সহজ। এর ফুল বা ফল হয় না। বকুল ভেরীগেটার বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে।

**বট ॥**

বট বা ফিকাস-এর প্রজাতি ইলাষ্টিকা ভেরীগেটা-র পাতা হলদে সাদা ও সবুজ। এটি ছোট অবস্থায় টবের গাছ হিসাবে খুবই ভাল। হালকা ছায়া পায় এরকম জায়গায় একে লাগাতে হবে। জমিতেও এটি বিশেষ বড় হয় না। বটের প্রজাতি কৃষ্ণ-র (এটি ঠোঙা বট নামেও পরিচিত।) পাতা বেশ একটু অদ্ভুত ধরনের। রাস্তায় ছায়া দেবার কাজে ভেরীগেটা ছাড়া সব বটই ভাল, তবু এদের ভেতরে অশ্বত্থ বা রিলিজিওসা এবং জির বা রেটুসা আরও বেশি উপযুক্ত। বটের প্রজাতি ইলাষ্টিকা, অশ্বত্থ ও জির বিশাল আয়তনের গাছ, এবং কৃষ্ণ আয়তনে ছোট। এদের কোন কোনটি ভারতের নিজস্ব গাছ এবং সব কয়টির গুটিকলমে বংশবিস্তার করা চলে।

**রেড়ি ॥**

রেড়ি বা রিসিনাস গিবসনী ছোট অবস্থায় দেখতে বেশ সুন্দর। এটির পাতার রঙ হালকা হলদে ও পিংক। গাছ কিছুটা ঢেঙা হলে তা ফেলে দিয়ে নতুন গাছ লাগাবেন। রেড়ির বংশবিস্তার বীজ দিয়ে।

**ষ্টারকুলিয়া ॥**

ষ্টারকুলিয়া এলাটা ডাইভারসিফোলিয়া-র কোন পাতার সাথে কোন পাতার মিল নেই এবং এটিই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর এই অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য এটি পাগলা গাছ নামেও পরিচিত। ডাইভারসিফোলিয়ার ভাল মূলগাছ থেকে করা কলমের গাছ যোগাড় করবেন। এর বীজের গাছও পাওয়া যায় কিন্তু তাদের বেলায় পাতার এই বৈশিষ্ট্য প্রায়ই তত পরিষ্কার নয়। ডাইভারসিফোলিয়া মোটামুটি বড় আয়তনের এবং কষ্টসহিষ্ণু। ষ্টারকুলিয়া সাধারণ প্রজাতি এলাটা উচ্চতায় খুব বড় এবং বড় রাস্তার পাশের গাছ হিসাবে বহুল সমাদৃত। ষ্টারকুলিয়ার এই প্রজাতি দুটি এসেছে অষ্ট্রেলিয়া থেকে। এর বাংলা নাম চন্দ্রচূড়।

**এসপারাগাস ॥**

এসপারাগাস বাংলায় শতমূলী নামেও পরিচিত। এদের ফার্ণের মত পাতা দেখতে ভারি সুন্দর। এসপারাগাস প্লুমোসাস দৈর্ঘ্যে হাত আটেক এবং প্লুমোসাস নানা আরও ছোট। এসপারাগাস স্প্রেঙ্গেরি ও স্প্রেঙ্গেরি ভেরীগেটাসও দৈর্ঘ্যে ছোট। তাই এদের উপরের সব কয়টিকে সহজেই টবে চাষ করা চলে। ভেরীগেটাসের পাতার রঙ সাদা ও সবুজ, সারের মাত্রা বেশি হলে পাতার রঙ ঠিকমত আসে না। এরা এসেছে আফ্রিকা থেকে এবং এদের বংশবৃদ্ধি গাছের গোছা ভাগ করে। এসপারাগাসের ছোট আয়তনের গাছগুলিকে ঝুলানো টবেও চাষ করা যেতে পারে।

**পোথোস ॥**

পোথোস বা ইংলিশে মানি প্ল্যাণ্ট অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু গাছ। গাছ টবে, ঝুলানো টবে, কোন জলপূর্ণ পাত্রে, জমিতে লাগিয়ে গাছে তুলে দেওয়া বা দেয়ালে তুলে দেওয়াও চলে। গাছেতে তুলে দেওয়া পোথোসের পাতা খুব বড় হয়, কিন্তু টবের বা জলপূর্ণ পাত্রে চাষ করা গাছের পাতা ছোট হবে। জলাধারের গাছে মাঝে মাঝে খুব অল্প পরিমাণে তরলসার দেওয়া উচিত এবং এর জলও মাঝে মাঝে পালটে দেওয়া দরকার। এটিকে ইচ্ছা করলে ঘরের ভেতরেও অনেকদিন ধরে রাখা যেতে পারে। পোথোস হালকা ছায়া ভালবাসে তবে রোদেও বেশ ভাল জন্মায়। এটি গাঁটে গাঁটে শেকড় ছাড়ে এবং এই গাঁট আলাদা করে এর বংশবৃদ্ধি। পোথোস এসেছে সলোমন দ্বীপ থেকে। এটি বাংলায় পুরবীলতা নামে পরিচিত।

**ফিকাস ॥**

ফিকাস রিপেনস দেয়ালে তুলে দিলে তা দেয়াল বেয়ে উঠে চমৎকার দেয়াল ঢেকে ফেলে। পুরানো এবং দেখতে ভাল নয় এরকম দেয়াল ঢাকার কাজেই এর ব্যবহার বেশি। কাটিং দিয়ে রিপেনসের বংশবিস্তার, এবং অস্ট্রেলিয়া এর অন্যতম আদি বাসস্থান।

**ফিলোডেনড্রন ॥**

ফিলোডেনড্রনের প্রজাতির সংখ্যা অনেক এবং এদের অনেকগুলির পাতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সব পাতার ভেতরটা কাটা কাটা—কোন শিল্পী যেন কাঁচির সাহায্যে পাতার মাঝে মাঝে সুচারুভাবে কেটে দিয়েছেন। ছোটবেলায় এদের টবে চাষ করে পরে কোন বড় গাছের গুঁড়িতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। এটি হালকা ছায়া ভালবাসে এবং এর বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। ফিলোডেনড্রন এসেছে প্রধানত ট্রপিকাল আমেরিকা থেকে।

**বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা ॥**

আজকাল বেশ কয়েক ধরনের বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা পাওয়া যায়। স্কারলেট কুইন ভেরীগেটা, মিসেস মেরী পামার ভেরীগেটা, গ্লবরা ভেরীগেটা, মিসেস ফ্রেজার ভেরীগেটা, লুই ওয়াদেন ভেরীগেটা দেখতে বেশ ভাল ; এবং এদের ভেতরের প্রথম দুটি গাছ দেখতে অন্য সবগুলির চেয়ে বেশি সুন্দর। এগুলির চাষ সহজ, এবং এদের পুরো রোদ পায় এরকম জায়গায় লাগাতে হবে। সব ক'টি বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটাই ভাল ফুল দেয়। ইদানীং নতুন অনেক ভেরীগেটা বুগেনভিলিয়ার উৎপত্তি রয়েছে। এদের ভেতরে ডাবল ফুলের মাহারা মেরিয়েটা এবং সাধারণ ফুলের রডনী জন্কল্যাস ও পার্থ ভেরীগেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**সেটক্রিসিয়া ॥**

সেটক্রিসিয়া পারপুরিয়া-র গাছ ও পাতার রঙ পারপেল, এবং এর ছোট ছোট ফুলের রঙ পিঙ্ক। জমির উপরে গাছ সহজেই লতিয়ে চলে। টবের সামনের দিক ঢাকতে এটিকে কাজে লাগানো চলে, এ কাজে গাছ টবে লাগিয়ে তার ডালপালা নিচে ঝুলিয়ে দিতে হবে। সেটক্রিসিয়া ঝুলানো টবের পক্ষেও খুবই ভাল গাছ। এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে এবং এটি এসেছে মেক্সিকো থেকে।

# বনসাই

যে কোন বনসাইয়ের ছবির টবটি ঢেকে গাছটির দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে একটি সুপ্রাচীন বিরাট মহীরুহ যেন সামনে রয়েছে। এ মহীরুহে শুধু বয়সের স্বাক্ষর নেই, এতে এর উপর দিয়ে যেসব ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে তার চিহ্নও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ছোট টবে ছোট বনসাই এই মহীরুহকেই সর্বপ্রকারে মূর্ত করে রাখে এবং প্রকৃতিকে যত বেশি মনে করিয়ে দিতে পারবে সেই বনসাই তত বেশি সার্থক।

বনসাই সম্পর্কে একথা বহুল প্রচলিত যে এতে কবির কল্পনা, শিল্পীর সুদক্ষ হাতের কাজ, চিত্রকরের দৃষ্টির গভীরতা ও চাষের পরাকাষ্ঠা একযোগে বিকশিত হয়েছে। বনসাই বাস্তবিকই শিল্পকর্মের আওতায় পড়ে। তবে অন্যান্য শিল্পাদিদর্শনের সঙ্গে এর একটু তফাত রয়েছে, কারণ এটি পুরোপুরি জীবন্ত, যার অন্যান্য গাছের মত সুখদুঃখ বোধ রয়েছে। বাগান করা বা গাছ চাষের সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি চোখ কান খুলে

রেখে এ বিষয়ের চর্চা করা। বনসাইয়ের চাষ চর্চা করার সুযোগ আমাদের একরকম হয়নি, কারণ বনসাই কি করে করতে হয় তা কিছুদিন আগে পর্যন্ত রহস্য বিদ্যার অঙ্গীভূত ছিল। অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে একথা মনে হয়েছে যে বনসাই করা সময়সাপেক্ষ হলেও এটি করা খুব কিছু কঠিন নয়। যদিও এদের পরিচর্যা সারা বছর ধরে করতে হয় এবং সার্থক বনসাই করার পেছনে প্রচুর অভিজ্ঞতাও থাকা দরকার। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইলে তা একমাত্র চর্চার মাধ্যমেই করতে হবে। চর্চার মাধ্যমেই হয়তো এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কোন পদ্ধতি বার করা সম্ভব হবে। শহর-জীবনে বাগান করার জায়গার একান্ত অভাব। কিন্তু বনসাইয়ের জন্য জায়গা লাগে খুবই কম, এর খরচও সামান্য এবং বনসাই করে বাগান করার পরিপূর্ণ আনন্দও সহজেই লাভ করা সম্ভব।

বনসাই ভারতে দুচারজন করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সামান্য বলে এ বিষয়ে জাপানী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। জাপানের অনেক পরিবার বংশপরম্পরায় একই বনসাইয়ের পরিচর্যা কয়েকশো বছর ধরে করে আসছেন। বনসাইয়ের চাষ এই সব পরিবারের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আজকাল এই ধরনের কিছু বিশেষজ্ঞের লেখা বই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এদের এই অভিজ্ঞতা পুরোপুরি এখানে কাজে লাগাবার উপায় নেই কারণ জাপানের জলবায়ু, মাটি ও গাছপালার সঙ্গে আমাদের দেশের খুব কমই মিল রয়েছে। আমাদের দেশের জলবায়ু গাছপালা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কি ভাবে জাপানী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে তা এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। এই প্রবন্ধটি লিখতে আমি বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। এদের ভেতরেও শ্রীমুরাটা-র 'প্রাকটিকাল বনসাই ফর বিগিনারস' বইটির কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

**গাছ বেছে নেওয়া ইত্যাদি ॥**

বনসাই করার উপযুক্ত গাছ কোনগুলি? যে গাছের গুঁড়ি দেখলেই তার বয়সের কথা মনে পড়বে, যার বড় ডালগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা ছোট কিন্তু ঘন ও প্রাণবন্ত, এ ধরনের গাছ বনসাই করার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এদেশে বিভিন্ন প্রজাতির বটগাছগুলি উপরের সব কয়টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এবং এর আরও বাড়তি সুবিধা রয়েছে এর ঝুরি। ছোট বনসাই থেকে কিছু ঝুরি নেমে এলে তা সহজেই এর বয়সের কথা মনে করিয়ে দেবে। বটগাছের ভেতরেও জির বোধ করি সব চেয়ে ভাল, এর পাতা ছোট ও তা দেখতেও বেশ সুন্দর। এ ছাড়া তেঁতুল, পাইন, বাওবাব এবং ফুলগাছের ভেতরে কেশিয়ার অনেকগুলি প্রজাতি, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, কল-ভিলিয়া, জ্যাকারানডা বরুণ, সোনালী শিমুল প্রভৃতি গাছও এ কাজের উপযুক্ত। ফুলগাছে বনসাই অবস্থায় ফুল এলে তা শুধু দেখতেই ভাল হবে না, তা বনসাইয়ের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যও দেবে।

বনসাই করতে এ রকম গাছ পেলে ভাল যা প্রকৃতির দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় গাছের বয়স হলেও তা বিশেষ বাড়ার সুযোগ পায়নি। পাহাড়ী অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে এ ধরনের গাছ দেখা যায়। সমতল বাংলায়ও পোড়ো বাড়ীর ছাদে বা অন্যান্য জায়গায় অনেক সময়ে এ ধরনের গাছ পাওয়া যায়। এগুলি যে সব জায়গায় পাওয়া যায় সেখান থেকে এদের ভাল ভাবে তুলে আনা বেশ একটু কঠিন কাজ। তাহলেও গাছ এমনভাবে তোলা দরকার যাতে শেকড়ের বা গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি না হয়। কোন অবস্থাতেই গাছ টেনে তোলা চলবে না এবং যেখানে সম্ভব সেখানে গাছের গোড়ার মাটিশুদ্ধ গাছ তুলতে হবে। এ গাছ টবে লাগিয়ে বেশ কয়েক দিন এমন জায়গায় রাখা দরকার যেখানে রোদ বা বেশি বাতাস না পায়। গাছের গোড়ার মাটি বেশ কয়েকদিন ধরেই সব সময়ে ভেজাভেজা রাখতে হবে।

বয়স হলেও ছোট রয়েছে এ রকম গাছ পাওয়া সব সময়ে সম্ভব নয়। এ অবস্থায়

বটগাছের সব প্রজাতি, কৃষ্ণচূড়া, সোনালী শিমুল, কর্লাভিলিয়া প্রভৃতির গুটিকলমের ছোট গাছ দিয়ে বনসাই সুরু করা যেতে পারে। গুটিকলমের গাছের সুবিধা এই যে, এতে বয়স্ক গাছের ডাল দিয়ে বনসাই করা হচ্ছে বলে এই সব গাছে প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। গুটিকলমের গাছ বীজের চারাগাছের চেয়ে ফুলও দেবে অনেক আগে। পছন্দসই ডাল দেখে সেটিকে গুটিকলমের সাহায্যে নতুন গাছ করে নিতে হবে। বরুণ ইত্যাদির বেলায় গুটিকলমে গাছ করা যায় না। এদের বেলায় পছন্দসই বীজের গাছ প্রথমে সাধারণ পাঁচ ইঞ্চি টবে বছর খানেক রাখার পরে তা দিয়ে বনসাই আরম্ভ করা উচিত।

তুলে নিয়ে আসা গাছ, বছরখানেকের বীজের চারাগাছ ও গুটিকলমের গাছ প্রথম লাগাবার কাজে ছয় ইঞ্চি ব্যাস ও ইঞ্চি চারেক উঁচু মাটির টব ব্যবহার করা প্রয়োজন। মূল শেকড় ও অন্যান্য বড় শেকড় সোজাভাবে টবে না ধরলে এগুলিকে কেটে ঠিক মাপের করে নিতে হবে। শেকড় কাটার কাজ সব সময়ে তেরছাভাবে করা উচিত। গুটি-কলমের গাছের শেকড় কাটার এক রকম কোন দরকার পড়বে না।

**সারমাটি ও বাড়তি সার ॥**

বনসাই সম্পর্কে এ ভুল ধারণা আমাদের রয়েছে যে তাদের খেতে না দিয়ে অথবা কোন কৃত্রিম উপায়ে ছোট করে রাখা হয়েছে। তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি খর্ব করে ছোট আয়তনের ভেতরে সীমিত রাখা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ছোট রাখার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমনভাবে তাদের খাবার দেওয়া ও অন্যান্য পরিচর্যা করা হবে যাতে বনসাইয়ের ভেতরে সেই জাতির মহীরুহের সব বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তি অনুভব করা যায়। যে গাছগুলি প্রকৃতির যে রকমের দাক্ষিণ্য লাভ করে সেই সব জাতির বনসাইয়ের জন্য অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা দরকার—বনসাইয়ের পরিচর্যার এটাই মূল কথা। এবং এর প্রতি লক্ষ্য রেখে বনসাইয়ের সারমাটি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। টবের মাটি এ রকম হবে যে টবে জল দিলে মাটি সময় ধরে ভেজাভেজা থাকবে কিন্তু তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ধরে রাখবে না। এবং সারমাটিতে সারের ভাগ এমন হবে না যা গাছের আয়তন বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া বাড়তি সার দিলে তা যেন গাছের গোড়ার মাটি সহজে নিতে পারে এবং টবের সারমাটি যেন কখনই এঁটে না যায়। জাপানে যে বিশেষ ধরনের মাটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তা এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এর কোন বিকল্পের কথা আমাদের ভাবতে হবে। তিন ভাগ আধ-পোড়া মাটি, তিন ভাগ দোআঁশ মাটি, দুভাগ পাতাপচাসার ও দুভাগ বেশ বড় দানার বালি মিশিয়ে এই সারমাটি তৈরী করা যেতে পারে। সারমাটি মিশিয়ে বাইরে রোদে ফেলে রেখে তা আবার মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

টবের বিভিন্ন স্তরের সারমাটি বিভিন্ন দানার হবে। সারমাটির বিভিন্ন উপাদান আলাদা আলাদা ভাবে ছেঁকে তা সম-আয়তনের দানার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া দরকার। টবের নিচের অংশে টবের সম্পূর্ণ সারমাটির কুড়ি ভাগ সারমাটি হবে এ রকম মোটা দানার যা অল্প বড় বলে ৩/৮ ইঞ্চি ফুটোর ছাঁকনি দিয়ে বেরোয়নি। এর উপরে সম্পূর্ণ সারমাটির সত্তর ভাগ সারমাটি হবে এ রকম দানার যা ৩/৮ ইঞ্চি ছাঁকনি দিয়ে বেরিয়েছে কিন্তু ১/৮ ইঞ্চি ফুটোর ছাঁকনি দিয়ে বেরোয়নি এবং এর উপরের সম্পূর্ণ সারমাটি শেষ দশ ভাগ সারমাটি হবে এ রকম দানার যা ১/৮ ইঞ্চি ছাঁকনি দিয়ে বেরিয়েছে কিন্তু ১/১৬ ইঞ্চি ফুটোর ছাঁকনি দিয়ে বেরোয়নি। ১/১৬ ইঞ্চি ছাঁকনি দিয়ে বেরুনো সারমাটি বনসাইয়ের কাজে কখনই লাগানো হবে না। ছেঁকে নেবার কাজ শুনে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এটা খুব কিছু কঠিন নয়। বনসাইয়ের টবেতে চারা দেবার দরকার পড়ে না তবে টবের ফুটো বড় হলে দুয়েকটা চারা দেওয়া যেতে পারে।

বনসাই যাতে তাড়াতাড়ি না বাড়ে তাই সারমাটিতে খাবারের পরিমাণ থাকছে খুব কম। গাছ ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখতে এ জন্য প্রয়োজনমত বাড়তি সার দিতে হবে। আমেরিকায় 'হাইপোনেক্স' নামে রাসায়নিক সারের মিশ্রের বহুল ব্যবহার, জাপানে ব্যবহার করা হয় খোলের তরলসার এবং আরও কিছু রাসায়নিক সারের। এখানে বাদামের খোলের

বা কাঁচা গোবরের তরলসার ব্যবহার করা যেতে পারে। খোল দিন সাতেক ধরে পচিয়ে বা কাঁচা গোবর কাপড়ের পুঁটলীতে রেখে তা জলের ভেতরে ঝুলিয়ে রেখে তরলসার তৈরী করতে হবে। ব্যবহারের উপযুক্ত তরলসারের রঙ হবে পাতলা চায়ের মত, এ রকম করে নিতে প্রয়োজনমত জল মেশাতে হবে। এর দু'লিটার তরলসারে আরও মেশাতে হবে চায়ের চামচের এক চামচ সুপারফসফেট ও আধা চামচ সালফেট অব পটাশ। তরলসার দেবার আধ ঘণ্টা আগে বনসাই গাছের গোড়া সাধারণ জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। তরলসার দেবার আধ ঘণ্টা পরে গাছের পাতা জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া দরকার। গাছ বাড়ার মরসুমে মাসে দুবার করে এ সার দেওয়া হবে এবং গাছের পাতা ঝরে গেলে বা গাছের বিশ্রামের মরসুমে বাড়তি সার দেওয়া ঠিক হবে না। বর্ষার দিনেও বাড়তি সার দেওয়া উচিত নয়। ফুল বা ফলের গাছে ফুল বা ফল ধরার মাস খানেক আগে থেকে ফুলফল শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই সার দেওয়া দরকার নিয়মিতভাবে। সোনালী শিমুল, বরুণ প্রভৃতির ফুল ফোটে গাছের নিস্পত্র অবস্থায়, গাছে পাতা না থাকলেও এদের বেলায় শেষ শীতে এই বাড়তি তরলসার দিতে হবে। কোঁসয়া, কলভিলিয়া, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতির শীতকালে পাতা ঝরে, তাই এ সময়ে এদের বাড়তি সার দেওয়া উচিত নয়। বট, তেঁতুল প্রভৃতি গাছে বাড়তি সার দেওয়া যেতে পারে একরকম সারা বছর ধরে।

**জল দেওয়া ॥**

জল দেওয়া সম্পর্কে প্রধান নিয়ম এই যে, টবের মাটি মোটামুটি শুকিয়ে গেলে জল দিতে হবে। অনেক সময়ে উপরের মাটি শুকিয়ে গেলেও নিচের মাটি বেশ ভেজা থাকে, এ অবস্থায় জল দিলে গাছের ক্ষতি হবে। একই সঙ্গে টবের মাটি যেন কখনই শুকিয়ে যেতে না দেওয়া হয়। এ রকম পরিমাণের জল দিতে হবে যাতে সমস্ত টবের মাটি ভিজে শুধু অল্প কিছুটা জল চুঁইয়ে বেরিয়ে যায়। মাটিতে জল দেওয়া ছাড়া গাছ ও গাছের পাতাও জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে, এ কাজ গরমের দিনে প্রত্যেক দিন বিকেলে করা দরকার এবং অন্যান্য সময়ে মাঝে মাঝে করলেই চলবে। টবে জল দেবার কাজে সাধারণ ঝারির ব্যবহার এবং গাছ ধুয়ে দেবার কাজে সূক্ষ্ম ঝারির। গাছ ধুয়ে দেবার কাজে 'গণেশ' ধরনের ছোট স্প্রেয়ারও কাজে লাগানো যেতে পারে। বনসাইতে সব সময়ে স্বাদু জল ব্যবহার করা হবে।

**সারমাটি পালটানো ॥**

বনসাই সব সময়ে ছোট টবে করা হয় তাই টবের মাটি মোটামুটি নির্ধারিত সময়ের ভেতরে শেকড়ে ভর্তি হয়ে যায়। এ অবস্থায় গাছ ভালভাবে বেঁচে থাকার উপযুক্ত খাবার মাটিতে পায় না। তাই নতুন সারমাটিতে গাছ পালটে লাগানো দরকার। গাছ নতুন সারমাটিতে পালটে লাগাবার আগে গাছের গোড়ার পুরানো মাটি যতটা সম্ভব সাবধানে বাদ দিয়ে দিতে হবে। শেকড়-ছাঁটার কাজও এই সময়ে করা উচিত। পালটে লাগাবার কাজে আলাদা টব ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা একই টবেতে সারমাটি পালটে লাগানো চলে। এখানের বেশির ভাগ গাছ বর্ষাকালে বেশি বাড়ে বা নতুন পাতা ছাড়ে, তাই এদের এ সময়ে পালটে লাগানো ভাল।

**ট্রেণিং ॥**

চিত্রকর চিত্রের মাধ্যমে যে রকম তার বক্তব্যকে তুলে ধরেন তেমনি সার্থক বনসাইকেও কোন কিছু বক্তব্যের মূর্ত প্রতীক করে গড়া হয়ে থাকে। এতে কি বক্তব্যের রূপায়ণ ঘটবে তা নির্ভর করছে যিনি বনসাই করছেন তাঁর উপরে। বিভিন্ন ধরনের ট্রেণিংয়ের সাহায্যে বনসাইয়ের বক্তব্য সুপরিস্ফুট করা ও এর বয়সের প্রাচুর্যের ভাব আনা হয়। ট্রেণিং বলতে ডাল ছাঁটা, পাতা খুঁটে ফেলা, শেকড় ছাঁটা, একটি কোন বিশেষ আকৃতিতে

কোন ডালকে বাঁকানো ইত্যাদিকে বোঝায়। অভিজ্ঞ হাত ট্রেণিংয়ের সাহায্যে দশ বছরের বনসাইতে হয়তো পঞ্চাশ বছর বয়সের স্বাক্ষর এনে দিতে পারেন। বয়সের প্রাচুর্যের স্বাক্ষর যেমন বনসাইয়ের জন্য সমাদর আনে, তেমনি সত্যিকারের বয়সের প্রাচুর্য একে কৌলীন্য এনে দেয়। বনসাইয়ের জগতে এই দুইয়ের মণিকাঞ্চনযোগ হওয়া একান্ত দরকার। কিভাবে বনসাইটির আকৃতি গড়ে তোলা হবে তা আগে থেকে মনে মনে ঠিক করে নিতে হবে। কোন বিশিষ্ট বনসাইয়ের ছবি অথবা প্রকৃতির কোলের কোন মহীরুহকে পছন্দ করে সেই আকৃতিতে গড়ে তুললে কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

**ডাল ছাঁটা ॥**

ডাল ছাঁটার কাজ আরম্ভ হবে প্রথমবার সারমাটি পালটে লাগানো থেকে। প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে বনসাইয়ের কোন দিকটি সামনের দিক হবে। সামনের দিকে এগিয়ে আছে এ রকম কোন ডাল না রাখা ভাল, কিন্তু পেছনের বা পাশের দিকে ছড়িয়ে থাকা ডাল রাখা উচিত। ডাল এমনভাবে ছাঁটা দরকার যাতে কোন ডাল জড়াজড়ি করে বেড়ে না ওঠে, অথবা একটি ডাল যেন অন্য একটি ডালকে সহজে দেখার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সমান্তরাল যে কোন দুটি পাশাপাশি ডালের কোন একটিকে কেটে ফেলতে হবে অথবা অন্যভাবে বাঁকিয়ে দেওয়া দরকার। ডাল ছাঁটতে গিয়ে বনসাই যেন গুঁড়িসর্বস্ব হয়ে না পড়ে, এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হবেন। বনসাইয়ের গোড়ার ইঞ্চি ছয়েক পর্যন্ত কোন ডাল রাখা উচিত নয় এবং এর ঠিক ওপরের বড় ডালগুলিকে মাটির দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া ভাল। কোন একটি ডাল অন্যগুলির থেকে তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকলে সেটি ছেঁটে দিতে হবে।

**পাতা খুঁটে ফেলা ইত্যাদি ॥**

নতুন পাতা প্রায় পূর্ণাবয়ব হলে সেগুলি খুঁটে ফেলে দিতে হবে। এতে আবার নতুন পাতা ছাড়বে এবং এই পাতাগুলি হবে আকারে ছোট। দরকার বোধ করলে একাধিকবার পাতা খুঁটে ফেলা যেতে পারে। পাতা খুঁটে ফেলা পদ্ধতির প্রয়োগ ছোট পাতার গাছেই বেশি। বড় পাতার বেলায় সব পাতাগুলির বোঁটার দিকের অর্ধেক পাতা রেখে অন্য অর্ধেক কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। এতে কয়েক দিনের ভেতরেই কাটা পাতাগুলি ঝরে যাবে এবং কিছুদিন পরে নতুন কিন্তু আয়তনে ছোট এ রকম পাতা গজাবে। এই পাতা কাটার কাজ সারা বছরে বার তিনেক করা চলতে পারে। পাতা কাটার আগে বার দুয়েক বাড়তি সার দেওয়া দরকার এবং গাছের পত্রহীন অবস্থায় তাকে রাখতে হবে হালকা ছায়া জায়গায়। যাতে তাড়াতাড়ি পাতা বেরোয় সেজন্য গাছের ডাল প্রত্যেক দিন ধুয়ে দেওয়া দরকার।

**শেকড় ছাঁটা ॥**

প্রতিবার সারমাটি পালটে গাছ লাগাবার বেলায় মরা শেকড় বা খুব পুরানো শেকড় ছেঁটে দিতে হবে। বনসাইয়ের সামনের দিকে ভেসে ওঠা শেকড় তৈরী করার চেষ্টা করা উচিত, এ রকম শেকড় গাছের বয়সের প্রাচুর্যের কথা ঘোষণা করবে। সরু সুতোর মতো শেকড়গুলি পরিমাণে অনেক হলে তাও কিছু কিছু ছেঁটে দিতে হবে।

**ডাল বাঁকানো ॥**

ডাল বাঁকাতে বা বাঁকা ডাল সোজা করতে বিভিন্ন ধরনের মোটা কিন্তু নরম তামার তারের বহুল ব্যবহার। এগুলি খড়ের আগুনে সেঁকে নিয়ে ব্যবহার করা বিধি। তামার তারের সাহায্যে ডালের ইচ্ছামত আকৃতি দেওয়া সম্ভব। তার প্রথমে শক্ত করে বনসাইয়ের গুঁড়িতে জড়িয়ে যেসব ডাল যে আকৃতিতে বাঁকানো দরকার সেই আকৃতিতে আনতে হবে। নির্দিষ্ট আকৃতিতে আনতে তার বাঁধার আগে ডালটিকে সাবধানে দুলিয়ে দুলিয়ে সেই আকৃতিতে এটি আসতে পারে এ রকম করে নেওয়া দরকার। কোন গাছের বাঁধা

তামার তার খুলে নেবার পরে সে গাছকে মাস তিনেকের ভেতরে আবার বাঁধা উচিত নয়। ঝুলে পড়া ডাল করার জন্য ডালে ছোট ঢেলা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে বা ডালকে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নিয়ে আসবে। জাপানে পুরানো দিনে শুধু ঢেলার সাহায্যে ডাল বিভিন্ন ভাবে বাঁকানো হতো।

**টবের কথা ॥**

বনসাইয়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরী এবং ঐতিহ্যে ভরপুর কোন কোন টবের মূল্য কয়েক হাজার আমেরিকান ডলার হওয়া সম্ভব বলে প্রকাশ। সহজে পাওয়া যায় এবং দামও অত্যন্ত সাধারণ এ রকম টবে আমাদের বনসাই করতে হবে। উচ্চতায় ইঞ্চিচারেক ও টবের মুখের ব্যাস ইঞ্চিছয়েক এ রকম টব বাজারে পাওয়া যায়। বনসাই এই টবে করতে আরম্ভ করা যেতে পারে সহজেই। বনসাই করার কাজে কিছুটা এগুলে রুচিমাফিক পোড়ামাটির টব তৈরী করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মাটির টব ব্যবহার করার আগে এগুলি আধ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। কোন্ আকৃতির বনসাইয়ের জন্য কোন্ আকৃতির টব ব্যবহার করলে ভাল, কিছু দর্শনযোগ্য বনসাইয়ের ছবি দেখলে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাবে।

**গাছ কোথায় রাখবেন ॥**

সমস্ত সকাল রোদ পায় কিন্তু দুপুর থেকে রোদ পড়ে না এবং দিনের সব সময় প্রচুর আলোবাতাস পায় এ রকম জায়গায় বনসাই রাখতে হবে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে গাছ রাখা চললেও একটু বেশি বৃষ্টিতে বা জোড়ালো হাওয়াতে বাইরে বনসাই রাখা চলবে না। তা ছাড়া কুকুর বেড়ালে বা অন্য কিছুতে গাছের ক্ষতি না করে সে বিষয়েও সাবধান থাকা দরকার,—আমার এক পরিচিত ব্যক্তির বনসাইয়ের পেছনে বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রম তাঁর পোষা হরিণের পেটে গিয়েছিল। বনসাই রাখতে হবে দুটো ইটের উপরে লম্বা দুতিন টুকরো কাঠ অল্প ফাঁক করে পেতে তার উপরে, অথবা বনসাইয়ের জন্য তৈরী করা কাঠের শেলফে।

# বারান্দা সাজাবার গাছ

বারান্দাকে তার অবস্থান অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অনেক সময় ধরে রোদ পায় এরকম বারান্দা, শুধু সকালের রোদ পায় এরকম বারান্দা এবং মোটেই রোদ পায় না এরকম বারান্দা। যথেষ্ট রোদ পায় এমন বারান্দা সাজানো যেতে পারে যেসব গাছ দিয়ে তাদের সংখ্যা খুবই বড়। যে গাছই রোদ ভালবাসে এবং যাদের টবে চাষ করা যায় তারাই এ কাজে লাগার উপযুক্ত। এই সব গাছের পরিচর্যা মূলত ছাদের ফুলবাগানের গাছের পরিচর্যার মত হবে। যেসব বারান্দা শুধু সকালের রোদ পায় তাদেরও একরকম সব গাছ দিয়েই সাজানো চলবে। এবং এই সব বারান্দার জন্য পাতাবাহার, ড্রেসিনা প্রভৃতি যেসব গাছ অল্প রোদ পছন্দ করে তারা এ কাজের খুবই উপযোগী। যে বারান্দায় রোদ একেবারেই পড়ে না সেখানে যেসব গাছ ছায়া পছন্দ করে এবং একই সঙ্গে যেগুলি বেশ কষ্টসহিষ্ণু তাদের দিয়ে সাজাতে হবে। ছায়া পছন্দ করে কিন্তু খুবই সুখী প্রকৃতির গাছগুলিকে চাষ করতে হবে ছায়াঘরে। ছায়াঘর থেকে প্রয়োজনমত বার করে এনে তাদের দিয়ে ছায়াঘর বারান্দা সাজানো চলবে। তবে এদের বারান্দায় একসঙ্গে বেশিদিন রাখা উচিত হবে না। গাছ বাগানের অন্য কোথাও চাষ করে তার ফুলফোটা অবস্থায় অথবা গাছ যখন দেখতে খুব সুন্দর সেই অবস্থায় এনে বারান্দা সাজানোর

কাজে লাগানোর রীতিও খুবই প্রচলিত। এবং এতেই বারান্দা সবসময়ে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা সম্ভব হয়। বারান্দা সাজাবার সব গাছের চাষ হবে টবে। টবের পক্ষে গাছ বড় হয়ে পড়লে তাদের টব থেকে খুলে জমিতে চাষ করতে হবে। 'বাছাই বাহারি পাতার গাছ' অধ্যায়ের একরকম সব গাছই বারান্দা সাজাবার কাজে খুব ভালভাবে ব্যবহার করা চলবে। বর্তমান রচনায় কিছু গাছের কথা বলা হয়েছে যারা বারান্দা সাজাবার গাছ হিসাবে খুবই উপযুক্ত এবং যাদের সম্পর্কে এই বইয়ে অন্য কোথাও আলোচনা করা হয়নি।

**পরিচর্যা ॥**

এই অধ্যায়ের এমারিলিস, রজনীগন্ধা ও সর্বজয়ার চাষ প্রধানত এদের অন্যান্য প্রজাতির মত হবে ; এখানে এদের চাষের বিশেষ দিকগুলি শুধু তুলে ধরা হয়েছে। নিচের অন্য গাছগুলির ভেতরেও প্রকৃতির প্রচুর তারতম্য রয়েছে, তাই এদের পরিচর্যার কথা এখানে বলা হয়েছে খুব সাধারণভাবে। সমান পরিমাণের সাধারণ মাটি, গোবরসার ও পাতাপচাসার প্রথমে মিশিয়ে ছাব্বিশ সেন্টিমিটার বা দশইঞ্চি টবের একটব পরিমাণ মাটিতে আরও মেশাবেন দুমুঠো লালবালি ও এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো। কোলিয়াস প্রভৃতির বেলায় চন্দ্রমল্লিকার ব্যবহৃত মাটি আবার ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। নতুন তৈরী সারমাটিতে এদের বেলায় অল্প পরিমাণে চুন মেশাতে হবে। প্রত্যেক বছর নতুন সারমাটি দেওয়া, টব পালটে লাগানো, বাড়তি সার, তরলসার ও বাড়তি সার দেবার পরে জল দেবার প্রভৃতি পরিচর্যা ছাদের ফুলবাগানের গাছের পরিচর্যার মত করবেন। টবের মাটি শুকিয়ে এলে গাছে জল দেবেন, জলের পরিমাণ এমন হবে যে টব থেকে জল খুব গড়িয়ে বেরুবে না কিন্তু টবের মাটি ভাল করে ভিজিয়ে দেবে। বারান্দায় টবের দাগ পড়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে তাই দেখতে ভাল কিন্তু ফুটো নেই এরকম কোন পাত্রের ভেতরে টবসহ গাছ রাখতে পারলে ভাল। গরমের দিনে এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য সময়েও স্প্রেয়ারের সাহায্যে গাছ জল দিয়ে ধুয়ে দিলে তা আরও ভাল দেখাবে। ছায়াঘরের গাছ ছাড়া অন্য সব ফুলফোটা গাছ দিয়ে বারান্দা সাজাবার বেলায় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গাছ সকালের বেশ কিছুটা রোদ পায়। ফুলফোটা অবস্থায় টবের মাটি সবসময়ে ভেজাভেজা রাখা দরকার।

**এগেভ ও ফুরক্রেয়া ॥**

এগেভের বেশির ভাগ প্রজাতি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, তাই এদের চাষও সহজ। ফুরক্রেয়া দেখতে খুবই সুন্দর। এ দুটিরই সকালের রোদ পাওয়া দরকার। বারান্দা সাজাতে এদের ছোট আয়তনের গাছ ভাল কাজ দেবে। ফুরক্রেয়ার বীজ থেকে সহজেই চারা করা যায়।

**এমারিলিস ভেরীগেটা ॥**

এমারিলিসের কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে যাদের পাতার মাঝখানটা লম্বালম্বিভাবে সাদা। এবং সাদা ও সবুজ পাতার জন্যই এদের বেশি সমাদর। এদের পিঙ্ক রঙের ফুলও ফোটে। এমারিলিস কন্দজ ফুলগাছ। ভেরীগেটা প্রজাতিগুলির চাষ হালকা ছায়া পায় এরকম জায়গায় করতে হবে।

**কেয়া ॥**

সংস্কৃতে কেতকী এবং এর উদ্ভিদবিদ্যার নাম প্যানডানাস। কেয়া এর ফুলের জন্য আমাদের খুবই পরিচিত। এ গাছ টবে করাই ভাল কারণ জমিতে এটি সহজেই জঙ্গল করে তোলে। এর ভেরীগেটা বা সুদৃশ্য পাতার গাছগুলি টবে চাষের জন্য বেছে নেবেন। বেশি সার নেই এরকম সারমাটিতে ভাল হয় বলে সমান পরিমাণে মাটি ও পাতাপচাসার লাগিয়ে তাতে গাছ লাগাবেন। কেয়ার সকালের রোদ দরকার এবং এর বংশবৃদ্ধি তেড়ের সাহায্যে।

**কোলিয়াস ॥**

কোলিয়াসকে সাধারণত মরসুমী গাছ হিসাবে চাষ করা হলেও এটিকে বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কোলিয়াস তার পাতার জন্য বহুল সমাদৃত এবং এদের কোন কোন গাছের পাতা মোটামুটি স্বচ্ছ। গাছে কখনও ফুল হতে দেবেন না এবং এদের জন্য সকালের রোদ দরকার পড়বে। বংশবিস্তার বীজ বা কাটিং দিয়ে, ভাল প্রজাতির বেলায় কাটিং করা উচিত। কাটিং দিয়ে নতুন গাছ তৈরী করে কোলিয়াস বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন।

**ডিফেনবাকিয়া ॥**

ডিফেনবাকিয়ার প্রজাতির সংখ্যা অনেক এবং এদের দিয়ে ঘরের ভেতরেও ভাল করে সাজানো যায়। এদের অনেকগুলি বেশ কষ্টসহিষ্ণু হলেও এরা রোদ মোটেই সহ্য করতে পারে না ; সুখী প্রকৃতির ডিফেনবাকিয়ার চাষ ছায়াঘরে করতে হবে। ডিফেনবাকিয়ার গাছের রস বিষাক্ত তাই এ বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার। এদের গাছের কাণ্ডের পাবসহ পাঁচ সেণ্টিমিটার লম্বা টুকরো করে কেটে তা কাটিং করার মাটিতে বসিয়ে রাখলে তা থেকে নতুন গাছ বেরুবে। পাবের মুখগুলিকে উপরের দিকে করে বসাতে হবে। ডিফেন-বাকিয়ার বাংলা নাম পত্ররাগ।

**নয়নতারা ॥**

নয়নতারা বা ভিনকা যেখানে সেখানে হয়ে থাকতে দেখা যায়। এর ফুল অনেকটা সিঙ্গেল টগরের মত, রঙ সাদা অথবা গোলাপী। ফুল ফোটে বেশি গ্রীষ্মকালে এবং নয়নতারা রোদ ও ছায়া দুইই ভালবাসে। ছায়াঘন বারান্দায় সাদা ফুলের নয়নতারা বেশি মানাবে। এর বংশবিস্তার প্রধানত বীজ দিয়ে।

**পাম ॥**

বহু রকমের পাম রয়েছে, এদের বেশির ভাগই ছায়া ভালবাসে ও টবে বেশ ভাল জন্মায়। এদের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট টব ব্যবহার করবেন। পাম বড় টবে পালটাবার দরকার পড়লে পালটাবার বেলায় শেকড়ে যাতে কোন আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

**বাঁশ ও ঘাস ॥**

বাঁশ বা বেম্বুসা-র বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে যেগুলি দেখতে বেশ সুন্দর এবং যারা উচ্চতায়ও খুব ছোট। ঘাস বা গ্রাস-এরও অনেক প্রজাতি রয়েছে যেগুলি বেশ দেখতে সুন্দর। এ দুয়েরই বেশ কয়েকটি ভেরীগেটা প্রজাতি রয়েছে এবং টবে চাষ করার পক্ষে এই প্রজাতিগুলিই বেশি উপযোগী, ভেরীগেটা প্রজাতিগুলি হালকা ছায়া পছন্দ করে।

**বিগোনিয়া ও ইমপেশেন্স ॥**

বিগোনিয়া সেমপারফ্লোরেন্স-এর ভেতরে সাদা, লাল ও পিংক রঙের ফুল পাওয়া যাবে। বিগোনিয়ার সুখী প্রজাতিগুলি ও বিগোনিয়া রেক্স চাষ করতে হবে ছায়াঘরে। ইমপেশেন্স সুলতানী বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায় তবে এদের অরেঞ্জ-স্কারলেট রঙের ফুল বেশি দেখা যায়। এ দুটি গাছের উচ্চতা খুব কম তাই ছোট গামলাটব বা তেরো সেণ্টিমিটার টবে এদের লাগাবেন। গাছ বাড়ার সময়ে গাছের আগাগুলি মাঝে মাঝে নখ দিয়ে খুঁটে ভেঙে দেবেন যাতে গাছ বেশ ঝোপালো হয়ে ওঠে এবং গাছ ঝোপালো না হওয়া পর্যন্ত তাতে ফুল হতে দেবেন না। এ দুটিই শুধু ভোরের রোদ পছন্দ করে। বিগোনিয়ার জন্য সারমাটি সমান ভাগে লালবালি, মাটি, পাতাপচাসার ও গোবরসার, এবং খুব অল্প পরিমাণে হাড়ের গুঁড়ো ও কাঠকয়লার ছোট ছোট টুকরো মিশিয়ে

তৈরী করবেন। এর পরে বাড়তি সার হিসাবে শুধুমাত্র গোবরের তরলসার ব্যবহার করা চলবে। ইমপেশেন্সের বেলায়ও একই সারমাটি ও পরিচর্যা করা যেতে পারে। গাছ পুরানো হলে এদের নতুন গাছ লাগানো হবে। বিগোনিয়া ও ইমপেশেন্সের ফুল বেশি ফোটে শীতকালে এবং এ দুটিরই বংশবিস্তার প্রধানত কাটিং দিয়ে। বিগোনিয়া বাংলায় শৈলমণি বলে পরিচিত।

**রজনীগন্ধা ভেরীগেটা ॥**

রজনীগন্ধা বা পলিয়ান্থাস টিউবরোজা ভেরীগেটার সমাদর এর হলুদ ও সবুজ পাতার জন্য। এর ফুল সিঙ্গেল, এটি কন্দজ ফুলগাছ এবং এটির শুধু সকালের রোদ পাওয়া ভাল।

**ষ্ট্রাবিলেন্থাস ॥**

ষ্ট্রাবিলেন্থাসের কিছু প্রজাতির সমাদর তাদের ফুলের জন্য এবং ডায়ারিয়েনাস প্রজাতির বহুল সমাদর এর ঝকমকে পাতার জন্য। এদের চাষ সহজ, তবে গোড়ায় জল দাঁড়াতে পারবে না এবং হালকা ছায়া জায়গায় চাষ করতে হবে। ষ্ট্রাবিলেন্থাসের বংশ-বৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। ডায়ারিয়েনাসের বাংলা নাম চিত্রলেখা।

**সর্বজয়া ভেরীগেটা ॥**

সর্বজয়া বা ক্যানা ট্রিনাক্রিয়া ভেরীগেটার পাতার রঙ হলুদ ও সবুজ, এবং এর ফুল হলদে রঙের। সর্বজয়া কন্দজ ফুলগাছ এবং এই প্রজাতিটির শুধুমাত্র সকালের রোদ দরকার।

**সাইকাস ॥**

টবেতে সাইকাস খুবই ভাল দেখায়। সাইকাস হালকা ছায়াতে খুব ভাল থাকে তবে এদের রোদেও রাখা চলে।

**হেলিকনিয়া ॥**

হেলিকনিয়ার একাধিক ভেরীগেটা প্রজাতি রয়েছে এবং এগুলি দেখতে খুব সুন্দর। ভেরীগেটা প্রজাতিগুলি টবে চাষ করার পক্ষে বেশি উপযুক্ত এবং অন্যগুলি চাষ করা ভাল জমিতে। হেলিকনিয়া দেখতে অনেকটা ছোট কলাগাছের মত। এগুলি কষ্টসহিষ্ণু এবং এদের চাষ করা দরকার হালকা ছায়া পড়ে এরকম স্যাঁতসেঁতে জায়গায়। এদের ফুল দেখতে অদ্ভুত ধরনের, ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এবং তা সুপ্রভ থাকে বহুদিন ধরে। হেলিকনিয়ার বংশবৃদ্ধি তেড় দিয়ে। এটির বাংলা নাম কলাবতী।

# ছায়া ঘরের গাছ

ছায়াঘরে গাছের চাষ একসময়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এর জনপ্রিয়তা বর্তমানে অনেক কমে গেছে। ছায়াঘরে চাষ করা হয় এরকম গাছের জনপ্রিয়তা কমে গেছে তা নয়, কিন্তু ছায়াঘর তৈরী করা বা তার আনুষঙ্গিক বাৎসরিক খরচ বেশ ব্যয়সাধ্য বলে অনেকেই ছায়াঘর তৈরী করতে আর ভরসা পান না। ছায়াঘরের ভেতরে বা বাইরে পাহাড়-উদ্যান করাও আগে মোটামুটি প্রচলিত ছিল কিন্তু ঐ একই কারণে এর সমাদরও আজকাল কমে গেছে। যেখানে ব্যয় করা সম্ভব সেখানে ছায়াঘর করার খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কারণ ছায়াঘর ছাড়া অনেক সুদৃশ্য পাতার গাছ বা স্প্যাথিফাইলাম, ফুলের এনথুরিয়াম, রঙ্গন সুপারবা প্রভৃতি ভাল চাষ করা বুঝি সম্ভব নয়।

**ছায়াঘর তৈরী করা ॥**

ছায়াঘরের প্রধান উপযোগিতা এই ঘরের ভেতরের গাছপালাকে পরিমিত ছায়া দেওয়া এবং ঘরে ভেতরে ঠান্ডা ঠান্ডা রাখা যাতে এই সব গাছ বেশ ভাল থাকে। ছায়াঘর এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ভেতরের গাছ পর্যাপ্ত আলোবাতাস পায় কিন্তু গাছে সরাসরি রোদ না লাগে। এ ঘর ঝড়ো হাওয়া থেকে গাছকে বাঁচাবে এবং এটি এমন হবে যাতে এর ভেতরটায় সবসময়ে হালকা ছায়া থাকে এবং এটি পাশাপাশি জায়গা থেকে অনেক ঠান্ডা হয়। ছায়াঘরের ভেতরে সরাসরি বেশি রোদ পড়লে গাছের পাতা পুড়ে গিয়ে সুখী গাছের মরে যাবার আশঙ্কা, আবার ছায়া বেশি হলে গাছ সহজেই দুর্বল হয়ে পড়বে।

পরিষ্কার খোলা জায়গায় যেখানে বর্ষার দিনেও ছাতলা ধরে না এরকম জায়গায় ছায়াঘর করা ভাল। ছায়াঘর কখনোই ঠিক গাছের তলায় করা হবে না। বর্ষার দিনে বৃষ্টি থেমে গেলেও গাছ থেকে টিপ টিপ করে জল পড়ে ছায়াঘরের ক্ষতি করবে, তাই গাছের তলায় এ ঘর করা কখনই উচিত নয়। ছায়াঘরের কাঠামো এমন হতে হবে যা বহুবছর ধরে ভাল কাজ দেবে ; তাই এ কাজে লোহার বা এই ধরনের কিছুর খুঁটি ও উপর নিয়ে সর্বদিক ঘিরে দেবার জন্য চার সেণ্টিমিটার ফুটোওয়ালা শক্ত তারের জাল ব্যবহার করা দরকার। ছায়াঘর তৈরী করার বেলায় এ কথা মনে রাখবেন যে, এ ঘর কিছুদিন অন্তর মেরামত করতে হলে ভেতরে গাছ মেরামতের সময়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই ছায়াঘর খুব ভাল করে তৈরী করা দরকার। ছায়াঘরের গাছে পশ্চিমের এবং শেষ দুপরের রোদ বেশি লাগতে পারবে না তাই এই ঘরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক একটু ঘন করে ছাইতে হবে। ছায়াঘরের ছাদ দোচালা ছাদের মত করে করা ভাল এবং এই ছাদ ছাইবার কাজে বেশ ভাল কাজ দেবে জংলী উলুখড়। উলুখড় ছাইতে হবে এমন হালকা ভাবে যাতে তার ভেতর দিয়ে ঝিরিঝিরি সূর্যের আলো ছায়াঘরে ঢোকে। পুরানো উলুখড় সরিয়ে নতুন উলুখড় দিয়ে ছায়াঘর ছেয়ে দিতে হবে প্রতি বছর। ছায়াঘরের ভেতরে চলার পথে পাথরের নুড়ি বা এমন কিছু বিছিয়ে দেওয়া দরকার যাতে পথটি কখনও পেছল না হয়ে ওঠে।

**সাধারণ পরিচর্যা ॥**

ছায়াঘরে চাষ করা যেতে পারে এরকম গাছের সংখ্যা প্রচুর। এবং বিভিন্ন গাছের প্রকৃতি আলাদা বলে তাদের পরিচর্যার কথা এখানে খুব সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এই পরামর্শ অনুযায়ী গাছ করতে আরম্ভ করে কিছুদিনের ভেতরেই তার সঠিক চাহিদা বের করে নেওয়া সম্ভব হবে। ছায়াঘরের গাছের পরিচর্যার কতগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এদের জন্য সারমাটি এমনভাবে তৈরী হতে হবে যা গাছের প্রয়োজনমত জল ধরে রাখে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ধরে গাছের গোড়া পচিয়ে না দেয়। সারমাটি কিছুটা ঝুরঝুরে হবে ঠিকই কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে গাছ লাগিয়ে কয়েকবার জল দেবার পরও তা মোটামুটি জমাট বাঁধবে না। জল তাড়াতাড়ি বের করে দেবে এরকম সারমাটি তৈরী করতে দালানভাঙ্গা রাবিশ, কাঠকয়লার গুঁড়ো, কাঠের ছাই ভাল কাজ দেবে। এ তিনটি ছাড়া আরও যোগ করতে হবে সাধারণ মাটি ও পাতাপচাসার। এছাড়া বেশির ভাগ গাছের বেলায় টব পালটে লাগাবার সময়ে নতুন টবের সারমাটিতে অল্প কিছুটা হাড়ের গুঁড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে। জল সবসময়ে এমনভাবে দিতে হবে যাতে গোড়ায় জল জমার সুযোগ না থাকে। গাছে জল দেবার দরকার রয়েছে কি না বুঝতে আঙ্গুল গাছের গোড়ার মাটিতে একটু বেশি ঢুকিয়ে তা পরীক্ষা করা যেতে পারে। সকালের দিকে পিচকারি বা স্প্রেয়ার দিয়ে গাছের পাতা ধুয়ে দিলে বা গাছের কাছাকাছি

জায়গায় জল ছিটিয়ে দিলে তা সমস্ত জায়গাটি আর্দ্র রাখতে সাহায্য করবে। বর্ষার দিনে ছায়াঘরের ছাদ থেকে চুঁইয়ে পড়া জলে গাছের পাতার ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। অনেক গাছের পাতা টব ঢেকে থাকে বলে এদের বেলায় সরাসরি মাটিতে জল দিতে হবে। গাছের শুকনো পাতা, রোগাক্রান্ত পাতা বা গাছ দেখলেই তা সরিয়ে ফেলতে হবে। বিভিন্ন পোকা ও শামুক গাছের পাতার ক্ষতি করে, এদের হাত দিয়ে বেছে ফেলতে হবে অথবা উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহার করবেন।

ছায়াঘরে গাছ লাগানো হয় প্রধানত তিন ভাবে। (১) ছায়াঘরের ভেতরের কেয়ারিতে। গোলাপের বিকল্প পদ্ধতির মত এর কেয়ারিও উঁচু করে নিতে হবে। ছায়াঘরের কেয়ারিতে লাগানো হয় প্রধানত সেই গাছগুলি যেগুলি অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু। (২) ঝুলানো টবে। এ গাছগুলিকে প্রয়োজনমত বাইরের ছায়া জায়গায় নিয়েও সাজানো হয়। অল্প সংখ্যায় অর্কিড করলে তাও ছায়াঘরে রাখা চলতে পারে। (৩) টবে। সুখী প্রজাতির গাছগুলি এবং যেগুলি বাইরে ছায়া জায়গায় নিয়ে মাঝে মাঝে সাজাতে হয় প্রধানত সেগুলি টবে করা হয়। কাঠের তাকের ব্যবস্থা করলে অল্প জায়গায় অনেক টব ভালভাবে রাখা যেতে পারে।

ছায়াঘরে চাষ করার কাজে বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ণ, এলোকেশিয়া, এনথুরিয়াম, বিগোনিয়া, রেক্স বিগোনিয়া, ক্যালাডিয়াম, বিলবার্জিয়া, ম্যারাণ্টা, ফিটোনিয়া, পিলিওনিয়া, পিপারোমিয়া, স্প্যাথিফাইলাম, এগলাওনেমা, একিমিনিস, ইউকেরিস, ফিকাস ইলাষ্টিকা ভেরীগেটা, ডিফেনবাকিয়ার সুখী প্রজাতিগুলি, ড্রেসিনার সুখী প্রজাতিগুলি, সিনেরারিয়া, জিরেনিয়াম, ট্রাডেসকানটিয়া প্রভৃতি বিশেষ সমাদৃত। এদের ভেতরের বিশিষ্ট কয়েকটির চাষ সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা নিচে করা হলো। বইয়ের পরিশিষ্টে প্রধানত এই বিশিষ্ট গাছের প্রজাতির একটি বাছাই তালিকা দেওয়া হয়েছে, গাছ বেছে নিতে এটি সাহায্য করবে।

**ফার্ণ ॥**

ফার্ণের সারমাটি সমান ভাগে সাধারণ মাটি, পাতাপচাসার ও লালবালি মিশিয়ে করা যেতে পারে। বালির পরিবর্তে বাড়ীর ছাদভাঙা রাবিশ ও গুঁড়ো কাঠকয়লা দিতে পারলে ভাল। এতে কয়েক মাস অন্তর অল্প কিছুটা চুন টবের মাটির উপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাড়তি সার হিসাবে অল্প করে হাড়ের গুঁড়ো টবের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া এবং গাছে মাঝে মাঝে জৈব তরলসার দেওয়া যেতে পারে। ফার্ণ প্রতিবছর টব পালটে লাগানো দরকার, একাজ করার সময়ে গাছের মরে যাওয়া অংশগুলি কেটে বাদ দিয়ে দেবেন। ফার্ণের টবে সাধারণত দিনে একবার জল দেবার দরকার পড়ে, তবে প্রয়োজন দেখা দিলে দিনে দুবারও জল দিতে হতে পারে। ফার্ণ সপ্তাহে বার তিনেক পিচকারির সাহায্যে ধুয়ে দেওয়া ভাল। এদের যেখানে রাখছেন তার কাছাকাছি জলের ছোট চৌবাচ্চা থাকলে তা ঐ জায়গা আর্দ্র রাখতে সাহায্য করবে।

**এলোকেশিয়া ॥**

একভাগ করে মাটি, গোবরসার, পাতাপচাসার এবং আধভাগ করে লালবালি, রাবিশ, এবং সঙ্গে কিছু গুঁড়ো কাঠকয়লা মিশিয়ে এলোকেশিয়ার সারমাটি তৈরী করা যেতে পারে। গাছ মরে গেলে কন্দ যত্ন করে রাখতে হবে এবং মার্চ মাসে তা নতুন করে লাগানো হবে। গাছ নিজে থেকে মরে না গেলে অক্টোবর থেকে জল আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিয়ে একে বিশ্রাম নেবার সুযোগ করে দেওয়া দরকার। এটির বাংলা নাম এলোকেশী।

**ক্যালাডিয়াম ॥**

ক্যালাডিয়ামের সারমাটি এলোকেশিয়ার মত করে তৈরী হবে, তবে এতে অল্প কিছুটা চুন মেশানো দরকার। এদেরও বিশ্রামের সময় অনেকটা এলোকেশিয়ার মত, এ সময়ে

কন্দ যত্ন করে তুলে রাখতে হবে। গরমের সময়ে এদের ছায়াঘরের ছায়া খুবই দরকার কিন্তু বর্ষাকালে এদের আলাদা করে সকালের রোদ খাওয়ানো ভাল। এতে এদের রঙ ভাল খুলবে। স্বচ্ছ পাতার ক্যালাডিয়ামের সমাদর বেশি। ক্যালাডিয়ামের বাংলা নাম কলাপী।

**এনথুরিয়াম ॥**

এনথুরিয়ামের সারমাটি তৈরী করা যেতে পারে দুভাগ পাতাপচাসার, একভাগ করে মাটি, গোবরসার, দালানভাঙ্গা রাবিশ মিশিয়ে। এনথুরিয়ামের কিছু প্রজাতির সমাদর তাদের সুন্দর ফুলের জন্য এবং অন্যগুলির সমাদর সুদৃশ্য পাতার কারণে। বাহারি পাতার এনথুরিয়ামের ফুল এলে তা খুব কচি অবস্থাতেই ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। এদের কাণ্ডে নতুন শেকড় এলে তা সারমাটি বা মস্ দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার। এনথুরিয়াম বর্ষাকালে ভাল জন্মায়। এটির বাংলা নাম সুদর্শনা।

**রেক্স বিগোনিয়া ॥**

রেক্স বিগোনিয়ার সমাদর তাদের বাহারি পাতার জন্য। সরাসরি রোদ পড়লে পাতা পুড়ে যাবে এবং গোড়ায় জল বেশি হলে কন্দ পচে যাবে, তাই এ দুটি বিষয়েই সাবধান হওয়া দরকার। এর সারমাটি দুভাগ পাতাপচাসার, একভাগ করে মাটি ও লালবালি, এবং এর সঙ্গে অল্প পরিমাণে কাঠকয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। রেক্স বিগোনিয়ার বাংলা নাম শৈলমঞ্জরী।

**পাহাড়-উদ্যান ॥**

পাহাড়-উদ্যান বা রক গার্ডেনের কৃত্রিম পাহাড় ছায়াঘরের ভেতরে বা উন্মুক্ত জায়গায় করা যেতে পারে। ছায়াঘরের পাহাড় উদ্যানে লাগাতে হবে ছায়াঘরের উপযুক্ত গাছগুলি এবং উন্মুক্ত জায়গার পাহাড়-উদ্যানে লাগাতে হবে প্রচুর রোদ ভালবাসে এরকম গাছগুলি। পাহাড় যে আকৃতির করবেন ঠিক করে নিয়ে সাধারণ মাটিতে তার সমান পরিমাণে পাতাপচাসার মিশিয়ে প্রথমে পাহাড়ের আকৃতির মাটির ঢিবি করতে হবে। এর পরে এই ঢিবিতে বসিয়ে দেওয়া হবে বড় পাথরগুলি বা কংক্রিটের চাঙরগুলি। পাথরগুলি একই সারিতে সুবিন্যস্তভাবে না সাজিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সাজালে ভাল দেখাবে। এগুলি এমন শক্ত করে বসাতে হবে যে তার উপরে কেউ উঠে দাঁড়ালেও পাথর সরে না যায়। এবং পাথরগুলির অবস্থান এমন হতে হবে যে সেগুলি যাতে গাছের গোড়ার মাটি ভেজা ভেজা রাখার ও গাছকে ছায়া দেবার সহায়ক হয়। গাছ লাগানো হবে পাথরের মাঝের জায়গাগুলিতে। খোলা জায়গার পাহাড়-উদ্যানে লাগাবার কাজে শীতের বিভিন্ন মরসুমী ফুল ও বিভিন্ন সাকুলেণ্ট ভাল কাজ দেবে, এদের ভেতরেও বেশি ভাল কাজ দেবে কিছুটা লতিয়ে চলে যে মরসুমী ফুলগাছগুলি। পাহাড়-উদ্যানের পাহাড়ের আকৃতি যেন এমন হয় যা সহজেই সত্যিকারের পাহাড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

## হেজ

হেজ্ ফুলবাগানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। হেজের বাংলা প্রতিশব্দ বেড়া, কিন্তু বেড়া বলতে আমরা যা বুঝি তা হেজ্‌কে সম্যক্ প্রকাশ করে না। বেড়া বলতে আমরা বুঝি গরু-ছাগল বা অনাদৃতজনকে ভেতরে ঢুকতে না দেবার উপায় বিশেষ। হেজ্



9744

বলতে এটাও বোঝায় ঠিকই, কিন্তু ফুলবাগানের ক্ষেত্রে এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক! ফুলের বাগানকে আরও সৌন্দর্যময় করে তুলতে হেজের ব্যবহার। কেয়ারি ও লনের মাঝখানে বা লন ও পায়ে-চলা পথের মাঝে সুস্পষ্ট সৌন্দর্যময় সীমারেখা টানতে ; লন বা নির্দিষ্ট জমিখণ্ডকে সুন্দর সীমারেখায় বাঁধতে, ফুলবাগানের বৈচিত্র্য আনতে এবং অসুন্দর জায়গা ঢাকতে হেজের ব্যবহার। হেজ্‌কে তার প্রকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সুদৃশ্য পাতার হেজ্, ফুল ফোটে এরকম হেজ্ এবং বেড়া।

হেজ্ করার কাজে যে সব গাছ খুব সহজে জন্মায়, যাদের ছাঁটলে আরও বেশি নতুন পাতা ছাড়ে এবং যাদের পাতা খুব বেশি ঝরে না এ রকম গাছ বেছে নিতে হবে। একেবারে জমির কাছ থেকে হেজের গাছের ডাল ও পাতা ছাড়লে হেজ্ দেখতে খুব সুন্দর দেখাবে। এর বিপরীত শুধু উপরের দিকটা দেখতে সুন্দর কিন্তু নিচটা ফাঁকা ফাঁকা, এ রকম হেজ্ কেউ পছন্দ করেন না। যাতে নিচটা ফাঁকা ফাঁকা না হয় সে জন্য প্রথম থেকেই যত্ন নিয়ে ছাঁটতে হবে। যদিও হেজের গাছ বেশ পুরানো হলে তার নিচের দিকটা কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা হবেই এবং এই অবস্থায় হেজ্ নতুন করে না করলে এই ত্রুটির সম্পর্কে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

**পরিচর্যা ॥**

সরু হেজের জন্য এক হাত চওড়া ও দেড় হাত গভীর এবং অন্যান্য হেজের জন্য দেড় হাত চওড়া ও দু'হাত গভীর করে হেজের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা কুপিয়ে মাটি উপরে তুলবেন। মাটি শুকিয়ে গুঁড়ো করে তাতে গোবর মিশিয়ে তা আবার খাদে ফেলতে হবে। মাটি ও গোবরের ভাগ হবে যথাক্রমে বারো ভাগ ও আট ভাগ। সম্ভব হলে প্রতি এক হাত পরিমাণ খাদের মাটিতে মেশাবেন বড় এক আঁজলা হাড়ের গুঁড়ো। গাছ বছরের যে কোন সময়ে লাগানো চললেও বর্ষার প্রথমে এ কাজ করা সবচেয়ে সুবিধের। গাছ লাগাবেন দু'সারিতে এবং এমনভাবে লাগাবেন যাতে যে কোন সারির যে কোন গাছ অন্য সারির দুটি গাছের মাঝখানে পড়ে। ভাল করে শেকড় হয়েছে এরকম কাটিং, কলমের গাছ অথবা বীজ দিয়ে হেজ্ করা হয়। যে গাছগুলির কাটিং সহজেই শেকড় দেয়, তাদের বেলায় ডাল কেটে সরাসরি হেজ্ করার কাজে লাগানো চলে। হেজের নির্দিষ্ট জায়গায় গাছগুলি ভাল করে লেগে গেলে এগুলি জমি থেকে ছ'ইঞ্চি উঁচু জায়গা থেকে ছেঁটে দেবেন এবং আবার ইঞ্চি ছয়েক বাড়লে নতুন ডালের ইঞ্চি তিনেক রেখে আবার গাছ ছেঁটে দেবেন। এই একই ভাবে ছেঁটে যেতে হবে যতদিন না হেজ্ নির্ধারিত উচ্চতায় পেঁছুচ্ছে। দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ছে এরকম ডালও প্রথম থেকে ছাঁটতে হবে। হেজের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত যাতে সমান চওড়া করে ছাঁটা হয় সেদিকে প্রথম থেকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

সব হেজ্ই নিয়মিতভাবে ছাঁটতে হবে। কতদিন অন্তর ছাঁটতে হবে তা নির্ভর করবে গাছগুলি কি রকম বাড়ে তার উপরে। তবে ছাঁটা অনিয়মিত হলে হেজের আকৃতি খারাপ হয়ে যাবে। হেজ্ ছাঁটা ধারালো ছাঁটার কাঁচি দিয়ে করা দরকার। প্রতি বছর বর্ষার প্রথমে কিছুটা করে কাঁচা গোবর হেজের গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দেবেন। এছাড়া হেজেতে পাতার সার হিসাবে ইউরিয়া সার জলে গুলে হেজের পাতায় স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে। এই সার শীতকালে অথবা মেঘলা দিনে ভোরবেলা স্প্রে করতে হবে। এ সারের কতটা পরিমাণ কতটা জলে গুলে স্প্রে করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে তা পরীক্ষা করে নিজে ঠিক করে নেবেন। পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে অল্প পরিমাণ সার দিয়ে আরম্ভ করবেন, হেজের সব গাছই খুব কষ্টসহিষ্ণু, তাই পাতার সারের পরিমাণ একটু বেশি হলেও তাতে খুব ক্ষতি হবে না। বর্ষার দিন ছাড়া হেজের গোড়া ভাসিয়ে জল দেবেন নিয়মিতভাবে। গ্রীষ্মকালে দিন দশেক অন্তর ও শীতকালে দিন পনেরো অন্তর জল দেওয়া দরকার। হেজের গোড়া ঠিকমত পরিষ্কার রাখা দরকার, না হলে নিচের দিকের ডালপালার খুবই ক্ষতি হবে।

বীজ দিয়ে হেজ্ করা প্রধানত বেড়া করার কাজেই ব্যবহার হয়। বীজ দিয়ে হেজ্ করতে চাইলে খাদের উপরের দিকে ইঞ্চি আটেক মাটিতে কোন সার মেশাবেন না। বীজ হেজের নির্দিষ্ট জমিতে সরাসরি চারাবেন এবং চারা না ওঠা পর্যন্ত জমি যাতে সব সময়ে ভেজা ভেজা থাকে সে ব্যবস্থা করবেন। চারাগাছ একটু বড় হলে এদের পরিচর্যা কাটিং দিয়ে করা হেজের পরিচর্যার মত হবে। বীজ হেজের জায়গায় চারাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র বীজতলা করে সেখানেও কিছু বীজ চারাবেন। হেজের জমিতে কোথাও চারা ঠিকমত না উঠলে বীজতলার চারা এনে সেখানে লাগাতে হবে।

**হেজের উপযুক্ত গাছ ॥**

নিচের তালিকার গাছগুলির ভেতরে যে কয়টি হেজের বিশেষ উপযুক্ত তাদের নিচে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ফুল ও সুদৃশ্য পাতার হেজ্ :—রঙ্গন, বুগেনভিলিয়া, ল্যানটানা ডিপ্রেসা, থানবার্জিয়া, প্লামবাগো, হেমেলিয়া, ঝাঁটি, পাতাবাহার, বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা, একালিফা, এরালিয়া, ইরান্থিমাম ইত্যাদি। এদের প্রথম সাতটি দিয়ে ফুল ফোটে এরকম হেজ করা যাবে এবং অন্যগুলির পাতা দেখতে বেশ সুন্দর। সুন্দর হেজ্ করার গাছ এদের ভেতরেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে। এদের ভেতরেও আবার রঙ্গন, বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা, ল্যানটানা, পাতাবাহার ও একালিফা বেশি ভাল।

সাধারণ সবুজ রঙের হেজ্ :—ক্লিরোডেনড্রন, ডোডোনিয়া, পেডিলেন্থাস, হাস্নাহানা ইত্যাদি। এদের ভেতর ডোডোনিয়ার হেজ্ দেখতে বেশ সুন্দর। কিন্তু ডোডোনিয়ার হেজের কোন কোন গাছ হঠাৎ মারা যায়। এটা এর একটা মস্ত অসুবিধা।

খুব নিচু হেজের গাছ :—এরুয়া, অলটারনানথেরা, কচিয়া প্রভৃতি। এগুলি ছ'ইঞ্চি থেকে একফুট উঁচু হেজ্ করতে ব্যবহার হয়। গাছ বাড়ে কম বলে খুব ঘন ঘন লাগাতে হবে এবং ছাঁটার কাজ গাছ ইঞ্চি চারেক বড় হলে আরম্ভ করতে হবে। কচিয়ার কিছু অসুবিধার দিক রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ দিয়ে ভাল ভাবে করা নিচু হেজ্ দেখতে এক কথায় অপূর্ব।

বেড়ার উপযুক্ত গাছ :—বাবলা, করমচা, ইঙ্গা ডালসিস, ডুরাণ্টা, মেহেদি, ক্যাকটাস, কামিনী, দেবদারু, ক্যাসুরিণা ইত্যাদি। এর প্রথম ছয়টির কাঁটা আছে তাই বেড়া করতে এদের প্রচুর ব্যবহার। শেষের কয়টি উঁচু ধরনের বেড়া তৈরীর কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে, এদের ভেতরে কামিনীর বেড়া দেখতে বেশি ভাল।

উপরের এই গাছগুলির ভেতরে একালিফা ট্রাইকলার, দীর্ঘজীবী কচিয়া, পাতাবাহার ছোট হলদে পাতার, বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা, রঙ্গন ডাফি হাইব্রিড ও ল্যানটানা ডিপ্রেসার তৈরী হেজ্ দেখতে খুবই ভাল।

**একালিফা ট্রাইকলার ॥**

একালিফা ট্রাইকলারের দুতিন রকম রঙ মেশান পাতার হেজ্ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহজেই। তিন চার ফুট উঁচু হেজ্ করার পক্ষে এ গাছ খুব মানানসই। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে খুব সুন্দর একালিফার হেজ্ রয়েছে। নতুন গাছ কাটিং দিয়ে অন্যত্র তৈরী করে পরে তুলে লাগাবেন। প্রত্যেক সারিতে গাছ লাগাবেন তিরিশ সেণ্টিমিটার অন্তর।

**কচিয়া ॥**

নিচু হেজ্ করার কচিয়া মরসুমী কচিয়ার থেকে আলাদা। এ গাছ বছরের পর বছর বেঁচে থাকে এবং মরসুমী কচিয়ার মত গোলাকৃতি না হয়ে সোজা উপরের দিকে বেড়ে ওঠে। কচিয়ার রঙ কচি কলাপাতার মত সবুজ এবং গাছ সিল্কের মত নরম। অন্য কোন গাছই নিচু হেজ্ করার কাজে কচিয়ার সমকক্ষ নয়। সৌন্দর্যের বিচারে এর প্রতিযোগী

কেউ না থাকলেও এই দীর্ঘজীবী কাঁচিয়ার একটি অসুবিধের দিকও রয়েছে। শীতকাল এর বিশ্রামের সময়, এ সময়ে কচিয়া এক রকম মাটির সাথে মিশে কোন রকমে বেঁচে থাকে। এই অসুবিধাকে সুবিধা হিসাবে রূপান্তরিত করতে শীতকালে এই হেজের খুব কাছ থেকে ভারবিনা বা ফ্লক্স লাগাবেন যাতে এই হেজ্‌কে হালকা ভাবে ঢেকে এই গাছগুলি ছড়িয়ে পড়ে। গরম পড়ার সময় থেকে কচিয়া বাড়তে আরম্ভ করলে ছাঁটার কাজও শুরু হবে এবং কোন কোন গাছ মরে গিয়ে থাকলে সেখানে কচিয়ার কাটিং বসিয়ে দেবেন। গাছ লাগাবেন দুই সারিতে এবং প্রত্যেক সারিতে ছ'ইঞ্চি অন্তর। পায়ে-চলা পথের পাশের হেজ্‌ হিসাবে কচিয়া খুব মানাবে এবং এর হেজ্‌ উচ্চতায় বিশ থেকে তিরিশ সেমির ভেতরে রাখা উচিত। এর বেলায় ছাঁটার কাজ একটু ঘন ঘন করবেন। কাটিং দিয়ে খুব সহজেই কচিয়ার নতুন গাছ জন্মায়।

**পাতাবাহার ॥**

পাতাবাহারের ছোট হলদে পাতার অতি সাধারণ প্রজাতিটি হেজ্‌ করার কাজে বিশেষ উপযুক্ত। এই প্রজাতিটির পাতা দুই থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা এবং পাতা অনেকটা ডিম্বাকৃতির। এর পাতার হলদে রঙের উপরে প্রচুর সংখ্যায় ছোট ছোট সবুজ ফোঁটা রয়েছে। পাতা-বাহারের এই প্রজাতিটি একটু বুনো ধরনের এবং এটি যে কোন জায়গায় চোখে পড়ে। রোদে এই পাতাবাহারটির খুব ভাল রঙ খোলে, তাই লনের সবুজ পাশে এর হেজ্‌ দেখতে খুবই ভাল দেখায়। এটির হেজ্‌ তিরিশ সেমি উঁচু করবেন। গাছ প্রত্যেক সারিতে তিরিশ সেমি অন্তর লাগাতে হবে। এদের নতুন গাছ কাটিং দিয়েও করা চলে কিন্তু গুটিকলমের গাছ হেজের বেলায় আরও ভাল কাজ দেবে। পাতাবাহারের খুব সরু ও সাধারণ লম্বা পাতার প্রজাতিটিও হেজের পক্ষে বেশ ভাল।

**বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা ॥**

বুগেনভিলিয়া স্কারলেট কুইন ভেরীগেটা ও মিসেস মেরী পামার ভেরীগেটা দিয়ে আলাদা ভাবে চমৎকার হেজ্‌ করা সম্ভব। বুগেনভিলিয়ার হেজ্‌ বাংলায় খুব প্রচলিত নয় এবং ভেরীগেটা দিয়ে হেজ্‌ করা ব্যয়সাধ্যও বটে। তবে নিজে কলম করে নিতে পারলে খরচ তেমন পড়বে না। এদের পাতা দেখতে খুব সুন্দর এবং ঘন ঘন ছাঁটা সত্ত্বেও এদের ফুল পাবেন। ভেরীগেটার হেজ্‌ হাত দুয়েক বা আরও উঁচু করা যেতে পারে। প্রত্যেক সারিতে গাছ লাগাবেন ষাট সেমি অন্তর। এদের নতুন গাছ দাবাকলমের সাহায্যে করবেন।

**রঙ্গন ডাফি হাইব্রিড ॥**

রঙ্গন ডাফি হাইব্রিড গোড়া থেকে ঘন হয়ে ওঠে সহজে এবং ছাঁটার পরে নতুন পাতাও ছাড়ে ভাল। রঙ্গনের এই প্রজাতিটি হাত দুই উঁচু হেজ্‌ করার কাজে খুবই উপযুক্ত। এদের গাছ লাগাবেন প্রত্যেক সারিতে তিরিশ সেমি অন্তর। বর্ষাকালে ফুল ফোটার আগে হেজের মাথার ডাল কম ছাঁটলে হেজ্‌ বড় বড় লাল ফুলের থোকায় ভর্তি হয়ে যাবে। নতুন গাছ কাটিং-এর সাহায্যে অন্যত্র করে পরে হেজের জমিতে তুলে লাগাবেন।

**ল্যানটানা ডিপ্রেসা ॥**

ল্যানটানা ডিপ্রেসার হেজ্‌ দেখতে বেশ সুন্দর। পাতা ঘন, পাতার রঙ সুন্দর সবুজ এবং হেজে উজ্জ্বল হলদে ফুল ফোটে। গাছ নিয়মিত ছাঁটলেও কিছু কিছু ফুল ফুটবে। এর হেজ্‌ তিরিশ সেমি বা তার কিছু উঁচু রাখলে ভাল দেখাবে। গাছ প্রত্যেক সারিতে তিরিশ সেমি অন্তর লাগাবেন। ল্যানটানা ডিপ্রেসার নতুন গাছ করবেন দাবাকলমের মাধ্যমে।

# জলজ ফুলগাছ

জলজ ফুলগাছের কথা উঠলেই ভারতের জাতীয় পুষ্প পদ্ম বা নিলাম্বিয়াম ও বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্প শালুক বা নিমফিয়ার কথা মনে পড়ে। পদ্ম ও শালুকের ভাগ্যে জাতীয় পুষ্পের সম্মান জুটলেও উপযুক্ত কোন সমাদর জোটেনি। সত্য বলতে এই দুটি ফুলই দুই দেশেই অবহেলিত। মজা পুকুর, বিল ইত্যাদিতে এরা আপনা আপনি প্রচুর সংখ্যায় ফুটে থাকলেও ফুলবাগানে এদের বড় দেখতে পাওয়া যায় না। পুজোতে পদ্মের বহুল ব্যবহার। কিন্তু এই সব ফুলই আসে এই সব বিল, মজা পুকুর থেকে। ফুলগুলি আসে ফুটন্ত কুঁড়ি অবস্থায়, এবং এগুলিকে জোর করে হাত দিয়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের পরিশ্রমের ফলে শালুকের বহু ধরনের প্রজাতি এখন পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এ সুবিধা পদ্মের বেলায় নেই। এদের সাদা ও গোলাপী শুধু এই দুই রঙের প্রজাতি সহজে পাওয়া যায়। আমেরিকা থেকে আনা পদ্মের হলদে রঙের প্রজাতি নিলাম্বিয়াম লিউটিয়া-র চাষ ভারতে কোথাও কোথাও হচ্ছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এদের দিকে পড়লে ভবিষ্যতে হয়তো এর সাহায্যে পদ্মের অনেক নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে। এখানের পদ্মের ডাবল ও সেমিডাবল ফুল রয়েছে এবং কিছু পদ্ম পাওয়া যায় যাদের রঙ বিভিন্ন পর্দার গোলাপী।

পদ্ম ও শালুক ছাড়া ভিক্টোরিয়া রেজিয়া সমতল বাংলায় সহজে চাষ করা সম্ভব। তবে এটির জন্য অপেক্ষাকৃত বড় জলাশয় দরকার। এছাড়া গাছটি অত্যন্ত দামী এবং প্রতিবছর এর নতুন গাছ লাগানো দরকার বলে ভিক্টোরিয়া রেজিয়া সাধারণ ফুলবাগানের আওতার বাইরে। যদিও এর ফুল ও পাতা দেখতে খুবই সুন্দর, এবং এর কোন বাগানে থাকা নিশ্চয়ই সেই বাগানের গৌরব বিশেষ। কচুরিপানার ফুলও বেশ সুন্দর, কিন্তু অতিবিস্তৃতির জন্য এটি যে কোন জায়গায় অভিশাপ বিশেষ। জলে জন্মায় এরকম কিছু ঘাস প্রভৃতিও রয়েছে। পছন্দমত এর দুয়েকটি গাছ ফুলবাগানের পদ্ম ও শালুকের জলাধারেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকৃতির কোলে যেসব জলাশয়ে পদ্ম ও শালুক জন্মায় সেগুলিকে অন্য কোন কাজে লাগানো একরকম অসম্ভব। এছাড়া এগুলি মশা জন্মানোরও আদর্শ স্থানস্বরূপ। এভাবে এই জলাশয়গুলি আমাদের ক্ষতির পরিমাণই বাড়িয়ে থাকে। ফুলবাগানের জলজ ফুল-গাছের চাষের বিস্তৃতি না ঘটার পেছনে এই দুটি বাধাই বড় বাধা। এই গাছগুলি বেশি সংখ্যায় চাষ করতে চাইলে এই অসুবিধাগুলি দূর করা বেশ কঠিন। কিন্তু এই অসুবিধা-গুলি খুব বড় হয়ে দেখা দেবে না যদি আমরা অনেকে ফুলবাগানে ছোট কৃত্রিম জলাধারে এর দুচারটি করে ফুলগাছ লাগাই। সেক্ষেত্রে ফুলগাছগুলিকে কাছে পেয়ে তাদের শোভা আমরা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারব, এবং এই সব জলাধার থেকে আমাদের ক্ষতিরও কোন আশঙ্কা থাকছে না।

**জলাধার ॥**

শালুকের প্রজাতি অনুসারে এদের জন্য একহাত থেকে দুহাত জল দরকার এবং পদ্মের জন্য প্রয়োজন দুতিন হাত জল। এই জলের নিচে হাতখানেক সারমাটি থাকবে। এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জলাধার তৈরী করতে হবে। অল্প বাড়ে এরকম শালুকের জন্য মাটির বড় চাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়ী করবার সময়ে ইট ভেজাবার জন্য করা জলের ট্যাঙ্কগুলিতে পরে সহজেই পদ্ম বা শালুকের চাষ করা চলে।

নতুন জলাধার তৈরী করে নেবার দরকার থাকলে তা নিজের রুচিমাফিক তৈরী করে নেবেন। ছোট জলাধার তৈরী করাই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত ভাল, তবে লম্বায় ও পাশে হাত চারেক করে জলাধারের তুলনায় এগুলি দেখতে তত ভাল দেখায় না। জলাধার তৈরী

হবে কংক্রিটের এবং দরকার মনে করলে জল যাতে চুইয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থাও করে নিতে হবে। জলাধারের তলটিও একই ভাবে তৈরী করা দরকার। জলাধারের পাশগুলি জমি থেকে হাতখানেক উঁচু হলে ভাল। এই উঁচু পাশগুলির কোন এক দিকে জলাধারের বাড়তি জল বেরিয়ে যাবার একটি ফুটোর ব্যবস্থা রাখবেন। বাড়তি জল বেরুবার ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার দিনে জলাধারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ফুলগাছের ক্ষতি করবে। জলাধারটি এমন জায়গায় করতে হবে যেখানে প্রচুর রোদ মেলে এবং গাছের পাতা পড়ার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। একই ছোট জলাধারে দুই আলাদা রঙের পদ্ম বা শালুক ল্যাগিয়ে দেখেছি যে সবল গাছটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল গাছটিকে মেরে ফেলে। তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন জলাধার অথবা একই জলাধারের দুটি প্রজাতির মাঝখানে দেয়াল করে দেওয়া ভাল। এই দেয়াল তলা থেকে আরম্ভ হবে এবং এটি সারমাটির থেকে আরও হাতখানেক উঁচু করে করা হবে।

**পরিচর্যা ইত্যাদি ॥**

বীজ থেকে চারা তুলতে অনেক সময় লাগে, তাই পদ্ম বা শালুকের কোঁড় কিনে বা যোগাড় করে লাগানো ভাল। নতুন তৈরী জলাধারে মাসখানেক জল ভরে রেখে তারপরে গাছ লাগাতে হবে। পদ্ম ও শালুকের সারমাটি তৈরী করবেন এই ভাগে,—সাতভাগ পাঁক-মাটি বা অভাবে সাধারণ মাটি, একভাগ পুরানো গোবর এবং এই দুটি উপাদান মিশ্রিত মাটির প্রতি দুই ন'ইঞ্চি টব পরিমাণ মাটিতে একমুঠো করে হাড়ের গুঁড়ো। এই সারমাটিতে ফুলগাছ লাগিয়ে এর গাছের পাতা ঠিক জলের উপরে ভেসে থাকে এরকম পরিমাণে জল দেবেন। পাতার ডাঁটি লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের পরিমাণও বাড়াতে হবে। জল পাতার উপরে উঠে গেলে গাছের ক্ষতি। যেখানে জল বাড়ানো কমানো সহজ সম্ভব নয় সেখানে নিচের পদ্ধতিটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। গাছ প্রথমে গামলাটবে লাগিয়ে টবটিকে জলের ভেতরে সাজানো ইটের উপরে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে গাছের পাতা ঠিক জলের উপরে ভেসে থাকে। পাতার ডাঁটি লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমাফিক ঠিক টবের নিচের কিছু ইট সাবধানে সরিয়ে নিতে হবে। এ ভাবে টবটি সারমাটিতে ঠেকে গেলে টবটি সাবধানে ভেঙে ফেলা দরকার। গামলাটব ভেঙে গেছে কিন্তু দড়ি বেঁধে নিলে কাজ চলে এরকম টব পেলে এ কাজ সহজ হয়ে উঠবে।

বর্ষাকাল জলজ ফুলগাছ লাগাবার বিশেষ উপযুক্ত সময়। গাছের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে তাও বর্ষাকালে ভাগ করে আবার নতুন করে লাগাবেন। পুরানো গাছের বেলায়ও মাটিতে নতুন করে পুরানো গোবর ও হাড়ের গুঁড়ো মেশাতে হবে এ সময়ে। বছর দু-তিনে একবার গাছ ভাগ করে লাগানো দরকার পড়বে। জল অনেক দিনের পুরানো হলে বা খারাপ হয়ে গেছে মনে হলে সাইফন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বেশিভাগ জল বের করে দিয়ে সেখানে নতুন জল দেবেন। জল খারাপ হয়ে গেলে কিছুদিন অন্তর অল্প পরিমাণে পটাশ পারমাঙ্গানেট জলে ফেলে জল শোধন করা যেতে পারে। জলাধারে মশা জন্মাবার সম্ভাবনা কমাতে মশার ডিম ইত্যাদি খেতে ভালবাসে এরকম কিছু মাছ ছেড়ে দিতে পারেন। পদ্ম ও শালুকের বংশবিস্তার সাধারণত কোঁড় ভাগ করে।

শালুকের সব পাতাই জলের উপরে ভেসে থাকে। পদ্মের অনেক পাতা জল ছেড়ে অনেকটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং বর্ষার দিনে এই পাতাগুলিতে জল জমলে তা খুবই সুন্দর দেখায়। পদ্মের ডাবল প্রজাতি দুটি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর। পদ্ম ফোটে গরমের দিনে এবং শালুক একরকম সারা বছর ধরে। শালুকের কোন কোন প্রজাতি ফোটে রাতে এবং অন্যগুলি দিনের বেলায়। পদ্মতে ও শালুকের কিছু প্রজাতিতে মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। নীলরঙের পদ্ম নেই বা কখনও ছিল বলে মনে হয় না।

পদ্ম ও শালুক চাষ করা কিছু কঠিন নয়। চাড়ি মাটিতে বসিয়ে তাতেও শালুকের চাষ করা যেতে পারে খুব সহজেই। চেষ্টা করলে বাড়ীর ছাদেও এর চাষ করা সম্ভব।

চাড়তে চাষ করার কাজে এরকম শালুকের প্রজাতি বেছে নেবেন যাদের বেশি জল দরকার পড়ে না।

# উদ্যান-সমিতি ও ফুলের প্রদর্শনী

সংঘবদ্ধভাবে করা কাজ সহজেই সাফল্য এনে দেয়—এ কথা ফুলবাগানের পক্ষেও খুব বেশি খাটে। ফুলবাগান করার কাজে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সব চেয়ে বড় পাথেয়, উদ্যান-সমিতির মাধ্যমে একজনের অভিজ্ঞতা আগ্রহীজনের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া সহজ সম্ভব এবং এভাবে একের অভিজ্ঞতা অন্যদেরও লাভবান করে তোলে। এদেশেও কিছু উদ্যান-সমিতি আছে ঠিকই কিন্তু এরকম আরও অনেক সমিতির গড়ে ওঠার প্রয়োজনও রয়েছে। একথাও খুবই সত্য যে দিন দিন আরও অনেকে ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। বিভিন্ন উদ্যান-সমিতির প্রধানতম কর্তব্য কি করে ফুলগাছ ইত্যাদির চাষ ভালভাবে করা যায় তা সবার সামনে তুলে ধরা, যাতে ফুলের প্রতি আকর্ষণ ফুলের প্রতি ভালবাসায় সহজেই রূপান্তরিত হয়। ফুলের প্রদর্শনী ফুলের প্রতি আকর্ষণকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, ফুলের প্রদর্শনীর বেলায় এ কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে।

প্রদর্শনীর উন্নত মানের ফুলগুলি যেমন জনমানসে সেই সব ফুল সম্পর্কে আগ্রহ জাগাবে, সেই একই প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই আগ্রহ তীব্র করে তুলতে হবে যাতে সে গাছগুলি অনেকেই চাষ করতে আরম্ভ করেন। অনেকের মনেই এই ভুল ধারণা রয়েছে যে উঁচুমানের ফুল করা বা বিশিষ্ট অনেক ফুলের চাষ বুঝি সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমেই কোন ফুলের কিরকম চাষ তা তুলে ধরলে এই ভুল ধারণা দূর হবে এবং আরও অনেকে ফুলের চাষে এগিয়ে আসবেন। একাজ পুস্তিকা, পত্রিকা, কলার-স্লাইড সহযোগে বক্তৃতার মাধ্যমে সহজেই করা যেতে পারে।

**প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি ॥**

প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার প্রস্তুতি আরম্ভ হতে হবে প্রতিযোগিতার অনেক দিন থেকেই। ক্যাকটাস, অর্কিড প্রভৃতির প্রস্তুতি দরকার অনেক বছর আগে থেকেই এবং ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতির বেলায় তা প্রদর্শনীর কতদিন আগে লাগালে উপযুক্ত সময়ে ফুটবে তা দেখে নিয়ে সেই সময়ে লাগাতে হবে। প্রত্যেক প্রদর্শনীর আগে তার একটি শিডিউল বার করা হয়ে থাকে, এটি দেখে কোন কোন বিভাগে অংশ নেবেন ঠিক করে তার জন্য প্রস্তুতি চালাবেন। যে যে বিভাগে ভাল ফল দেখাবার সম্ভাবনা রয়েছে সেই সব বিভাগে যোগ দেওয়াই ভাল। প্রতিযোগিতার নিয়মগুলি ভাল করে দেখে নেবেন এবং এটি প্রদর্শনীতে সাজাবার সময়েও সঙ্গে রাখবেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার প্রস্তুতি হিসাবে সব সময়ে গাছ কিছু বেশি সংখ্যায় লাগানো দরকার, কারণ সব গাছ আশানুরূপ ভাবে বেড়ে নাও উঠতে পারে। প্রদর্শনী ভাল করে অনুধাবন করলে ফুলের মান কিরকম ভাল হওয়া উচিত সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে। কোন্ প্রজাতির ফুলগুলি বা গাছ সাধারণত জেতে, কোন্ রঙের ফুলের পাশে কোন্ রঙ বেশি মানানসই, ফুল কিভাবে সাজালে তা আরও ভাল দেখায়, এই সব প্রদর্শনীর সাহায্যে নিজে নিজে ভাল করে জেনে নিতে হবে। অনেক সময়ে প্রদর্শনীতে এরকম গাছ আসে যা দুষ্প্রাপ্য কিন্তু তার ফুল বা গাছ যথেষ্ট উন্নত মানের নয়। প্রতিযোগিতায় এদের সমাদর লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই কারণ কোন্ গাছ বা ফুল কত ভাল করা যেতে পারে এটা তারই প্রতিযোগিতা।

**প্রতিযোগিতায় সাজানো ॥**

প্রতিযোগী দ্রষ্টব্যগুলি কি ভাবে সাজালে তা সবচেয়ে ভাল দেখায় তা প্রতিযোগিতার আগে নিজেদের বাগানে সাজিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। কেটে আনা ফুলের বেলায় বাগান থেকে ফুল কাটার সময় থেকেই ফুলের কাটা ডাঁটির দিক সব সময়ে জলের ভেতরে থাকবে। প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবার পথে যাতে পাপড়ি খসে না যায় সে বিষয়েও সাবধান হবেন। প্রদর্শনীতে সাজাবার ঠিক আগে কতটা ডাঁটি রেখে কাটতে হবে তা ঠিক করে নিয়ে বালতির জলের ভেতরে ডাঁটি কাটতে হবে, জলের ভেতরে রেখে কাটার জন্য এয়ার লক্ হবার আশঙ্কা কমে যাবে। ফুল ঠিক জায়গায় রাখার কাজে ফ্লোরাল পিন-হোলডার ব্যবহার করা উচিত। এখানে এখনো বালি ব্যবহার করা হয় ফুল ঠিক জায়গায় রাখতে, কিন্তু এতে খুব সহজেই এয়ার লক্ হতে পারে। সাজাবার পরে ফুলদানিতে জল দিতে ভুলবেন না।

**ভারতে তৈরী সংকর প্রজাতিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা ॥**

আজকাল ভারতেই বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ফুলের সংকর প্রজাতি তৈরী করা হচ্ছে। এই তালিকায় রয়েছে গোলাপ, ডালিয়া, জবা, বুগেনভিলিয়া প্রভৃতি ফুলগাছ। এ দেশে হয়েছে এরকম সংকর প্রজাতিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরতে প্রতিযোগিতায় এ রকম কিছু বিভাগের প্রবর্তন করতে হবে যে বিভাগে শুধু এগুলি অংশ নিতে পারবে। এই সব বিভাগে বিদেশ থেকে আসা ফুলগুলি অংশ নিতে পারবে না কিন্তু ভারতীয় সংকর প্রজাতিগুলি অন্যান্য যে কোন বিভাগেই অংশ নিতে পারবে। বিদেশী ফুলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার বেলায় ভারতীয় সংকর প্রজাতিগুলির মানের তুলনামূলক বিচার সম্ভব হবে, আবার শুধু দেশী সংকর প্রজাতিগুলির ভেতরে প্রতিযোগিতা থাকায় এদের জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সহজ হবে।

**প্রদর্শনীতে ফুলের বিচার ॥**

কোন ফুলের উঁচু মানের ফুল হিসাবে পরিচিত হতে গেলে তার কি কি গুণ থাকা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা সেই সব ফুলের উপরে লেখা বইতে পাওয়া যাবে। কিন্তু শুধু লেখা পড়ে এ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব নয়। প্রদর্শনীর উচ্চ-সম্মানিত ফুলগুলি, উঁচু মানের ফুল কি হওয়া উচিত তার সার্থক দৃষ্টান্তের কাজ করে। প্রদর্শনীর এই বিশেষ দিকটির কথা মনে রেখে ফুলের বিচার করতে হবে, নইলে প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। ফুল বা অন্য কোন প্রদর্শিত বস্তু যথেষ্ট উচ্চমানের না হলেও তাদের উচ্চ সম্মান দেবার প্রবণতা এখানের প্রতিযোগিতায় খুবই বেশি দেখা যায়। এর ফল হয় এই, যেহেতু নিকৃষ্ট মানের ফুলের সাহায্যেই প্রতিযোগিতায় উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন তাই প্রতিযোগীরা আগামী প্রতিযোগিতায় সেই সব ফুলের মান বাড়াতে সচেষ্ট হবার দরকার বোধ করেন না ; এবং দর্শকরাও উচ্চ সম্মান লাভকারী নিকৃষ্ট ফুল দেখে তাদেরই উচ্চ মানের ফুল বলে মনে করে নেন, এর ফলে ভাল ফুল বলতে সত্যিই কি বোঝায় সে ধারণা তাঁদের কাছে পরিষ্কার হতে পারে না। কথাটি শুনতে স্ব-বিরোধী মনে হলেও এটি খুবই সত্য যে ফুলের উৎকর্ষ যত বেশি হবে সবার মনে তার আকর্ষণ হবে ততই বেশি। একই সঙ্গে, যে ফুল যত বেশি আকর্ষণ করে, তার চাষ করতে আমরা তত বেশি উৎসাহিত বোধ করি। এখনকার বিচারে এটা হামেশাই দেখা যাবে যে নিকৃষ্ট মানের ফুল উচ্চ সম্মান লাভ করছে। অথচ এর সুষ্ঠু প্রতিকার করা মোটেই কঠিন নয়। উপযুক্ত মানের ফুল না থাকলে সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার বা অন্য উচ্চ পুরস্কার যেন না দেওয়া হয়। এ দেশেই কুকুরের প্রদর্শনীতে উপযুক্ত মানের কুকুর না থাকলে বিচার আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরস্কার দিয়ে। ঠিক একই পদ্ধতির কথা ফুল বিচারের নিয়মেও লেখা আছে, তাই এটা প্রবর্তনের কোন বাধা থাকতে পারে না। বর্তমানে ফুলের প্রতিযোগিতার বেলায় আরও একটি জিনিস

দেখা যায় যে একই বিভাগে অন্তত তিনটি প্রতিযোগী দ্রষ্টব্য না থাকলে তা অনেক সময়ে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে এদের ভেতরে খুব উ'চু দরের দ্রষ্টব্য থাকলেও সেটি তার যোগ্য সমাদর লাভ করে না। দ্রষ্টব্যের সংখ্যা যাই হোক না কেন, তাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে। এবং যে সব প্রতিযোগিতায় অনেক উচ্চমানের দ্রষ্টব্য এসেছে তাদের বেলায় পুরস্কারের সংখ্যাও বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেক উন্নত দেশে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বিচার করার উপযুক্ততা লাভ করতে হয়। ফুলের উন্নতির স্বার্থে এ দেশেও এ ব্যবস্থা মেনে নেবার দিন এসেছে। বিভিন্ন ফুল বিচারের নিয়মাবলী যথাযথ অনুসরণ করলেও বর্তমানের অনেক অসুবিধা সহজেই দূর হতে পারে।

**পুরস্কার কি দেওয়া হবে ॥**

কিছুদিন আগে পর্যন্তও ফুলের প্রতিযোগিতা একরকম শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিদের ভেতরে সীমাবন্ধ ছিল। কিন্তু আজকাল সাধারণ বিত্তবানেরাও প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। পুরস্কার হিসাবে কাপ, মেডেলের ব্যবহার চলে আসছে অনেক দিন ধরে। কিন্তু এগুলি কোন কাজেই লাগে না যদিও এর সঙ্গের মানপত্রের নিশ্চয়ই খুবই মূল্য রয়েছে। এই গতানুগতিক পুরস্কার পালটে এমন পুরস্কার দেওয়া দরকার যা পুরস্কার-বিজয়ীর সত্যিকারের কাজে লাগবে।

**সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার বাধা ॥**

প্রতিযোগী ফুল ইত্যাদি নিজে চাষ করতে হবে অথবা নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ হতে হবে, এটি সব ফুলের প্রতিযোগিতার একটি বিশিষ্ট নিয়ম। অথচ এ নিয়ম যে মোটেই যথাযথ পালিত হয় না তা প্রদর্শনী সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজ নিলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে। অনেক উন্নত মানের ফুল স্থানীয় ব্যক্তিদের নামে প্রদর্শিত হলেও তা অনেক সময়ে দু-পাঁচ দিন আগে কিনে নিয়ে আসা হয় সুদূর অঞ্চলগুলি থেকে। এভাবে পশ্চিম বাংলা-সংলগ্ন বিহার থেকে আসে গোলাপ, কালিম্পং থেকে আসে ক্যাকটাস, বাঙ্গালোর থেকে আসে পাতাবাহার ; অতীতে এমন কি ফুলফোটা অর্কিডও এসেছে পাশ্চাত্যের দেশ থেকে। এ ছাড়াও রয়েছে ভাল ফুল ইত্যাদি ফুলচাষীর কাছ থেকে ঠিক প্রদর্শনীর আগে কিনে নেওয়া। এভাবে কিছু ব্যক্তি উচ্চ পুরস্কার পান ঠিকই কিন্তু এতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বজায় থাকে না। এ ছাড়াও ফুলের প্রদর্শনীতে গাছ চুরি যাওয়া বা বিচারের আগেই দ্রষ্টব্যের ক্ষতি করা লেগেই রয়েছে। প্রদর্শনী ভাল করতে এই সব বাধা সমূলে দূর করার কাজে আমাদের সচেষ্ট হতেই হবে।

**ফুলের প্রদর্শনী কোথায় হয় ॥**

সমতল বাংলায় ফুলের প্রদর্শনী বেশি হয় তা নয়, তবে ইদানীং নতুন নতুন ছোটখাটো প্রদর্শনী এদিক ওদিক হচ্ছে। সমতল বাংলার বিশিষ্ট তিনটি প্রদর্শনীর প্রথমটি বিধানসভা বাগানে চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনী, এটি সাধারণত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি দি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইনডিয়ার ( ১ আলিপুর রোড ) জানুয়ারীর ফুলের প্রদর্শনী এবং তৃতীয়টি এই সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনী। এই তৃতীয় ফুলের প্রদর্শনীটিই সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী। এটি সাধারণত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে হয়ে থাকে।

# পাখি ও ফুলবাগান

ঝুমকোর ফুল ফোটে সকালে। দিনের সাথে প্রথম পরিচয়ের লজ্জায় ফুল অবনত-মুখী। ভ্রমর গুনগুনিয়ে আসুক বা নাই আসুক, মৌটুসি পাখি তার কাছে আসার চেষ্টা করবেই। বরেণ্য অতিথি সংকারের অধীর প্রতীক্ষায় ঝুমকো কাল কাটাচ্ছে, এ খবর পেঁছে গেছে ঝুমকো ফুটে উঠতেই। অতিথি-শ্রেষ্ঠ প্রমাণের সর্ত কিন্তু খুব সহজ নয়। ব্রীড়াবনতা ঝুমকোকে স্পর্শ না করে তার মধু-ভাণ্ডারের দ্বারের খোঁজ পেতে হবে। শুধু তবেই ঝুমকো তার মধু উজাড় করে সাদর আপ্যায়ন জানাবে এই বরেণ্য অতিথিকে। শ্রেষ্ঠ অতিথি প্রমাণ করার সুযোগ ছাড়তে রাজী নয় মৌটুসি। অতিথি বলে স্বীকৃত হবার আগে সে ঝুমকোকে তো স্পর্শ করবেই না, এমন কি কোন কিছু স্পর্শ না করে সেই দ্বারপ্রান্তে সে পেঁছুতে পারবে। বিদেশী হামিং বার্ডের মত হাওয়ায় এক জায়গাতেই সে ভেসে থাকতে পারে। যা পারে খুব কম পাখিই। ঝুমকোর রঙ হালকা নীলবেগনি, ফুলে মিষ্টি গন্ধ ও ফুলের বুকে মধুর খনি। খুব ছোট পাখি এই মৌটুসির গায়ের রঙ ঘন নীলবেগনি, রোদে এর গায়ের রঙ ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে, এবং পাখিটির ওড়ায় চমৎকার ছন্দ। ফুলের ভেতরে জিভ ও ঠোঁট ঢুকিয়ে নিস্তব্ধ ওড়ার সময়ে সুদর্শনা ফুল ও মনোহর পাখির নৈকট্য যে অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার তুলনা মেলা ভার। এ দৃশ্য দেখার পরে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই অপরূপ রূপসৃষ্টিতে অবদান কার বেশি—ফুলের না পাখির?

ফুলবাগানে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে শুধু মৌটুসি ও ঝুমকোই নয়। অনেক ফুলের সঙ্গে অনেক পাখির সম্পর্ক খুবই মধুর। অনেক পাখি আবার স্বভাবতই মনে করিয়ে দেয় অনেক ফুলের কথা। ফুলবাগানে পাখিদের নিত্য আনাগোনা। এ কথা আবার বেশি খাটে সুন্দর-স্বভাব পাখিদের বেলায়। কাক ফুলবাগানে বড় আসে না। তার এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে মনে মনে কিন্তু সবাই খুশি। সমতল বাংলার ফুলের বাগানে সহজেই দেখা মিলবে মৌটুসি, বেনে বৌ, দোয়েল, ফটিকজল, বাঁশপাতি, পাপিয়া, কোকিল, চাতক, হুপো, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি সুন্দর পাখির।

পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে ফুলবাগানের ভোরবেলা। ফুলেদের ফুটে উঠতে পাখিদের এ যেন সমবেত আহ্বান। রাতের অন্ধকার না কাটতেই কাকলির প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে জেগে উঠবে তরুলতারা। তারপরে অপেক্ষা করবে সূর্য-বন্দনার শুভ লগ্নের। পাখির যে কিন্নরকণ্ঠ তরুলতার সূর্য-বন্দনায় যোগ দেবে সে কণ্ঠ দোয়েলের। এর গান শুরু হবে রাতের অন্ধকার না কাটতেই। দোয়েল আয়তনে চড়াই পাখির চেয়ে কিছু বড়, গায়ের রঙ ঘন কালো ও পরিষ্কার সাদা। এবং দেখতে ভারি সুন্দর এর লেজ নাচানো। সব গাছের সঙ্গে দোয়েলের মিতালি। খুব ভোরবেলায় দেখা যাবে কোন গাছের সুউচ্চ ডালে বসে দোয়েল তান লয় ঠিক রেখে বিভোর হয়ে গান গেয়ে চলেছে। দোয়েল গান গায় অনেক সময় ধরে। এবং এটি সমতল বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক পাখি। দুপুরে বা দিনের অন্যান্য সময়েও দোয়েল গান গায় কিন্তু ভোরসকালের গানই তার সঙ্গীত মাধুর্যে সবার চিত্ত জয় করে নেবে। ফুলবাগানে দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা পাওয়া যাবে আরও অনেক পাখির। হলদে ও কালো রঙের শালিখের মত দেখতে যে পাখিটির দেখা মিলবে সেটি অনেকের মতে সমতল বাংলার সবচেয়ে সুন্দর পাখি। পাখিটির নাম বেনে বৌ বা হলদে পাখি। বেনে বৌর মাথা, ডানার বেশ কিছুটা জায়গা এবং লেজের কিছুটা জায়গা ঘন কালো ; শরীরের আর একরকম সব জায়গা সোনালী হলদে রঙের। এ পাখিটি সর্বজনপ্রিয়, সাহিত্যেও হলদে পাখির বিশেষ সমাদর। গ্রীষ্মকালে এর অপূর্ব সুধাকণ্ঠে 'চোখ গেল', 'ইষ্টি কুটুম', 'খোকা হোক' প্রভৃতি ধ্বনির ডাক সমস্ত জায়গাটি মাতিয়ে রাখে। গ্রীষ্মের কণ্ঠমাধুর্য হারিয়ে ফেললেও অন্যান্য সময়েও বেনে বৌর ডাক

চমৎকার মিষ্টি। পাখিটি অতি শান্ত স্বভাবের এবং এটি সদা আনন্দময়। এর উচ্ছল আনন্দের প্রকাশ মিলবে এর নেচে নেচে চলার ভঙ্গিতে, থেকে থেকেই এর উদ্বেল সুধাস্বরের ডাকে। একে দেখে মনে হবে পৃথিবীর দুঃখকষ্ট তার লম্বা হাত বাড়িয়েছে ঠিকই কিন্তু তা বেনে বৌর নাগাল পায়নি। হলদে পাখি থাকে জোড়ায় জোড়ায় এবং এরা মাটিতে কখনও নামতে চায় না। মনে ভয়, মাটির সংস্পর্শে পাছে তার অনাবিল আনন্দ মাটি হয়ে যায়। সব গাছের ভেতরেই বেনে বৌ চমৎকার মানানসই, তবুও একে আরও বেশি ভাল লাগবে একদল পাপড়ির ছোট সূর্যমুখীর পাশে। এ ফুলের রঙও হলদে ও কালো। এর পাশে বেনে বৌকে দেখে মনে হবে, কোন যাদুমন্ত্রে সূর্যমুখী গতি পেয়ে পাখি হয়ে গেছে। দোয়েল ও হলদে পাখির মত সকাল বেলার দিকেই বেশি দেখা যাবে হুপোদের। পাখিটির শালিখের চেয়ে হালকা গড়ন কিন্তু লম্বায় বেশ কিছুটা বড়। হুপোর গায়ের বেশি জায়গার রঙ খয়েরি ধরনের, লম্বা ঝুঁটি ও ডানায় সাদাকালো ডোরা কাটা—এদের এই সাদাকালো ডোরা জেব্রার কথা মনে করিয়ে দেবে। হুপোর ডোরাকাটা রঙের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এরকম ডালিয়া ও গোলাপের অনেক প্রজাতি পাওয়া যাবে। কিন্তু যে ফুলটিকে ফুলগাছের জগতের হুপো বলা যেতে পারে সে লতানো ফুলগাছটির নাম একটি পাখির নামে—ঘুঘুলতা। এই ফুলটির গড়ন ও রঙ হুপোর মতই বিস্ময় সৃষ্টি করে। হুপোর জমিতে হেঁটে চলার ভঙ্গি সুন্দর এবং এদের খুব সুন্দর দেখায় ওড়ার প্রস্তুতি হিসাবে পাখা মেলে দেবার সময়ে। মা-হুপোর বাচ্চাকে খাবার খুঁটে খেতে শেখাবার দৃশ্য বড়ই অদ্ভুত। মার দেখাদেখি বাচ্চা হুপোও মাটির ভেতরে ঠোঁট চালিয়ে যায়, কিন্তু কি খুঁজবে বা কেমন করে খুঁজবে তা ভেবে পায় না। মাঝে মাঝেই সে বকাসুরের মত লম্বা ঠোঁট হাঁ করে মার কাছে ছুটে যায় খাবারের প্রত্যাশায়।

দুপুরে পাখি ডাকে কম। তবে মধ্যদিনে সব পাখি গান বন্ধ করে তাও নয়। দুপুরেই ফিঙের গান বেশি শোনা যাবে, এ সময়েই শোনা যাবে ফটিক জলের অনিন্দিত সুরেলা ডাক এবং ছোট বসন্ত বউড়ির গলা। সুমধুর বিলম্বিত ডাক 'ফ-টি-ক জল' শোনা যাবে প্রায়ই কিন্তু পাখিটির দেখা পাওয়া ভার। এটি পাখি-জগতের লজ্জাবতী লতা। সদাই সঙ্কোচ, সদাই ভয় পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে। এর মিষ্টি ডাক অনুসরণ করে পাখিটিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেই ফটিক জল ডাকা বন্ধ করে লুকিয়ে পড়বে। তাই একে খুঁজে বার করতে হবে সন্তর্পণে—তাকেই খুঁজছি এ সন্দেহ যেন এই লজ্জাবতীর মনে না জাগে। ফটিক জল চড়াই-এর চেয়ে দেখতে ছোট ও অনেক পাতলা গড়নের। এর গায়ের রঙ প্রধানত হলদেটে রঙের এবং পিঠের কিছুটা অংশ কালো। মধ্যদিনে যে পাখিটি ফুলবাগান শব্দময় করে তোলে তারই নাম ছোট বসন্ত বউড়ি। এর ক্ষুদ্র আয়তন ও উচ্চগ্রামে ডাকার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট'-এর

"এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।"

—পংক্তি দুটিই মনে পড়বে। ছোট বসন্ত বউড়ি আয়তনে চড়াই পাখির মত কিন্তু বেশ গোলগাল তাই দেখতে বড়ই লাগে। পাখিটির মাথার ও গলার কিছুটা করে জায়গা ঘন লাল, গলার কিছুটা ও চোখের পাশের জায়গা হলদে ; এবং এছাড়া অন্যান্য অনেক জায়গার রঙ কোন না কোন ধরনের সবুজ। ছোট বসন্ত বউরিকে দেখে নয়নমণি ফুলের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। নয়নমণির গড়ন সুইটপীর মত তবে তা লম্বায় অনেক বড়, ফুল ফোটে অদ্ভুত ধরনের থোকায়। ফুলের রঙ উজ্জ্বল লাল এবং এই লালফুলের মাঝখানটি কালো রঙের। ছোট বসন্ত বউড়ি ও নয়নমণি এই দুয়ের বেলাতেই এরকম রঙ রয়েছে সাধারণত যার একটির সঙ্গে অন্যটি ভাল মেলে না। কিন্তু নয়নমণির বেলায় আপাত বিপরীতধর্মী রঙের সমাবেশ অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে ছোট বসন্ত বউড়ির গায়ের রঙের সমাবেশ চক্ষুপীড়ার কারণ হয়েছে মাত্র। এই পাখিটিকে দেখে শরৎচন্দ্রের সেই অরক্ষণীয়া কন্যার স্মৃতি জাগবে, যে সুন্দর হয়ে সাজার প্রচেষ্টায়

সঙে পরিণত হয়েছিল। ছোট বসন্ত বউড়ির সৌন্দর্য সম্পর্কে যার যত নিচু ধারণা হোক না কেন, গলাবাজিতে বিরাম দিতে সে মোটেই রাজী নয়—সুউচ্চ ডালে বসে সে ডেকে চলেছে 'টং টং টং'।

মধ্যদিনের ফিঙে গান গায় বেশি। এর গানের কলি দোয়েলের মত দীর্ঘ নয়, কিন্তু ফিঙে মধুকণ্ঠের অধিকারী। কাছাকাছি গেলেও পাখিটি ভয় পায় না বা গান বন্ধ করে না। ফিঙেকে যত ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখতে পেয়েছি ততই মুগ্ধ হতে হয়েছে। এটি দেখতে কালো কুচকুচে, পাতলা গড়নের, এবং লম্বা দুফাঁক লেজ নিয়ে আয়তনে শালিখের চেয়ে কিছু বড়। পাখিটিকে কিছুতেই সুন্দর বা শ্রীমণ্ডিত বলা চলে না। তবে শ্রীহীন চাঁপা ফুলের মত এর গুণপনাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ফিঙের বুকে অদম্য সাহস এবং অন্যায়ের প্রতিবাদের এটি মূর্ত প্রতীক। ফিঙেকে দেখে মনে হয়েছে এটি যেন পাখির জগতে বাঙালীর সার্থক প্রতিভূ। অনেক মানুষের মত কাকের স্বভাব অকারণে অন্যের পেছনে লাগা। তুলনায় ফিঙে আয়তনে অনেক ছোট হলেও এর কাছে কাক পুরোপুরি জব্দ। ফিঙের ভয়ে কাক এর বাসস্থানের চৌহদ্দির ভেতরে আসে না। কোন কারণে ঢুকে পড়লে ফিঙের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে কাক পালিয়ে বাঁচে। অন্যায়কারী পাখিদের বেলায় ফিঙে লড়াকু হলেও, সজ্জন পাখিদের সে প্রাণের বন্ধু। ফিঙে অন্য পাখির বা বেড়ালের ডাক প্রভৃতি অদ্ভুত অনুকরণ করতে পারে। জানা না থাকলে এ ধরনের অনুকরণ হঠাৎ শুনে চমকে যেতে হবে।

গোধূলিতে অনেক পাখি দিনকে বিদায় জানাবার উৎসবে মেতে ওঠে। ফিঙেরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে সভা করবে। এদের অন্যদের ডাক অনুকরণ করতে এবং আকাশে উড়ে ডিগবাজি খেতে বেশি দেখা যাবে এই সময়েই। তবে ডিগবাজি খাবার সত্যিকারের ওস্তাদজী নীলকণ্ঠ পাখি। ফুলবাগানে অর্কচূড়ের বড় গাছ থাকলে নীলকণ্ঠ সেই গাছই বেছে নেবে, না থাকলে অন্য কোন বড় গাছ থেকে উড়বে। গোধূলি বেলায় নীলকণ্ঠ অর্কচূড়ের সরু মাথা থেকে সোঁ করে উপরের দিকে অনেকটা উড়ে গিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসে। গাছের সেই একই জায়গায় ফিরে এসে আবার উড়ে যাবে ডিগবাজি খেতে। এভাবে চলতে থাকে অনেক সময় ধরে। নীলকণ্ঠের শূন্যে ডিগবাজি তারিফ করে দেখার মত। পাখিটির নীলকণ্ঠ নামটি সুন্দর কিন্তু তা বাস্তবানুগ নয় মোটেই। এর কণ্ঠের রঙ নীল না হয়ে ধূসর বা ফিকে লাল, যদিও এর শরীরের বেশি ভাগ জায়গা কোন না কোন পর্দার নীলরঙের। নীলকণ্ঠ আয়তনে শালিখের দেড়গুণের চেয়ে বড় এবং চেহারা গোলগাল ধরনের। জমিতে বসে পাখা ছড়িয়ে রোদ পোয়ানো নীলকণ্ঠের বিলাস এবং এ অবস্থায় একে দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। গোধূলি গড়িয়ে ফুলবাগানে সন্ধ্যা নামে। এ সময়েও দেখা যাবে দোয়েল এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুলবাগানের মায়া কাটিয়ে রাতের বিশ্রাম নিতেও তার মন চাইছে না। রাতে ফুলবাগানে রয়েছে রাত-চরা পাখিরা, যদিও তাদের দেখা পাওয়া সহজ নয়। গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাতে ফুলবাগানের শোভায় পাপিয়া নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বিহ্বল পুলকে পাপিয়া ডেকে চলে অবিরাম। এ সময়ে মাঝে মাঝে কোকিলও তার বীণানিন্দিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে কুহুতান। এদের হর্ষে সাড়া দিয়ে রাতে ফুটে ওঠে মধুচন্দ্রা। যার সুন্দর ফুলের রঙ তুহিনশুভ্র এবং যার সুগন্ধ ভুলবার নয়। চাঁদের হাসি, পাখির সুমধুর ডাক, ফুলের রূপ ও গন্ধ ফুলবাগানকে পরিণত করে এক অপার্থিব লোকে।

যেসব পাখিকে ফুলবাগানে দেখা যাবে সারাদিন তাদের ভেতরে টুনটুনি, বুলবুলি, বাঁশপাতি, কাঠঠোকরা, চণক প্রভৃতি প্রধান। টুনটুনি শিশুসাহিত্যের প্রধান পাখিচরিত্র—যদি না দেখে থাকি তাহলেও এর সাথে আমাদের আশৈশব পরিচয়। টুনটুনি লম্বায় প্রায় চড়াই পাখির মত কিন্তু খুব হালকা গড়নের। এটি দেখতে খুবই সাধারণ, কিন্তু ফুলগাছের ভেতরে লেজ উঁচু করে এর অবিরাম নেচে নেচে চলা এবং এর উৎফুল্ল টিটিচক-টিটিচক-টিটিচক ডাক সহজেই মন ভরিয়ে দেয়। বুলবুলি দেখা যাবে কয়েক রকমের এবং এদের সবাই ঝুঁটিধারী। এদের মারামারি করার ধরন বেশ অদ্ভুত। এক জায়গায়

বসে নিজেকে রাগে ফুলিয়ে নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে সোজা ছুটে যায়। প্রতিপক্ষকে বাগে না পেলে আবার কোথাও বসে নিজেকে ফুলিয়ে নিয়ে তার দিকে ছুটে যাবে। বাঁশপাতির গায়ের রঙ কাঁচ বাঁশপাতার মত এবং গড়নও খুব হালকা ধরনের। এর লেজের দুটি বড় পালক খুব সরু হয়ে নেমে আসে এবং বাঁশপাতি লম্বায় শালিখের মত। বাঁশপাতির ওড়ার ভঙ্গি যেন হাওয়ায় ভেসে চলা। অনেক বাঁশপাতি যখন একসঙ্গে কোন অল্প জায়গায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তখন বড় ভাল দেখায়। কয়েক ধরনের কাঠঠোকরা ফুলবাগানে দেখা যাবে যাদের ভেতরে সোনালী-পিঠ কাঠঠোকরা সহজেই চোখে পড়ে। এরা আমাদের বিশেষ পরিচিত পাখি এবং কাঠঠোকরা শিশুসাহিত্যের বহু গল্পের নায়ক। ঘুঘুও আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, দুপুরে এর লম্বা ডাক খুবই শোনা যায়। ঘুঘু নামটি অনেক দুর্নামের বাহন, কিন্তু দুর্নামের উৎস এই পাখিটি আসলে অত্যন্ত নিরীহ স্বভাবের। মানুষের সঙ্গে মিতালি করতে এটি উৎসুক—বাধা না দিলে ঘরের বারান্দায় এসে বাসা বাঁধতেও ঘুঘুর মোটেই আপত্তি নেই। শালিখ ফুলবাগান থেকে একটু দূরে দূরেই থাকে, কিন্তু পালতে মাদার ফুটলে সাধারণ শালিখ, গাং শালিখ ও ঝুঁটি শালিখ আগেভাগেই এসে ফুলগাছটিকে অধিকার করে নেয় পুরোপুরি ভাবে। বুঝি সারাবছরের অবহেলা এই ক'দিনের অকুণ্ঠ ভালবাসায় জুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। ফুলবাগানে এরকম দৃশ্য অসম্ভব নয় যে দূর থেকে দেখা ফুলগুলি হঠাৎ উড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। অথচ, ফুলের উড়বার ইচ্ছা থাকলেও ওড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ গাছের ভালবাসার সে বন্দী। ভাল করে দেখে বোঝা যাবে দূর থেকে দেখা ফুলগুলি আসলে চণক পাখি। এই পাখিটি আয়তনে চড়াই-এর মত কিন্তু পাতলা গড়নের। একসঙ্গে অনেকগুলি চণক মিলেমিশে থাকে এবং মাঝে মাঝে দলের সব পাখিগুলি একই গাছের মাথার ডালগুলি অধিকার করে বসে থাকে। চণকের গায়ের উজ্জ্বল রঙের অংশগুলি চোখে পড়ে দূরে থেকেও, এবং দেখার ভুলে এই উজ্জ্বল অংশগুলি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

বসন্ত ও গ্রীষ্মে পাখিদের মনে বয়ে চলে সুখের হিল্লোল। অনেকে এতদিন সবার চোখের আড়ালে থাকার সাধনায় ব্যস্ত ছিল, তারা এবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অনেকে এতদিন স্রেফ মৌনীবাবা বনে গিয়েছিল, এখন তারা সুরেলা কণ্ঠ নিয়ে আসর জমাতে সচেষ্ট। অনেক পাখির কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য উন্নতি ঘটে এই সময়ে। এ সময়ের ফুলবাগানে কোকিলের মন মাতানো কুহু ধ্বনি শোনা যাবে প্রায়ই, পাপিয়াও একনাগাড়ে ডেকে চলে। বিভিন্ন পাখির ডাকে এসময়ে আকাশ বাতাস মুখরিত। বসন্তকালে পাখিদের সৌন্দর্যও বেড়ে যায় অনেকগুণে—বিশেষ করে পুরুষ পাখিদের। পুরুষ পাখির পাশে অনেক মেয়ে পাখিই হীনপ্রভ। কোকিল, দোয়েল, সোনালী-পিঠ কাঠঠোকরা, ফটিক জল, মৌটুসি, চণক, শাহী বুলবুল, বেনে বৌর মাথা কালো নয়, প্রজাতির মেয়ে পাখিরা এদের পুরুষ পাখিদের চেয়ে দেখতে বেশ কিছুটা আলাদা। পুরুষ পাখিদের প্রাধান্য আরও একটি বড় কারণে—পাখিদের পরিচয় দেবার বেলায় তা পুরুষ পাখিকে কেন্দ্র করেই প্রধানত করা হয়। জানা না থাকলে সর্বজনপ্রিয় কোকিলের মেয়ে পাখিটিকে আলাদা কোন পাখি বলে মনে হবে। মেয়ে কোকিলের গায়ের রঙ কালচে ধূসর এবং এই রঙের উপরে অজস্র ছোট ছোট ছিটে সাদা দাগ। পাপিয়া ঘুঘুর চেয়ে কিছুটা বড় এবং দেখতে অনেকটা শিকরে বাজের মত। পাখিটি খুবই শান্ত ও লাজুকও, তাই ডাকের অনুসরণ করে অনেক কষ্টে একে খুঁজে বার করতে হবে। পাপিয়ার ডাকের ধ্বনি অনেকটা হলদে পাখি ও অনেকটা কোকিলের মত। বসন্তে পাখিরা পুলকে উচ্ছল, পাখিদের এই বসন্তোৎসবে অংশ নিতে ফুলবাগানের অনেক গাছ নিজেদের সাজিয়ে তোলে উৎসবের সাজে। তাই এ সময়ে রক্তোপল, পলাশ, সোনালী শিমুল, শিমুল, বরুণ, নীলমণিলতা প্রভৃতি অনেক গাছ ফুলে ফুলময় হয়ে ওঠে। বসন্তের ফুলবাগান সত্যই উৎসবমুখর।

গ্রীষ্মকালে পাখিদের বাসা বাঁধার পালা। যারা বাসা বাঁধে তারা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বার করে। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে বেনে বৌর মত অনেক নিরীহ পাখি বাসা বাঁধে ফিঙের বাসার কাছে। ডিম বা বাচ্চা চুরি করে নিতে আসে কাক, আসে বাজ

প্রভৃতি অনেক পাখি। ফিঙে কাছাকাছি থাকলে কাক বা অন্য অনেক পাখিকে তাড়া খেয়ে ফিরতে হয়। একদিকে অনেক পাখি যেমন ডিমের পরিচর্যায় ব্যস্ত, অন্যদিকে কোকিল, পাপিয়া, চাতক প্রভৃতি পরভৃত পাখিরা সব সময়েই চেষ্টা চালায় কি করে ফাঁকি দিয়ে অন্যের ঘাড়ে সন্তান প্রতিপালনের ভার গছিয়ে দেওয়া যায়।

কিছু যাযাবর পাখি সমতল বাংলার ফুলবাগানে এসে আশ্রয় নেয় কিছুদিনের জন্য। শীতকালে দেখা যাবে খঞ্জনদের, চলার সময়ে অনলস লেজ নাচানো এদের সাধনা। শীতের শেষে এদের আবার নতুন দেশের অভিমুখে যাত্রা করার পালা। শীতকালে আরও দেখা যাবে পাহাড়ী ময়নাকে। শীতে হিমরঞ্জন যখন মৃতের অভিনয় করছে তখন তার মগডালে এই ময়নার সাক্ষাৎ পাবার বেশি সম্ভাবনা। সমতল বাংলাতে কিছু পাহাড়ী ময়না স্থায়ী ভাবে বাসও করছে বলে মনে হয়। বর্ষার ঠিক আগে আসে চাতক এবং থেকে যায় শরতের শেষ পর্যন্ত। এটি দেখতে অনেকটা বুলবুলির মত, তবে দেখতে আরও বড় ও আরও সুন্দর। বেনে বৌর মাথা কালো নয়, প্রজাতিটিও কখনও কখনও আসে সমতল বাংলার ফুলবাগানে। শাহী বুলবুল, যার অন্য নাম পারিজাত বিহঙ্গ, ঘন জঙ্গলে থাকতে ভালবাসে, কিন্তু সেও কখনও কখনও আসে ফুলবাগানে। বুলবুলির মত কিছুটা দেখতে বলে এর নামেতে বুলবুল কথাটি রয়েছে, আসলে কিন্তু বুলবুলির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। পারিজাত বিহঙ্গের রূপ অতুলনীয়, যেমনি অতুলনীয় ইন্দ্রাণীর ফুল। পাখিটির রঙ নীলচে কালো ও ধপধপে সাদা, এবং এর লম্বা লেজ দেখার মত। যথাযোগ্য পরিচর্যা করতে পারলে ইন্দ্রাণীর ফুল সমতল বাংলাতেও ফোটানো সম্ভব। এর ফুল দেখে মনে হবে কোন পাখি যেন পাখা মেলে উড়ে যাবার মুখে। ইন্দ্রাণীর ফুলের রঙ কমলা ও নীল। অভিনব-দর্শন পারিজাত বিহঙ্গ ও ইন্দ্রাণী এই দুটিই স্বর্গীয় সুষমার পরিপূর্ণ আধার।

কট্টর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র দেখার উপায় হোক বলে অনেক সময়ে সোচ্চার দাবি ওঠে। সেক্ষেত্রে পাখির বর্ণাঢ্য রঙ, পাখির গান, ফুলের মনোমুগ্ধকর রূপ ও ফুলের সুগন্ধ তাদের জীবন সংগ্রামের অভিব্যক্তি মাত্র। অথচ ফুল, পাখি ও মানুষের ভেতরে একটি বিমল আনন্দের সম্পর্ক নেই এ কথা মেনে নিতে মন চায় না। এবং না চাওয়ার কারণেই রূপরসগন্ধময় এই জগতের সৃষ্টি। পাখি ও ফুল অন্য কোন উপকার যদি নাও করে, এরা আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে বলেই ফুল ও পাখির কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। এ ঋণ শোধ করা যায় না বা তার প্রশ্নও ওঠে না, কিন্তু তবুও এদের প্রতি আমাদের বেশ কিছু কর্তব্য রয়েছে। এবং এ কর্তব্য সম্পর্কে আর উদাসীন থাকা চলে না। ফুলের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ, এটি প্রকাশের একমাত্র উপায় ফুলের চাষের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। পাখিদের বেলায়ও এই একই কথা—এদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া। বুনো জাম, জিরগাছ প্রভৃতির ফল পাখিদের বিশেষ প্রিয়। এগুলি থাকলে সে ফুলবাগান পাখিদের আরও প্রিয় হয়ে উঠবে। খাবার দেওয়া হয়তো সহজ নয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে খাবার জলের ব্যবস্থা করে দিলে পাখিরা তা অতিকৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করবে। পাখিদের জন্য অভয়-অরণ্য স্থাপনের কথা শোনা যায়। পাখিদের কল্যাণ চাইলে সব ফুলবাগানকেই এক একটি অভয়-অরণ্য হয়ে উঠতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না অনেক পাখিই ফুল ও মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে। তাই ফুলবাগান যেন ফুল ও পাখি দুয়েরই নিরাপদ ও সুখের আশ্রয় হয়।

রূপকথায় পাখিরা তাদের রঙ পেয়েছে রামধনু থেকে এবং ফুলেরা তাদের রঙ পেতে সাহায্য পেয়েছে পাখিদের কাছ থেকে। রূপকথা শুধুই রূপকথা। কিন্তু ফুল-বাগানের সঙ্গে পাখির সম্পর্ক সত্যই সুনিবিড়। পাখি না থাকলে ফুলের সৌন্দর্য বিকশিত হয় না, পাখি না গাইলে ফুল উৎফুল্ল আনন্দে ফুটে ওঠে না। ফুল না থাকলে পাখির সৌন্দর্য থেকেও তা ম্রিয়মাণ, ফুলের সান্নিধ্য না পেলে পাখির গান নীরস ও প্রাণহীন। ফুল ও পাখি একে অন্যের সম্পূরক, একমাত্র এ দুয়ের সান্নিধ্য দুজনকেই পরিপূর্ণ করে তোলে।

[ উল্লিখিত পাখিদের পক্ষীবিদ্যার নাম :
মৌটুসি–Cynnyris asiaticus ; হামিং বার্ড–Trochilidae ; বেনে বৌ–Oriolus xanthornus ; দোয়েল–Copsychus saularis ; ফটিক জল–Aegithina tiphia ; বাঁশপাতি–Merops orientalis ; পাপিয়া–Cuculus varius ; কোকিল–Eudynamis scolopuceus ; চাতক–Clamator jacobinus ; হুদ্‌পো–Upupa epops ; নীলকণ্ঠ–Coracias bengalensis ; ছোট বসন্ত বউড়ি–Megalaima haemacephala ; চড়াই–Passer domesticus ; ফিঙে–Dicrurus macrocercus ; টুনটুনি–Orthotomus sutorius ; বুলবুলি–Molpastes ; সোনালী-পিঠ কাঠঠোকরা–Brachypternus bengalensis ; চণক–Pericrocotus ; ঘুঘু–Streptopelia ; শালিখ–Acridotheres ; ঝুঁটি শালিখ–Aethiopsar fuscus ; শাহী বুলবুল–Tchitrea paradisi ; বেনে বৌর মাথা কালো নয় প্রজাতি–Oriolus oriolus ; শিকরে বাজ–Astur ; কাক–Corvus ; খঞ্জন–Motacilla ; পাহাড়ী ময়না–Gracula religiosa. এবং গাছের উদ্ভিদবিদ্যার নাম : লজ্জাবতী–Mimosa pudica ; মধুচন্দ্রা–Ipomea bona-nox ; ইন্দ্রাণী–Strelitzia reginae ; ঘুঘুলতা–Aristolochia ; অন্য সব গাছের নাম বইয়ের যথাস্থানে রয়েছে ]

# ফুলবাগান ঘিরে নানান চিন্তা

ফুলবাগান ঘিরে নানান চিন্তা-ভাবনা রয়েছে এবং অবকাশ রয়েছে নানান বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার। ফুলবাগান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচলিত ধারণা রয়েছে যেগুলি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখারও দরকার রয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলির ভেতরে রয়েছে এরকম কতগুলি বিষয় যাদের সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার অবস্থা এখনও আসেনি। এবং একই সঙ্গে এদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত হবার দরকার রয়েছে। ফুলবাগান করার বিষয়ে এগিয়ে যেতে হলে তা হতে হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এবং এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকে।

**পাতার সার ॥**

গাছের পাতায় সার স্প্রে করলে তা গাছের খাদ্য যোগান দেবে, এ খবর বছর দশেক আগেও এ দেশে চমক জাগাতো। কিন্তু বেশ কিছু বছর আগে থেকে আমেরিকায় গাছের পাতায় সার ছেটানো ব্যাপক ভাবে চলে আসছে। এ দেশেও পাতার সার যে জনপ্রিয় হবেই তার সব লক্ষণই বর্তমান।

ফুল, ফল, শস্য প্রভৃতি অনেক কিছুর চাষেতেই এর ব্যবহার আরও ভাল ফুল ইত্যাদি পেতে বাড়তি সার হিসাবে। গাছের সারমাটি এবং অন্যান্য সার যেভাবে দেবার কথা তা একই ভাবে করতে হবে, এবং এসবের উপরে দেওয়া হবে এই পাতার সার। বিভিন্ন উপাদানের দুটি আলাদা দ্রবণের ব্যবহার পাতার সার হিসাবে। প্রথম পাতার সারটির কাজ গাছের প্রধান খাবারগুলির যোগান দেওয়া এবং দ্বিতীয় পাতার সারটির ব্যবহার খুব অল্প পরিমাণে যেসব সার অর্থাৎ ট্রেস এলিমেণ্ট দরকার তাদের যোগান দিতে।

পাতার সার দুটি বহু গাছের বেলায় ব্যবহার করা গেলেও কোন্ গাছে কতটা পরিমাণে, কোন্ উপাদানের ঠিক কতটা, গাছের বৃদ্ধির কোন্ সময়ে বা কতদিন অন্তর ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে তার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি এখনও গড়ে ওঠেনি। এবং এটা গড়ে ওঠেনি বলে সবাইকে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বার করে নিতে হবে।

প্রথমে অল্প কিছু গাছে পরীক্ষামূলক ভাবে দিয়ে ভাল ফল পাবার পরে সেই জাতির অন্যান্য গাছেও দিতে পারবেন। পাতার সার দেবার নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সযত্নে মেনে চলা উচিত। ( ১ ) এটি সকাল আটটা নাগাদ স্প্রে করা হবে। ( ২ ) দুটি পাতার সারকে কখনও একসঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করা চলবে না যদিও এদের যে কোনটির সঙ্গে ফলিডল প্রভৃতি কীটনাশক ওষুধ মেশানো চলবে। ( ৩ ) পাতার সারের প্রথমটি ব্যবহার করা চলে দিন দশেক অন্তর এবং দ্বিতীয় পাতার সারটি একমাস বা দুমাস অন্তর। দুটিরই সঠিক পরিমাণে মেশানো সার গাছের পক্ষে খুবই উপকারী ; পরিমাণে কম হলে তত ক্ষতি নেই কিন্তু বেশি হলে গাছের খুবই ক্ষতি হবে। ( ৫ ) পাতার সার ব্যবহার করা উচিত শীতকালে বা ঠান্ডা রয়েছে এরকম দিনে। ( ৬ ) দুটি পাতার সারের এক লিটার দ্রবণে এক থেকে দুই গ্রাম লিকুয়িড সোপ মিশিয়ে দিলে গাছের পাতায় সারটি লাগবে ভাল। ( ৭ ) পাতার সার প্রেশার স্প্রেয়ার দিয়ে এমন ভাবে ছেটাতে হবে যাতে সারটি পাতার দুদিকেই ভাল করে লাগে এবং ( ৮ ) পাতার সার ফুলে লাগলে তাতে দাগ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতে হবে।

গোলাপের চাষে দুটি পাতার সারেরই বহুল ব্যবহার এবং এর বেলায় সারের নির্দিষ্ট মাত্রাও গড়ে উঠেছে। 'গোলাপ' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। এর সারের নির্দিষ্ট মাত্রাটি সামনে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য ফুলগাছের উপযুক্ত সারের মাত্রা ঠিক করে নিতে পারেন।

**বিভিন্ন গাছের সংকর প্রজাতি সৃষ্টি ॥**

আগে অনেক বিশিষ্ট ফুলের সম্পর্কে ধারণা ছিল যে তাদের সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করা সমতল বাংলার জলবায়ুতে সম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে অনেক ফুলেরই সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করা এখানে সহজ সম্ভব। এই ফুলের ভেতরে প্রধান ডালিয়া, গোলাপ, বুগেনভিলিয়া, জবা ; এবং এছাড়া পাতাবাহার। সংকর প্রজাতি তৈরী করতে চাইলে সেই সব গাছের চাষ আগে ভালভাবে জেনে নিতে হবে। একই সঙ্গে এদের উঁচুদরের ফুল বলতে কি বোঝায় তাও খুব ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার। কারণ সংকর প্রজাতি তৈরী হলেও তা খুব উঁচু মানের না হলে তাকে ফুলবাগানে কেউ স্থান দিতে চাইবেন না।

সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে ফুলের প্রতি ভালবাসাই এর সবচেয়ে বড় মূলধন। উদ্ভিদবিজ্ঞানে কিছুটা দখল থাকলে নিশ্চয়ই ভাল কিন্তু না থাকলেও কাজ মোটেই আটকাবে না। উপরে গাছগুলির ভেতরেও ডালিয়ার সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করা সবচেয়ে সহজ এবং সমতল বাংলায় এর ভবিষ্যতও খুবই উজ্জ্বল। সব সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজেই বিপুল আনন্দ লাভ করা সম্ভব এবং এ কাজ করার খরচও খুব কিছু নয়। সংকর প্রজাতির নামকরণের অধিকার যিনি এর সৃষ্টিতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিচ্ছেন তাঁর। সংকর প্রজাতি তৈরী সম্পর্কে এ বইয়ে অন্যান্য জায়গায়ও আলোচনা করা হয়েছে। দেশে প্ল্যাণ্ট পেটেণ্ট এ্যাক্ট বলবৎ থাকলে উন্নত সংকর প্রজাতি এর সৃষ্টিতে সাহায্যকারীকে ভাল অর্থও এনে দিতে পারে।

**প্ল্যাণ্ট পেটেণ্ট এ্যাক্ট ॥**

প্ল্যাণ্ট পেটেণ্ট এ্যাক্ট বা আইন অসাধু ব্যক্তির সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে সাহায্যকারীকে ঠকানো বা গাছের নাম পালটানোর বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের কাজ করে। এই আইন সব অগ্রসর দেশে রয়েছে। ভারতে কবে এ আইন হবে বা হলেও কবে তা কার্যকরী হবে তা কারো জানা নেই। কিন্তু এটা না হলে গাছপালার বেলায় বিশেষ উন্নতি হবারও কোন সম্ভাবনা নেই।

সংকর প্রজাতি তৈরী করার সাথে এ কাজে সাহায্যকারীর যশের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে দেখা দেয় এর সম্ভাব্য অর্থকরী দিকটি। একটি

সমাদৃত সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করতে পারলে এবং প্ল্যাণ্ট পেটেণ্ট এ্যাক্টের সাহায্য পেলে উন্নত সংকর প্রজাতিটি এর সৃষ্টিতে সাহায্যকারীকে ভাল অর্থ এনে দিতে পারে। একটি বিশিষ্ট সংকর প্রজাতির গোলাপ 'পোট্রেট'-এর সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকায় খুব ইদানীং। প্ল্যাণ্ট পেটেণ্ট এ্যাক্টের আনুকূল্যে এই গোলাপ প্রজাতিটির সৃষ্টিতে সাহায্যকারী বেশ কিছু অর্থ পাবেন। সতেরো বছর ধরে পোট্রেট গোলাপটির যত কলম/বিক্রী হবে তার প্রত্যেকটির মূল্যের একটি অংশ এই সাহায্যকারী পাবেন রয়ালটি হিসাবে। এই একটি ফুলই তাঁকে বেশ কিছু অর্থের মালিক করে তুলবে এ সম্ভাবনা খুবই রয়েছে।

সংকর প্রজাতি সৃষ্টির বেলায় সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকেন প্রধানত সাধারণ ব্যক্তিরা। এতে কিছু খরচ আছে ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার লেগে থাকার ক্ষমতা। অনেক পরিশ্রমে তৈরী সমাদৃত প্রজাতির সম্পর্কিত যশ ও অর্থ অসাধু ব্যক্তিরা যখন সহজেই আত্মসাৎ করে এবং এ ঠকানো রোধ করার কোন উপায়ই থাকে না, তখন একাজে এগিয়ে আসতে কেউ চাইবেন না এটাই স্বাভাবিক। গাছপালার শ্রীবৃদ্ধির কারণেই প্ল্যাণ্ট পেটেণ্ট এ্যাক্ট হওয়া ও তা কার্যকরী করার দরকার রয়েছে।

**গাছের স্পোর্ট ॥**

প্রকৃতির খেয়ালে গাছের কোন ডালের ফুল বা পাতা হঠাৎ মূলগাছের থেকে ভিন্ন রকমের হতে দেখা যায়। এটা অল্প কিছু আলাদা হলে তা খুব কিছু ধর্তব্যের ভেতরে নয়। কলমের সাহায্যে এই বেশি রকমের পালটে যাওয়া ডালগুলিকে নতুন গাছে পরিণত করতে পারলে এবং তাতে ভিন্ন গুণগুলি বর্তালে তা একটি নতুন প্রজাতিতে পরিণত হবে। এভাবে গোলাপের ক্রোনেনবুর্গ ; চন্দ্রমল্লিকার সোনার বাংলা ; বুগেনভিলিয়ার মেরী পামার, মেরী পামার ভেরীগেটা, মাহারা ; ডালিয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্ল্যাক আউট স্পোর্ট, আফ্রিকান জেষ্টার প্রভৃতি বহু গাছের স্পোর্ট থেকে সুন্দর প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে।

**ভারতেই মরসুমী ফুলের ভাল বীজ হচ্ছে॥**

কয়েক বছর আগে পর্যন্তও মরসুমী ফুলের ভাল বীজ সবই আসতো বাইরের দেশ থেকে। বীজ বাইরের দেশ থেকে আনাতে বহু বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ায় ইদানীং সোজা পথে বীজ বড় আনা যেত না। তাই অন্য পথে বীজ আসতো এবং তা বিক্রী হোত অগ্নিমূল্যে। এতে সাধারণজনের পক্ষে ভাল বীজ যোগাড় করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। খুব অল্প কয়েক বছর ধরে ভারতেই বিভিন্ন বিশিষ্ট মরসুমী ফুলের বীজ তৈরীর চেষ্টা চলছে। এবং এ চেষ্টা এর ভেতরেই আশাতীত সাফল্য এনে দিয়েছে। অনেক বিশিষ্ট মরসুমী ফুলের সম্পর্কে এ ধারণা প্রবল ছিল যে তাদের উন্নত মানের বীজ এ দেশে জন্মানো সম্ভব নয়। কিন্তু এর ভেতরেই বাঙ্গালোর প্রভৃতি অঞ্চলে এই সব ফুলের কিছুর আন্তর্জাতিক মানের বীজ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আজকাল ভারত বাইরের দেশে এই বীজ রপ্তানি করতেও আরম্ভ করেছে।

সমতল বাংলায় অনেক বিশিষ্ট মরসুমী ফুলের বীজ হয় না বা ভাল বীজ হয় না ঠিকই, কিন্তু কোন্ কোন্ ফুলের ভাল বীজ করা সম্ভব সে সম্পর্কেও কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। চেষ্টা করলে হয়তো দেখা যাবে যে এখানে অনেক মরসুমী ফুলের ভাল বীজ হয়, যদিও তা হয় না বলেই আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। উচ্চমানের এনটিরাইনামের ভাল বীজ করা সম্ভব নয় বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু একটি বিশিষ্ট ফুলের প্রদর্শনীতে যে এনটিরাইনামগুলি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছে সেগুলির বীজ তৈরী হয়েছিল সমতল বাংলাতেই, এ রকমও দেখেছি। তাই এটা একেবারে অসম্ভব নয় যে সমতল বাংলাতেই অদূর ভবিষ্যতে অনেক মরসুমী ফুলের ভাল বীজ হবে।

**জীবাণুসার ॥**

জীবাণু প্রয়োগ ( ব্যাকটেরিয়া ইনোকুলেশান ) করে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ

বাড়ানো তথা গাছের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন যোগান দেওয়া সম্ভব। আমেরিকায় এ সার খুবই সমাদৃত হয়েছে এবং এখানে এর প্রয়োগ সবেমাত্র হতে শুরু করেছে। জীবাণুসার বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, তবে ফুলগাছের বেলায় এটা কি ভাবে ব্যবহার করলে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন কাজ হয়নি। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব নিয়ে এ সার ব্যবহার করা উচিত হবে। জীবাণুসার গাছকে নাইট্রোজেন যোগান দেবে, অন্যান্য সার গাছকে যথারীতি দিতে হবে।

**ওষুধ ব্যবহারের ভাবনা ॥**

মানুষের ব্যবহারের যেমন নিত্য নতুন ওষুধ বের হচ্ছে, তেমনি নতুন নতুন ওষুধ বের হচ্ছে গাছের জন্যও। আগে অনেক অসুখ ছিল যাতে গাছ মারা না গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত হোত ভীষণ ভাবে। আজকাল নতুন নতুন ওষুধের সাহায্যে অনেক রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। তবে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে অন্য জায়গায়। মানুষ এবং আরও অনেক প্রাণীর উপরে অনেক ওষুধের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। অল্প সময়ে এটা অনেক সময়েই বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু পরে তা খুব বড় করে ধরা পড়ছে।

বিভিন্ন গাছের ওষুধ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে আমেরিকা ডি.ডি.টি. প্রভৃতি অনেক পোকা-মারা ওষুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে চেষ্টা চলছে ক্ষতিকারক পোকামাকড়কে ধ্বংস করতে অন্য পোকাকে বা পাখিকে কাজে লাগাবার। এ বিষয়ে কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছে তবে এর কোন বিপরীত প্রভাব থাকবে কি না তা ভাবার সময় এখনও আসেনি।

আমাদের দেশে ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা এখনও আসেনি। এ সচেতনতা আসতে সময় লাগবে এবং ততদিনে আমাদের অনেক ক্ষতিও হয়ে যাবে।

**গাছের আয়তন ছোট রাখা ॥**

ফুলের আয়তন ছোট না করে গাছের আয়তন কি করে ছোট রাখা যায় এ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ দেশের জলবায়ুতে এটা কি ভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে কিছু কাজ এখানেও হয়েছে। এটা এখানে কি করে করা যেতে পারে সে সম্পর্কে দি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইনডিয়ার ১৯৭২ এ্যানুয়াল ফ্লাওয়ার শো নাম্বার হর্টিকালচারাল বুলেটিন ও দি ইনডিয়ান জার্নাল অব অরনামেন্টাল হর্টি-কালচারের ১৯৭২ জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যায় এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। এতে রয়েছে যে কয়েকটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে অনেক গাছ বেশ ছোট রাখা সম্ভব, এবং এর কোন কোনটির ব্যবহারে গাছের ফুলও আরও বড় হয়। এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ থাকলেও এটা বলা চলে যে এর ভবিষ্যত সম্ভাবনা খুবই রয়েছে। গাছ খুব ছোট রেখে কি করে চন্দ্রমল্লিকার চাষ করা যেতে পারে তার বিশদ আলোচনা 'চন্দ্রমল্লিকা' অধ্যায়ে করেছি।

**ফুল সুপ্রভ রাখার উপায় ॥**

ফুলদানিতে ফুল কি করে আরও বেশি সুপ্রভ রাখা যায় সে ভাবনা অনেকের। এটা খুব দেখা যায় যে, পুরো ফোটা ফুলের থেকে দুই-তৃতীয়াংশ ফুটেছে এরকম ফুল ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে বেশি সময় ধরে। এছাড়া ফুলের পরাগ-সংযোগ হতে না দিলে সে ফুলও অপেক্ষাকৃত বেশি সুপ্রভ থাকে। গ্লাডিওলাস, এমারিলিস প্রভৃতি ফুলের পরাগস্থলী খুলবার আগে তা সহজেই তুলে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। পুষ্প-সজ্জা ছাড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও ফুল সুপ্রভ রাখার খুব দরকার পড়বে।

আমাদের দেশে ফুল সুপ্রভ রাখা সম্পর্কে কোন ভাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বলে শুনিনি। নিচে ফুল সুপ্রভ থাকার উপরে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করছি, একই ধরনের কাজ করতে এটি আমাদের সাহায্য করবে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার

বেলায় আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়া একেবারে আলাদা তা মনে রাখতে হবে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাটি করেছেন প্রতীচ্যের শ্রীমতী অড্রে ম্যাকলীন। তিনি তিনটি গোলাপ— গোল্ডেন ডন, গ্রান্ড গালা ও সুপার ষ্টার, এ কাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং ফুলগুলি রাখা হয়েছিল ঘরের ভেতরে ফুলদানিতে।

| | সুপ্রভ থাকার সময় |
|---|---|
| ঠাণ্ডা সাধারণ জল | ...৪ দিন |
| গরম সাধারণ জল ( ১২০° ফা. উত্তপ্ত জল ) | ...৬ দিন |
| চিনি মেশানো জল ( ঠাণ্ডা এক পাইণ্ট জলে এক চামচ চিনি ) | ...৯ দিন |
| ঠাণ্ডা জলে কয়েক টুকরো কয়লা | ...৯ দিন |
| এপসম সল্টস ( বা এক পাইণ্ট জলে এক চামচ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ) | ...৮ দিন |
| এসপিরিণ ( পাঁচ গ্রেণ এক পাইণ্ট জলে ) | ...৭ দিন |
| ফুল সুপ্রভ রাখার প্রপ্রাইটারি কম্পাউণ্ড ( এগুলি অনেক কোম্পানী তৈরী করে ) | ...৬ দিন |
| তামার পাত্রে ঠাণ্ডা জল | ...১১ দিন |

**ফুল তাড়াতাড়ি খোলানো ও ধীরে খোলানো ॥**

কোন বিশেষ সময়ে ফুলগুলি ফুটে উঠুক এ ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়েই এটা দেখা যায় যে মাত্র দুয়েক দিনের জন্য ফুলটি আগে বা পরে ফুটে যাচ্ছে। এই সময়টুকু পিছিয়ে বা এগিয়ে ফোটানো যায় কিনা এ ভাবনা অনেকের। একটা জিনিস আজ অনেকটা পরিষ্কার যে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ দিনের আলো ফুল ফোটাতে অপেক্ষাকৃত দেরি করে এবং একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণের অন্ধকার ফুল ফোটায় অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি। বৈদ্যুতিক আলো জেলে বা কিছুর সাহায্যে অন্ধকার করে এই অবস্থা কৃত্রিম ভাবে তৈরী করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। তবে এগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশ ব্যয়সাধ্য, তাই কোন্ ফুলের বেলায় কি ভাবে বা কত সময়ের জন্য করলে তা ভাল ফল দেবে তা জানা নেই।

তাড়াতাড়ি ফুল ফোটাবার একটি প্রক্রিয়ার কথা শ্রীগ্রিনডাল তাঁর বই 'এভরিডে গার্ডেনিং ইন ইনডিয়া'-তে বলেছেন। ফুল কিছুটা ফুটেছে এ রকম জমির গাছের গোড়ার কিছু দূর থেকে দশ সেন্টিমিটার গভীর করে মাটি তুলে তাতে কিছু পাথর চুনের ডেলা ছড়িয়ে দিয়ে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং এর পরে গাছটিকে ব্যারেল জাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার। গাছটিকে ঢেকে দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে জল দিলে পাথর চুনের ধোঁয়া উঠে ব্যারেলের ভেতরটা ভরিয়ে ফেলবে। ঘণ্টাখানেক এরকম থাকার পরে ফুলের অনেকটা খুলে যাবার কথা। এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার রয়েছে বলে মনে হয়েছে। আমরা এর থেকে সন্তোষজনক ফল পাইনি, তবে কেউ কেউ পেয়েছেন বলে শুনেছি।

গাছে কুঁড়ি আসার পরে দেরি করে ফুল ফোটানো সহজ না হলেও গাছে যাতে কুঁড়ি দেরিতে আসে তার ব্যবস্থা করা কিছু কঠিন নয়। গাছে পাতার সার হিসাবে শুধু ইউরিয়া দিন দশেকে একবার ব্যবহার করলে গাছে কুঁড়ি আসবে অপেক্ষাকৃত দেরিতে। গাছের গোড়ার তরলসার হিসাবে নাইট্রেট অব সোডাও একই ধরনের কাজ দেবে।

**সুগন্ধি ফুল প্রসঙ্গে ॥**

বহু ফুলের চমৎকার সুগন্ধ রয়েছে এবং এই সুগন্ধের কারণে এরা আরও বেশি সমাদৃত। কি ধরনের উদ্বায়ী তেল বা ভোলাটাইল অয়েল ফুলে থাকলে তার কি রকম গন্ধ হবে জানা সম্ভব হলেও, কি উপায়ে বিশেষ ধরনের গন্ধ বংশধরদের বেলায় অনুসৃত করানো যেতে পারে অনেক গাছের বেলায় তা কারুরই জানা নেই। সুগন্ধি ফুল ফোটে এরকম গাছের বীজ দিয়ে বংশবৃদ্ধির দুটি সুস্পষ্ট ধারা রয়েছে—বংশধররা একই সুগন্ধ নিয়ে

জন্মায় এবং দ্বিতীয় ধারার গাছগুলিতে কি ধরনের সুগন্ধ হবে বা আদৌ হবে কিনা তা বলা যায় না। দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী কোন গোলাপের পিতামাতা প্রজাতি দুটি সুগন্ধি ফুল হওয়া সত্ত্বেও সন্তান-ফুলে কোন গন্ধ নেই বা এর উল্টো চিত্রও আমাদের তৈরী গোলাপের সংকর প্রজাতিতে পেয়েছি। গোলাপ বা এই প্রকৃতিসম্পন্ন ফুলে সুগন্ধ হবে কি না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপরে। তবে প্রকৃতি এ বিষয়ে আমাদের প্রতি সত্যিই সদয়। গত দশ বছরে গোলাপের এত ভাল সুগন্ধি ফুলের সৃষ্টি হয়েছে যা অন্য কোন দশকে হয়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কয়েকটি সুগন্ধি চন্দ্রমল্লিকারও সৃষ্টি হয়েছে ইদানীং। ফুলের সুগন্ধের সৃষ্টি নিশ্চয়ই ফুলের স্বার্থে, কিন্তু আরও অনেক সুগন্ধি ফুলের সৃষ্টি হলে তা আমাদের আনন্দের খোরাক অনেক বাড়িয়ে দেবে।

**গাছের ফুল ফোটা সম্পর্কে ॥**

এরকম মাঝে মাঝেই দেখা যায় যে একই প্রজাতির দুটি (আলাদা প্রজাতি নয়) গাছ একই পরিচর্যা পেয়েও ফুল দিচ্ছে ভিন্ন সময়ে বা ফুল দিচ্ছে কম বা বেশি। এ ভাবে স্প্যাথোডিয়া ক্যামপানুলেটার বিভিন্ন গাছকে ফুল দিতে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে; সোনালী শিমুলের পাশাপাশি গাছে ফুল ফোটে বেশ কিছুদিন আগেপিছে। এরকম ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরাও দেখেছি যা অনেক ফুল দেয় একেবারে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং আবার ফুল দেয় বর্ষার দিকে, যদিও ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা সাধারণত ফোটে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। কৃষ্ণচূড়ায় তিনটি আলাদা রঙ দেখা যাবে সহজেই এবং কেশিয়া নডোসার বিভিন্ন গাছের তফাতও মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। কোন কোন কদম্ব ফুলগাছে দোলের সময়ে ফুল ফোটে ঐশ্বরিক কৃপা বলে পরিচিত হলেও আসলে তা এই ধরনেরই নিয়মের ব্যাতিক্রম। শিমুলের ফুলের তফাত একটু ভাল করে দেখলেই চোখে পড়বে। এভাবে পলাশের সাদা ফুলও পাওয়া সম্ভব এবং পাওয়া সম্ভব স্প্যাথোডিয়া ক্যাম-পানুলেটার হলদে ফুলও। এইসব তারতম্যের বৈজ্ঞানিক কোন কারণ নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু কোন্ বীজের গাছের এটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা ফুল না ফোটা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়।

ফুল ফোটার বেলায় তারতম্য রয়েছে এ রকম গাছগুলিকে বাগান সাজাবার কাজে খুব ভাল ভাবে লাগানো যেতে পারে। তবে এটা করা যাবে শুধু সেইসব গাছের বেলায় যাদের বংশবিস্তার কলমের সাহায্যে করা চলে। প্রকৃতিতে তারতম্য রয়েছে এরকম গাছ লাগিয়ে ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা এবং আরও অনেক গাছের ফুল পাওয়া যেতে পারে দুটি আলাদা সময়ে বা একই গাছের ফুল পাওয়া যেতে পারে একাধিক রঙের। এভাবে এগুলি ফুলবাগানের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য এনে দিতে পারে।

**ফুলের নীল রঙ ॥**

নীলরঙের ফুলের আকর্ষণ দুর্নিবার। এ রঙ আমাদের মনে করিয়ে দেয় উদার উন্মুক্ত আকাশের কথা, মনে করিয়ে দেয় অসীম সাগরের কথা। নীলরঙের ফুলের গৌরব কীর্তিত হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। নীলকমল, নীল চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে সমাদৃত ও অতি পবিত্র ফুল হিসাবে, যদিও বাস্তবে এ ফুল কখনও ছিল তার নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে সাহায্যকারীরা অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন যে প্রকৃতি সংকর প্রজাতির বেলায় কি রকম বৈচিত্র্যের পর বৈচিত্র্য যোগ করে চলেছেন। তাই প্রকৃতির দাক্ষিণ্যকে প্রধান পাথেয় করে চেষ্টা চলছে কতগুলি বিশিষ্ট জনপ্রিয় ফুলের নীলরঙের ফুল সৃষ্টি করার। কিন্তু গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতির বেলায় দেখা যাচ্ছে যে সত্যিকারের নীলরঙের ফুল কিছুতেই সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। এদের কিছু ফুল তৈরী হয়েছে যাদের নীলরঙের কাছাকাছি রঙ কিন্তু সত্যিকারের নীলরঙের কোন ফুলই

এখনো হয়নি, এবং এটা করা কখনও সম্ভব হবে কিনা এ প্রশ্নও অনেকের মনে জাগছে।

একসময়ে সবুজ চন্দ্রমল্লিকা ছিল অলীক কল্পনা মাত্র। একসময়ে সাদা রঙের বুগেনভিলিয়ার কথা বললে লোকে এটা হওয়া অসম্ভব মনে করতো। কিন্তু হালকা সবুজ রঙের চন্দ্রমল্লিকা 'গ্রীন গডেস', সাদা রঙের বহু বুগেনভিলিয়া আজ আমাদের বিশেষ পরিচিত ফুল। একসময়ে যা মনে হয়েছিল অসম্ভব, আজ তাই আনন্দদায়ক বাস্তব। এই একই ভাবে নীলরঙের গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি পাওয়াও কি সম্ভব হতে পারে না? সাধনায় নিরলস হলে প্রকৃতিদেবী কৃপা করবেনই, এই অটুট বিশ্বাস নিয়ে নীলরঙের গোলাপ ইত্যাদি সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকৃতি কোন না কোন ভাগ্যবানকে বরমাল্য দেবেন, তার সাগ্রহ প্রতীক্ষা করে চলেছেন এই সাধকেরা।

**পুজার ফুল প্রসঙ্গে ॥**

সমতল বাংলায় ফুলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার পুজার ফুল হিসাবে। কোন্ ফুল পুজায় লাগবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি রয়েছে, যদিও এই বিধি অনেক সময়েই যুক্তিনির্ভর নয়। এই বিধিগুলি অনুধাবন করলে দুটি প্রধান দিক দেখা যাবে—ফুল দেশী ফুলগাছের হতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফুলে সুগন্ধ থাকা প্রয়োজন। এর প্রথম দিকটির উপরে খুবই জোর দেওয়া হয়, এবং বিদেশ থেকে আসার কারণে অনেক গাছের ফুল পুজার কাজে অচ্ছুত হয়ে রয়েছে।

বিদেশ থেকে আসা গাছের ফুলকে পুজায় লাগানো চলবে না, এই অনমনীয় মনোভাব গড়ে উঠেছে অনেক দিন ধরে। অথচ বিধিকারগণ কোনটি ভারতীয় ফুলগাছ এবং কোনটি নয় সে খবর খুব কমই রাখেন। ফলে অনেক বিদেশ থেকে আসা ফুল পুজার কাজে খুবই সমাদৃত এবং একই সঙ্গে ভারতীয় কোন কোন গাছের ফুল পুজায় অপাঙক্তেয়। পুজাতে হোমাস্কিয়োলডিয়া, গ্লোরিওসা সুপার্বা, ম্যাগনোলিয়া টেরোকার্পা, ফুরুস প্রভৃতি ভারতীয় ফুলের ব্যবহার দেখাই যায় না। পুজার কাজে অতি সমাদৃত ফুলের তালিকায় রয়েছে রজনীগন্ধা, জবা, গন্ধরাজ, বেল ( বেল রাই জাপানীজ ইত্যাদি ), কলকে, লঙ্কাজবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি। অথচ এর একটিও ভারতীয় গাছ নয়। গোলাপের যেসব প্রজাতির পুজাতে ব্যবহার তারাও এসেছে বিদেশ থেকে।

বিদেশ থেকে আসা যে সব গাছের ফুল পুজাতে বিশেষ সমাদৃত তাদের মতই সমাদর লাভ করার দাবি রয়েছে আরও অনেক ফুলগাছের, যারাও এসেছে বিদেশ থেকে। সমাদৃত ফুলগুলি অনেক আগে এসে পেঁছেছে তাও বলা চলে না। লঙ্কাজবা নিশ্চয়ই জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া প্রভৃতির চেয়ে এমন কিছু আগে আসেনি। আর তাছাড়া বিদেশী গাছের ফুলে পুজা চলবেই বা না কেন? আজকাল বিদেশেও হিন্দুমতে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজা হয়ে থাকে ; এবং সেখানে পুজায় সমাদৃত এই তথাকথিত নিষিদ্ধ ফুলগুলিই।

যে সব ফুলের ব্যবহার বেশি তাদের চাষের প্রসারও ঘটে সহজে। ফুলের চাষের সঙ্গে ফুলচাষীদের জীবিকার প্রশ্নও জড়িত। পুজার ফুল হিসাবে স্বীকৃতি পেলে অনেক নিষিদ্ধ ফুলের চাষ অনেক বেড়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার সংস্থানও বাড়বে।

# বিদেশী ফুলগাছের দেশী নাম

আমরা সমতল বাংলা তথা ভারতে যেসব ফুলগাছ ও অন্যান্য গাছের চাষ করি তার একটা খুব বড় অংশ এসেছে বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে। ফুলগাছের সব দেশে ঠাঁই খুঁজে নেওয়া চলে আসছে কোন্ অজানা সুদূর অতীত থেকে। তবে গত দুশো বছরের

ভেতরে বিদেশ থেকে ফুলগাছ এসেছে সবচেয়ে বেশি। এদের কারো কারো ভাগ্যে সুন্দর ঘরোয়া নাম জুটেছে, কোন কোন ফুলগাছ পরিচিত হচ্ছে তার বিদেশী নামে এবং অনেক সময়ে বিদেশী নামকে বিকৃত করে দেশী নাম হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে কথাবর্তায়। কোন কোন ফুলগাছের বেলায় ঘরোয়া নাম জুটেছে অনেকগুলি ; এবং ব্যবহৃত ঘরোয়া নামটির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এর সাহায্যে সঠিক গাছটি চেনা অনেক সময়ে বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। আসলে বিদেশী ফুলগাছের নামের বেলায় সুশৃঙ্খল কোন ধারার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে, গাছের প্রচলিত নাম পেলেই সে গাছের খোঁজও সহজে পাওয়া যাবে এ কথা জোর করে বলা যাচ্ছে না।

বিদেশ থেকে আসা ফুলগাছগুলি কি নামে এ-দেশে পরিচিত হবে বিভিন্ন মত এ সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠেছে ইদানীং। কেউ কেউ চান উদ্ভিদবিদ্যার কাঠামো বজায় রেখে গণ ( জেনাস ) থেকে নামগুলিকে দেশী ভাষায় পালটে দিতে, কেউ কেউ বিভিন্ন গণের নামও ঠিক রেখে প্রজাতিগুলির ( স্পিশিস ও ভ্যারাইটি ) নাম পালটাবার পক্ষে। আবার যাঁরা কট্টরপন্থী, তাঁরা চান ফুলগাছগুলিকে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেশী নামে পরিচিত করতে। এ'রা সবাই বিদেশী নামের পরিবর্জন চান এবং মনে করেন এই বর্জনের মাধ্যমেই দেশী নামকরণের কাজ সহজ হয়ে উঠবে। বিদেশী নাম বলতে এ'রা উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলিকেও বুঝিয়ে থাকেন এবং দেশী নাম বলতে বুঝিয়ে থাকেন প্রাদেশিক ভাষার নামগুলিকে। দেশী নামকরণ সম্পর্কে এ'দের এই মনোভাবের পরিচয় মিলবে পত্রপত্রিকার আলোচনায়, পরিচয় মিলবে এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তায়। বিদেশ থেকে আসা ফুলগাছগুলির বিদেশী নামগুলিকে সহ্য করতে না পারার সুর ক্রমশই চড়া হয়ে উঠছে। সব ফুলগাছকেই একমাত্র দেশী ভাষায় পরিচিত হতে হবে, নইলে এ-দেশের মাটিতে তাদের ঠাঁই হবে না, এ দাবিও শোনা গেছে কোন বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে।

ফুলগাছের বিদেশী নাম বর্জন করে দেশী নামকরণের উপরে পূর্ণাঙ্গ কোন আলোচনার খোঁজ পাইনি তবে এ বিষয়ে এ'রা যে যুক্তিগুলির অবতারণা করেন তা এরকম। ( ১ ) দেশী নাম ফুলগাছের সঙ্গে আত্মীয়তা বাড়াবে এবং এর ফলে বিদেশ থেকে আসা ফুলগাছগুলি আমাদের মনে ও বাগানে সহজেই স্থায়ী আসন করে নেবে। ( ২ ) বিদেশী নাম এবং বিশেষ করে উদ্ভিদবিদ্যার নাম অত্যন্ত খটমটে, এদের মনে রাখা যায় না এবং উচ্চারণ করতে শুধুই হোঁচট খেতে হয়। ( ৩ ) সব কিছুরই কোন না কোন বৈজ্ঞানিক নাম রয়েছে কিন্তু অনেক কিছুরই বেলাতে আমরা বৈজ্ঞানিক নাম জানার কোন প্রয়োজন দেখি না। ফুলগাছের বেলায়ও উদ্ভিদবিদ্যার নাম জানার এমন কিছু প্রয়োজন পড়তে পারে না, তাই এদের এই নামগুলি বিসর্জন না দেবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। (৪) গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক মনীষী বিদেশী ফুলগাছের দেশী নাম রাখার কথা বলেছেন। এ'দের কেউ কেউ অনেক বিদেশী ফুলগাছের দেশী নামকরণও করেছেন।

যে বিপুল সংখ্যক বিদেশী ফুলগাছের কোন দেশী নাম নেই তাদের দেশী নামকরণ কিভাবে হবে সে সমস্যার সমাধানও তাঁদের মতে তাঁরা খুঁজে বার করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিক কিছু কিছু ফুলগাছের দেশী নামকরণ করে থাকেন। এগুলি নেওয়া হবে। এ ছাড়া গ্রহণ করা হবে সেইসব নামগুলি যেগুলি ফুলগাছের তদারককারী মালীদের মুখে মুখে গড়ে উঠেছে। এর পরে দেশী নামকরণ আর কোন সমস্যা হয়ে থাকছে না।

সব ফুলগাছ শুধু দেশী নামে পরিচিত হবে শুনে ভাল লাগলেও সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে জাগে যে, এটা কি হওয়া সম্ভব অথবা হওয়া উচিত? এটা জোর করে করা হলে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনাই কি বেশি নয়? একই সঙ্গে মনে জাগে তাঁদের কথা, ফুলগাছের নাম ব্যবহার করা যাঁদের নিত্য প্রয়োজন। ফুলগাছ বা তার নামের দরকার রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের, যাঁরা এদের সম্পর্কে নতুন তথ্য আহরণে সদাই তৎপর; দরকার রয়েছে পুষ্পপ্রেমিকের, যাঁরা গাছ ভালবাসেন এবং বিভিন্ন ফুলগাছের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক তা

চান; প্রয়োজন রয়েছে ফুলগাছ ব্যবসায়ীদের, যাঁদের অনেকের এটিই একমাত্র জীবিকা। এ ছাড়াও দরকার রয়েছে সাহিত্যিকের, যাঁরা ফুল, গাছ প্রভৃতিকে কবিতা, গান, রচনা প্রভৃতির আঙিনায় নিয়ে আসেন; প্রয়োজন রয়েছে মালীদের, যাঁরা গাছপালার পরিচর্যায় ব্যাপৃত; প্রয়োজন রয়েছে ফুলগাছ প্রভৃতি সম্পর্কে যাঁরা লেখেন তাঁদের। ফুলগাছের শুধু দেশী নাম এদের সবার প্রয়োজন মেটাতে পারবে তো?

তাই ফুলগাছগুলি শুধু দেশী নামে পরিচিত হবে কিনা সে সম্পর্কে মনস্থির করার আগে এর অসুবিধার দিকগুলিও ভালভাবে ভেবে নেওয়া দরকার। অসুবিধার ভেতরে এগুলি প্রধান: (১) ভারতে বহু ভাষা; প্রত্যেক ভাষাতে নাম পালটে যাবার পরে এক প্রদেশের অধিবাসী অন্য প্রদেশে যে সব ফুলগাছের চাষ হয় তাদের চিনতে পারবেন না। (২) গাছের নামগুলি অনেক সময়ে ব্যক্তির সম্মানে হয়ে থাকে, এগুলিকে পালটালে সেই সব ব্যক্তিকে অসম্মান করা হবে। ফুলগাছের নাম পালটানো অনেক ক্ষেত্রে আইনবিরুদ্ধও। (৩) এদেশে ফুলগাছের নাম অনেক সময়ে এলোপাতাড়ি গড়ে ওঠে, এ সব নাম স্বীকৃতি পেলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হবে। (৪) উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলির অবলোপ করা সম্ভব নয় এবং বোধ হয় উচিতও নয়। (৫) ফুলগাছগুলি সমস্ত জগতের আপনজন, এদের পরিচয় একটি ছোট গণ্ডীর ভেতরে আটকে রাখলে ক্ষতি আমাদেরই। নিচে এইসব অসুবিধাগুলির একটু বিশদ আলোচনা করছি।

**(১) ভারত বহুভাষী দেশ ॥**

ভারতে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা অনেক। এবং একই সংগে এমন কোন ভারতীয় ভাষা নেই যা মোটামুটি সব ভারতীয় বোঝেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয়দের ভেতরে এখনও যোগসূত্র বিদেশী ভাষা ইংলিশ, যদিও এর প্রসার বেশি করে শিক্ষিতদের ভেতরেই।

একমাত্র দেশী নাম—এ দাবি মেনে নেবার পরে প্রত্যেক প্রদেশেই তাদের ভাষাতে আলাদা আলাদা নামকরণ হবে। এবং ফলে কিছুদিন পরে এক প্রদেশের অধিবাসী, পাশের প্রদেশের বাগানের ফুলগাছের নাম ও বিশদ বিবরণ শুনেও কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারবেন না সেগুলি ঠিক কি ফুলগাছ। ফুলসহ ফুলগাছের রঙীন ছবি পেলে সে গাছ চেনা কিছুটা সহজ হয়; কিন্তু এর অভাবে বর্ণনা যতই প্রাণবন্ত হোক না কেন বা বর্ণনার সংগে যতই সাদাকালো ছবি থাক না কেন, তা ফুলগাছকে সঠিক জানতে খুব সাহায্য করে না। বর্ণনা ও ছবির সাহায্যে ফুলগাছ চেনা আরও কঠিন করে তুলবে অন্য একটি বিষয় যার সম্পর্কে আমরা এখনও ততটা সজাগ নই। জলবায়ুর পরিবর্তনের সংগে সংগে বেশ কিছু গাছের প্রকৃতিও বেশ পালটায়। ভারত বিশাল দেশ এবং এর বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ু আলাদা। দুটি বড় ফুলগাছের কথা এখানে উল্লেখ করছি যাদের প্রকৃতি জলবায়ুর কারণে বেশ কিছুটা পালটে যায়। গাছ দুটি ট্যাবিবুইয়া রোজিয়া ও স্প্যাথোডিয়া ক্যামপানুলেটা। ট্যাবিবুইয়া এখানে বিশাল আকৃতির গাছ এবং ফুল দেবার সময়ে গাছে যথেষ্ট পাতাও থাকে। কিন্তু এই একই গাছ বাঙ্গালোর অঞ্চলে ফুল দেয় গাছের নিষ্পত্র অবস্থায়, ফুলের রঙ আরও গাঢ় এবং গাছ ছোট থেকে মাঝারি আয়তনের মাত্র। স্প্যাথোডিয়া ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ফুল দেয় বিভিন্ন সময়ে। বিভিন্ন প্রদেশে সব ফুলগাছের নাম পালটে যাবার পরে সঠিক ভাবে গাছ চেনার একমাত্র উপায় গাছ ও তার ফুলের বিবরণ প্রভৃতি। জলবায়ুর কারণে অনেক ফুলগাছই কমবেশি পালটায়, তাই বিভিন্ন প্রদেশে বেশ কিছু গাছের বর্ণনা বেশ কিছু আলাদা হবেই, ফলে একই প্রজাতির বিভিন্ন গাছ ভিন্ন প্রজাতির গাছ বলে পরিচিত হবে।

এ বিষয়ে আমাদের একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করছি। লখনউর এক বিশিষ্ট গোলাপ-ব্যবসায়ী 'বিষ্ণুকান্থা' নামে একটি লতানো ফুলগাছের থেকে জিবারালিক অ্যাসিডের সমগুণসম্পন্ন গাছের সার পাওয়া যায় বলে লেখেন। এখানে কোন গাছই 'বিষ্ণুকান্থা' নামে পরিচিত নয়, তাই গাছটিকে চিনতে তাঁকে গাছটির উদ্ভিদবিদ্যার নামটি জানাতে অনুরোধ করে চিঠি লিখি। ভারতীয় রীতি অনুযায়ী কোন উত্তর পাইনি। তবে বছর

দুয়েক পরে সুযোগ পেয়ে লখনউ যাই এবং সেখানে এই গোলাপ-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করি। আমার সঙ্গে অন্য একজন ভদ্রলোক গিয়েছিলেন যিনি কিছু কিছু ফুলের চাষ করেন কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রতি বিশেষ কোন ঝোঁক নেই। গোলাপ-ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যত্ন করে বিষ্ণুকান্থার ফুল ও গাছের বিশদ বিবরণ দিলেন কিন্তু আমরা দুজনে কেউই ফুলগাছটিকে মোটেই চিনতে পারলাম না। তখন তাঁকে অনুরোধ জানাতে হলো ফুলগাছটির উদ্ভিদবিদ্যার বা পশ্চিম বাংলায় প্রচলিত নাম জানাতে। তিনি এর বাংলা নাম জানেন না জানালেন এবং অনেক হাতড়ে উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রথম অংশটি বার করলেন। এ নাম বলতেই আমার চোখের সামনে ফুলগাছটি পরিষ্কার ভেসে উঠল। সঙ্গী ভদ্রলোকটির কাছে ফুলগাছটি ধরা পড়ছে না দেখে তাঁকে এর বাংলা নামটি বলতেই তিনি বলে উঠলেন, "ও হরি! 'অপরাজিতা'র কথা বলছেন! এত পরিচিত ফুলগাছের নাম জানতে কিনা এত কষ্ট করে আসতে হলো?" গোলাপ-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের উপরে সত্যিই রাগ হচ্ছিল। তাঁর গোলাপের ক্যাটালগ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে থাকে, সেকথা মনে রেখে উদ্ভিদবিদ্যার নামটিও একবার উল্লেখ করলে গাছটিকে চিনতে কারুরই কষ্ট হবার কথা ছিল না।

এমন কোন নাম যদি না থাকে যা সবাই বুঝতে পারেন, তাহলে উপরের ধরনের ঘটনা আকছার ঘটবে। উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলি লোপ পাবার ফলে খুঁজেও বার করা যাবে না কোনটি ঠিক কি গাছ। পারিজাত নামটি আমাদের সবার কমবেশি পরিচিত এবং অনেকের এ নামটি খুবই প্রিয়। পশ্চিম বাংলায় এ নামটি দিয়ে প্রধানত শিউলিকে (নিকটেন্থাস আরবর-ট্রিস্টিস) বোঝায় এবং অনেক সময়ে এটি ব্যবহার হয় পালতে মাদার (এরিথ্রিনা ইনডিকা) ফুলগাছটিকে বোঝাতেও। বেশ কয়েকটি প্রদেশেও পারিজাত নামটি ব্যবহার হয় এই দুটি গাছকেই বোঝাতে। কিন্তু আগে থেকে জানা না থাকলে এটা কি ধরা সম্ভব হবে যে আমাদের প্রতিবেশী আসামে পারিজাত নামে বোঝানো হয় সর্বজয়াকে (ক্যানা) এবং অন্য কোথাও কোথাও বোঝানো হয় বাওবাবকেও (এডেন-সোনিয়া)? চন্দ্রমল্লিকা বলতে আমরা বুঝি ক্রিসেন্থিমামকে, কিন্তু এই একই নাম কর্ণাটকে ব্যবহার হয় ভুঁইচাঁপার (কেম্পফেরিয়া) একটি প্রজাতিকে বোঝাবার জন্য। কর্ণাটকে রজনীগন্ধার (পলিয়ান্থাস) নাম সুগন্ধরাজ; এই নাম শুনে অনেকটা মিল থাকার জন্য আমরা কি একে গন্ধরাজের (গার্ডেনিয়া) সঙ্গে ভুল করে বসবো না? গ্লোরিওসা সুপার্বা গাছটি পুরোপুরি ভারতীয়, এটিকে ঝোপে-ঝাড়ে ফুটে থাকতে দেখা যাবে ভারতের অনেক জায়গায়। পশ্চিম বাংলা, তামিলনাড়ু ও উত্তর প্রদেশের পিথোরা-গড়ের ঝোপে-ঝাড়ে এই সুন্দর ফুলটিকে আপনাআপনি ফুটে থাকতে দেখেছি। এর কোন সর্বভারতীয় নাম নেই, তবে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক নাম রয়েছে। সর্বভারতীয় কোন নাম না থাকায় এটি যে একই গাছ তা না দেখলে কি করে বুঝবো? উদ্ভিদবিদ্যার নাম বর্জন ও সর্বভারতীয় কোন নাম গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা না থাকায় কোন ফুলগাছের সঠিক পরিচয় বার করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।

সব দুস্তর বাধা অতিক্রম করে ফুলগাছের নামের বেলায় যদি শুধু দেশী নামগুলি ব্যবহার করা চলে তাহলেও একটা বড় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ভারতের বহু প্রদেশেই একাধিক ভাষা প্রচলিত এবং আজকাল সব ভাষাই তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই একই ফুলগাছের জন্য একই প্রদেশে তার ভাষার সংখ্যা অনুযায়ী কয়েক প্রস্থ করে নাম হতে হবে। পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষায় নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে নেপালী ও সাঁওতালী ভাষায় এইসব ফুলগাছের নামকরণের সুযোগও নিশ্চয়ই দিতে হবে। ফলে একই ফুলগাছকে একই প্রদেশের অধিবাসীরা পুরোপুরি আলাদা নামে চিনবেন।

**(২) ফুলগাছের নাম পরিবর্তনের বাধা ॥**

ফুলগাছের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেও এ কাজে কতকগুলি বাধার সম্মুখীন হতে হবে যা অতিক্রম করা একরকম অসম্ভব। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা

যাবে বহু ফুলগাছের ভেতরে ব্যক্তির নাম ফুলগাছের নামের অংশ হিসাবে রয়েছে। এটা ফুলের গণের ক্ষেত্রে হতে পারে, যথা ডালিয়া, ম্যাগনোলিয়া, বুগেনভিলিয়া, এমহার্ষ্টিয়া প্রভৃতি। এটা ফুলগাছের প্রজাতির নাম হতে পারে, যথা বোহিনিয়া হুকারী, অরোকেরিয়া কুকী, ক্যাটেভা রক্সবুর্গী ইত্যাদি। এবং এটা খুব বেশি হতে দেখা যায় সংকর প্রজাতির প্রজাতিগত নামগুলির বেলায়, যথা গোলাপের সংকর প্রজাতি মিষ্টার লিঙ্কন, জন এফ কেনেডী, ডক্টর হোমী ভাবা; চন্দ্রমল্লিকার সংকর প্রজাতি মহাত্মা গান্ধী, পিটার মে, মার্ক উলম্যান; ডালিয়ার সংকর প্রজাতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ডোনাল্ড ভ্যানডিমার্ক, এমরী পল প্রভৃতি। ফুলগাছের নামে ব্যক্তি-নামের সংযোজন ঘটানোর প্রধান কারণ সেইসব ব্যক্তিকে স্মরণে রাখা। কোথাও যোগ হয়েছে সেইসব নাম যা চিরস্মরণীয়, কোথাও আবিষ্কারকের নাম যোগ হয়েছে তাঁর আবিষ্কৃত ফুলগাছের সঙ্গে; আবার কোথাও যোগ হয়েছে সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে যাঁরা সাহায্যকারী তাঁদের অতি আপনজনের নাম। সব ক্ষেত্রেই ফুলগাছের নামের সঙ্গে ব্যক্তিদের সম্মান জানাবার সযত্ন প্রয়াস সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

ফুলবাগানে আমরা যেসব ফুলগাছকে স্থান দিয়ে থাকি তাদের শতকরা নিরানব্বুইটি সংকর প্রজাতি, যাদের সৃষ্টি হয়েছে কোন ব্যক্তির সাহায্যে। গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, জবা, বুগেনভিলিয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট গাছগুলির বনজ প্রজাতিগুলি সহজে পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও ফুলবাগানে আশ্রয় লাভের সমাদর তাদের ভাগ্যে জোটে না। সংকর প্রজাতি করে করে এইসব ফুল ক্রম-বিবর্তনের পথে এগিয়ে আজকের এই রমণীয় রূপ নিয়েছে। এদের সুন্দর বা আরও সুন্দর করে তুলতে বহু সাধকের নীরব সাধনা রয়েছে। এই সাধনাকে স্বীকৃতি দিতে সব অগ্রসর দেশে সংকর প্রজাতির নামগুলি আইন দ্বারা সুরক্ষিত—এদের যে নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছে তা পালটালে দন্ড পেতে হবে। ফুলগাছগুলির গণ-নাম ও বনজ প্রজাতিগুলির নাম যদি-বা পালটানো সম্ভব হয়, সংকর প্রজাতির সৃষ্টির সাহায্যকারীর দেওয়া নামের অংশটি কিছুতেই পালটানো সম্ভব নয়। যেসব নামে ব্যক্তিবিশেষকে সম্মান জানানো হয়েছে তা পালটাবার চেষ্টা করা নিশ্চয়ই কিছু কাজের কথা নয়। আজ আমরা বিদেশী নাম বলে ফুলগাছের নাম পালটে দিতে চাইছি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আমাদের তৈরী বিভিন্ন ফুলগাছের সংকর প্রজাতি নিশ্চয়ই বিদেশে যাবে। বিদেশী নামের অজুহাতে আমাদের দেওয়া নামগুলি যদি জোর করে কেউ পালটে দেয়, আমরা কি তা প্রসন্ন মনে নিতে পারবো?

উচিত নয় জেনেও গায়ের জোরে ফুলগাছের নাম পালটে দেওয়া অসম্ভব নয়। তবে এ কাজও সহজ হবে না। এক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভারতীয় লেখকের নামী বইগুলি বিনা অনুমতিতে নিজেরা ছেপে বিক্রী করেছেন। ভারতীয় লেখকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, মর্মাহত হয়েছেন, কিন্তু প্রতিকারের উপায় খুঁজে না পেয়ে অসহায় অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বাইরের জগতের যেসব নামী প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরেই বহু সংকর প্রজাতি বাজারে ছাড়ছেন, তাঁদের নিজেদের অসহায় বোধ করার কোন কারণ নেই। প্রয়োজন মনে করলেই তাঁরা আইনের সাহায্য নিতে দ্বিধা করবেন না। বছর কয়েক আগে এ দেশের এক মোটামুটি বিখ্যাত গোলাপ-ব্যবসায়ী ওয়েস্ট জার্মানীর একটি বিশ্বখ্যাত গোলাপ-ব্যবসায়ীর ক্যাটালগ থেকে কয়েকটি রঙীন ছবি অনুমতি না নিয়েই নিজেদের ক্যাটালগে ছাপিয়ে দেন। এদেশী ব্যবসায়ীটির আশা ছিল ওয়েস্ট জার্মানীর প্রতিষ্ঠানটি এ খবর জানবে না বা জানলেও কিছু করবে না। কিন্তু তার এ আশা পূর্ণ হয়নি। বিদেশী প্রতিষ্ঠানটি এ খবর জেনে দেশী প্রতিষ্ঠানটির এই ক্যাটালগের প্রচার শুধু বন্ধ করেনি, এই দেশী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ক্ষমা চাইতেও বাধ্য করেছিল।

এদেশীয় অনেক অসাধু নার্শারী ইচ্ছে করে বিদেশ থেকে আসা সংকর প্রজাতির নাম পালটে দিয়ে থাকেন। এতে এইসব নার্শারীর আপাত কিছুটা লাভ হয় ঠিকই, কিন্তু এতে আমাদের সার্বিক ক্ষতির পরিমাণই বেশি। এ খবরে আজ কোন নতুনত্ব নেই,

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিদেশ থেকে কোন ফুলগাছের সংকর প্রজাতি নিয়ে আসার পরে দেখা গেছে যে, সে সংকর প্রজাতিটি এদেশে আগেই এসে গেছে যদিও তা পরিচিত হয়েছে তার পালটানো নামে। এর ফলে আশাভঙ্গই ঘটে ; একই সংকর প্রজাতির পরিবর্তে অন্য একটি ভাল সংকর প্রজাতি সহজেই আসতে পারতো। অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে করে নাম পালটে দেবার ফলে একটি অসুবিধা আজকাল ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি ডালিয়ার সংগ্রহকে শ্রেষ্ঠতম করতে ভারতের বিভিন্ন নার্শারীতে যত নতুন ডালিয়ার খবর পেয়েছেন তাদের বাল্ব অনেক টাকা খরচ করে কিনে এনেছেন। বিভিন্ন নার্শারীর নতুন ডালিয়াগুলির বর্ণনা পড়ে তিনি উল্লসিত হয়েছেন এবং উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা করে চলেছেন এদের ফুল দেখার জন্য। ফুল ঠিক সময়েই ফুটেছে, কিন্তু এদের বেশির ভাগই তাঁর নিদারুণ মনোবেদনার কারণ হয়েছে। এগুলি সব সেই অতি সাধারণ ডালিয়ার প্রজাতি যেগুলিকে তিনি সযত্নে তাঁর বাগান থেকে বিতাড়ন করেছেন! নাম পালটে নতুন বলে চালানোতে তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে এগুলি সেই অবাঞ্ছিত ডালিয়া।

**( ৩ ) ফুলগাছের এলোপাতাড়ি দেশী নাম ॥**

খুব অল্প কিছু নামের ব্যতিক্রম হলেও এদেশে বিদেশী ফুলের দেশী নামকরণ ঘটে খুব এলোপাতাড়ি ভাবে। মালীরা নাম দেন বিদেশী নামকেই একটু বিকৃত করে। এর ফলে এনটিরাইনাম হয়ে ওঠে আঁটিনামা, ফ্লক্স ফেলাকস এবং জবা ড্যাফোডিল ডেপুচি। অথবা এঁরা 'বিলাতী' শব্দটিকে জুড়ে দেন খুব পরিচিত কোন গাছের নামে। এভাবে সব বিদেশী গাছই সহজে একটি 'দেশী' নাম পেয়ে যায়। এই ধরনের বিকৃত নামগুলি এখনও সুধীমহলে স্বীকৃতি পায়নি কিন্তু হয়তো তা পেতে দেরি হবে না। যে নামগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের বেলায় দেখা যায় মালতী ও চাঁপা শব্দ দুটির বহুল ব্যবহার। এ নামগুলি যোগ করে যেসব বিদেশী ফুলগাছের দেশী নাম তৈরী হয়েছে তাদের বেলায় শুধু দেশী নামের সাহায্যে ফুলগাছটিকে অনেক সময়েই চেনা সম্ভব হয় না। সত্যিকারের চাঁপার প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায় মাত্র চার রকমের এবং দুটি প্রজাতি মাত্র পশ্চিম বাংলায় সচরাচর পাওয়া যায়। অথচ চাঁপা নামটি যুক্ত হওয়ায় এটাই মনে হয় যে এই অপরিচিত গাছগুলিও চাঁপারই বিভিন্ন প্রজাতি। এ ভুল শুধু অনভিজ্ঞজনে করেন তা নয়। উদ্ভিদবিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট অধ্যাপকের বাংলা ভাষায় লেখা এক নামী পুস্তকেও ঠিক একই ভুল রয়েছে। কলকাতার কোন এক পুরানো নার্শারীকে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিতে দেখেছি যে তাঁরা বারো রকমের চাঁপার যোগান দিতে পারেন! নিচে কতগুলি নাম দিচ্ছি যেখানে দেশী নাম তৈরী করতে চাঁপা কথাটির ব্যবহার হয়েছে : কাঁঠালি চাঁপা ( আরটাবট্রিস ) ; সুলতানী চাঁপা ও পুন্নাগ চাঁপা ( কেলোফাইলাম ) ; গোবর চাঁপা, কাঠ চাঁপা, গরুড় চাঁপা, গুলান চাঁপা, গোলাপ চাঁপা ও গৌর চাঁপা ( প্লুমেরিয়া ) ; জহুরী চাঁপা ( ম্যাগনোলিয়া পুমিলা ) ; আনন্দ চাঁপা ও দুলি চাঁপা ( ম্যাগনোলিয়া টেরোকার্পা ) ; হিম চাঁপা ( ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা ) ; ভুঁই চাঁপা ( কেম্পফেরিয়া ) ; কনক চাঁপা ( টেরোস্পার্মাম ) ; নাগ চাঁপা ও নাগেশ্বর চাঁপা (মেসুয়া) ; অপূর্ব চাঁপা (উভেরিয়া) ; দুলাল চাঁপা ও দোলন চাঁপা (হেডিচিয়াম) ; রামধন চাঁপা ও কনক চাঁপা (ওকনা) ; ও বাঁই চাঁপা (হ্যামিলটোনিয়া)। এই তালিকা থেকে দেখা যাবে কোন কোন গাছের বেলায় চাঁপা সহযোগে তার একাধিক নাম রয়েছে; আবার একই নাম কনক চাঁপা দিয়ে দুটি আলাদা গাছকে বোঝানো হচ্ছে। চাঁপা কথাটি বেশির ভাগ সময়েই ব্যবহৃত হয়েছে সুগন্ধ রয়েছে এরকম ফুল বোঝাতে, কিন্তু এই তালিকার ভেতরে গন্ধ নেই এরকম ফুলও রয়েছে। এই তালিকার ফুলগাছের প্রকৃতির বেলায় দেখা যাবে, এদের ভেতরে কাঁঠালি চাঁপার মত লতানো গাছ রয়েছে, অপূর্ব চাঁপার মত গুল্ম রয়েছে, রয়েছে ভুঁই চাঁপা ও দোলন চাঁপার মতো কন্দজ ফুলগাছ। চাঁপা নামের বেলায় যেমন দেখা যায়, এমনি আরও কতকগুলি নাম দিয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির গাছকে বোঝানো হয়েছে।

সব বিদেশী ফুলগাছকে শুধুমাত্র তাদের দেশী নামে পরিচিত করার কথা অনেকে ভাবছেন, কিন্তু উপরে 'চাঁপা'র তালিকা থেকে উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলি সরিয়ে নেবার পরে দেশী নাম দিয়ে ফুলগাছগুলিকে সঠিক ভাবে চেনা কি সহজ হবে? উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলি সরিয়ে নেবার পর স্বর্ণচাঁপা ও শ্বেতচাঁপার (মাইকেলিয়া) মত এগুলিও চাঁপার বিভিন্ন প্রজাতি হয়ে দাঁড়াবে, নাম দিয়ে এদের সত্যিকারের প্রকৃতি ধরতে পারার আর কোন সুযোগ থাকবে না। অনেকটা একই ধরনের অবস্থা দেখা যায় ইংলিশে যেসব ফুলগাছের বেলায় লিলি শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। লিলি নামধেয় গুচ্ছ সাধারণ কন্দজ লিলি হতে পারে, শালুক হতে পারে এবং চাই কি অর্কিডও হতে পারে। কিন্তু এদের ব্যবহার মোটেই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। এদের এই ঘরোয়া লিলি নামেই তাঁদের পরিচয় করানো হয় কিন্তু কারো বুঝতে অসুবিধা হবে মনে করলেই ঐ নামের সঙ্গে অন্তত একবার উদ্ভিদবিদ্যার নামের উল্লেখ করে এই অসুবিধা দূর করা হয়।

ফুলগাছের নাম হিসাবে একমাত্র দেশী নামকে বেছে নেবার আগে ফুলগাছের ব্যবসার দিকটিও ভেবে দেখার দরকার রয়েছে। ভাল ব্যবসায়ীদের ফুলগাছের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভারত জুড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে রয়েছে বাইরের জগতেও। শুধু দেশী নাম মেনে নেবার পরে তাঁদের এ নামে ক্যাটালগ ছাপাতে হবে, বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাইলে উদ্ভিদবিদ্যার নাম দিয়ে ক্যাটালগ ছাপাতে হবে এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাইলে সেইসব প্রদেশে চলে এরকম নাম দিয়ে আলাদা আলাদা ক্যাটালগ প্রকাশ করতে হবে। অথচ এগুলি করা কি আদৌ সম্ভব হবে? এ ছাড়াও দেশী নামের কোন্ নামটি দেশী নামের ক্যাটালগের জন্য বেছে নেওয়া হবে বা সবাই বুঝবেন? মিরাবিলিস জলাপা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত সন্ধ্যামণি, সন্ধ্যামালতী, কৃষ্ণকলি, নন্দদুলাল, সন্ধ্যারানী প্রভৃতি নামে। এর সবগুলি নাম ক্যাটালগে উল্লেখ করতে গেলে নামাবলীর অরণ্যে আসল ফুলগাছটি নিশ্চয়ই হারিয়ে যাবে। অন্যদিকে, এক নীল কলমী নামে বোঝানো হয় ইপোমিয়া লিয়ারী, জ্যাকুমণ্টিয়া ভায়োলেসিয়া, আর-জিইরিয়া ক্যামপানুলেটা এবং মরসুমী ফুলের ইপোমিয়া রুব্রো সিরুলিয়া হেভেনলি ব্লু ও ফ্লাইং সসারস-কে। তাই ক্যাটালগে শুধু নীল কলমী নামটি দেওয়া হলে কোন্ ফুলগাছটিকে বুঝতে হবে?

**(৪) উদ্ভিদবিদ্যার নাম অবলোপ না করাই ভাল ॥**

উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলি গড়ে উঠেছে অনেক দিন ধরে এবং অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ফুলগাছগুলির শ্রেণী বিভাগ হয়েছে তাদের প্রকৃতির মিল অনুসারে, তাই ফুলগাছের নাম দিয়েই কোন অপরিচিত প্রজাতির প্রকৃতিও মোটামুটি আন্দাজ করা সম্ভব। উদ্ভিদ-বিদ্যার বিভাগ সর্বতোভাবে নির্ভুল এ দাবী কেউ করেন না এবং একই সঙ্গে কেউ অস্বীকার করেন না এর উপযোগিতার কথা। উদ্ভিদবিদ্যার নামটি পেলে ঠিক কোন্ গাছটিকে সে নাম দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তা সারা জগতের পক্ষে নিশ্চিতভাবে বোঝা সম্ভব। ফুলগাছ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে এই নামগুলির শরণাপন্ন হতেই হবে। উদ্ভিদবিদ্যার শ্রেণী বিভাগের কাঠামো বজায় রেখে এই বিভাগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দেশী ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হলে হয়তো একটি সমাধান খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু এ কাজ বোধ হয় অসম্ভব। এটা সম্ভব যদি-বা হয়, উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা উদ্ভিদবিদ্যার বর্তমান নামগুলি লোপ পাক এটা কখনই মেনে নিতে পারবেন না। দেশী নামগুলি ব্যবহার করে তাঁরা বোঝাতে পারবেন শুধুমাত্র এই প্রদেশের অধিবাসীদের কিন্তু তাঁদের লেখা এই প্রদেশের বাইরে অচল হয়ে পড়বে। এ অবস্থা কোন বিজ্ঞানীর পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে না।

**(৫) ফুলগাছ সমস্ত জগতের ॥**

বিশ্ব-নাগরিক কথাটা আমরা আজকাল খুব ব্যবহার করি। কথাটা ব্যবহার হয় মানুষের

বেলায় কিন্তু এ ব্যবহার আলঙ্কারিক মাত্র, কোন মানুষেরই কোনো কালে সত্যিকারের বিশ্ব-নাগরিক হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ফুলগাছের বেলায় এই কথাটির সার্থক ব্যবহার হতে পারে। ফুলগাছ তার আদি বাসস্থানকে ভালবাসে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভিন্ন দেশে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সে সেই নতুন দেশকে ভালবেসে তার সাথে একাত্ম হয়ে যায় ; তার ব্যবহারে এ কথা মনে রাখার সুযোগই রাখে না যে সে বিদেশ থেকে এসেছে। রজনীগন্ধা, জবা, গন্ধরাজ, বেলফুলের কিছু অতি সমাদৃত প্রজাতি এসেছে বিদেশ থেকে ; কিন্তু এরা কি আমাদের একান্ত আপনজন নয়? ডালিয়া এসেছে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে—মাত্র একশো বছরের কিছু আগে। কিন্তু এটি এসেই আমাদের একান্ত আপনার জন হয়ে পড়েছে। হিমালয়ের কোলে এটি বছরের পর বছর ফুল দিয়ে যায় কোন রকমের যত্ন ছাড়াই, এবং এর আদি বাসস্থান মেক্সিকো ছাড়া বোধ হয় এই একমাত্র দেশ যেখানে সে বিনা যত্নেও হাসিমুখে ফুটে থাকতে রাজী। ফুলগাছ সব দেশকেই ভালবাসতে চায় এবং তার বিদেশী নাম ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রাচীরের সৃষ্টি করে না। ভালবাসার কারণেই জাপান তার দেশের জাতীয় পুষ্প হিসাবে বেছে নিয়েছে চীন থেকে আসা চন্দ্রমল্লিকাকে ; এই ভালবাসার জন্যই ধর্মযাজক ক্যাভাইনাইলস-এর নেতৃত্বে স্পেনবাসীরা মেক্সিকোর ফুলের নামকরণ করেছে সুইডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানীর নামে ডালিয়া। সব ফুলগাছই সারা জগতের ফুলবাগানের আত্মীয়স্বরূপ ; আমরা যেন আজ ফুলবাগানে কৃত্রিম প্রাচীর তুলে না দেই। একমাত্র ভালবাসাই অন্যকে আপন করতে পারে ; ফুলগাছকে যদি সত্যিই ভালবাসি তাহলে তার বিদেশী নাম তাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

ফুলগাছের উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলি লোপ পেলে এ বিষয়ে আমরা নিজ প্রদেশের বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। অথচ ফুলগাছের বেলায় ভাবের আদান-প্রদান একান্ত দরকার। ক্লায়ান্থাস, এমহার্স্টিয়া নোবিলিস এদেশে এসেছে অনেক দিন আগে কিন্তু কিভাবে চাষ করলে সহজে কৃতকার্য হওয়া যায় তা অনেকের জানা নেই বলে এদের চাষ এখনও খুবই সীমিত রয়ে গেছে। ফুলগাছের সব প্রজাতির বা সংকর প্রজাতির পরিচর্যা কিছু না কিছু আলাদা। এটা চন্দ্রমল্লিকার বেলায় খুব সহজেই ধরা পড়বে। যাঁরা সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকেন, তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সেই সংকর প্রজাতি কিভাবে চাষ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে তাও বার করে থাকেন। এবং এটা তাঁরা ক্যাটালগ বা অন্য কিছুর মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এভাবেই আমরা জানতে পারি কোন্ চন্দ্রমল্লিকা গাছের সবচেয়ে ভাল ফুল পেতে গাছের মাথা ক'বার ভেঙে দেওয়া দরকার। এ খবরগুলি প্রথম থেকে জানা থাকলে চাষ অনেক সহজ হয়ে ওঠে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা নিজেদের বার করে নেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। ফুলবাগানের উপরে ইংলিশে বা অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অজস্র পত্রপত্রিকা বের হয় ; উদ্ভিদবিদ্যার নামের সঙ্গে যোগ না থাকায় এগুলিতে দেওয়া নতুন তথ্যাদিতে আমাদের কোন অধিকার জন্মাবে না। এ বিষয়ের উপরে ভারতেও কয়েকটি ভাল পত্রিকা ইংলিশে বার করা হয় ; স্বাভাবিক কারণে এতে উদ্ভিদবিদ্যার নামের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়, তাই এগুলিও আমাদের কোন কাজে লাগবে না। উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলিকে বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা কূপমণ্ডূক বনে যাব।

**সমাধান ॥**

উপরের অসুবিধার দিকগুলি তুলে ধরতে গিয়ে শুধু এ কথাই বারবার মনে হচ্ছে, এ অসুবিধা তো সহজেই এড়ানো যেতে পারে যদি কট্টর মনোভাবকে একটু নমনীয় করি। একথা তো খুবই সত্য যে সব আপনজনের একটা করে ঘরোয়া বা দেশী নাম থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ নামে ডাকতে যত ভাল লাগবে তা নিশ্চয়ই অন্য নামের বেলায় হবার সম্ভাবনা নেই। দেশী নাম যাতে সহজ সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই সচেষ্ট হব, কিন্তু একই সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলিও আমরা নিশ্চয়ই বজায় রাখব। ফুলগাছের উপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কোন কিছু জানাতে চাইলে উদ্ভিদবিদ্যার

নাম ব্যবহার না করে শুধু ঘরোয়া নাম ব্যবহার করলেই চলে যেতে পারে। দেশী নাম শুনে বুঝতে পারলে অন্য কোন নামের দরকার পড়বে না, এবং বুঝতে না পারলে তক্ষুনি তা জিজ্ঞাসা করে নেবার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা করে নেবার সুযোগ ফুলগাছ সম্পর্কে লেখাপড়ার বেলায় মোটেই নেই। তাই লেখা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, সেখানে দেশী নামের সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যার নামও উল্লেখ করতে হবে যাতে ফুলগাছটিকে নিশ্চিতভাবে চিনতে কোন অসুবিধা না হয়। ফুলগাছের দেশী নামটি প্রথমবার লেখার সময়ে উদ্ভিদবিদ্যার নামটি একবার মাত্র উল্লেখ করলেই চলবে, এর পরে সারা রচনায় শুধু দেশী নামটি ব্যবহার করা চলে স্বচ্ছন্দে। উদ্ভিদবিদ্যার নামটি রয়েছে বলে ফুল-গাছটিকে গুলিয়ে ফেলার কোন আশঙ্কাই আর থাকছে না।

যে সব গাছের বিদেশী নাম সহজ সরলভাবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছে তাদের নাম পালটে দেবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ক্যামেলিয়া, অর্কিড, ম্যাগনোলিয়া, বুগেন-ভিলিয়া, ডালিয়া, জিনিয়া প্রভৃতি নাম বাংলা সাহিত্যেও স্বীকৃত, এবং এদের ব্যবহার করার সময়ে আমাদের মনেই হয় না যে নামগুলি বিদেশী। বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক বিদেশী শব্দকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করেছি, খুব ইদানীং গ্রহণ করেছি আরবী সংখ্যাকে। তাই ফুলগাছের বেলায় একটু সদয় হতে কোন বাধা থাকতে পারে না। অনেক ফুলগাছের বাংলা নামকরণ করতে গিয়ে অনেক নতুন বাংলা শব্দ সৃষ্টি করতে হবে। এ অবস্থায় বিদেশী যে নামগুলি আমাদের জীবনে এসে গেছে তাদের বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করে নিয়ে বাংলা নাম করে নিলে ক্ষতি কোথায়? বাংলা হরফে এ নামগুলি বা উদ্ভিদবিদ্যার পুরো নাম লেখা তো মোটেই কঠিন নয়।

যে সুন্দর নামগুলি স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে তাদের মেনে নেওয়া সবচেয়ে ভাল। কারণ, কিছু স্নিগ্ধ বাংলা নাম ফুলগাছের নামকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি কিন্তু খুব চলেনি। ফুলগাছের দেশী নামগুলি যাতে এলোপাতাড়ি গড়ে না ওঠে সে বিষয়ে সচেতন হবার খুবই দরকার রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা ভাল নামগুলিকে লেখার মাধ্যমে স্বীকৃতি জানাতে হবে এবং একই সঙ্গে চেষ্টা করে যেতে হবে স্নিগ্ধ দেশী নাম গড়বার। দেশী নামকরণে ইংলিশ নামের আক্ষরিক অনুবাদের একটা প্রবণতা এদেশে খুব বেশি দেখা যায়। এটা পরিহার করে ফুলগাছের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে ষোলো আনা বাংলা নাম দেওয়া দরকার। এ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে উদ্ভিদবিজ্ঞানী, পুষ্পপ্রেমিক, সাহিত্যিক প্রভৃতিকে কাজ করতে হবে একযোগে।

দেশী নাম এবং প্রয়োজনবোধে উদ্ভিদবিদ্যার নামের উল্লেখ—এই পদ্ধতিকে মেনে নিতে বাধা কি থাকতে পারে তা নিয়ে অনেক ভেবেছি। ফুলবাগান সম্পর্কে বাংলায় একটু-আধটু লিখতে চেষ্টা করি, তারই সূত্র ধরে কেন শুধু বাংলা নাম ব্যবহার করি না এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন অনেকে। সুযোগ পেলেই আমার বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখেছি, অনেকে আমার বক্তব্য মাতৃভাষার প্রতি অনাদর হিসাবে নিয়েছেন। বিভিন্ন আলোচনায় দেখেছি অনেকে এ সম্পর্কে কি ধরনের কট্টর মনোভাব পোষণ করেন—দেশী নাম ছাড়া অন্য কোন নাম নয়, কিছুতেই নয়। অসুবিধার দিকগুলি কেন বুঝতে চান না এ প্রশ্ন জেগেছে বারবার, এবং এ কথাই বারবার মনে হয়েছে যে, বুঝতে না চাইবার কারণ আসলে অন্যত্র।

আসলে বুঝতে না চাইবার পেছনে যে মানসতা কাজ করছে তা ইংলিশ হঠাও এবং উগ্র প্রাদেশিকতা মাত্র। উদ্ভিদবিজ্ঞানের নামগুলিকে আমরা ইংলিশের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেই। ফলে একেও এদেশ থেকে হঠাতে চাই। এ কথা মনে করতে চাই না যে উদ্ভিদবিদ্যার নামগুলি প্রধানত ল্যাটিন এবং মনে রাখতে চাই না ল্যাটিনের সঙ্গে ইংলিশের যোগ অনেক দিন ধরেই কিছু গভীর নয়। এছাড়া, আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে শুধু বাংলা নাম বা গ্রেট ব্রিটেনে শুধু ইংলিশ নাম দিয়ে সে দেশের অধিবাসীদের জন্য ফুলগাছের সম্পর্কে লেখার কাজ হয়তো চলে যেতে পারে। কারণ এই দুটি দেশেই এদের প্রধান ভাষা সবাই বোঝেন এবং এই দুটি দেশের আয়তনই খুব ছোট বলে প্রাকৃতিক কারণে

ফুলগাছের প্রকৃতি খুব কিছু পালটায় না। এই রকম ছোট দেশগুলির বেলায় যা হয়তো চলতে পারে তা বিশাল দেশ ভারতের বেলায় মোটেই চলতে পারে না। এখানে এটা জোর করে করতে চাইলে তা হিতে বিপরীত হবে। প্রাদেশিকতা ও তথাকথিত ইংলিশ হঠাও মানসতা পরিহার করে চিন্তা করলে বাংলা নামের পাশাপাশি উদ্ভিদবিদ্যার নামকে মেনে নিতে কোন বাধা থাকবে না। সব ফুলগাছেরই সুন্দর সুন্দর দেশী নাম হোক, তবে এদের সম্পর্কে লেখার বেলায় ফুলগাছকে সঠিক ভাবে চেনাতে আমরা যেন উদ্ভিদবিদ্যার নামও ব্যবহার করি।

# বৃত্তি হিসাবে ফুলের চাষ

সারা পশ্চিম বাংলায় তথা ভারতে আজ ভূমিলক্ষ্মীর আরাধনায় সত্যিকারের সাড়া জেগেছে। আজ এটা সবার কাছে পরিষ্কার যে চাষবাসের মাধ্যমেও ভাল ভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব। খাদ্য-সম্ভার বাড়াতে সচেষ্ট হলেও ভূমিলক্ষ্মীর আরাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আজও অবহেলিত। এটি ফুল চাষের দিক। ফুল করা শৌখিন কিছু করা বলেই এখনও পরিচিত ; ফুল চাষ যে জীবিকা হিসাবেও পরিগণিত হতে পারে সে কথা আমরা এখনও ততটা ভাবতে পারি না। এই অবহেলার কারণে বৃত্তি হিসাবে ফুলের চাষ মোটেই এগুতে পারছে না। সমতল বাংলা ফুল চাষের ক্ষেত্রে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ভরপুর, ফুল চাষ করার এত সুযোগ-সুবিধা খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যাবে। এখানে শীতকালে যখন ফুলের সমারোহ তখন বাইরে অনেক দেশে বরফ পড়ে। সেখানের বাগানে তখন ফুল নেই কিন্তু ঘরে ঘরে ফুলের চাহিদা রয়েছে। ভাল ফুলের চাহিদা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রয়েছে এবং সমতল বাংলাতেও এটা দিন দিন বাড়ছে। ভারত আজকাল বিদেশে গোলাপ পাঠাচ্ছে এবং বাইরের দেশে এদের সমাদরও হচ্ছে। চেষ্টা করলে সমতল বাংলাও বিভিন্ন প্রদেশে বা বিদেশে ফুল যোগান দেবার একটি ভাল কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

ব্যবসার ভিত্তিতে করতে গেলে মনে প্রথম জিজ্ঞাসা দেখা দেয়, ফুলের চাষ লাভজনক হবে কিনা? ব্যবসার জন্য ফুলচাষ সমতল বাংলায় চলে আসছে অনেক দিন ধরে এবং এটা অনেকের একমাত্র জীবিকাও। কিন্তু মোট আয় থেকে পরিশ্রম ও খরচ বাদ দিলে বর্তমান অবস্থায় ফুলচাষীরা বিশেষ কিছু লাভ করতে পারেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। পূজা ও বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদিতে আমাদের জীবনে ফুলের ব্যবহার রয়েছে এবং বাজারে ফুলও কিনতে পাওয়া যায়। এ সব ফুলই যোগান দেয় ফুলচাষীরা—ফুলচাষই যাঁদের একমাত্র বৃত্তি। এ সব ফুলের ভেতরে প্রধান রজনীগন্ধা, সাধারণ মানের গোলাপ, গাঁদা, বেল, জুঁই, পদ্ম, এষ্টার, দোপাটি, লাল জবা প্রভৃতি। এ ফুলগুলি পরিমাণে হয়তো অনেক বিক্রী হয় কিন্তু তাতে অর্থ সমাগম বিশেষ হয় না। কেন এরকম হয় তা বার করাও বোধ হয় কঠিন নয়। আমাদের জীবনের যে সব ক্ষেত্রে এইসব ফুলের ব্যবহার, সেখানে উঁচু বা নিচুমানের ফুলের ভেতরে কোন প্রভেদ করা হয় না, শুধুমাত্র ফুল হলেই হোল। এ সব ক্ষেত্রে ভাল দাম দিয়ে কেউ ফুল কেনেন না, তাই ফুলচাষীদের পকেটও একরকম শূন্যই থেকে যায়।

সত্য বলতে, ব্যবসার ভিত্তিতে ফুলচাষের ভাল লাভ হতে পারে গৃহসজ্জার তথা পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুলের যোগান দিতে পারলে। যেসব ফুলের উল্লেখ উপরে করা হয়েছে তাদের ভেতরে একমাত্র রজনীগন্ধার ব্যবহার রয়েছে গৃহসজ্জার ফুল হিসাবে এবং এদের উঁচুমানের ফুল বাজারে পাওয়াও যায়। তাই বোধ হয় এদের চাষে অন্যান্য ফুলের চেয়ে লাভও বেশি। ফুলদানি সাজাবার কাজে ফুলের ব্যবহার পূজার অঙ্গন বা সভাসমিতির মঞ্চ সাজাতে আগে থেকেই ছিল। তবে এখন গৃহসজ্জায় ফুলের ব্যবহার

দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভাল পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত উঁচু মানের ফুলেরও সমাদর বাড়ছে এবং ভাল ফুলের অভাব অনেকেই বোধ করছেন।

ব্যবসার ভিত্তিতে চাষ করার জন্য এমন ফুলগুলি বেছে নেওয়া দরকার যাদের এই গুণগুলি রয়েছে : ( ১ ) ফুলগুলি তাদের সৌন্দর্যের বিচারে বিশেষ সমাদৃত ; ( ২ ) ফুলগুলি ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকবে অনেক সময় ধরে ; ( ৩ ) এদের চাষ হবে মোটামুটি সহজ ; ( ৪ ) ফুলের চাষের খরচ হবে এমন যাতে ফুল বিক্রীর পরে লাভের অংশটি অন্তত মোটামুটি ভাল হয় ; ( ৫ ) ফুলগাছগুলির বংশবিস্তার সহজ হতে হবে যাতে এদের নতুন গাছ নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে ; ( ৬ ) এই সব ফুলগাছের রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়া দরকার ; ( ৭ ) ফুলগুলি এরকম হওয়া দরকার যা সহজেই দূরপ্রান্তে পাঠানো যেতে পারে, এবং ( ৮ ) ডালিয়া, গোলাপ প্রভৃতি যে সব গাছের অনেক প্রজাতি রয়েছে তাদের যে প্রজাতিগুলি বেশি ফুল দেয় তাদের ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের জন্য বেছে নিতে হবে।

ফুলের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ব্যবসাও কিছুটা এসে যাবে। গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস প্রভৃতির চারগাছ বা বাল্ব বেশ ভাল দামে বিক্রী হয়। এবং ভাল গাছ দেয় বা ইচ্ছা করে ঠকায় না এ সুনাম অর্জন করতে পারলে সব গাছ সহজেই বিক্রী হয়ে যাবে। সমতল বাংলায় কিছু নার্শারী একসময়ে সুনামের সঙ্গে গাছ বিক্রী করতো কিন্তু ইচ্ছা করে ঠকানোর ব্যবসা আরম্ভ করে তাদের ব্যবসা পড়ে গেছে। ফুলগাছের ব্যবসার সময়ে আমরা এটা যেন মনে রাখি।

জীবিকা হিসাবে ফুলচাষের বেলায় বিভিন্ন ফুলের চাষ একসঙ্গে করতে হবে। এ কাজে পুষ্পসজ্জার বিশিষ্ট ফুলগুলির যেমন চাষ করা হবে তেমনি চাষ করা হবে পূজা ও অন্যান্য কাজের উপযুক্ত ফুলগুলি। পুষ্পসজ্জার ফুলগুলি কাটতে হবে তাদের উপযুক্ত সময়ে এবং তাদের উপযুক্ত সময়ে পেঁাছে দেওয়া দরকার। এবং প্রত্যেক ফুলচাষীর চেষ্টা করতে হবে পুষ্পসজ্জার ফুলের কিছু বাঁধা খদ্দের ধরবার। সমতল পশ্চিম বাংলা থেকে কোন দিন বিদেশে ফুল রপ্তানী করা হবে কিনা জানি না, কিন্তু যদি কোন দিন যায় তাহলে যাবার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ডালিয়ার। বিদেশে পুষ্পসজ্জার ফুল হিসাবে এর চাহিদা গোলাপের সমান। সমতল বাংলায় এর চাষের খাটুনি ও খরচ দুইই খুব কম। এখানে ডালিয়া ফুল দেয় পুরো চার মাস ধরে এবং এখানকার ফুল উৎকর্ষের বিচারে যে কোন দেশের ভাল ফুলের সমতুল। ডালিয়া ছাড়া যে গাছগুলি পুষ্পসজ্জার ফুলের যোগান দিতে সমতল বাংলায় চাষ করার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত তারা ক্লায়ান্থাস, গোলাপ, গ্লাডিওলাস, গ্লোরিওসা, জারবেরা ও রজনীগন্ধা। এদের চাষ সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের বেলায় আরও কি করা দরকার তা নিচে দেওয়া হলো।

**ক্লায়ান্থাস ॥**

ক্লায়ান্থাসের সাধারণ চাষ সম্পর্কে 'বাছাই লতানো ফুলগাছ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এর ভাল বীজ দিয়ে ভাল ফুল ফোটাতে পারলে এক একটি থোকায় দশটি করে ফুল পাওয়া সম্ভব এবং পুষ্পসজ্জায় এই দশটি ফুলের ক্লায়ান্থাসের থোকারই বেশি সমাদর। ক্লায়ান্থাসের থোকার ডাঁটিটি খুব বড় নয় তাই এগুলি বেশি ব্যবহার হবে নিচু ফুলদানি সাজাতে। গাছের ডাল কাটতে রাজী থাকলে এক সঙ্গে তিন থোকা ফুল নিয়ে তা কাটা যেতে পারে এবং এটি বিভিন্ন রকমের পুষ্পসজ্জায় ব্যবহার করা চলবে। তবে ডাল কাটলে সেই পুরো ডাল থেকে আর ফুল পাবার সম্ভাবনা নেই। কারণ ক্লায়ান্থাস ডালের পাশ দিয়ে নতুন ডাল বড় ছাড়ে না বা ছাড়লেও তাতে ফুল পাওয়া খুবই কঠিন। তাই ফুলসহ ডালের জন্য খুব ভাল দাম না পেলে তা কখনও কাটা উচিত নয়। ক্লায়ান্থাসের পাতাও পুষ্পসজ্জাতে ফুলের মত কয়েক দিন ধরে সুপ্রভ থাকে। ক্লায়ান্থাসের শুধু সাদা ফুলের প্রজাতিটিও বাইরের দেশ থেকে আনানো দরকার। এটি গাছেতে তত সুন্দর না দেখালেও সাধারণ ক্লায়ান্থাসের সঙ্গে পুষ্পসজ্জায় খুবই মানাবে। ব্যবসার ভিত্তিতে

চাষ করতে গিয়ে অনেক গাছের চাষ করা দরকার পড়ে। সাধারণ অবস্থাতে ক্লায়ান্থাসের সব ডালগুলি আলাদা আলাদা কাঠি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু এ বেলায় তা করা অসম্ভব এবং তার কোন দরকারও নেই। কারণ ক্লায়ান্থাস মাটিতেই লতিয়ে চলতে পারে এবং এ অবস্থায় ফুলও বেশ ভাল দিয়ে থাকে। তবে এ বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে যে লতিয়ে দেবার জমি যেন এমন হয় যাতে জল দাঁড়ায় না। এদের দুটি গাছের ভেতরে দূরত্ব হবে হাত তিনেক। ক্লায়ান্থাস দুতিন দফায় চারাতে হবে কারণ গ্রীষ্মের প্রথমে যখন পুষ্পসজ্জার ভাল ফুল পাওয়া বেশ কঠিন, তখনও এটি বেশ ভাল ফুল দিয়ে থাকে।

**গোলাপ ॥**

গোলাপের সমাদর সর্বত্র। পুষ্পসজ্জার ক্ষেত্রে সমাদর সত্যিকারের উঁচুদরের ফুলগুলির, যেগুলির সৃষ্টি হয়েছে ইদানীং কালে। ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের বেলায় এই দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। গোলাপের অনেক সংকর প্রজাতি রয়েছে যাদের ফুল খুবই উঁচুমানের, কিন্তু তাদের ভাল ফুল পেতে পরিচর্যাও করতে হয় অনেক। এ গোলাপ-গুলিকে ব্যবসার ভিত্তিতে চাষ করা উচিত হবে না, যদিও এসব ফুল দিয়ে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর পুষ্পসজ্জা রচনা করা সম্ভব। গোলাপ চাষের বেলায় আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিভিন্ন রঙের ফুল যেন ফুলচাষীর কাছে পাওয়া যায়। পুষ্পসজ্জার জন্য গোলাপ কাটতে হবে আধফোটা অবস্থায় এবং কাটতে হবে বেশ কিছুটা ডাঁটিসহ। ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের বেলায় গোলাপের বংশবিস্তারের উপায়গুলি ভালভাবে শিখে নেওয়া দরকার যাতে কিছু গাছ কিনেই কিছুদিনের ভেতরে তা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়ে নেওয়া যায়। বিভিন্ন পদ্ধতির ভেতরে চোখকলমের সাহায্যে গোলাপের বংশবিস্তার খুবই সহজ।

সমতল বাংলায় যে গোলাপটির ব্যবসার ভিত্তিতে চাষ, তার নাম 'হিজ ম্যাজেস্টি' এবং এর জন্ম হয়েছে সুদূর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। এটি মোটামুটি ভাল ফুল কিন্তু এর থেকে উন্নততর অনেক গোলাপের সৃষ্টি হয়েছে এর ভেতরে। ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের বেশি উপযোগী এরকম কিছু প্রজাতির নাম দিচ্ছি, তবে এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, গোলাপের এত বেশি সংকর প্রজাতি প্রতি বছর তৈরী হচ্ছে যে, যে কোন তালিকা কয়েক বছরের ভেতরেই পুরানো হয়ে যাবে : আইফেল টাওয়ার ; গ্রাণাডা ; মনটিজুমা ; দি কুইন এলিজাবেথ ; আমেরিকান হেরিটেজ ; হ্যাপিনেস ; হরিদ্রা ; পীয়ার জীণ্ট ; তুষার ; ডক্টর হোমী ভাবা ; মিষ্টী মর্ণ ; সুপার ষ্টার ; জয় ; রাজাজী ; ক্লাউস ষ্টোর-টেবেকার ; বেল অব পানজাব ; ইনটারফ্লোরা ; কমাণ্ড পারফরমেন্স ; জিনজার রজার্স ; ল্যানডোরা ; মুলার্ড জুবিলী ; ওরিয়ানা ; সামার হলিডে।

**গ্লাডিওলাস ॥**

ফুলদানির ফুল হিসাবে গ্লাডিওলাসের খুবই চাহিদা রয়েছে। এর সাধারণ চাষ সম্পর্কে 'কন্দজ ফুলগাছ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের বেলায় এদের জুন-জুলাই থেকে আরম্ভ করে জানুয়ারী পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে। তবে যে কোন গ্লাডিওলাসের বাল্বকে লাগাবার আগে অন্তত চার মাস ধরে বিশ্রাম দেওয়া একান্ত দরকার। এদের বিশ্রামের সময় তুলে রাখতে হবে নইলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। গ্লাডিওলাসের সুন্দর প্রজাতির সংখ্যা এখন অনেক এবং এদের ভেতরেও ডাবল প্রজাতিগুলি আরও বেশি সমাদৃত। সমতল বাংলায় বছরের বেশি সময় ধরে ফুল দিতে পারলেও গ্লাডিওলাসের বেশি ভাল ফুল ফোটে শীতকালে। দেওঘরে একটি প্রতিষ্ঠান অনেক দিন ধরে পুষ্পসজ্জার গ্লাডিওলাস যোগান দিয়ে আসছে ; ব্যবসার ভিত্তিতে চাষ করতে আরম্ভ করার আগে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

**গ্লোরিওসা ॥**

গ্লোরিওসা সম্পর্কে 'কন্দজ ফুলগাছ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবসার ভিত্তিতে

চাষের বেলায় এর সব প্রজাতিরই চাষ করতে হবে। গাছের সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়াবার জন্য সুপারবা ও অন্য যেগুলির বীজ হয় তাদের বীজ থেকেও গাছ তৈরী করা দরকার।

**জারবেরা ॥**

জারবেরা সম্পর্কে 'শীতের মরসুমী ফুল' অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করেছি। এদের চাষ খুবই সহজ। জারবেরার জন্য জমি পাশাপাশি জমির থেকে একটু উঁচু হওয়া দরকার যাতে এর গোড়ায় কখনও জল না দাঁড়ায়, এবং এ জমিতে যেন প্রচুর রোদ পড়ে। এর ডাবল ও সিঙ্গেল এই দুই ধরনের ফুলই পুষ্পসজ্জায় সমাদৃত। গোছা ভাগ করে বংশবিস্তার জারবেরার বেলায় সাধারণ নিয়ম কিন্তু অল্প সময়ে বেশি গাছ পেতে বীজ দিয়েও এদের বংশবিস্তার করতে হবে। জারবেরার বীজ পাকলেই তা চারাবার নিয়ম।

**ডালিয়া ॥**

পুষ্পসজ্জার ফুল হিসাবে পাশ্চাত্যে ডালিয়ার সমাদর গোলাপের মতই। এদেশেও একাজে ডালিয়ার চাহিদা না হবার কারণ নেই তবে পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত প্রজাতিগুলি পাবার দরকার। পুষ্পসজ্জার কাজে বেশি সমাদর পম্পন, স্মল ক্যাকটাস ও স্মল ডেকরে-টিভের। কিছু ভাল স্মল ডেকরেটিভের সমতল বাংলাতেই খুব ইদানীং সৃষ্টি হয়েছে এবং এর কতগুলি পুষ্পসজ্জার খুবই উপযুক্ত। কিন্তু পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত পম্পন ও স্মল ক্যাকটাসের কিছু ভাল প্রজাতি বিদেশ থেকে আনানো দরকার। ডালিয়ার চাষ খুব সহজ এবং খুব সহজেই অনেক সংখ্যায় এর বংশবৃদ্ধি করা যায়। ডালিয়ার চাষ সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য প্রথম লেখকের অন্য বই 'ডালিয়া'-র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এখানে এখন যে সব ডালিয়া পাওয়া যায় তাদের ভেতরে স্মল ক্যাকটাস 'চিয়ারীও'; স্মল ডেকরেটিভের ভেতরে 'সারদা দেবী', 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ', 'জালি', এবং মিডিয়াম ডেকরেটিভ 'ভিক্ষু-স মাদার' প্রভৃতি পুষ্পসজ্জার পক্ষে খুবই ভাল ফুল। এছাড়া এবং পম্পনের 'গ্লো', 'ডাষ্টন স্টোন', 'এলবিনো' প্রভৃতিও চাষ করা যেতে পারে।

**রজনীগন্ধা ॥**

'কন্দজ ফুলগাছ' অধ্যায়ে রজনীগন্ধা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সমতল বাংলায় এর চাষ অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে পুষ্পসজ্জার ফুল হিসাবে। এদের চাষ বেশি হাওড়া ও মেদিনীপুরে। রজনীগন্ধার জমিতে যেন প্রচুর রোদ পড়ে এবং গোড়ায় যেন জল না দাঁড়ায়। এটি সার হিসাবে পাঁকমাটি ও গোবরসার খুব পছন্দ করে। সিঙ্গেলের চেয়ে ডাবল রজনীগন্ধা ফুল দেয় কম এবং এদের গন্ধও কম। ব্যবসার ভিত্তিতে রজনী-গন্ধার চাষ করার আগে অনেক দিন ধরে এই ব্যবসায় আছেন এরকম কোন রজনীগন্ধা-চাষীর কাছ থেকে এর চাষ সম্পর্কে আরও ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত। ব্যাপক চাষের বেলায় রজনীগন্ধায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারেন। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ছয় গ্রাম ইউরিয়া, ষোলো গ্রাম সিঙ্গেল সুপারফসফেট ও ষোলো গ্রাম মিউরেট অব পটাশ প্রতি বর্গমিটার হারে প্রয়োগ করলে বেশ ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। এই মিশ্র সার কন্দ লাগাবার আগে এবং গাছ উঠবার চার সপ্তাহ পরে আবার দিতে হবে। রজনীগন্ধার কন্দ বছর দুই অন্তর তুলে লাগানো সাধারণ বিধি, লাগাবার সময়ে শুধু বড় কন্দগুলিই লাগানো ভাল। প্রথম দুয়েকটি ফুল ফুটলেই রজনীগন্ধার ডাঁটি কেটে নেওয়া চলবে।

# ফুলবাগানের বারো মাসের কাজ

ফুলবাগানে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে। এদের অনেকগুলির প্রস্তুতি শুরু হয় অনেকদিন আগে থেকে। ঠিক সময়ে কাজ আরম্ভ না করতে পারলে সে কাজের বেলায় আশানুরূপ ফুল পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সারা বছরের বেশি দরকারী কাজগুলি চুম্বক আকারে এখানে দেওয়া হয়েছে। কোন্ কাজ কোন্ সময়ে হওয়া দরকার তা এরা সহজেই মনে করিয়ে দেবে। বারো মাসের কাজ লেখার সময়ে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকবে এবং বর্ষা আরম্ভ হবে জ্যৈষ্ঠের ভেতরে। বাংলা মাসের সঙ্গে সঙ্গে ইংলিশ মাসও দেওয়া হয়েছে, প্রথমে দেওয়া ইংলিশ মাসটির মাঝামাঝি থেকে পরে দেওয়া ইংলিশ মাসটির মাঝামাঝি সময় বুঝতে হবে।

**বৈশাখ ( এপ্রিল-মে ) ॥**

বৈশাখের প্রধান কাজ গরমে যাতে গাছপালা মারা না পড়ে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করা। এ কাজ করতে গাছের জলের যাতে অভাব না হয় তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং সুখী গাছের বেলায় সন্ধ্যার দিকে জল স্প্রে করাও দরকার।

গাছের গোড়ায় মালসিং-এর ব্যবস্থা করলে গোড়া ঠাণ্ডা থাকবে এবং জল টানার পরিশ্রমও অনেক কমবে। একাজে মরসুমী ফুলগাছের জন্য পাতাপচাসার, টবের গাছ ও অন্যান্য গাছের জন্য কুচি করে কাটা খড় ইত্যাদি ব্যবহার করা ভাল।

ঘন বর্ষার দিনে ফুটবে এরকম মরসুমী ফুলের বীজ চারাবেন এ মাসের শেষ দিকে।

দীর্ঘজীবী যেসব ফুলগাছ ইত্যাদি বর্ষার প্রথমে লাগাতে চান তাদের জন্য গর্ত ও তাতে সারমাটি ভরার কাজ বর্ষার আগে শেষ করে ফেলবেন।

নতুন লনের ঘাস লাগাবার আগের সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে বর্ষা নামার আগেই।

সামনের বছরের জন্য রাখা ডালিয়া ( বেঁচে থাকা গাছ, গাছ মরে গেছে এরকম বাল্ব নয় ) ও চন্দ্রমল্লিকার গাছে জল দিতে হবে নিয়মিত ভাবে। এবং সকাল দশটার পর থেকে রোদের পরিবর্তে হালকা ছায়া পায় এরকম খোলা জায়গায় এদের রাখা দরকার।

টবের বা অন্যান্য জায়গায় লাগানো বুগেনভিলিয়া ছাঁটার পক্ষে এই মাসের শেষ দিক সবচেয়ে ভাল সময়।

গরমের দিনে রেড-স্পাইডার মাইট-এর উপদ্রব বেশি, মোরেষ্টান প্রভৃতি ওষুধ এর প্রতিরোধে ভাল কাজ দেবে।

**জ্যৈষ্ঠ ( মে-জুন ) ॥**

জ্যৈষ্ঠের শেষ দিকে বর্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত সব কিছুই বৈশাখের মত পরিচর্যা চলবে। এবং বর্ষা আরম্ভ হবার পরে নিচের পরিচর্যাগুলি করা হবে। অনেক সময়ে বর্ষা আরম্ভ হয়ে আবার খরা দেখা দেয়, এরকম হলে গাছে জল দেবার প্রতি ভাল নজর রাখতে হবে।

গাছের গোড়ায় গরমের সময়ে দেওয়া মালস্ বর্ষা আরম্ভ হলেই সরিয়ে নিতে হবে।

গরমের দিনে গাছে জল দেবার সুবিধার জন্য গাছের গোড়ার জমি পাশাপাশি জমি থেকে নিচু করে দেবার দরকার পড়েছিল। বর্ষার আরম্ভেই বাড়তি মাটি দিয়ে গাছের গোড়া পাশাপাশি জমি থেকে একটু উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে।

বাড়তি জল কোন গাছেরই উপকারে লাগে না, তাই বাড়তি জল বেরিয়ে যাবার ভাল ব্যবস্থা বর্ষার প্রথমেই করা দরকার।

লনের জমির কোন জায়গা নিচু রয়েছে কিনা তা বেশি বৃষ্টির ঠিক পরেই ভাল করে বোঝা যাবে। নিচু জায়গা থাকলে তা গুঁড়ো মাটি কিছু দিন অন্তর দিয়ে পাশের

জায়গার সমান করে দেবেন। নতুন তৈরী হচ্ছে এরকম লনে ঘাসের কাটিং লাগানো হবে এ সময়ে। পুরানো লনে পাতাপচাসার মেশানো সারও বিছিয়ে দেওয়া হবে এ সময়ে।

বৃষ্টি যাতে ক্যাকটাসের ক্ষতি না করে তার জন্য সাবধান থাকা দরকার।

ছায়াঘরের বা অর্কিড-ঘরের ছায়া দেবার উপকরণ এই সময়ে অপেক্ষাকৃত পাতলা করে দিতে হবে।

সর্বজয়া এ সময়ে ভাগ করে লাগাবেন, লাগাবার আগে এদের জোর করে বিশ্রাম দিইয়ে নেওয়া ভাল।

বর্ষা ভালভাবে আরম্ভ হলে দীর্ঘজীবী গাছের কাটিং ও গুটিকলম আরম্ভ করা যাবে।

বর্ষার দিনে জবা গাছে বীটেল পোকা লেগে গাছের খুব ক্ষতি করে, এ সম্পর্কে প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে।

**আষাঢ় (জুন-জুলাই) ॥**

আষাঢ় বর্ষার মাস। তাই জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টির দিনের যে সব পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে তা সবই একই ভাবে করতে হবে। প্রথম দিকের বৃষ্টি মাটি সহজেই শুষে নেয়, কিন্তু কিছুদিন পরে বৃষ্টির জল আর সহজে নামতে চায় না। এই অবস্থা এই মাস থেকে বেশি করে হবে। তাই জল বেরিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আরও সাবধান হওয়া দরকার।

চন্দ্রমল্লিকার কাটিং লাগানো শুরু হবে আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে।

ডালিয়ার যে সব গাছ মাঝখান থেকে ছেঁটে দেবার দরকার তাদের এই মাসের শেষ দিকে ছেঁটে দেবেন। ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকার কাটিং নেবার মূলগাছগুলিতে খুব অল্প পরিমাণে ইউরিয়া পাতার সার হিসাবে ব্যবহার করলে তা আরও ভাল কাটিং পেতে সাহায্য করবে।

লনের ঘাস বর্ষার সময়ে অন্য সময়ের চেয়ে বড় রাখতে হবে। লনে কেঁচোর তোলা মাটি নিয়মিত ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করবেন, এবং লনে চুন দেবার দরকার থাকলে তাও এই সময়ে দেবেন।

গোলাপ প্রভৃতির জমিতে চুন ছড়াবার দরকার থাকলে তা এই সময়ে ছড়ানো ভাল।

আষাঢ় বনসাই লাগাবার বা টব পালটে লাগাবার বিশেষ উপযুক্ত সময়।

টবের গাছের উপরের সারমাটি পালটানো বা বাড়তি সার দেওয়া বা টব পালটে লাগাবার ভাল সময়।

পদ্ম ও শালুক লাগাবার ভাল সময়, এদের পুরানো গাছে বাড়তি সার দেবারও উপযুক্ত সময়।

বর্ষার দিনে বিভিন্ন ফাংগাস রোগ দেখা দেয়, এ সম্পর্কে প্রথম থেকেই সাবধান হবেন।

**শ্রাবণ ( জুলাই-অগাস্ট ) ॥**

এ মাসের শেষ দিক থেকে ডালিয়ার কাটিং বসাতে আরম্ভ করবেন।

শীতের যে মরসুমী ফুলগুলি ফুল দিতে সময় বেশি নেয়, তাদের এ মাসের শেষ দিকে চারাবেন। এবং এগুলি গামলা-টবে চারানো উচিত।

গোলাপ এ মাসের শেষে লাগাতে পারেন। এ সময়ের গাছ আগামী শীত থেকেই ফুল দেবে।

দীর্ঘজীবী গাছের বীজের চারাগাছ জমি থেকে তুলে এই সময়ে নার্শারী টবে লাগানো যেতে পারে।

এ মাসেও জমিতে ভালভাবে চুন ছড়ানো যাবে।

**ভাদ্র ( অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ) ॥**

এ মাসের শেষ দিকে চন্দ্রমল্লিকা গাছ ফাইনাল টবে বসিয়ে দেওয়া দরকার। এ কাজটি এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে করাই সবচেয়ে ভাল।

শীতের মরসুমী ফুলের বীজ এ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারাবেন।

গ্লাডিওলাস এ মাস থেকে বেশ ভালভাবে লাগানো যেতে পারে, এদের দিন পনেরো অন্তর লাগিয়ে গেলে অনেক দিন ধরে ফুল পাওয়া যাবে।

ভাদ্রের শেষদিক থেকে ডালিয়ার কচিগাছ লাগানো যাবে, এগুলি ফুল দেবে নবেম্বর থেকে।

**আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ৷৷**

শীতের মরসুমী ফুলের বীজ চারানো আগের মাসে শেষ না হলে তা পুরো আশ্বিন ধরে চারানো যেতে পারে। তবে এ মাসের শেষের দিকে চারানো বীজের ফুল পেতে দেরি হয়ে যাবে।

এই মাসে এবং এর পরের মাসেও আকস্মিক ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে চন্দ্রমল্লিকার যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

**কার্তিক ( অক্টোবর-নবেম্বর ) ৷৷**

চন্দ্রমল্লিকার বাড়তি কুঁড়ি ও ডাল কচি অবস্থায় খুব সাবধানে ভেঙে দেবেন। কুঁড়ি আসার ঠিক পরের বাড়তি চাপান সার এবং তার নির্দিষ্ট সময় পর থেকে তরলসার দিয়ে যেতে হবে।

ডালিয়ার কেয়ারি এখন থেকে পাশাপাশি থেকে একটু নিচু করে তৈরী করবেন।

এ মাসের শেষদিক গোলাপ গাছ লাগাবার বিশেষ উপযুক্ত সময়। বর্ষা ভাল ভাবে ধরে গেলে এ মাসে গোলাপ গাছ ছাঁটবেন এবং গোড়ার মাটি খুঁড়ে দেবার প্রয়োজন মনে করলে তাও গাছ ছাঁটার ঠিক পরেই করবেন।

সর্বজয়াতে বাড়তি সার দেবেন এই মাসে।

ঝড়ের জন্য চন্দ্রমল্লিকার যাতে বড় রকমের কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য এ সময়েও সাবধান থাকতে হবে।

**অগ্রহায়ণ ( নবেম্বর-ডিসেম্বর )**

গোলাপের কুঁড়ি বাড়তে আরম্ভ করলে গাছে নিয়মিতভাবে তরল সার দেওয়া দরকার। গোলাপে পাতার দুটি সারও এ মাস থেকে আরম্ভ করা যাবে।

শীতকালের লন দেখতে সবচেয়ে সুন্দর, তবে এর জন্য নিয়মিত সার দেওয়া দরকার। লনের ঘাস এ সময় থেকে ছোট করে ছাঁটা হবে।

গরমের প্রথম দিকেও শীতের যেসব মরসুমী ফুল ফোটে তাদের বীজ এ সময়ে চারানো যেতে পারে।

**পৌষ ( ডিসেম্বর-জানুয়ারী ) ৷৷**

এ মাস থেকে বিভিন্ন ফুলের ফোটার সময়, ভাল ফুল পেতে নির্দিষ্ট সময় থেকে তরলসার ব্যবহার করতে হবে।

ডালিয়ার লেট-কাটিং করা আরম্ভ হবে এ মাসের প্রথম থেকে। এ কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে কাটিং যতদিন ধরে করা সম্ভব।

পৌষ মাস থেকে চন্দ্রমল্লিকার সাকার তুলে টবে অথবা জমিতে লাগানো হবে।

গোলাপের চোখকলমের জন্য এ মাস ও এর পরের মাস খুব ভাল সময়।

সারা পৌষ জবা গাছ লাগাবার ভাল সময়।

হেমেন্থাস লিলির পরিচর্যা শুরু হবে এ মাস থেকে।

**মাঘ ( জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ) ৷৷**

গ্রীষ্মের মরসুমী ফুলের বীজ চারানো হবে এই মাসে।

মাঘ মাস দীর্ঘজীবী ফুলগাছ লাগাবার পক্ষে বেশ ভাল সময়।

এমারিলিস লিলিতে জল দিতে আরম্ভ করবেন এ মাসের প্রথম থেকে। ভাল ফুলের এমারিলিসে তরলসার দেওয়া দরকার নিয়মিত ভাবে।

এ মাসের শেষ থেকে কিছুটা গরম পড়তে আরম্ভ করবে, তাই গাছে প্রয়োজনমত জলের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

গোলাপের চোখকলম এ মাসের গোড়ার দিকেও খুব ভালভাবে করা চলবে।

**ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) ॥**

এ মাসের শেষ দিকে জমির ডালিয়া গাছ টবে তুলে নেবেন। সব টবের ডালিয়ার গাছ যতদিন বেঁচে থাকবে নিয়মিত জল দেওয়া হবে এবং গাছ শুকিয়ে গেলে জলও বন্ধ করবেন।

জবার চোখকলম করার কাজে এ মাস ও এর পরের মাস বেশ ভাল সময়।

দীর্ঘজীবী ফুলগাছ ইত্যাদির বীজ চারাবার পক্ষে ফাল্গুন বেশ ভাল সময়।

গরম আরম্ভ হওয়াতে পাতাবাহার এবং আরও অনেক বাহারি-পাতার গাছকে দুপুরের রোদ দেওয়া চলবে না। তাই এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

পাতাপচাসার, গোবরসার ও কম্পোষ্ট সার তৈরী করার পক্ষে এ মাস বেশ ভাল সময়।

**চৈত্র ( মার্চ-এপ্রিল ) ॥**

বর্ষাকালের প্রথম দিকে ফুল দেবে এরকম মরসুমী ফুলের বীজ এ মাসের প্রথম থেকে চারানো যাবে।

লনের ঘাস বীজ দিয়ে করতে চাইলে তার পক্ষে এ মাস বেশ ভাল সময়।

ফুলবাগানে পাখি আসুক চাইলে এ মাসের শেষ থেকে বর্ষা আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত পাখির খাবার জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

অনেক বছর চৈত্র থেকেই বেশ গরম পড়তে আরম্ভ করে। এ রকম হলে গরমের হাত থেকে গাছ রক্ষা করার যেসব বিশেষ কাজের কথা বৈশাখ মাসের বেলায় বলা হয়েছে, সেগুলি এ মাস থেকেই করতে হবে।

# পরিভাষা

**অলটারনেট :** * * * * / * * * এই চিত্রের প্রথায় গাছ লাগানোকে বলে অলটারনেট পদ্ধতি। প্রতি গাছ তার পাশের সারির গাছগুলির দুটি গাছের মাঝে পড়ে বলে তা বাড়ার জন্য বেশি জায়গা পায়। এবং এতে সব গাছের ফুল চোখে পড়ে অপেক্ষাকৃত সহজে।

**এয়ার-লক :** ডাঁটিশুদ্ধ ফুল কাটার বেলায় অনেক সময়ে কাটা ডাঁটির ভেতরে হাওয়া ঢুকে যায়। ভেতরের হাওয়ার বাধায় সেই ডাঁটি জলে রাখলেও তা ফুলকে প্রয়োজনীয় জলের যোগান দিতে পারে না, ফলে এই ফুল সহজেই ঝিমিয়ে পড়ে। ডাঁটিতে ঢুকে যাওয়া বাতাস জলের পথ বন্ধ করে দেয় বলে বলা হয় এয়ার-লক।

**কাঁচগাছ :** কাটিং থেকে তৈরী গাছের বেলায় এ কথাটির ব্যবহার এবং সুখী গাছের বেলাতে এর ব্যবহার বেশি। কাটিংয়ে শেকড় এলে তা ছোট টবে বসিয়ে কিছু দিন পরে এই গাছ অন্যত্র লাগানো হয়। গাছের এই ছোট টবে থাকার অবস্থার নাম কাঁচগাছ।

**টপ ড্রেসিং :** গাছকে আরও ভাল ফুল বা পাতা দিতে সাহায্য করতে গাছের গোড়ায় বাড়তি সারমাটি দেওয়ার নাম টপ ড্রেসিং। বাংলাতে 'চাপান সার' এর সমার্থক হয়ে গড়ে উঠছে। এর পরে গাছে কোন বাড়তি গুঁড়ো সার সাধারণত দেওয়া হয় না, তাই

টপ ড্রেসিং গ‍ুঁড়ো সার দেবার শেষ পর্যায়।

**ট্রেনিং :** আপন পছন্দ অনুযায়ী গাছকে একটি বিশেষ আকৃতিতে গড়ে তোলার নাম ট্রেনিং।

**ট্রেস এলিমেণ্ট :** খাদ্য হিসাবে কিছু কিছু মৌল পদার্থ গাছের খুব অল্প পরিমাণে দরকার পড়ে। এই পদার্থগুলিকে ট্রেস এলিমেণ্ট বলে। সাধারণত মাটিতেই এরা উপযুক্ত পরিমাণে থাকে। যে কোন একটি ট্রেস এলিমেণ্টের ঘাটতির কারণে অন্য সব খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও গাছ এইসব খাদ্য নিতে সক্ষম নাও হতে পারে। দ্বিতীয় পাতার সারটি ট্রেস এলিমেণ্টের যোগান দিতে সক্ষম।

**ডাবল :** বহুদল বিশিষ্ট ফুল ডাবল ফুল নামে পরিচিত। ফুলের সুন্দরতম অবস্থা পার হয়ে যাবার পরে ডাবল ফুলের কেন্দ্র খোলে, তার আগে খোলে না।

**ডিজবাডিং :** বিভিন্ন প্রয়োজনে কুঁড়ি ভেঙে দেবার নাম ডিজবাডিং। যথাসম্ভব বড় ফুল পেতে এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার।

**পি-এইচ ভ্যালু :** মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাপ সূচকের নাম পি-এইচ ভ্যালু। বিভিন্ন গাছ বিভিন্ন পি-এইচ ভ্যালুর মাটিতে বেশি ভাল জন্মায়। মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব কোন গাছের পক্ষে বেশি রকমের অনুপযুক্ত হলে সেই মাটিতে সেই গাছ কখনই ভাল জন্মাবে না। উপযোগী পি-এইচ ভ্যালুর মাটিতে গাছ বাড়তি সার সহজেই নিজের পুষ্টির কাজে লাগাতে পারে। পি-এইচ ভ্যালু সাতকে না-ক্ষার-না-অম্ল ধরা হয়; সাতের কমে মাটির অম্লত্ব ও সাতের বেশি হলে মাটির ক্ষারত্ব বোঝায়। পরীক্ষা করা ছাড়া মাটির সঠিক পি-এইচ ভ্যালু জানার উপায় নেই। মাটিকে নির্দিষ্ট কোন পি-এইচ ভ্যালুতে আনতে কি করা প্রয়োজন তা মাটি-পরীক্ষকের কাছে জানা যাবে।

**ফাইনাল টব :** কোন কোন গাছের বেলায় কয়েক বার টব পালটে গাছ লাগানো দরকার। এই ধরনের গাছকে পাকাপাকি যে টবে লাগানো হয় তার নাম ফাইনাল টব। গাছ এই ফাইনাল টবে ফুল দেবে।

**শিডিউল :** পুষ্পপ্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতার নিয়ম ও প্রতিযোগিতার বিভাগ সম্বলিত পুস্তিকা বা ঐ ধরনের কিছু।

**স্টপিং :** সাধারণ অর্থে ঝোপালো করতে গাছের মূল ডালকে খুঁটে ভেঙে দেওয়াকে বলে স্টপিং। চন্দ্রমল্লিকার বেলায় ভাল ফুল পেতে এর ব্যবহার।

**সংকর প্রজাতি :** পরাগ সংযোগের মাধ্যমে তথা বীজের সাহায্যে যে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি তার নাম সংকর প্রজাতি। সংকর প্রজাতি তৈরীর প্রধান লক্ষ্য আরও উন্নত প্রজাতি পাওয়া। জনপ্রিয় বহু গাছের যেসব প্রজাতি বাগানে চাষ করা হয় তাদের শতকরা নিরানব্বইটি প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে সংকর প্রজাতি হিসাবে। নিত্য নতুন সংকর প্রজাতি তৈরী হবার ফলে ফুলবাগান দিন দিন আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে।

**সারমাটি :** নির্ধারিত হারে সার মেশানো সাধারণ মাটি। বিভিন্ন গাছের চাহিদা অনুযায়ী সারমাটি আলাদা আলাদা ভাগে তৈরী করার দরকার পড়ে।

**সিঙ্গেল :** সিঙ্গেল ফুল বলতে বোঝায় একসারি-পাপড়ির ফুলকে। এদের ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের কেন্দ্রও দেখতে পাওয়া যায়।

**সেমিডাবল :** দুই সারি বা কিছু বেশি পাপড়ির ফুলকে বলে সেমিডাবল ফুল। এদের কেন্দ্র সিঙ্গেল ফুলের চেয়ে পরে খুললেও ডাবল ফুলের চেয়ে অনেক আগে খুলে যায়। অনেক ফুলের বেলায় সেমিডাবল ফুলকেও ডাবল ফুল বলা হয়ে থাকে।

**স্পোর্ট :** প্রকৃতির খেয়ালে অনেক সময়ে মূলগাছের ফুল বা পাতা বেশ কিছুটা পালটে যায়। গাছের এই রূপান্তর বজায় রাখতে পারলে তা সেই গাছের স্পোর্টে পরিণত হয়। এই স্পোর্টকে আলাদা প্রজাতি হিসাবে গণ্য করা বিধি।

# বইয়ের বিভিন্ন শব্দ বা নামের ইংলিশ সমার্থক

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নাম |
|---|---|
| অফসেট | Offset |
| অলটারনেট | Alternate |
| আয়রন কেলেটস (বা চিলেটস) | Iron chelates |
| ইউরিয়া | Urea |
| উইডিসাইড | Weedicide |
| উইল্ট | Wilt |
| এপসম সল্টস | Epsom salts |
| এফিস | Aphis |
| এমোনিয়াম সালফেট | Ammonium sulphate |
| এয়ার-লক | Air-lock |
| এলড্রিন | Aldrin |
| এলুমিনিয়াম লেবেল | Aluminium label |
| এসপিরিন | Aspirin |
| কাঁচগাছ | Green plant |
| কপার কার্বনেট | Copper carbonate |
| কপার সালফেট | Copper sulphate |
| কম্পোষ্ট | Compost |
| কলার-স্লাইড | Colour-slide |
| কাটিং | Cutting |
| ক্যাটারপিলার | Caterpillar |
| ক্যাটালগ | Catalogue |
| ক্যান্টিলিভার পোর্টিকো | Cantilever portico |
| ক্যাপটান | Captan |
| গুয়ানো | Guano |
| গোবরসার | Cowmanure |
| গ্রীণ ম্যানিওর | Green manure |
| গ্রেন | Grain |
| গ্লাসহাউস | Glasshouse |
| চারা | Crocks |
| চেশাণ্ট কম্পাউণ্ড | Cheshunt compound |
| জলদি গ্রো | Jaldi Gro |
| জেনাস | Genus |
| টপ ড্রেসিং | Top dressing |
| টপিয়ারি | Topiary |
| ট্রাওয়েল | Trowel |
| ট্রেনিং | Training |
| ট্রেস এলিমেণ্ট | Trace element |

Gov. of West

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নাম |
|---|---|
| ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট | Di-ammonium phosphate |
| ডাইব্যাক | Dieback |
| ডাউনি মিলডিউ | Downy mildew |
| ডাবল | Double |
| ডাবল-পারগোলা | Double-pergola |
| ডিজবাডিং | Disbudding |
| ডি.ডি.টি | D.D.T. |
| ডিবার | Dibber |
| ড্যামপিং অফ | Damping off |
| থিওভিট | Theovit |
| থ্রিপস | Thrips |
| নাইট্রেট অব সোডা | Nitrate of soda |
| নাইট্রোজেন | Nitrogen |
| নার্শারী টব | Nursery pot |
| নিকোটিন প্রিপারেশান | Nicotine preparation |
| পটাশ | Potash |
| পটাশিয়াম নাইট্রেট | Potassium nitrate |
| পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট | Potassium permanganate |
| পলিথিন শিট | Polythene sheet |
| পাউডারি মিলডিউ | Powdery mildew |
| পাতাপচাসার | Leafmould |
| পি-এইচ ভ্যালু | pH value |
| প্রপ্রাইটারি কম্পাউন্ড | Proprietory compound |
| প্রেশার স্প্রেয়ার | Pressure sprayer |
| প্ল্যাণ্ট পেটেণ্ট এ্যাক্ট | Plant patent act |
| ফলিডল | Folidol |
| ফলিয়ার ফিড | Foliar feed |
| ফরমালিন | Formalin |
| ফসফরাস | Phosphorus |
| ফাইটোলান | Fytolan |
| ফাইনাল টব | Final pot |
| ফাঙ্গাস রোগ | Fungus disease |
| ফিউরাডন | Furedon |
| ফিশমীল | Fishmeal |
| ফুট রট | Foot rot |
| ফেয়ারি রিং | Fairy-ring |
| ফ্লোরাল পিন-হোল্ডার | Floral pin-holder |
| বটল ব্রাশ | Bottle-brush |
| বাসুডিন | Basudin |
| বি.এইচ.সি | B.H.C. |
| বি-নাইন | B-Nine |
| বীজ চারানো | Sowing of seeds |
| বীটেল | Beetle |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নাম |
|---|---|
| বোর্দো মিকশ্চার | Bordeux mixture |
| বোরো সিলিকেট | Borosilicate |
| ব্যাকটেরিয়া ইনোকুলেশান | Bacteria inoculation |
| ব্রাক্ট | Bract |
| ব্লাইটক্স | Blitox |
| ব্লাকস্পট | Blackspot |
| ব্লাডমীল | Bloodmeal |
| ভাইরাস রোগ | Virus disease |
| ভোলাটাইল অয়েল | Volatile oil |
| ভ্যারাইটি | Variety |
| ময়শ্চার-প্রুফ ফয়েল | Moisture-proof foil |
| মস | Moss |
| মাইক্রো-সালফ | Micro-sulf |
| মালসিং ( বা মালচিং ) | Mulching |
| মিউরেট অব পটাশ | Muriate of potash |
| মিন্ট চেম্বার | Mist chamber |
| মুরগীর সার | Poultry manure |
| মোরেস্টান | Morestan |
| ম্যাগনেসিয়াম সালফেট | Magnesium sulphate |
| ম্যালাথিয়ন | Malathion |
| রয়ালটি | Royalty |
| রাস্ট | Rust |
| রুট রট | Root rot |
| রেক | Rake |
| রেড লেড | Red lead |
| রেড স্পাইডার মাইট | Red spider mite |
| রোগর | Rogor |
| রোজ | Rose of water-can |
| রোলার | Roller |
| র‍্যালীমীল | Rallimeal |
| লন | Lawn |
| লন মোয়ার | Lawn-mower |
| লিকুয়িড সোপ | Liquid soap |
| লিনডেন | Lindane |
| লিনসীড অয়েল | Linseed oil |
| লেট কাটিং | Late-cutting |
| লোনাকল | Lonacol |
| শিডিউল | Schedule |
| ষ্টপিং | Stopping |
| ষ্টীমড হাড়ের গুঁড়ো | Steamed bonemeal |
| ষ্টেম রট | Stem rot |
| ষ্টেরামীল | Sterameal |
| সাকার | Sucker |

Govt. of West

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নাম |
|---|---|
| সালকল | Sulkol |
| সালটাফ | Sultaf |
| সালফেট অব পটাশ | Sulphate of potash |
| সিউডো বাল্ব | Pseudo-bulb |
| সিকুয়েষ্ট্রিন প্লাস | Sequestrene plus |
| সিকেটার | Secateur |
| সিঙ্গেল | Single |
| সুপারফসফেট | Superphosphate of lime |
| সেভিন | Sevin |
| সেমিডাবল | Semi-double |
| সেরাডিক্স | Seradix |
| স্পার্টিন | Spartin |
| স্পিশিস | Species |
| স্প্রিঙ্কলার | Sprinkler |
| স্প্রে | Spray |
| স্পোর্ট | Sport |
| স্লাজ | Sludge |
| হাড়ের গুঁড়ো | Bonemeal |
| হেজ্‌ | Hedge |
| হেপটাক্লোর | Heptachlor |

## প্রচলিত নাম ও তাদের উদ্ভিদবিদ্যার নাম

| বইতে ব্যবহৃত নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| অতসী | Crotalaria |
| অনকোবা | Oncoba |
| অপরাজিতা | Clitoria |
| অর্কিড | Orchid |
| অরোকেরিয়া | Araucaria |
| অলটারনানথেরা | Alternanthera |
| অলিয়া | Olea |
| আইরিস | Iris |
| আকাশ নিম | Millingtonia |
| আর্কটোটিস | Arctotis |
| আরজিইরিয়া | Argyreia |
| ইউকেরিস | Eucharis |
| ইঙ্গা ডালসিস | Inga |
| ইপোমিয়া | Ipomea |
| ইমপেশেন্স | Impatiens |
| ইরান্থিমাম | Eranthemum |
| উইষ্টেরিয়া | Wistaria |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| একালিফা | Acalypha |
| একিমিনিস | Achimenes |
| একিয়াম | Echium |
| এক্রোক্লিনিয়াম | Acroclinium |
| এক্সকোকারিয়া | Excoecaria |
| এগলাওনেমা | Aglaonema |
| এগেভ | Agave |
| এগ্রোষ্টেম্মা | Agrostemma |
| এজেরেটাম | Ageratum |
| এডেনিয়াম | Adenium |
| এডেনোক্যালাইমনা | Adenocalymna |
| এনচ্যুষা | Anchusa |
| এনজেলোনিয়া | Angelonia |
| এনটিগোনন | Antigonon |
| এনটিরাইনাম | Antirrhinum |
| এনথুরিয়াম | Anthurium |
| এপিফাইলাম | Epiphyllum |
| এমহার্ষ্টিয়া | Amherstia |
| এমারান্থাস | Amaranthus |
| এমারিলিস | Amaryllis |
| এরালিয়া | Aralia |
| এরুয়া | Aerua |
| এলাম্যানডা | Allamanda |
| এলিসাম | Allysum |
| এলোকেশিয়া | Alocasia |
| এষ্টার | Aster |
| এসকোলজিয়া | Eschscholzia |
| এসপারাগাস | Asparagus |
| ওডোনটেডেনিয়া | Odontadenia |
| ওয়াটসনিয়া | Watsonia |
| কক্সকোম্ব | Celosia (cockscomb) |
| কচিয়া | Kochia |
| কচুরিপানা | Eichhornia |
| কদম্ব | Anthocephalus |
| কমব্রিটাম | Combretum |
| করবী | Nerium |
| করমচা | Carissa |
| কারিজিয়া | Chorisia |
| কারিয়পসিস | Coreopsis |
| কর্ডিয়া | Cordia |
| কর্ডিলাইন | Cordyline |
| কর্ণফ্লাওয়ার | Centaurea (cornflower) |
| কলকে | Thevetia |

INSTITUTE OF EDU
Govt. of West Beng

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| কলভিলিয়া | Colvillea |
| কসমস | Cosmos |
| কাঞ্চন | Bauhinia |
| কাঠালি চাঁপা | Artabotrys |
| কামিনী | Murraya |
| কারনেশান | Dianthus (carnation) |
| কুপারেন্থাস | Cooperanthes |
| কুফিয়া | Cuphea |
| কুরচি | Holarrhena |
| কৃষ্ণচূড়া | Poinciana |
| কৃষ্ণচূড়া-ছোট | Caesalpinia |
| কেয়া | Pandanus |
| কেশিয়া | Cassia |
| কোয়াশিয়া | Quassia |
| কোলিয়াস | Coleus |
| ক্যাকটাস | Cactus |
| ক্যাকেলিয়া | Cacalia |
| ক্যান্ডিটাফট | Iberis (candytuft) |
| ক্যামোয়েনসিয়া | Camoensia |
| ক্যাম্পসিস | Campsis |
| ক্যালাডিয়াম | Caladium |
| ক্যালিয়ানড্রা | Calliandra |
| ক্যালিষ্টিমন | Callistemon |
| ক্যালেনডুলা | Calendula |
| ক্যাসুরিণা | Casuarina |
| ক্রসেনড্রা | Crossandra |
| ক্রাইনাম | Crinum |
| ক্রিসেন্থিমাম | Chrysanthemum |
| ক্রোটন | Croton |
| ক্লায়ান্থাস | Clianthus |
| ক্লারকিয়া | Clarkia |
| ক্লিওম | Cleome |
| ক্লিভিয়া | Clivia |
| ক্লিমেটিস | Clematis |
| ক্লিরোডেনড্রন | Clerodendron |
| গন্ধরাজ | Gardenia |
| গলফিমিয়া | Galphimia |
| গাঁদা | Tagetes (marigold) |
| গাজানিয়া | Gazania |
| গিলার্ডিয়া | Gaillardia |
| গুলঞ্চ | Plumeria |
| গোডেসিয়া | Godetia |
| গোয়াকাম | Guaiacum |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| গোলাপ | Rosa (rose) |
| গ্রেভিলিয়া | Grevillea |
| গ্লক্সিনিয়া | Gloxinia |
| গ্লাডিওলাস | Gladiolus |
| গ্লিরিসিডিয়া | Gliricidia |
| গ্লোব আমারান্থ | Gomphrena (globe amaranth) |
| গ্লোরিওসা | Gloriosa |
| চন্দ্রমল্লিকা | Chrysanthemum |
| চাঁপা | Michelia |
| চামেলি | Jasminum |
| ছাতিম | Alstonia |
| জবা | Hibiscus |
| জারবেরা | Gerbera |
| জারুল | Lagerstroemia (tree) |
| জাস্টিসিয়া | Justicia |
| জিনিয়া | Zinnia |
| জিপসোফিলা | Gypsophila |
| জিরেনিয়াম | Geranium |
| জুঁই | Jasminum |
| জেফিরেন্থাস | Zephyranthes |
| জ্যাকারণডা | Jacaranda |
| জ্যাকুমণ্টিয়া | Jacquemontia |
| জ্যাট্রোফা | Jatropha |
| ঝাঁটি | Barleria |
| ঝাউ | Thuja |
| ঝুমকো | Passiflora |
| টগর | Tabernaemontana |
| টিথোনিয়া | Tithonia |
| টেকোমা | Tecoma |
| টোরেনিয়া | Torenia |
| ট্যাগিটেস | Tagetes |
| ট্যাবিবুইয়া | Tabebuia |
| ট্রাকেলোস্পারমাম | Trachelospermum |
| ট্রাডেসকানটিয়া | Tradescantia |
| ডম্বিয়া | Dombeya |
| ডায়ান্থাস | Dianthus |
| ডালিম-ফুল | Punica |
| ডালিয়া | Dahlia |
| ডিফেনবাকিয়া | Dieffenbachia |
| ডিমোরফোথেকা | Dimorphotheca |
| ডুরাণ্টা | Duranta |
| ডেডালাকান্থাস | Daedalacanthus |
| ডোডোনিয়া | Dodonea |

Gov. of West Be

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| ড্রেসিনা | Dracaena |
| থানবার্জিয়া | Thunbergia |
| থেসপেশিয়া | Thespesia |
| দুপুরেচণ্ডী | Pentapetes |
| দেবদারু | Polyalthia |
| দোপাটি | Impatiens (balsam) |
| দোলন চাঁপা | Hedychium |
| নয়নতারা | Vinca |
| নাইজেলা | Nigella |
| নাগলিঙ্গম | Couroupita |
| নাগেশ্বর | Mesua |
| নার্শিসাস | Narcissus |
| নিকোটিয়ানা | Nicotiana |
| নিপোফিয়া | Kniphofia |
| নীলমণিলতা | Petrea |
| নেমিসিয়া | Nemesia |
| নেমোফিলা | Nemophila |
| ন্যাশটারসিয়াম | Tropaeolum (nasturtium) |
| পদ্ম | Nelumbium |
| পপি | Papaver (poppy) |
| পয়েনসেটিয়া | Poinsettia |
| পরচুল্যাকা | Portulaca |
| পলাশ | Butea |
| পাইন | Pinus |
| পাইরোষ্টেজিয়া | Pyrostegia |
| পাতাবাহার | Codiaeum (croton) |
| পাথরকুচি | Bryophyllum |
| পান্থপাদপ | Ravenala |
| পাম | Palm |
| পালতে মাদার | Erythrina |
| পিটুনিয়া | Petunia |
| পিপারোমিয়া | Peperomia |
| পিমপেনেলা | Pimpinella |
| পিলিওনিয়া | Pellionia |
| পেট্রিয়া | Petrea |
| পেডিলেন্থাস | Pedilanthus |
| পেণ্টাস | Pentas |
| পেল্টোফোরাম | Peltophorum |
| পোথোস | Pothos |
| পোর্টল্যানডিয়া | Portlandia |
| পোসোকুরিয়া | Posoqueria |
| প্যানক্রেটিয়াম | Pancratium |
| প্যানজি | Viola (pansy) |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| প্যানডোরিয়া | Pandorea |
| প্যানাক্স | Panax |
| প্লামবাগো | Plumbago |
| ফার্ণ | Fern |
| ফিকাস | Ficus |
| ফিটোনিয়া | Fittonia |
| ফিলিসিয়াম | Filicium |
| ফিলোডেনড্রন | Philodendron |
| ফুরক্রেয়া | Furcraea |
| ফুরুস | Lagerstroemia (shrub) |
| ফেলিসিয়া | Felicia |
| ফ্যাসেলিয়া | Phacelia |
| ফ্রান্সিশিয়া | Franciscea |
| ফ্রিজিয়া | Freesia |
| ফ্লক্স | Phlox |
| বকফুল | Sesbania |
| বকুল | Mimusops |
| বট | Ficus |
| বরুণ | Crataeva |
| বাঁশ | Bambusa |
| বাবলা | Acacia |
| বিগোনিয়া | Begonia |
| বিগ্নোনিয়া | Bignonia |
| বিলবার্জিয়া | Billbergia |
| বুগেনভিলিয়া | Bougainvillaea |
| ব্যমণ্টিয়া | Beaumontia |
| ব্রাউনিয়া | Brownea |
| ব্রাচিকোম | Brachycome |
| ব্রানফেলসিয়া | Brunfelsia |
| ব্রায়া | Brya |
| ব্রায়োলিয়া | Browallia |
| ভারবিনা | Verbena |
| ভিক্টোরিয়া রেজিয়া | Victoria |
| ভুঁই চাঁপা | Kaempferia |
| মধুমালতী | Quisqualis |
| মাধবীলতা | Hiptage |
| মায়োসিটিস | Myosotis |
| মালতী | Echites |
| মালপিগিয়া | Malpighia |
| মিগনোনেট | Mignonette |
| মিনা লোবাটা | Ipomea (mina lobata) |
| মিমুলাস | Mimulus |
| মিলেটিয়া | Milletia |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| মুসায়েনডা | Mussaenda |
| মেসেমব্রিয়ান্থিমাম | Mesembryanthemum |
| মেহেদি | Lawsonia |
| মোরেয়া | Moraea |
| ম্যাগনোলিয়া | Magnolia |
| ম্যারাণ্টা | Maranta |
| রঙ্গন | Ixora |
| রজনীগন্ধা | Polianthes |
| রণডেলেটিয়া | Rondeletia |
| রনানকুলাস | Ranunculus |
| রামধন চাঁপা | Ochna |
| রাসেলিয়া | Russelia |
| রেক্স বিগোনিয়া | Begonia-rex |
| রেড়ি | Ricinus |
| লঙ্কাজবা | Malvaviscus |
| লনিসেরা | Lonicera |
| লাইনাম | Linum |
| লাইনেরিয়া | Linaria |
| লাভ-লাইজ-ব্লিডিং | Amaranthus (love-lies-bleeding) |
| লার্কস্পার | Delphinium (larkspur) |
| লিলিয়াম | Lilium |
| লুপিন | Lupinus |
| লেবু | Citrus |
| লেমোনিয়া | Lemonia |
| ল্যানটানা | Lantana |
| শালুক | Nymphaea |
| শিউলি | Nyctanthes |
| শিমুল | Bombax |
| শ্বেত শিমুল | Ceiba |
| ষ্টক | Matthiola (stock) |
| ষ্টারকিউলিয়া | Sterculia |
| ষ্টিক্টোকার্ডিয়া | Stictocardia |
| ষ্টিফানোটিস | Stephanotis |
| ষ্টেমাডেনিয়া | Stemmadenia |
| ষ্ট্যাকিটারফিটা | Stachytarpheta |
| ষ্ট্যাটিস | Statice |
| ষ্ট্রবিলেন্থাস | Strobilanthes |
| ষ্ট্রেলিৎজিয়া | Strelitzia |
| সন্ধ্যামণি | Mirabilis |
| সর্বজয়া | Canna |
| সাইকাস | Cycas |
| সাকুলেণ্ট | Succulent |
| সারবেরা | Cerbera |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| সিনেরারিয়া | Senecio (cineraria) |
| সিলোশিয়া | Celosia |
| সুইট উইলিয়াম | Dianthus (sweet william) |
| সুইট পী | Lathyrus (sweet pea) |
| সুইট সুলতান | Centaurea (sweet sultan) |
| সুখদর্শন | Crinum |
| সূর্যমুখী | Helianthus (sunflower) |
| সেটক্রিসিয়া | Setcreasea |
| সোনাঝুরি | Acacia |
| সোনালী শিমুল | Cochlospermum |
| স্থলপদ্ম | Hibiscus |
| স্পাথিফাইলাম | Spathiphyllum |
| স্প্যাথোডিয়া | Spathodea |
| স্যাপোনারিয়া | Saponaria |
| স্যারিটা | Sarita |
| স্যালভিয়া | Salvia |
| হলিহক | Althaea (hollyhock) |
| হাইমেনাথেরাম | Hymenatherum |
| হায়াসিন্থ | Hyacinth |
| হাস্নাহানা | Cestrum |
| হিপিয়াষ্ট্রাম | Hippeastrum |
| হেমারোকেলিস | Hemerocallis |
| হেমেন্থাস | Haemanthus |
| হেমেলিয়া | Hamelia |
| হেলিওট্রোপ | Heliotropium |
| হেলিকনিয়া | Heliconia |
| হেলিক্রিসাম | Helichrysum |
| হোমস্কিয়োলডিয়া | Holmskioldia |
| হ্যামিলটোনিয়া | Hamiltonia |

Govt. of West Be

## গাছের নাম

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নাম |
|---|---|
| অগ্নিশিখা | Gloriosa |
| অতসী | Crotalaria serisia |
| অর্কচূড় | Araucaria |
| আর্কিড | Orchid |
| অর্জুন | Terminalia arjuna |
| অলকনন্দা | Allamonda |
| অলকলতা | Odontadenia |
| অপরাজিতা | Clitoria ternatea |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| অশোক | Saraca indica |
| অশ্বত্থ | Ficus religiosa |
| আকাশ নিম | Millingtonia hortensis |
| আনন্দ চাঁপা | Magnolia pterocarpa |
| আম | Mangifera indica (mango) |
| এলোকেশী | Alocasia |
| কঙ্কণা | Crossandra |
| কচুরিপানা | Eichhornia |
| কদম্ব | Anthocephalus |
| কনকলতা | Pyrostegia venusta |
| কমললতা | Campsis grandiflora |
| করঞ্জ | Pongamia glabra |
| করবী | Nerium Oleander |
| করমচা | Carissa carandus |
| কলকে | Thevatia nerifolia |
| কলাপী | Caladium |
| কস্তুরী | Quassia |
| কাঞ্চন | Bauhinia |
| কাঠালি চাঁপা | Artabotrys |
| কামিনী | Murraya |
| কিন্নরী | Adenium obesum |
| কিরণময়ী | Clerodendron |
| কিরীটিনী | Amaryllis |
| কুন্দ | Jasminum pubescens |
| কুরচি | Holarrhena |
| কৃষ্ণচূড়া | Poinciana regia |
| কেয়া | Pandanus |
| গন্ধরাজ | Gardenia |
| গাঁদা | Tagetes (marigold) |
| গুলঞ্চ | Plumeria |
| গোলকমণি | Haemanthus |
| গোলাপ | Rosa (rose) |
| চন্দ্রচূড় | Sterculia |
| চন্দ্রমল্লিকা | Chrysanthemum |
| চাঁপা | Michelia Champaka |
| চামেলি | Jasminum grandiflorum |
| চিত্রপ্রভা | Geranium |
| চিত্রলেখা | Strobilanthus dyerianus |
| ছন্দতিলক | Thunbergia |
| ছন্দপ্রভা | Tecoma |
| ছাতিম | Alstonia scholaris |
| ছোট কৃষ্ণচূড়া | Caesalpinia |
| জবা | Hibiscus |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| জয়তী | Jatropha |
| জহুরী চাঁপা | Magnolia pumila |
| জারুল | Lagerstroemia (tree) |
| জির | Ficus retusa |
| জুঁই | Jasminum (jasmine) |
| ঝাঁটি | Barleria |
| ঝাউ | Thuja |
| ঝুমকোলতা | Passiflora |
| টগর | Tabernaemontana |
| ঠোঙা বট | Ficus Krishnae |
| ডমরুপাণি | Dombeya |
| ডালিম-ফুল | Punica granatum |
| ডালিয়া | Dahlia |
| তারামঞ্জরী | Clematis |
| তারামণি | Gerbera |
| তিলকলতা | Lonicera |
| তুষারজ্যোতি | Portlandia grandiflora |
| তেঁতুল | Tamarindus indica |
| দুপুরেচন্ডী | Pentapetes |
| দেবদারু | Polyalthia |
| দোপাটি | Impatiens balsamina (balsam) |
| দোলন চাঁপা | Hedychium |
| দ্রোণ | Holmskioldia |
| নবমল্লিকা | Jasminum gracile magnificum |
| নয়নতারা | Vinca |
| নয়নবিলাস | Plumbago |
| নয়নমণি | Clianthus Dampieri |
| নাগলিঙ্গম | Couroupita guianensis |
| নাগেশ্বর | Mesua ferrea |
| নিম | Melia azadirachta |
| নীলকণ্ঠ | Jacaranda |
| নীলমণি | Petrea arborea |
| নীলমণিলতা | Petrea volubilis |
| নীলাঞ্জনলতা | Jacquemontia violacea |
| পত্রনিধি | Filicium decipiens |
| পত্রবিলাস | Dracaena |
| পত্রমঞ্জরী | Poinsettia |
| পত্ররাগ | Dieffenbachia |
| পত্রলেখা | Mussaenda |
| পদ্ম | Nelumbium |
| পরাশ | Thespesia |
| পলাশ | Butea |
| পাইন | Pinus longifolia |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| পাতাবাহার | Codiaeum (croton) |
| পাথরকুচি | Bryophyllum |
| পান্থপাদপ | Ravenala |
| পার্বতী | Ipomea |
| পালতে মাদার | Erythrina |
| পুত্রঞ্জীব | Putranjiva Roxburghii |
| পুন্নাগ চাঁপা | Calophyllum inophyllum |
| পুলকলতা | Adenocalymna |
| পুরবীলতা | Pothos |
| ফুরুস | Lagerstroemia (shrub) |
| বকফুল | Sesbania |
| বকুল | Mimusops elengi |
| বট | Ficus bengalensis |
| বরুণ | Crataeva Roxburghii |
| বসন্তদূত | Tabebuia |
| বাঁই চাঁপা | Hamiltonia suaveolens |
| বাঁশ | Bambusa |
| বাবলা | Acacia |
| বিচিত্রা | Franciscea |
| বুগেনভিলিয়া | Bougainvillaea |
| বেল | Jasminum sambac |
| বৈজয়ন্ত | Gladiolus |
| বৈদূর্যমণি | Stictocardia beraviensis |
| ভুঁই চাঁপা | Kaempferia |
| ভোর গরবী | Ipomea Morning Glory |
| মণিকুন্তলা | Calliandra |
| মণিমালতী | Stemmadenia bella |
| মধুলতা | Antigonon |
| মধুমালতী | Quisqualis indica |
| ময়ূরপঙ্খী ঝাউ | Thuja orientalis |
| মাধবীলতা | Hiptage madhablata |
| মালতী | Echites |
| ম্যাগনোলিয়া | Magnolia |
| মেহগনি | Sweitenia |
| মেহেদি | Lawsonia inermis |
| রক্তরাগ | Cordia sebestena |
| রক্তোপল | Spathodea campanulata |
| রঙ্গন | Ixora |
| রজনীগন্ধা | Polianthes tuberosa |
| রজনীগন্ধালতা | Stephanotis floribunda |
| রঞ্জনী | Rondeletia |
| রতনচূড় | Pentas |
| রাধাচূড়া | Peltophorum |

| বাংলা নাম | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ |
|---|---|
| রামধন চাঁপা | Ochna wightiana |
| রেড়ি | Ricinus |
| লঙ্কাজবা | Malvaviscus |
| লার্বান | Lemonia |
| লোকেশ্বর | Cassia |
| শতমূলী | Asparagus |
| শর্বাণী | Galphimia |
| শালুক | Nymphaea |
| শ্যামালতা | Trachelospermum jasminoides |
| শিউলি | Nyctanthes arbor tristis |
| শিমুল | Bombax malabaricum |
| শিরীষ | Albizzia |
| শ্বেতচাঁপা | Michelia champaka alba |
| শৈলমঞ্জরী | Rex begonia |
| শৈলমণি | Begonia |
| সন্ধ্যামণি | Mirabilis jalapa |
| সর্বজয়া | Canna |
| সহজ চাঁপা | Magnolia mutabilis |
| স্থলপদ্ম | Hibiscus mutabilis |
| স্বর্ণচূড় | Brya ebenus |
| সিতকণ্ঠ | Posoqueria |
| সিতচম্পা | Eucharis grandiflora |
| সীমন্তক | Amherstia nobilis |
| সুখ চাঁপা | Magnolia fuscata |
| সুখদর্শন | Crinum |
| সুদর্শনা | Anthurium |
| সুলতানী জুঁই | Jasminum sambac species |
| সুহাসিনী | Aralia |
| সূর্যমুখী | Helianthus (sunflower) |
| সোঁদল | Cassia fistula |
| সোনাঝুরি | Acacia Moniliformis |
| সোনালী শিমুল | Cochlospermum gossypium |
| হাস্নাহানা | Cestrum |
| হিমচাঁপা | Magnolia grandiflora |
| হিমরঞ্জন | Colvillea racemosa |
| হিমাঞ্জন | Chorisia speciosa |

STATE INSTITUTE OF EDUCATION Govt. of West Bengal

## Selected Cultivars

## বাছাই প্রজাতির তালিকা

### ROSE

**Hybrid Tea :**

Akebona ; Alec's Red ; Bajazzo ; Big Chief ; Blue Moon ; Century Two ; Cheshire Life ; City of Panjim ; Cock O' North ; Gladiator ; Dr. Homi Bhabha ; Evening Star ; Fantan ; First Federal Gold ; First Prize ; Fragrant Cloud ; Futura ; Golden Gate ; Inge Horstman ; Interflora ; Jadis ; John F. Kennedy ; Joy ; Kiss of Fire ; Klaus Stortebeker ; Kronenburg ; Lady X ; Landora ; Mala Robinstein ; Miss Harp ; Mullard Jubilee ; Oriana ; Papa Meilland ; Parthenon ; Perfume Delight ; Princesse ; Rajaji ; Rebecca ; Red Masterpiece ; Shannon ; Srinivasa ; Sun King ; Super Star ; Susan ; Suspense ; Taj Mahal ; Tushar ; Tzigane ; Whisky ; White Masterpiece.

**Grandiflora :**

Arizona ; Bhikkus Som ; Chitchor ; Fontainebleu ; Montezuma ; Pink Parfait ; The Queen Elizabeth Rose ; Red Gold ; Scania ; Sea Pearl.

**Floribunda :**

Anabell ; Angel Face ; Aparitif ; Artistic ; Banjaran ; Bon Bon ; Charleston ; Colchester Gazette ; Cordula ; Evangeline Bruce ; Flash Light ; Freisia ; Gene Boerner ; Iceberg ; Kum Kum ; Kiskadee ; Lady Eve Price ; Lili Marlene ; Living Fire ; Mambo ; Nimes ; Pandit Nehru ; Rumba ; Spartan ; Strawberry Crush ; Wouburn Abbey ; Zambra.

### DAHLIA

**Giant Decorative :**

African Jester ; Axford Gold ; Barbara Marshal ; Bhikkus Vivek ; Challenger ; Cherokee Beauty ; Croydon Ace ; Croydon Dawn ; Croydon Delicate ; Croydon Masterpiece ; Croydon Monarch ; Croydon Sensation ; Croydon Snotop ; Donald Vandemark ; Dixie's Winedot ; Fancy Free ; Grace Hay ; Kelvin ; Kelvin Rose ; Kenya ; Kenya Sport ; Majestat ; Nearest Blue ; Nobby's Light ; Our Friend ; Prime Minister ; Red Glamour ; September Queen ; Shirley Wright ; Shri Ramkrishna ; Thelma Davidson ; The Master ; Vigour ; White Nobby's Light ; White Pop Harris ;

Winifred Stredwick.

**Other types :**

Bhikkus Mother ; Bholaram ; Blackout Sport ; Cabaret ; Cheerio ; Clarissa ; Dandapani Sport ; Dorothy Stanton ; Glory of Shyamalatal ; H. M. Queen Elizabeth ; Holland Festival ; Juanita ; Lace Maker ; Pop Harris ; Potgaiter ; Sarada Devi ; Swami Lokeswarananda ; Terry ; Willy Mullen ; Xantine.

## CHRYSANTHEMUM

Ajina Purple ; Alfred Simpson ; Angel Bell ; Anokha ; Birmingham ; Bravo ; Coronation Pink ; Cover Girl ; Dr. S. Mukherjee ; Dream Castle ; Edith Cavell ; Fire Flash ; Garden Estate ; General Petain ; Gloria Deo ; Green Goddess ; Green Sensation ; Improved Louisa Pockett ; Innocence ; J . S . Lloyd ; Jet Snow ; Kasturba Gandhi ; Kikubiori ; Leviathan ; Louisa Pockett ; Maharaja of Sikkim ; Mark Woolman ; Mrs. W. A. Reid ; Mountaineer ; Pink Cloud ; Rajah ; Rangmahal ; Red Westfield ; S. L. Andre Reffaurd ; Shirley Perfection ; Snowball ; Sonar Bangla ; Super Giant ; Surprise D'orsy ; Universe ; Valiant ; Violet Queen ; William Turner.

## BOUGAINVILLAEA

**Single Bougainvillaea :**

Blondie ; Elizabeth Angus ; Gillian Greenswith ; Glady's Hepburn ; Golden Glow ; Gopal ; Isobel Greenswith ; Jennifer Fernie ; Kayata ; Killie Campbell ; Killie Campbell Triangle ; Lady Mary Baring ; Lilac Perfection ; Mary Palmer ; Mary Palmer White ; Mrs. Enid Lancaster ; Meriol Fritz Patrick ; Nawab Ali Yar Jung ; Nigrette ; Partha ; Phillips no. 2 ; Pixie ; Poultonii Special ; R. R. Pal ; Refulgens ; Srimati Biezli ; Snow White ; Splendens Improved ; Srinivasa ; Temple Fire ; Tomato Red ; Trinidad ; Turley's Special.

**Double Bougainvillaea :**

Mahara Crimson ; Mahara Off-white (Cherry Blossom) ; Mahara Orange-salmon (Roosevelle's Delight) ; Mahara Pink (Los Benos Beauty).

**Variegated (leaf) Bougainvillaea :**

Lady Mary Baring Variegated ; Mahara Crimson Variegated ; Mary Palmer Variegated (Thimma) ; Partha Variegated ; Rodney Jonklass ; Scarlet Queen Variegated (Rao).

## HIBISCUS

**New Single Hibiscus :**

Battalion ; Chester Frowe ; Cromwell ; Exquisite ; Hubba Hubba ; Kanaka Nui ; Leberacea ; Morley Theaker ; Niumalu ; Mai Mai ; Sebactani ; Vasco ; White Pink centre. Note : Many varieties are still unnamed.

**Older Single Hibiscus :**

Agnes ; Australian Rose ; Gilt ; Gilt White ; Hawaii White ; Lakshmi ; Major Gage ; My Beauty ; Netaji White ; New Orange ; Pink Beauty ; Splendens ; Viceroy.

**Double Hibiscus :**

Aurora ; Centenary ; Daffodil ; Golden Giant ; Golden Gleam ; Juno ; Jupiter ; Mahatma ; May Walker ; Rajendra Prasad ; Rex Travancorensis ; Salmon Globe ; Sri Lanka ; Subhas Chandra ; Triple Gem.

## CROTON

America ; Challenger ; Chandrika ; Dharnappa ; Ecstasy ; Federation ; Frontier Gandhi ; Gagarin ; Ganga ; Glory ; Indian Prince ; Japan ; Kasturi Rangan ; Kempe Gowda ; Leela ; Mahatma ; Maharaja of Darbhanga ; Maharani Regent ; Narayan Gowda ; Narendra ; Partha ; Raj ; Schomburghiana ; Sch. aurantiaca ; Socolove ; Spearhead ; Spot II ; Tomking ; Valentina Tereshkova ; Vivekananda ; Wilderness.

## গ্রন্থপঞ্জী


1. Bailey, L.H : The Standard Cyclopedia of Horticulture.
2. Benthall, A.P. : The trees of Calcutta and its neighbourhood.
3. Bhatcharji, B.S. : Rose growing in the tropics.
4. Bor, N.L. & Raizada, M.B. : Some beautiful Indian climbers and shrubs.
5. Bose, T.K. & Mukherjee D : Gardening in India.
6. Desai, B.L. : Seasonal flowers.
7. Ghose, B.N. : Beautiful Indian orchids.
8. Gopalaswamiengar, K.S. : Complete gradening in India.
9. Graf, A.B. : Exotica 3.
10. Grindal, E.W. : Everyday gardening in India.
11. Harler, A.W. : The garden in the plains.
12. Menninger, E.A. : Flowering trees of the world.
13. Menninger, E.A. : Flowering vines of the world.
14. Murata, K. : Practical bonsai for beginners.
15. Pal, B.P. : Beautiful Climbers of India.
16. Pal, B.P. : The rose in India.
17. Pal, B.P. & Krishnamurthi, S. : Flowering shrubs.
18. Pocha's garden guide.
19. Shurly, E. : Cacti.
20. Swarup, V. : Garden flowers.
21. Woolman, J. : Chrysanthemums for garden and exhibition.
22. ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও জগদীশ সেনগুপ্ত : ডালিয়া।
23. ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও জগদীশ সেনগুপ্ত : মরসুমী ফুল।


—

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
Govt. of West Bengal

## নির্ঘণ্ট

## শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | যা আছে | যা পড়তে হবে |
|---|---|---|---|
| ১৩ | ১৭ | ক্যানডিটাফট, হায়াসিন্থ | ক্যানডিটাফট হায়াসিন্থ |
| ১৫ | ৩০ | অভিনবত্ব | অভিনবত্বের |
| ১৬ | ১৪ | বুগেনভিলিয়া, স্কারলেট | বুগেনভিলিয়া স্কারলেট |
| ১৮ | ২৬ | ঢলে | ঢাল |
| ২০ | ৩২ | ডাই-এমোনিয়াম সালফেট | ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট |
| ২৩ | ২০ | গঁুটিকলম | গুটিকলম |
| ২৭ | ২৭ | মর্নাটফুমা | মর্নাটজুমা |
| ২৭ | ৩৩ | ব্রিতাইপস | ব্রিভাইপস |
| ২৮ | ৪০ | দেড়ভাগ | তিনভাগ |
| ৩০ | ৪১ | গাছুগুলির | গাছগুলির |
| ৩১ | ৩৭ | ছাঁটবের | ছাঁটবেন |
| ৩৩ | ৪২ | কোয়ারেট | কোলারেট |
| ৩৪ | ২৮ | পাঁচভাগ স্টেরামীল | দশভাগ স্টেরামীল |
| ৩৬ | ১১ | ও কাজ | এ কাজ |
| ৩৯ | ৪ | নয়সেটিট র‍্যামবেলার | নয়সেটি, র‍্যামবলার |
| ৪৩ | ৩৮ | এই টবে এই যে, | টবে সুবিধা এই যে |
| ৪৩ | ৩৯ | এটাও অনেক ফুল দেবার, | যেগুলি অনেক ফুল দেয় |
| ৪৯ | ৪২ | ও সালফেট | ও একভাগ সালফেট |
| ৫০ | ৮ | সারমাটি ছ'ভাগ | সারমাটি ষোলভাগ |
| ৫০ | ১৪ | সাবমাটি | সারমাটি |
| ৫১ | ৩৩ | একটু শক | একটু শক্ত |
| ৫৩ | ১২ | শেকড় গাজিয়ে | শেকড় গজিয়ে |
| ৫৮ | ২৬ | গাছ ভাল | গাছে ভাল |
| ৬০ | ৩৭ | ছডানো | ছড়ানো |
| ৬২ | ৩ | ইত্যাদি চাষের | ইত্যাদি টবে চাষের |
| ৬৬ | ৩৬ | ফুলসহ | ফুলভা |
| ৬৯ | ২৫ | নিচে যাবে | নিচে যাবে না |
| ৭৬ | ৪৩ | মোশানো | মেশানো |
| ৭৭ | ৪১ | স্বল্প উচ্চতায় | স্বল্প উচ্চতার |
| ৮২ | ৩১ | টিলোনিয়া | টিথোনিয়া |
| ৮৪ | ৩৩ | মেরী গোল্ডই | মেরীগোল্ডই |
| ৮৫ | ২০ | এরকম জয়গায় | এরকম জায়গায় |
| ৮৬ | ৩৪ | এটি বেশ | এটি বেশি |
| ৮৮ | ৩৫ | কিছু কিদ্দ | কিছু কিছু |
| ৯০ | ৫ | আরবোরিসা | আরবোরিয়া |
| ৯০ | ৩৪ | এন্যাড | এ্যান্ড |
| ৯২ | ৩৯ | লানটানা ডিপ্লেসা | ল্যানটানা ডিপ্রেসা |
| ৯৩ | ৪ | ফলের | ফুলের |
| ৯৩ | ১৩ | গুটকলমের | গুটিকলমের |

## শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | যা আছে | যা পড়তে হবে |
|---|---|---|---|
| ৯৫ | ২৯ | ওডোরাটিসিমোস | ওডোরাটিসিমাস |
| ৯৬ | ২২ | টোপিয়.রি | টোপিয়ারি |
| ৯৬ | ৩২ | পয়েলাসি:না | পয়েনসিয়ানা |
| ৯৬ | ৩৫ | ফ্লাজা | ফ্লাভা |
| ৯৯ | ১৪ | ল্যাগারষ্টোমিয়া | ল্যাগারষ্ট্রোমিয়া |
| ১০০ | ৩৩ | পর্ভিফ্লোরা | পার্ভিফ্লোরা |
| ১০২ | ৩০ | কম বয়সে | কম বয়সের |
| ১০৪ | ৪ | দুট করিজিয়া | দুটি করিজিয়া |
| ১০৫ | ৫ | নভোসা | নডোসা |
| ১১৩ | ৫ | এলাম্যানডা | এলাম্যানডার |
| ১১৪ | ৩২ | স্প্রেনডেনস | স্প্লেনডেনস |
| ১১৯ | ২ | পোটল্যানডিয়া | পোর্টল্যানডিয়া |
| ১২৫ | ২৪ | লনমোয়ারের | লন মোয়ারের |
| ১২৬ | ৪২ | ল্যাংকাটেরী | ল্যাংকাষ্টেরী |
| ১২৭ | ১০ | ক্রেটেন | ক্রোটন |
| ১২৮ | ১২ | গাছট | গাছ |
| ১২৯ | ২১ | সাধ্যারণত | সাধারণত |
| ১৩৪ | ১৪ | গ্লবরা | গ্লাবরা |
| ১৩৫ | ৩৩ | জ্যাকারানডা বরুণ | জ্যাকারানডা, বরুণ |
| ১৩৬ | ২২ | মাটি সময় | মাটি অনেক সময় |
| ১৩৭ | ১৩ | কোসিয়া | কোশিয়া |
| ১৩৭ | ৪২ | ডা: ছাঁটা | ডাল ছাঁটা |
| ১৫৪ | ৩৬ | পাাখির | পাখির |
| ১৫৬ | ৪ | মধ্যাদিনের | মধ্যাদিনে |
| ১৫৭ | ৩১ | কালো নয়, প্রজাতির | কালো নয় প্রজাতির |
| ১৬৪ | ২০ | ফুল ফোটে | ফুল ফোটা |
| ১৬৫ | ২১ | হোর্মাস্কিয়োলডিয়া | হোর্মস্কিয়োলডিয়া |
| ১৬৬ | ৩ | কথাবর্তায় | কথাবার্তায় |
| ১৭০ | ৩৩ | প্লুমেরিয়া | প্লুমেরিয়া |
| ১৭১ | ১৯ | হবে বা | হবে যা |
| ১৭৫ | ৮ | নিতে পারে | নিতে পারি |
| ১৭৭ | ২০ | জালি | জলি |
| ১৮৩ | ২ | বাংলা নাম | বাংলায় লেখা নাম |
| ১৮৩ | ২ | উদ্ভিদবিদ্যার নাম | ইংলিশে বা ইংলিশ অক্ষরে |
| ১৮৭ | ১ | বাংলা নাম | বইতে ব্যবহৃত নাম |
| ১৯৩ | ৩১ | গাছের নাম | গাছের বাংলা নাম |
| ১৯৪ | ১ | উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ | উদ্ভিদবিদ্যার নাম |

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কয়েকটি ক্ষেত্রে একই ভুল পর পর দেখা দিয়েছে। এদের বেলায় এখানে সংশোধন করা হয়েছে শুধু প্রথম ভুলটির।